প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৩, এপ্রিল, ১৯৫[illegible]

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপসেটিং : পেজমেকার্স
২৩বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রক স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রাক্-কথন

নাটক ও প্রহসন : স্বভাবের অনুকরণ নাটক সৃষ্টির মূলকথা। উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক মানবজীবনকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ কাহিনীই নাটক। প্রহসন নাটকেরই এক শাখা—সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী দশ রূপকের[১] একটি। নাটকের বিস্তার মানবজীবনের সামগ্রিক ব্যাপ্তি ও অপার ঐশ্বর্য নিয়ে। মানবজীবনের দুরধিগম্য দৈনন্দিন জীবনচর্যার সুগভীর ভাবসমূহ নিয়ে রচিত হয় নাটক। শাশ্বত বা চিরন্তন হয় যার যুগাতিশায়ী অনুভাবন। জীবনসমুদ্রের অতলে যে নিস্তব্ধ নিষ্কম্প বিশাল গাম্ভীর্য বিরাজমান তার ছোঁয়া দিয়ে সেখানে অমূল্য মণিমুক্তা সংগ্রহে রত থাকেন নাট্যকার, আর সেই সমুদ্রের উপরিতলের উদ্দাম তরঙ্গ ভঙ্গের উচ্ছল চাপল্যের স্বাদ দিয়ে সেই তরঙ্গ-লাঞ্ছিত অহং-মন্য স্বভাবের ঝিনুকের হাস্যকরতা নিয়ে প্রহসনের রচনাকার সদা ব্যস্ত থাকেন। প্রহসনের কাহিনীতে উচ্চ আদর্শের ছোঁয়া লাগলে প্রহসন নষ্ট হয়ে যায়। অথচ নাটকের কাহিনী নির্বাচনে ভাবগম্ভীর ঘটনা-সকল—পুরাণ, ইতিহাস, সমকালীন জীবন প্রভৃতির সুগভীর মাত্রাযুক্ত কাহিনী অনায়াসে নির্বাচিত হতে পারে। প্রহসনের এই অপূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই সিদ্ধেশ্বর রায় লিখেছিলেন,—"প্রহসনের রস মিষ্ট হইলেও স্থায়ী নহে; সন্ধান তীব্র হইলেও মর্মভেদী নহে। ইহা অস্ত্র ঘায়ের অমোঘ ঔষধ হইতে পারে কিন্তু পুরাতন জ্বরের কেহ নহে।"[২]

প্রহসনের ইতিহাস জানার যৌক্তিকতা : প্রহসনের ইতিহাস জানার যৌক্তিকতার উপর স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রহসনের ইতিহাসকে স্বতন্ত্রভাবে জানার যৌক্তিকতা কোথায়? সাহিত্য সমাজ বিবিক্ত কোন শিল্প সৃষ্টি নয়। প্রতিটি সাহিত্য

---

১. বিশ্বনাথ 'সাহিত্যদর্পণে' রূপকের সংজ্ঞায় বলেছেন,—

দৃশ্য-শ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধামতম্।
দৃশ্যং তত্রাভিনেয়;—

তস্য রূপক সংজ্ঞাহেতুমাহ—

—তদ্ রূপারোপাত্তু রূপকম্।।

তদ্ দৃশ্যং কাব্যং নটে রামাদি স্বরূপারোপাদ্ রূপকমিত্যুচ্যতে। অর্থাৎ দৃশ্যত্ব ও শ্রব্যত্ব ভেদে আবার কাব্য দুই শ্রেণীর। দৃশ্যকাব্য হইতেছে—অভিনেয় (অর্থাৎ অভিনয়ের যোগ্য)।

রূপক সংজ্ঞার কারণ বলা হইতেছে—

রূপের আরোপ করা হয় বলিয়া ইহা রূপক (এই সংজ্ঞায় অভিহিত হয়।)।

দৃশ্যকাব্যকে রূপক বলা হয় এই কারণে যে ইহাতে নটের উপর রাম প্রভৃতি স্বরূপের আরোপ হয়।

রূপকের দশ প্রকার ভেদ সম্পর্কে বিশ্বনাথ বলেছেন,—

রূপকস্য ভেদানাহ—

নাটকমথ প্রকরণং ভাণব্যায়োগ সমবকারডিমাঃ।
ঈহামৃগাংকবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকানি দশ।।

রূপকসমূহ হইতেছে দশ প্রকার : নাটক, প্রকরণ, ভান, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথি ও প্রহসন।

—সাহিত্যদর্পণঃ (শ্রীরামচরণ তর্কবাগীশ কৃত)/ডঃ শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃঃ ৩৬৫—৩৬৬

২. নব্যভারত/১২৯৬ সাল, পৌষ/বঙ্গ সাহিত্যে নাটক সৃষ্টি

শাখায় সমাজ সচেতন কবি-সাহিত্যিকের সচেতন মানসিকতার পরিচয় মুদ্রিত। কারণ চিরকালীন সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণায় সাহিত্যিকেরা যা সৃষ্টি করেন তা সমকালের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও সমকাল অতিক্রমী। বিশেষ কালের নিরীখে তাকে বিচার করা যায় না, কারণ তা নিত্যকালের হয়ে ওঠে। নিত্যকালের কথা যে সাহিত্য বলে থাকে স্বাভাবিক কারণেই তার মধ্যে কোন বিশেষ কালের সঙ্কীর্ণ সমাজবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয় না। তাই কোন দেশের মহৎ সাহিত্যকীর্তিগুলির মধ্যে সেই দেশের সমাজকে বস্তুতাত্ত্বিক বিচারে খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনের সুন্দর দিকগুলিই সৎসাহিত্যের অবলম্বন, জীবনের আলোকিত পথেই তার পদবিক্ষেপ, কিন্তু প্রহসন জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিককে ফুটিয়ে তুলেছে। যে অন্ধকার আলোক সৃষ্টিকে করেছে ত্বরান্বিত। তাই কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসের যথার্থ রূপটিকে দেখতে হলে প্রহসনের মধ্যে তা অনুসন্ধান করতে হবে। বাংলাদেশে যুগে যুগে সমাজচিত্রের যে বিবর্তন, তার হুবহু রেখাচিত্র আঁকতে হলে বাংলা প্রহসনের ইতিহাস জানা আবশ্যক।

প্রহসন সৃষ্টির কারণ : উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশে আধুনিক বাংলা প্রহসন রচনার সূত্রপাত। প্রশ্ন জাগতে পারে হঠাৎ এই সময়েই বা কেন বাংলা প্রহসন জন্মলাভ করল—পূর্বে বা পরে নয় কেন? এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শুরুতেই জানাতে হয় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্তন উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত হয়েছিল প্রহসন সৃষ্টির মূল কারণ ছিল তাই। উনিশ শতকের শুরুতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার দ্বিতীয় দশকের পর থেকে ডিরোজিও-পন্থী ইয়ংবেঙ্গলদের অন্ধ ইংরেজীয়ানা, সাথে সাথেই রাধাকান্ত দেব-বাহাদুরের প্রাচ্য প্রীতি ও ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনা; রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের সমাজ-সংস্কার, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাবলী বাঙালী মানসে এক সুদূরপ্রসারী ভাব-সংঘাত সৃষ্টি করেছিল। সংঘাতমুখর দুই বিরুদ্ধ শক্তি পরস্পরের কার্যধারার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। হাস্যরসের উদ্ভব সম্বন্ধে অমৃতলাল এক জায়গায় লিখেছেন,—

> "পরস্পরের দৃষ্টিকোণের পার্থক্যই হাস্যরসের উৎস। যিনি নিজের দৃষ্টিকোণকেই অপরের দৃষ্টিকোণের চেয়ে সত্য ভাবেন, তিনিই অপরের কার্য্যে কটাক্ষ করে হাসেন।"[১]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপন্থী বাঙালীরাও পরস্পরের প্রতি তেমনি কটাক্ষ করলেন। উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন, ধর্মীয় আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতি সুদূরপ্রসারী দিক নয়—প্রহসনের বিষয়বস্তুরূপে স্থান পেল এই সব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মেকি বা ভণ্ডদের হাস্যকর কার্যকলাপ। মহৎ সাহিত্যের মধ্যে উপরোক্ত আন্দোলনগুলির গুরুগম্ভীর দিক নিয়ে আলোচনা রয়েছে, প্রহসনে রয়েছে সেগুলির অপূর্ণতার দিক।

উদ্দেশ্য : প্রহসন রচনার উদ্দেশ্য সব ক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। সার্থক প্রহসন উদ্দেশ্যমূলক হবে কি হবে না এ প্রসঙ্গও বিতর্কিত। রসরাজ অমৃতলাল বসু স্বয়ং বলেছেন প্রহসন দেখতে হলে প্রয়োজন মানসিক পরিচ্ছন্নতার। প্রহসনের উদ্দেশ্য নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি। এতে Satire থাকলেও তা অনেকক্ষেত্রে humour-এ পর্যবসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রহসন সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রহসনকার দ্বিধাগ্রস্ত। হরিমোহন রায় 'মাগ সর্বস্ব' (১৮৭০) প্রহসনের ভূমিকায় বলেছেন,—

---

১. জয়তি (শারদীয়া সংখ্যা)/১৩৬৫বঙ্গাব্দ/কমলাকান্তের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে ভূমিকা

"প্রহসনাভিনয়ে যে সামাজিক দোষের কথঞ্চিৎ সংশোধন হয়, ইহা সর্বতোভাবে সম্ভব; কিন্তু বঙ্গদেশে প্রহসনের সংখ্যা অতি অল্প প্রযুক্তই যে সামাজিক দোষের বৃদ্ধি হইতেছে এমত নহে। তবে প্রহসনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি কিঞ্চিৎ দোষেরও সংশোধন হয়, তাহাই পরম লাভ।"[১]

শ্যামাচরণ ঘোষাল 'বারইয়ারী পূজা' (১৮৭৮) প্রহসনের ভূমিকায় জানিয়েছেন 'সমাজের কতকগুলি কুরীতি সংশোধন করাই আমার পুস্তকখানির একমাত্র উদ্দেশ্য'।

সুতরাং সমাজ সংশোধন এক শ্রেণীর প্রহসনকারের অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু আর এক শ্রেণীর প্রহসনকার বিকৃত রুচির মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য প্রহসন রচনা করতেন। বটতলার সাহিত্য তখনও সৃষ্টি না হলেও ওই ধরনের সাহিত্য রচনার ব্যাপার তখনও ছিল। বেচুলাল বণিক 'সচিত্র হনুমানের বস্ত্রহরণ' (১৮৮৫)-এর 'ভূমিকার ধাক্কা'য় লিখেছেন নিছক ব্যবসার জন্যই তিনি প্রহসন রচনা করেছেন,—

"বৈখানি আমার যে হুড়মুড় করে বিক্রী হবে তাতে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। নিশ্চয় জানি আমার ব্যবসা ফস্কাবে না।"[২]

সুতরাং প্রহসন রচনার উদ্দেশ্যরূপে আমরা প্রাপ্ত মন্তব্যের ভিত্তিতে তিনটি কারণ নির্দেশ করতে পারি,—

(i) নিছক নির্মল আনন্দদানের উদ্দেশ্যে প্রহসন রচনা।

(ii) সমাজ সংশোধন।

(iii) রুচিবিকৃত মানুষের চাহিদা অনুসারে ব্যবসার জন্য প্রহসন রচনা।

প্রথম শ্রেণীর প্রহসনগুলির মধ্যেই আমরা সাহিত্যমূল্য খুঁজে পাই—দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর প্রহসনগুলি নিছক সমাজচিত্র এবং যুগরুচির ক্লেদাক্ত পরিচয়ে অ-সাহিত্য পদবাচ্য। বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রহসনগুলির উপর আলোকপাত করারই চেষ্টা করব।

সাধারণ লক্ষণ : প্রহসনের উদ্ভব তার অগ্রগতির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে প্রহসনের লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় কথা জেনে নেওয়া দরকার। সাধারণভাবে মনে হয়, লঘু ঢঙে সংলাপের মাধ্যমে রচিত সংক্ষিপ্ত নাটক হল প্রহসন। কিন্তু সংক্ষিপ্ততা, উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে হাস্যরসের সহজ প্রকাশই প্রহসনের সব বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করে না। প্রহসনের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটনের জন্য বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। বাংলা নাটক উদ্ভবের পশ্চাতে যেমন তিনটি ধারার অনুপ্রেরণা ক্রিয়াশীল, বাংলা প্রহসনের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো গ্রহণের পশ্চাতেও তেমনি রয়েছে ত্রিধারার ত্রিবেণী সঙ্গম।

লৌকিক প্রহসনের প্রভাব ঃ বাংলা প্রহসনের প্রাণভোমরা লুক্কায়িত ছিল লৌকিক ধারার মধ্যে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যায় স্থূল হাস্যরসের দিকে ছিল তৎকালীন সাধারণ মানুষের প্রবল আকর্ষণ। মঙ্গলকাব্যের আঁটোসাঁটো কাঠামোতেও হর গৌরীর সংসার বর্ণনার সময় অথবা নায়কের বিবাহযাত্রার প্রাক্কালে হাস্যরস সৃষ্টির পথ

১. সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন/জয়ন্ত গোস্বামী/পৃঃ২১

২. ঐ/পৃঃ ২২

নির্মাণ করে নিয়েছিলেন কবিগণ। তির্যক বাক্‌ভঙ্গীর মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টির ব্যাপারটিও তৎকালে দুর্লক্ষ্য ছিল না। গ্রাম বাংলার জনসাধারণকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিত যে গ্রামীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটগীত, গম্ভীরা গান, ভুচুং বাউল প্রভৃতি। মেদিনীপুর জেলায় পালাধর্মী এক ধরনের সঙ্‌যাত্রা পাওয়া যায় যাকে প্রহসনের পূর্বসূরীরূপে উল্লেখ করা যায়। সমকালীন গ্রামীন কোন কেলেঙ্কারী বা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে লোককবি স্থূল ভাঁড়ামোর দ্বারা সে নাটিকায় প্রকাশ করে হাস্যরস বিতরণ করেন। এই সঙ্‌যাত্রাও চৈত্র বা বৈশাখ মাসে হয়ে থাকে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ ঘোষালের 'বারইয়ারী পূজা' প্রহসনে এই ধরনের সঙ্‌যাত্রার কথা পাই,—

"শশী।। কাল ভূত সেজে এসে কি নাকালটাই করলে ভাই।

আমোদিনী।। তবু যদি মহেশ চক্রবর্তী দলের ভূত পেত্নী দেখ্‌তিস্‌, তাহলে আর হেসে বাঁচতিস্‌ নে।

শশী।। যা হোক ভাই, বড় বেহায়াপণা করে। তাইতেই বাবা আমাদের যাত্রা শুনতে যেতে বারণ করেন।

আমোদিনী।। তা ভাই, একটু নকল না করলে কি যাত্রা ভাল লাগে?"

লোক প্রচলিত এই সঙ্‌যাত্রাগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন লিখিত রূপ ছিল না। অভিনেতৃগণ অনেক ক্ষেত্রেই ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন। একজন মূল গায়েন থাকতেন যিনি মুখে মুখে কাহিনী বাঁধতেন। মহড়ার দিন অভিনেতাদের কাহিনীটুকু জানিয়ে দিতেন। অভিনেতৃবৃন্দ নিজেরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সরস উক্তি-প্রত্যুক্তি চালিয়ে কাহিনীকে পরিসমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যেতেন। গ্রাম-বাংলার বুকে বসবাস করেও এইভাবে তাঁর চার পাশের সামাজিক ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করার দুঃসাহস সঙ্‌দারেরা বছরে কেবলমাত্র একটি সময়েই পেতেন।[১] এসময় কার্টুনিস্টদের মত যেন তাঁদের অধিকার-সীমা বহুদূর বিস্তৃত হতো। জনৈক প্রাবন্ধিক বলেছেন,—

"অতএব বাংলা প্রহসনের লৌকিক ধারার বীজ, কাহিনীর অবকাশের মধ্যে উপস্থাপিত

---

১. শ্যামাপদ দোলুই/ঘাটাল, রাধানগর/সঙ্‌যাত্রার মূল গায়েন প্রদত্ত তথ্য সঙ্‌যাত্রার মূল গায়েন প্রদত্ত তথ্য—

(ক) শ্যামাপদ দোলুই/রাধানগর, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা/গুণধর ধাড়া, ঐ

(খ) হুগলী জেলার আবদুল লতিফের সঙ্‌যাত্রার দল আছে 'কালীমাতা অপেরা'। সমাজ- সমস্যা অবলম্বী কয়েকটি সঙ্‌যাত্রার পালা গান করেন তাঁরা। —'কার পাওনা', 'কালের হাওয়া', 'জোড়া লাগা' বা 'শিবদুর্গার বরপ্রাপ্তি'। আবদুল লতিফের মতে—

(i) সঙ্‌যাত্রার মূল উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা বা সামাজিক ন্যায় রক্ষা।

(ii) সঙযাত্রা এবং ভাঁড় নাচ সমধর্মী। বীরভূমের লেটোর সঙ্গে এর মিল রয়েছে।

(iii) সঙ্‌যাত্রার কাহিনী হয়ে থাকে চিত্তাকর্ষক।

(iv) রাজনীতির কচ্‌কচির প্রতি সঙ্‌যাত্রার আকর্ষণ কম।

(গ) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও লক্ষ্য করেছেন— "যাত্রার মত এক শ্রেণীর লৌকিক নাটক (Folk drama) অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে চলিয়া আসিতেছে। মধ্যযুগে ইহাকেই নাটগীত বলিত। এমন কি, ইহা স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায় যে, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে একটি প্রচলিত লোক-নাট্যের ধারাকেই সংস্কার করিয়া ইহার একটি আদর্শ রূপ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রাচীনতর কাল হইতে প্রচলিত সেই লোক-নাট্যের ধারাটি লুপ্ত হইয়া যায় নাই—তাহা কখনও লুপ্ত হইয়া যাইতে পারেও না।"

[বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১ম)/ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য/ পৃঃ ৮০।]

গ্রন্থানুবর্তী হাস্যরসাত্মক গীত এবং গ্রন্থাতিবর্তী স্বাধীন হাস্যরসাত্মক কথোপকথনের মধ্যেই আহিত ছিলো।"[১]

সুতরাং প্রাবন্ধিকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লৌকিক ধারার সঙ্যাত্রার মধ্যে প্রহসনের দুটি লক্ষণ মেলে—(ক) হাস্যরসাত্মক সংলাপ (খ) হাস্যরসাত্মক গীত। কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত বিষয়ের আলোচনার অবকাশে আমরা দেখেছি লৌকিক সঙ্যাত্রা সমকাল-ব্যতিরিক্ত বিষয় নির্বাচন সাধারণত করে না; সুতরাং (গ) সমকাল ভাবনাও লৌকিক ধারার হাস্যরসাত্মক রচনায় মেলে। অভাবটা তাহলে কি? অভাব লিখিত আঁটো-সাঁটো ফর্মের, অভাব ভাঁড়ামি অতিক্রমী মার্জিত দৃষ্টিভঙ্গীর। কিন্তু প্রহসন রচনা করতে গিয়ে রচয়িতাগণ যে ভাঁড়ামিকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি মধুসূদন দত্ত পর্যন্ত তার উজ্জ্বল উদাহরণ শব্দব্যবহারে শুচিবায়ুগ্রস্ততা যাঁর মজ্জাগত।

সংস্কৃত প্রহসনের প্রভাব ঃ বাংলা প্রহসন তার নিজস্ব কাঠামো পেয়েছিল এবং সাহিত্যের আঙ্গিকে নিজ দাবি পেশ করার অধিকার লাভ করেছিল সংস্কৃত প্রহসনের ধারার সুগভীর অনুসরণ ও অনুশীলনে। 'সাহিত্য দর্পণে'র ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রহসনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। সংস্কৃত প্রহসনের লক্ষণগুলি নিম্নোক্ত শ্লোকে অভিব্যক্ত হয়েছে,—

"ভাণবৎ-সন্ধিসন্ধ্যঙ্গলাস্যাঙ্গাঙ্কৈর্বিনির্মিতম্।
ভবেৎ প্রহসনং বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতম্।।
অত্র নারভটী, নাপি বিষ্কম্ভক-প্রবেশকৌ।
অঙ্গী হাস্যরসস্তত্র বীথ্যঙ্গানাং স্থিতির্নবা।।
তপস্বি-ভগবদ্‌বিপ্রপ্রভৃতিষ্বত্র নায়কঃ।
একো যত্র ভবেদ ধৃষ্টো হাস্যং তচ্ছুদ্ধমুচ্যতে।।
বৃত্তং বহূণাং ধৃষ্টানাং সংকীর্ণং কেচিদুচিরে।
তৎ পুনর্ভবতি দ্ব্যঙ্কমথ বৈকাঙ্কনির্মিতম্।।[২]

অর্থাৎ যে দৃশ্যকাব্যে ভাণের মতো দুটি সন্ধি যথাসম্ভব সন্ধ্যঙ্গ, লাস্যাঙ্গ এবং একটি মাত্র অঙ্ক থাকবে, যেখানে নিন্দনীয় ব্যক্তির কবিকল্পিত বৃত্তান্ত বর্ণিত হবে—সেই রূপককে বলা হয় **প্রহসন**। সুতরাং সংস্কৃত প্রহসনের সংজ্ঞায় আমরা লক্ষ্য করতে পারি—সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র প্রহসনের গুরুত্ব বিচার করেছে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণের উপর নির্ভর করে। লক্ষণগুলি,—

(i) কাঠামো—এক অঙ্ক থেকে দুই অঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত।

(ii) রস—হাস্যরস।

(iii) চরিত্র—কোন তপস্বী বা বিপ্র প্রহসনের নায়ক হবেন।

সংস্কৃত প্রহসন রীতির চরিত্র বিষয়ক বিশেষ লক্ষণটি বাংলা প্রহসনে গৃহীত নয়। অন্য দুটি লক্ষণ অনুসৃত হয়েছে।

পাশ্চাত্য প্রহসনের প্রভাব ঃ ইংরেজী Farce শব্দটির প্রতিশব্দরূপে আমরা প্রহসন শব্দটিকে গ্রহণ করে থাকি। ল্যাটিন 'Farcita' শব্দ থেকে ইংরেজী Farce শব্দের উদ্ভব।

---

১. সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন/ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী/পৃঃ ৭

২. সাহিত্যদর্পণ/বিশ্বনাথ চক্রবর্তী/সম্পাদনা ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়/পৃঃ ৫২৮—৫২৯

Farcita শব্দ এসেছে Farcio থেকে। Farcio শব্দের অর্থ হল বাজে কথায় নিম্নস্তরের ভাঁড়ামি। সুতরাং সে অর্থ ধরলে Farce বা প্রহসন বলা হবে সেই নাটিকাকে—যাতে স্বল্পায়তনের মধ্যে স্থূল রুচিসম্পন্ন লঘু হাস্যরসের প্রকাশ ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় পাশ্চাত্য লঘুরসাত্মক নাটকগুলিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—

(ক) **বারলেস্ক** (Burlesque) ঃ লঘু রসের নাটক ঃ ব্যক্তিগত আক্রমণ মুখ্য।

(খ) **এক্স্ট্রাভ্যাগাঞ্জা** (Extravaganza) ঃ পৌরাণিক বিষয়বস্তুর আধারে রচিত।

(গ) **কমেডি** (Comedy) ঃ লঘু রসের মিলনান্তক নাটক।

(ঘ) **ফার্স** (Farce) ঃ Farce-এর সংজ্ঞায় Encyclopedia Britanica জানিয়েছে—

"A Form of Comedy in dramatic art, the object of which is to excite laughter by rediculas situations and incidents."

সাহিত্যতাত্ত্বিক অধ্যাপক নিকল বলেছেন Farce-এর কাহিনীতে (ক) অসম্ভাব্যতা ও (খ) মাত্রাতিরিক্ততার কথা। জনৈক বিদেশী সমালোচক বলেছেন,—

"The Vices and follies of everyday life and occasionally political life were burlesqued and caricatured and its object was good natured fun."

'Greek Gomedy' গ্রন্থে সমালোচক Norwood বলেছেন,—

"Farce may be defined as exaggerated comedy ; its problem is unlikely and absurd, its action ludicrous and one-sided, its manner entirely laughable."

উদাহরণ আর সংখ্যায় বাড়িয়ে লাভ নেই। Farce সম্পর্কে পাশ্চাত্য গবেষকদের মতামত থেকে Farce -এর লক্ষণগুলি আমরা চিহ্নিত করতে পারি—

Encyclopedia Britanica বলেছে—(i) Farce-এর কাঠামো কমেডি (ii) মূলরস হাস্যরস (iii) অদ্ভুত পরিস্থিতির কথা নিকল বলেছেন, (iv) অসম্ভাব্যতা, (v) মাত্রাতিরিক্ততার কথাও। পরের সংজ্ঞায় আছে (vi) প্রাত্যহিক জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা (vii) চরিত্রে ত্রুটিসমূহের অনুকরণ (viii) Farce-এ থাকে নাট্যকারের কিছুটা পক্ষপাতিত্ব। Norwood-এর সংজ্ঞায় সেকথা আমরা জানতে পারি।

পাশ্চাত্য গবেষকবৃন্দ Farce-এর বিষয়বস্তু, রস, মাত্রা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করলেও এর কাঠামো বা বিস্তৃতি নিয়ে আলোচনা করেননি। সেক্ষেত্রে তাই বাঙালী প্রহসন রচয়িতারা সংস্কৃত প্রহসনের অনুসরণ করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উনিশ শতকের প্রহসনকারবৃন্দ পাশ্চাত্য প্রহসনের কয়েকটি লক্ষণকে এড়িয়ে যেতে পারেননি—সেগুলি হলো অদ্ভুত পরিস্থিতি, অসম্ভাব্যতা, মাত্রাতিরিক্ততা, প্রাত্যহিক জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সর্বোপরি নাট্যকারের কিছুটা পক্ষপাতিত্ব।

প্রহসনকারের পক্ষপাতিত্ব : পক্ষপাতিত্ব ব্যাপারটা কিছু আলোচনার দাবি রাখে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে যে এক তীব্র দ্বান্দ্বিক মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছিল সে সময় দুই পক্ষে প্রহসনকারগণও মূলত দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সচেতনভাবে তাঁরা নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা হয়ত কেউ কেউ করেছিলেন কিন্তু অধিকাংশ প্রহসনকারই শেষ পর্যন্ত সমাজ-শোধন বা অন্য উদ্দেশ্যে কলম ধরার কারণে তাঁর নিজের রচনায় কিছুটা পক্ষপাতিত্বের ছাপ

রেখে গেছেন। ফলে এই গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক মূল্য হয়ত কিছুটা কমে গেছে কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তনের রূপরেখাটি অনুভব করতে এই প্রহসনগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলা প্রহসনের লক্ষণ : বাংলা প্রহসনের উদ্ভব এবং অগ্রগতির ইতিহাসে তাই লৌকিক, সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য প্রহসনের প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রহসনের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্মাণের পূর্বে বাংলা প্রহসনের উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলি চিহ্নিত করা যায়,—

১। **কাঠামো বা আঙ্গিক** ঃ

(ক) এক অঙ্ক কিংবা দুই অঙ্কে বিন্যস্ত এবং সংক্ষিপ্ত।

(খ) প্রতি অঙ্কে দৃশ্যের সংখ্যাও দুই তিনের বেশি নয়।

(গ) নক্সাধর্মীও হয়ে থাকে। এক ঘটনার সঙ্গে আর একটি দৃশ্যের বিষয়বস্তুগত কোন মিল নেই।

২। রস ঃ

(ক) অঙ্গীরস হাস্য।

(খ) কোন কোন ক্ষেত্রে করুণরস নাটিকার কিছু অংশকে ভারাক্রান্ত করেছে। আধুনিক প্রহসনের কাঠামোয় এটি লক্ষিত হয়।

(গ) ভাঁড়ামি বা স্থূল হাস্যরসও অনুপস্থিত নয়।

৩। বিষয়বস্তু ঃ

(ক) সমকালীন ঘটনা অবলম্বী।

(খ) সাধারণত পূর্বাপর কাহিনী বা বিষয়বস্তুর যোগ সাধিত হয় কোন একটি চরিত্রের মাধ্যমে নতুবা প্রতি দৃশ্যের ঘটনার সঙ্গে পারস্পরিক কোন নিবিড় যোগ নেই।

৪। চরিত্র ঃ

(ক) টাইপধর্মী চরিত্র হলেও স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

(খ) অধিকাংশ চরিত্রই নিজ নিজ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

৫। সংলাপ ঃ

(ক) চরিত্রের মর্যাদা অনুসারে ভাষা সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে। সাধারণত আঞ্চলিক কথ্য ভাষাই সংলাপের ভাষা হয়ে থাকে।

(খ) ভাষার তির্যকতা প্রহসনের সংলাপের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

সংজ্ঞা : উপরোক্ত লক্ষণগুলির ভিত্তিতে প্রহসনের একটা সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্মাণ করা যেতে পারে। **টাইপধর্মী চরিত্রগুলি তাদের নিজস্ব ভাষাভঙ্গি ও পরিবেশের সীমারেখায় সমকালীন বহু আলোচ্য ঘটনাবলীকে যখন এক থেকে দুই অঙ্কের সীমায়ত নাটিকায় জীবন্ত করে তোলে, তখন হাস্যরসাত্মক সেই নাটিকাকে বলা যায় প্রহসন।**

প্রহসনের গুরুত্ব : প্রহসনের উদ্ভব এবং অগ্রগতির ইতিহাস বড় বিচিত্র। বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে অবহেলিত এই শাখাটি তার প্রতি সন্ধিৎসু গবেষকের দৃষ্টিপাতের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় কত অসংখ্য দিনাতিপাত করেছে। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির মধ্যে যেখানে রয়েছে মন এবং মননের পারম্পর্যপূর্ণ অভিনিবেশ—প্রসঙ্গত সমাজচিত্রের চিত্রায়ণ; প্রহসনের মধ্যে সেখানে ব্যক্ত হয়েছে জীবনের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ রূপে অভিহিত করেন যে সব সমালোচক—প্রহসন তাঁদের

মন্তব্যের পরিপোষকতা করে। Art for arts sake নীতিতে বিশ্বাসীদের মানস-তৃপ্তি ঘটানোর জন্য রয়েছে অন্যান্য সাহিত্যশাখা; কিন্তু উপযোগবাদের ভিত্তিতে রচিত প্রহসনগুলি যুগের মর্মবাণী ও আকাঙক্ষাকে ব্যক্ত করেছে। তাই প্রহসনগুলিকে বিচার করতে হবে তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পটভূমিতে। আধুনিক দৃষ্টিকোণে শত বৎসরেরও বেশী পূর্বে সৃষ্ট প্রহসনগুলির বিচার তাদের প্রতি অবিচারেরই নামান্তর।

যুগ বিভাগ : বিশেষ সামাজিক পটভূমিকায় রচিত প্রহসনগুলির মধ্যে যুগের স্পর্শ অত্যন্ত স্পষ্ট। তৎকালীন রীতিনীতি, ঘর গেরস্থালীর চিত্র, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাদ-প্রতিবাদের ভাষা, নূতনের প্রতি সমর্থন ও অসমর্থনের চিত্র সহজভাবে আঁকা হয়েছে। প্রায় একশ বছরের বেশী সময় ধরে রচিত এই প্রহসনগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এই সমগ্র কালপর্বকে তিনটি স্থূলভাগে ভাগ করতে পারি।

(ক) **প্রহসনের উদ্ভব ও বিস্তারের যুগ** ঃ এই কালপর্বে আমরা দেখার চেষ্টা করব প্রহসনের উদ্ভব থেকে প্রাক্-মধুসূদন কাল পর্যন্ত এর অগ্রগতি ও বিস্তার।

(খ) **ঐশ্বর্য যুগ** ঃ প্রহসনের ঐশ্বর্য যুগের সূচনা মধুসূদন দত্তের হাতে; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, রসরাজ অমৃতলাল বসু পর্যন্ত এই যুগের বিস্তার। এই সুবৃহৎ যুগকে আলোচনার সুবিধার জন্য, প্রায়-সমধর্মী ভাষা ব্যবহারে জন্য স্থূলভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব,—

১। মধুসূদন-দীনবন্ধু কালপর্ব।

২। গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-অমৃতলাল-রবীন্দ্রনাথ কালপর্ব।

(গ) **প্রহসনের রূপান্তরের যুগ বা অবক্ষয়ের যুগ** ঃ এই কালপর্বে আলোচিত হবে অমৃতলাল পরবর্তী নাট্যকারদের রচিত প্রহসনের কথা। বনফুল, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ নাট্যকারদের রচিত প্রহসন এই পর্বের আলোচ্য।

প্রথম অধ্যায়

প্রহসনে অবলম্বিত সমস্যাবলী

বাংলা প্রহসনের গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারাটিকে লক্ষ্য করতে হয়। কারণ সমকালীন নানান সমস্যার চালচিত্র ফুটে উঠেছে প্রহসনগুলিতে। উনিশ শতকের বাংলাদেশে এত অজস্র আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে যে তার সীমা পরিসীমা নেই। রামমোহন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বিদ্যাসাগর প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে প্রাচ্য শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়।[১] শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিস্তরঙ্গ বাঙালী জীবনে এসেছিল নানা ধরনের তরঙ্গাভিঘাত। এ-সময়কার ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রহসনগুলি রচিত হয়েছিল—প্রহসনগুলির পশ্চাৎপট বোঝার জন্য এই আন্দোলনগুলির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক।

ধর্মনৈতিক ঃ খ্রীষ্টধর্ম : ইংরেজ শাসক এদেশে শাসন কায়েম করার সাথে সাথে ধর্মের ক্ষেত্রেও নিজ ধর্ম চাপিয়ে দেবার পরোক্ষ চেষ্টা করেছিল অন্তত উনিশ শতকের প্রথম পর্বে। পোর্তুগীজ মিশনারীরা, শ্রীরামপুর মিশনারীরা প্রাণপণ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক অশিক্ষিত মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাফ এদেশে আসর পর তাঁর প্রচেষ্টায় ডিরোজিও-রিচার্ডসনের দিক্‌ভ্রান্ত

১. ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর রাজা রামমোহন রায় গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে এক পত্রে জানান,—

"...the sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruc-tion, embracing Mathematics, Natural philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talent and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus."

রামমোহন রচনাবলী/হরফ/পৃঃ ৪৩৬

সংস্কৃত কলেজে যোগদানের অব্যবহিত পরে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল বিদ্যাসাগর নিজ শিক্ষা ভাবনা সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন,—

"I have carefully studied the working of system, and the suggestions made are brought forward with the view of facilitating the acquirement of the largest store of sound sanskrit and English learning combined, under the impression that such training is likely to produce men who will be highly useful in the work of imbuing our vernacular dialects with the science and civilization of the western world."

ছাত্রবর্গ তথা ইয়ংবেঙ্গলেরা ধর্মান্তরিত হয়েছিল অনেকেই।[১] সারাদেশ সচকিত হয়ে উঠেছিল, খ্রীষ্টানদের এই আচরণের বিরোধিতা করেছিলেন অনেকেই। গুপ্ত কবি তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গবিদ্ধ করেন ডাফকে।[২] পরিশেষে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেওয়ার সময় ভারতবাসীর ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ না করার কথা ঘোষণা করেন। সেই থেকে বঙ্গদেশে খ্রীষ্টান হবার স্রোত মন্দীভূত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম: পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্রবে আসার পর হিন্দুধর্মের বহু-দেবতাবাদী চিন্তাধারার প্রতি কেউ কেউ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় হিন্দুদের এক ধর্মগ্রন্থ বেদান্তের মধ্যে অনুভব করেন হিন্দুধর্মের সার কথাকে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ করে তিনি যুক্তিবাদী ধর্মচিন্তার পথ প্রদর্শন করেন। বেদান্তের চিন্তাকে পরস্পরের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু রামমোহনের মৃত্যুর পর বেদান্তনির্ভর এই সমাজের দুর্বলতা দূর করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মধর্মে পরিণত করেন। তিনি নিজে প্রথম এ ধর্মে দীক্ষা নেন।[৩] হিন্দু সমাজের নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল ব্রাহ্মসমাজের মূল লক্ষ্য।

১. (ক) ডিরোজিওর শিষ্যগণ কোন ধর্মকেই স্বীকার করতেন না। তাদের নিজস্ব মুখপত্র 'Athenium' এ (মাসিক) মাধবচন্দ্র মল্লিক লেখেন,—'If there is anything that we hate form the bottom of our heart, it is Hinduism.'

(খ) "১৮৩২ সালের ২৮ অক্টোবর ইন্‌কোয়ারারে সংবাদ বাহির হইল যে, হিন্দু কলেজের অন্যতম ছাত্র ও কৃষ্ণমোহনের বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। কলিকাতা সমাজে তুমুল আন্দোলন উঠিল।"/রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ/শিবনাথ শাস্ত্রী/পৃঃ ১১১

(গ) ডিরোজিওর শিষ্যবর্গ এবং ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীকে কেন ডাফ সহজেই খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে আলেকজাণ্ডার ডাফের জীবনীকার প্যাটন সাহেব লিখেছেন,—

"He (Krishnamohun) and his friends were reformers, but they knew themselves to have nothing to give in place of that which they were resolved to demolish. They believed Hindooism false, but what was true they knew not."

বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ/ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়/ পৃঃ ২০১

২. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ প্রসঙ্গে সরসভঙ্গিতে লেখেন,—

"হেদো বনে কেঁদো বাঘ রাঙ্গামুখ যার।
বাপ বাপ বুক ফাটে নাম শুনে তার।।
* * *
শিশু সবে ত্রাণকর্ত্তা জ্ঞান করে ভবে।
বিপরীত লবে পোড়ে ডুব দেয় টবে।।

৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মধর্মে পরিণত করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে,—"....যদি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এক হইবে, জাগ্রত হইবে. এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে।"
আত্মজীবনী/দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর/পৃঃ৬৬

কেননা এঁরা নিজেদের হিন্দু সমাজভুক্ত ভাবতেন। হিন্দুদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের মানসিকতার দূরত্ব বেড়ে গেল ষাটের দশকে সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মদের নানান শক্ত বাঁধনে বাঁধার জন্য কতকগুলি নিয়ম করেন—পৈতা পরিত্যাগ, দাড়ি রাখা, খ্রীষ্টানী পদ্ধতিতে অনুতাপ-পরিতাপ প্রভৃতি।[১] পাত্র-পাত্রীর বিবাহের বয়সের ব্যাপারেও তাঁরা মতামত দিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশব সেনের মতদ্বৈধতার ফলে ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে গেল। কেশব সেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন।

গোঁড়া হিন্দুধর্ম : খ্রীষ্টধর্মের সর্বগ্রাসী বিস্তারে হাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাধাকান্ত দেববাহাদুর 'ধর্মসভা' স্থাপন করেন। হিন্দুধর্মের নামে যা কিছু লৌকিক আচার-আচরণ প্রচলিত ছিল, সেই কুসংস্কারগুলিকেও সমর্থন করতে লাগলেন এই সভার সভ্যবৃন্দ। ফলে সতীদাহ রোধ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের বিরোধিতা করতে লাগলেন তাঁরা। খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজের প্রতি তাঁদের আক্রোশ তীব্র হয়ে উঠল। যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বাহক ডিরোজিও এঁদের চাপে পড়ে হিন্দুকলেজে শিক্ষকতার পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারমুখী কর্মধারা, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি প্রয়াস ও এঁদের বিরোধিতা লাভ করতে থাকে। এই সমাজের ধারক ছিলেন গ্রামগঞ্জের ধর্মধ্বজী ব্রাহ্মণেরাও। এঁদের পাপাচারের চিত্র নানা প্রহসনে অঙ্কিত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, বিলাত গমন, সংস্কারপ্রবণ মানসিকতার বিরুদ্ধে এঁদের সর্বদা বাধাদান প্রয়াসই লক্ষ্য করা যেত।

হিন্দু ধর্মধ্বজী : হিন্দু ধর্মধ্বজীদের একজন তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধবগিরির লাম্পট্য সম্পর্কিত একটি ঘটনা ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গোঁড়া হিন্দু সমাজকে প্রবল আঘাত করেছিল। তারকেশ্বরের কাছে ঘোলা গ্রামে বিয়ে করেছিল অরফ্যান প্রেসের কর্মচারী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তার স্ত্রী বাপের বাড়ীতে থাকত। মোহান্তের সঙ্গে তার মিলন হত গোপনে। এজন্য মোহান্ত তার পিতা-মাতাকে অর্থ দিত। নবীনচন্দ্র শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে সব জানতে পেরে স্ত্রীকে নিয়ে আসতে চায়। মোহান্ত বাধা দেয়। নবীন তখন স্ত্রীকে হত্যা করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে সব কথা বলে নিজে শাস্তি চায়। এই ঘটনা নব্য-হিন্দুরা বেশ সরস মেজাজে গ্রহণ করে এবং গোঁড়া ধর্মধ্বজীদের ধিক্কারে জর্জরিত করতে থাকে তারা নানান প্রহসনে। অমৃতলাল বসু জানিয়েছেন বেঙ্গল থিয়েটারের বাজার যখন খুব মন্দা

---

১. (ক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর/শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল
(খ) ভারত শ্রমজীবী পত্রিকা/অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
(গ) 'বিশ্ব সঙ্গীত' (১২৯৯ বঙ্গাব্দ) পৃঃ৪৬০
অজ্ঞাত কবির লেখা গান,—
"চাপ দাড়ি রাখা চোখে চস্‌মা ঢাকা,
ভয়ানক ঢং লেগেছে বাংলাতে।
এ পথের পথিক নম্বরে অধিক
যায় কেবল ইয়ংবেঙ্গলেতে।"

সেই সময় "....কে একজন বাঙ্গালী (কৃশ্চান বোধ হয়) 'মোহান্তের এই কি কাজ' বলে নাটক লিখলেন, সেই নাটকের অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের নাম সারা বেঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল,...." এই বিষয়কে অবলম্বন করে যে হাস্যরসাত্মক নাটিকাগুলি রচিত হয়েছে সেগুলি দেশীয় সঙ্ জাতীয় রচনা অশ্লীলতা এবং গ্রাম্যতা রচনাগুলির ভূষণ। কিন্তু এগুলি কয়েক বৎসর যাবৎ সাধারণ দর্শকের রুচির খোরাক জুগিয়েছিল। এখানে এই শ্রেণীর প্রহসনগুলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'তারকেশ্বর নাটক অর্থাৎ মহান্তলীলা (১ম)' 'যমালয়ে এলোকেশীর বিচার', 'মোহান্তের কারাবাস' প্রভৃতি, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ রচিত 'মোহান্তের এই কি দশা', 'উঃ। মোহান্তের এই কাজ', 'মোহান্তের এই কি কাজ', লক্ষ্মীনারায়ণ দাস রচিত 'মোহন্তের এই কি কাজ!!' ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মোহন্তের চক্রভ্রমণ', হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'মহান্ত পক্ষে ভূতো নন্দী', দুর্গাদাস ধরের, 'আজকের বাজার ভাও', তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের 'মহান্তের কি দুর্দ্দশা', রাজেন্দ্রলাল ঘোষের 'নবীন মহান্ত', চন্দ্রকুমার দাস রচিত 'মোহান্তর কি সাজা', দক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভণ্ড তপস্বী', নারায়ণ চন্দ্রের 'মোহান্তের য্যায়সা কি ত্যাসা', রাজেন্দ্রলাল দাসের, 'এলোকেশী, নবীন, মোহন্ত', নিমাই চাঁদ শীলের 'তীর্থ মহিমা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রাসঙ্গিকভাবে এ সময় তিনটি প্রধান ধর্মের নানা আচার আচরণকে কেন্দ্র করে প্রহসনে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সংক্ষেপে চিহ্নিত করা যেতে পারে,—

১। ব্রাহ্মধর্মের গোঁড়ামি, কথা-কাজের ফারাক, সংস্কারক হবার প্রচেষ্টা, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিস্তারে পক্ষপাতিত্ব, পোষাক-আশাক, দাড়ি রাখা, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক (ভাই-ভগিনী) বাল্যবিবাহের বিরোধিতা, বিধবা বিবাহের পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি।

২। খ্রীষ্টধর্মকে কেন্দ্র করে খুব বেশী প্রহসন বাংলায় লেখা হয়নি, তবে কোনও কোনও প্রহসনে যীশুর আবির্ভাব নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

৩। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা, অন্ধ পাশ্চাত্য বিদ্বেষ, সমুদ্র যাত্রা নিষেধ, সমাজ অনুশাসন না থাকলেই একঘরে করে দেওয়া, কথা এবং কাজের ফারাক, সমস্ত রকম সংস্কার কর্মের বিরোধিতা, হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যেই আধুনিক বিজ্ঞানের বীজ (শশধর তর্কচূড়ামণি কর্তৃক) আবিষ্কার প্রভৃতি।

রাজনৈতিক ঃ দেশ শাসনের অজুহাতে ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক আরোপিত নানান রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি বা বিলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেও অনেকগুলি প্রহসন রচিত হয়েছে। নিচে এই বিষয়গুলি এবং পরে যথাস্থানে এই বিষয় অবলম্বনে রচিত প্রহসনগুলির নাম উল্লেখ করা যাবে। বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে এই প্রহসনগুলির গুরুত্ব প্রহসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা মাত্র।

(ক) **যুবরাজের ভারতে আগমন** ঃ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র যুবরাজ ওয়েলস ভারতে আসেন। তাঁর কোলকাতা আগমন উপলক্ষে সারাদেশ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। মহারাণীর প্রীতিভাজন হবার জন্য বহু কবি যুবরাজের বন্দনা করে কবিতা রচনা করেছিলেন। এই বিষয় অবলম্বনে কয়েকটি প্রহসনও রচিত হয়েছিল। কোলকাতা হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, যিনি

ওয়েলসকে তাঁর অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে নিজ পরিবারের মেয়েদের দ্বারা যুবরাজকে বরণ করিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন এই প্রহসনগুলির আক্রমণস্থল।[১]

(খ) **টাইটেল প্রসঙ্গ** ঃ ব্রিটিশ শাসক কিছু গুণগ্রাহী তাঁবেদার মানুষ তৈরী করার উদ্দেশ্যে এদেশী বিত্তবান, সম্ভ্রান্ত ও জমিদার শ্রেণীর মানুষদের রাজা, রাজাবাহাদুর, রায়বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি দিয়েছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা রাজাবাহাদুর রায়বাহাদুরদের এক বিস্তৃত তালিকা দিয়ে জানাচ্ছে 'যাঁহারা রাজাবাহাদুর প্রভৃতি খেতাব সকল পাইয়াছেন, তাঁহারা কোন কোন ভালো কাজ করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া সেই সকল খেতাব দিয়াছেন।" বাঙালির টাইটেল লাভ প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক নাটিকা রচিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টাইটেল না ভিক্ষার ঝুলি', প্রিয়নাথ পালিতের 'টাইটেল দর্পণ, বা 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়', দুর্গাদাস দে রচিত 'ল বাবু', ধীরেন্দ্রনাথ পাল রচিত 'ভুটিয়া মালিক বা দারজিলিন্যের নক্সা', গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'বাঙ্গালির মুখে ছাই' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(গ) **মিউনিসিপ্যালিটি প্রসঙ্গ** ঃ শহরে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ বা কমিশনারেরা সমগ্র অঞ্চলের উন্নতির চেষ্টা করবেন উদ্দেশ্য ছিল এটাই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে

---

১. ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজের ভারতে আগমন উপলক্ষে সারাদেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিচয় লিপিবন্ধ রয়েছে তৎকালীন পত্র-পত্রিকায়, কাব্যে, নাটকে। কবি রাধামাধব মিত্র যুবরাজকে বন্দনা করার উদ্দেশ্যে লেখেন 'যুবরাজের অভ্যর্থনা' কবিতা—

"এসো এসো যুবরাজ রাজ বংশধর।
প্রিন্স অব ওয়েলস, ভাবী রাজ্যেশ্বর।।
বৃটনেশা, ভারতেশা, মহারাজ্ঞী যিনি।
তোমায় ধরিয়া গর্ভে, রত্নগর্ভা তিনি।।
তুমি তাঁর প্রাণাধিক, সবজ্যেষ্ঠ সুত।
মাতৃ বশীভূত তুমি, মাতৃভক্তি যুত।।"

রাজার কৃপালাভের উদ্দেশ্য প্রগতিশীলতা দেখাতে গিয়ে হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজকে নিজ অন্তঃপুরে নিয়ে যান। সমসাময়িক অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় বিবেকবান মানুষ জগদানন্দের এই কার্যকলাপকে ধিক্কার জানান। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখে,—

"যে পাষণ্ড নিজ পরিবারের মর্যাদা এইভাবে ধূলিস্যাৎ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না—সে দেশের, জাতির ও সমাজের ব্যাধিস্বরূপ ঘোর কলঙ্ক।"

'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা জগদানন্দের এই কাজের নিন্দা করে লেখে,—

"যে মূল্যে ইনি রাজসম্মান ক্রয় করিলেন তাহাতে সমস্ত জাতির মানসম্ভ্রম আজ পদদলিত হইল।"

'বাজিমাৎ' কবিতায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহকর্মী জগদানন্দকে একহাত নিয়েছেন,—

"সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়;
দেখালে অদ্ভুত কীর্তি বকুলতলায়।।
পুন্য দিনে বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে।
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে।।"

এই বিষয় অবলম্বনে বহু প্রহসনও রচিত হয়েছে, যথাস্থানে সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।

হয়েছে বিপরীত। এই নির্বাচন উপলক্ষে প্রচার, ট্যাক্স আদায় ও অন্যান্য ব্যাপারে যে সব দুষ্কৃতি—তাই প্রকাশিত হয়েছে এ সম্পর্কে রচিত প্রহসনগুলিতে।[১]

সামাজিক : কৌলীন্য সমস্যা : উনিশ শতকের মধ্যভাগে সমাজ সংস্কারমূলক একাধিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বাল্যবিবাহ প্রথা বন্ধ, বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলন, বহুবিবাহ প্রথা রদ প্রভৃতি কৌলীন্য সমস্যাকেন্দ্রিক আন্দোলন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সমাজকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়েছিল। বল্লাল সেন প্রবর্তিত কুলীন সমাজের বিবাহ পদ্ধতিতে দোষানুসারে মেলবন্ধনের রেওয়াজ সৃষ্টি করে দেবীবর ঘটক যে বিষম বিপত্তি ডেকে এনেছিলেন উপরোক্ত সামাজিক সমস্যাগুলি তার থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ইয়ং-বেঙ্গলেরা নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন সমস্যাকে দূর করার জন্য আন্দোলন করেছেন—ফললাভও হয়েছে। রামমোহনের প্রচেষ্টায় ছোটলাট লর্ড বেন্টিঙ্কের সহযোগিতায় সতীদাহ প্রথা আইনত নিরাকৃত হয়েছে, বিদ্যাসাগরের প্রয়াসে বিধবাবিবাহ প্রথা আইনত স্বীকৃত হয়েছে, বাল্যবিবাহ রদ হয়েছে পরে। বিবাহ সংক্রান্ত বিলে বিবাহের উপযুক্ত বর কনের বয়স বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই বিল Civil Marriage Act নামে পরিচিত।

নব্যবঙ্গের উচ্ছৃঙ্খলতা : হিন্দু সমাজের শান্ত নিস্তরঙ্গ বক্ষে কালাপাহাড়ের মতো সর্বধ্বংসী মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন ডিরোজিওর ভক্ত-শিষ্য ইয়ংবেঙ্গলেরা। সামাজিক ধর্মীয় শুচিতা-অশুচিতাকে অতিক্রম করাকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করতেন। নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ, নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণে তাঁদের অপার আনন্দ হত। গোহাড় নিক্ষেপ করতেন তাঁরা গোঁড়া ব্রাহ্মণের বাড়ীতে। পাশ্চাত্য শিক্ষার যুক্তিবাদী বাস্তব চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হলেও অন্ধ বিলাতিয়ানার অনুকরণে অনেকেই হয়েছিলেন পথভ্রষ্ট। বিলাতের যা কিছু সবই তাঁদের চোখে ভালো বোধ হয়েছে এদেশী দ্রব্য মাত্রই বাজে। ইংরেজ অনুকরণে ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে এবং কুসংস্কার ভাঙার জন্য মদ্যপান শুরু করে অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়েছেন, সমাজে দুর্নাম এবং ভৎর্সনা কুড়িয়েছেন।

মদ্যপান ও অন্যান্য নেশা : উনিশ শতকের মধ্যভাগে মদ্যপানের বাড়াবাড়িতে সারা

---

১. ভোট নির্ভর হওয়ার জন্য, সাধু উদ্দেশ্যে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হলেও, শেষ পর্যন্ত তা পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। বৈষ্ণবচরণ বসাকের 'বিশ্ব সঙ্গীত' (১২৯৯ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের একটি গানে ভোটপ্রার্থী ব্যক্তিদের ক্ষণে ক্ষণে চরিত্র বদলের যে পরিচয় দেওয়া আছে তা যথাযথ,—

"তখন কাচা দিয়ে গলে, 'আমায় ভোট দাও' বলে,
দ্বারস্থ হ'য়েছ দ্বারে দ্বার,
এখন বীচি গেছে উলে, সকল গেছ ভুলে,
দেখ্‌লে যেন চিন্‌তে পার না আর।
করে গরীবকে পেষণ শুষ্ককে শোষণ,
সেই রক্ত উঠা ধনের
এই কি ব্যাভার।
ওহে তিল কাঞ্চন হ'লে অনাসে যা চলে,
কর বৃষোৎসর্গ! পেয়ে পরের ভাঁড়ার।"

দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সাময়িক উত্তেজনার জন্য কী শিক্ষিত কী অশিক্ষিত সকলেই মদ্যপান করতে শুরু করেন। মদ্যপানের রেওয়াজ এদেশে থাকলেও উনিশ শতকের মধ্যভাগে এই ব্যাপারে বাড়াবাড়ির পশ্চাতে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ নিস্তরঙ্গ জীবনে মদ্যপান নিয়ে আসে খুশীর আমেজ। দ্বিতীয় কারণ, এই আবেশ সৃষ্টির জন্য মদ ক্রয়ের পূর্ববর্তী অসুবিধা দূর হয়ে গিয়েছিল—মদ্য সুলভ হয়ে উঠেছিল। তৃতীয় কারণ, কুসংস্কার ভাঙার একমাত্র পথ হিসেবে অনেকে মদ্যপান করাকে বীরত্বের কাজ বলে মনে করতেন। চতুর্থ কারণ, বিদেশীদের অনুকরণ করে তাদের মতো সভ্য হতে চেয়ে মদ্যপান করতেন অনেকে। মদের বিরুধে সম্মিলিত জনমত গড়ে তোলার জন্য অনেকে প্রচেষ্টা করেন। ভারত সংস্কারক সভা 'মদ না গরল' (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ) নামে একটি মাসিক পত্র বের করে জনসাধারণকে মদ্যপানের কুফল বোঝানোর চেষ্টা করে। মদের পাশাপাশি চলেছে আফিম, চরস, গুলি, গাঁজা প্রভৃতি মারাত্মক নেশা। অনেক প্রাচ্যদেশীয় আফিম প্রভৃতি নেশাকে নেশা বলে মনে করতেন না, দাওয়াই মনে করতেন। অমৃতলালের 'বাবু' প্রহসনে সেই চিন্তার পরিচয় রয়েছে।

বেশ্যাগমন ব্যভিচার : নেশা সব খায়। খায় মানুষের স্বভাব চরিত্রও। নানান সামাজিক ব্যভিচার ও লাম্পট্য কর্মে সে অপরিমিত আত্মপ্রসাদ অনুভব করে থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তারের যুগে ভূমি-রাজস্ব বিষয়ক প্রশাসন ব্যবস্থার বন্দোবস্তে যে নূতন জমিদার মুৎসুদ্দি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে—তাদের হাতে এসে জমা হয় প্রচুর কাঁচা টাকা। সেই অর্থ দিয়ে বেশ্যা রাখাকে তৎকালীন যুগে সামাজিক মর্যাদার ব্যাপার বলে গণ্য করা হত। প্রকাশ্যে বেশ্যাগমন ছাড়াও গোপনে পরনারী গমন বা ব্যভিচারে রত ছিলেন কিছু লম্পট বিত্তবান ব্যক্তি। বাংলা প্রহসনের বিশাল বক্ষে এই চরিত্রগুলিও স্থান পেয়েছে। পুরুষদের এই ব্যভিচারের পাশাপাশি রয়েছে স্ত্রীদের যথেচ্ছাচার।

স্ত্রীস্বাধীনতা : স্ত্রীস্বাধীনতার সূত্রপাত করেন কেশবচন্দ্র সেন। তিনি তাঁর কিশোরী স্ত্রীর হাত ধরে প্রথম রাস্তা দিয়ে হেঁটে ঠাকুরবাড়ী যাওয়ার দুঃসাহস দেখান। নারীশিক্ষা ও প্রগতির নামে উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের তলদেশে এক তীব্র নাড়া দিয়েছিল। নারীর হাব-ভাব, আচার-আচরণে এমন অবিনয়ী ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেতে থাকে—যা অনেক মানুষের মনেই স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জাগায়। বাংলা প্রহসনে তাই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার স্বেচ্ছাচার প্রসঙ্গ যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা প্রহসনের উদ্ভব ও বিস্তারের যুগ

ভূমিকা : উনিশ শতকের বাংলাদেশ পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়েছে। সাহিত্য ও সমাজনৈতিক চিন্তায় প্রাচীন ধ্যানধারণাকে স্বীকার করেও তা অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পেরেছে রিভাইবল্ এর কিংবা রেনেসাঁসের প্রত্যক্ষ ফলে। রেনেসাঁসের জন্ম হয় যে আগ্রহ, যে উৎকণ্ঠার কর্ষিত মাটিতে, বাংলাদেশে বাঙালির হৃদয়-ভূমিতে সেই কর্ষণ প্রকৃত অর্থে তখনও শুরু হয়নি। তার পূর্বেই অকস্মাৎ এই মহার্ঘ্য বস্তু নেহাৎ দানের মতো এসে জোটে তার কপালে। ফলে রেনেসাঁস-এর আলোক সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের দীপ্তির জগতে নিয়ে এলেও সেটা হয়ে দাঁড়ায় প্রায় বাহ্য। হৃদয়-অভ্যন্তরে আগ্রহী শেকড় গাড়েনি তা সেভাবে। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পরস্পর-বিরুদ্ধ আচার-আচরণ ও জীবনচর্যায় এসময় শুরু হয়েছে সংঘর্ষ। বাংলা প্রহসনের উদ্ভবের পশ্চাতে তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় আন্দোলনের এই সংক্ষোভ যে অনেকাংশে ক্রিয়াশীল ছিল সে কথা মনে রাখা দরকার।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের পূর্বরূপ : কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে, আধুনিক বাংলা প্রহসনের উদ্ভবের পশ্চাতে রয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের স্বতোৎসারিত। উচ্ছ্বাস। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে—মঙ্গলকাব্য এবং ধ্রুপদী সাহিত্য রামায়ণে যে হাস্যরসের উৎসারণ ঘটেছে—তার মূলে রয়েছে দৈহিক অঙ্গভঙ্গী; যা কিছু সৎ, স্বাভাবিক এবং মার্জিত তার বিপরীত আচরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে স্থূল হাস্যরসের স্বতোচ্ছ্বাস। বাংলা ভাষায় লেখা প্রহসনধর্মী রচনার প্রথম পরিচয় পাই ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। অবশ্য মূল নাটিকাটি বাংলা ভাষায় লেখা নয়—জোডরেলের 'The Disguise-এর বাংলা অনুবাদ করেন গোলোকনাথ দাস (?) নামে 'কাল্পনিক সংবদল'। নাটিকাটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় তিনটি করে ভাগ লক্ষিত হয়—প্রথম ভাগে মূল ইংরেজি নাটকের পাঠ, দ্বিতীয় ভাগে রুশ অনুবাদ, তৃতীয় ভাগে বাংলা।

কাল্পনিক সংবদল : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত (১৯৬৩) 'কাল্পনিক সংবদল' নাটকের ভূমিকায় মদনমোহন গোস্বামী জানিয়েছেন—১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর ২৫ নং ডোমতলা স্ট্রিটে (অধুনা এজরা স্ট্রিট) গেরাসিম লেবেডফ প্রতিষ্ঠিত Bengallie Theatre-এ 'কাল্পনিক সংবদল' প্রহসনটি অভিনীত হয়। দেশীয় ও বিদেশীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে ঐকতান বাদ্য (symphony orchestra) সৃষ্টির প্রয়াস বাংলাদেশে গেরাসিম প্রথম করেছিলেন। 'কাল্পনিক সংবদল'-এর কাহিনী নিম্নরূপ। ভোলানাথবাবু একজন সজ্জন ব্যক্তি তাঁর প্রেমিকার নাম সুখময়[১]। তিনি থাকেন লক্ষ্ণৌ-এ। ভোলানাথবাবুর ভৃত্য রামসন্তোষের পত্নী ভাগ্যবতী। বিশেষ কার্যে ভোলানাথবাবু ভৃত্য রামসন্তোষকে নিয়ে কোলকাতায় এসে ভ্রষ্টা নারী শশিমুখীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। সুখময় তার প্রেমিকের

১. নায়িকার নাম সুখময়ী হওয়া উচিত ছিল, বাঙালীর নাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে লেবেডফ এই ভুল করেছিলেন বলে মদনমোহন গোস্বামী জানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত এই অনুবাদ লেবেডফের নয়। গোলোকনাথ দাসের। ভুল যদি হয়ে থাকে তবে সে তাঁরই।

প্রেম পরীক্ষা করার জন্য ভাগ্যবতী, রতনমণি নামে দুই সহচরীকে নিয়ে কোলকাতায় আসেন। এবং পুরুষ মোহনচাঁদের ছদ্মবেশে[১] ভোলানাথবাবুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে শশিমুখীর কথা জানতে পারেন। ভৃত্য রামসন্তোষ ইতোমধ্যে অবগুণ্ঠনবতী ভাগ্যবতীকে অন্য রমণী ভেবে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে। মোহনচাঁদের বিবাহের আয়োজন চলছে ইতোমধ্যে একদিন ভোলানাথবাবুর কাছে মোহন শশীমুখী সম্পর্কে কুৎসিৎ মন্তব্য করায় তিনি তাকে ছেড়ে দেবেন বলে স্থির করেন। রামসন্তোষ কর্তার পত্র বারাঙ্গনাকে দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়ে উকিলের সাহায্যপ্রার্থী হয়। কর্তা মোহনচাঁদের কাছে সুখময়ের ফটো দেখে ভীষণ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। পরে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে জানতে পারেন হবু স্বামীর প্রণয় পরীক্ষা করার জন্য সুখময় সাজবদল করেছিলেন। নাটক হিসেবে এটা খুব একটা উৎকৃষ্ট স্তরের না হলেও পরবর্তী কালের বাংলা প্রহসনে যখন একই ধরনের কাহিনী পাই তখন স্বভাবতই মনে হয় 'কাল্পনিক সংবদল'-এর কাহিনী সেই প্রহসনের কাহিনীকে কিছুটা-বা প্রভাবিত করেছে বুঝি। এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ'-এর কাহিনী কিছুটা একই রকম।

প্রাক্-রামনারায়ণ বাংলা প্রহসন : আধুনিক যুগ সমস্যা নিয়ে প্রহসন রচিত হতে শুরু করে উনিশ শতকের মধ্যভাগে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশ রচিত 'হাস্যার্ণব' এবং ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের লেখা রঙ্গ-কৌতুক-ভিত্তিক প্রহসন 'কৌতুক সর্বস্ব' বাংলা প্রহসনের পশ্চাৎপট তৈরী করেছে। 'কৌতুক সর্বস্ব' নাটকটি সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন এটি, 'নয় আদিরসাত্মক অথবা উপদেশ-মূলক আখ্যায়িকা বা নক্‌শা',[২] অতি সাধারণ স্তরের রসিকতা-ভিত্তিক হাস্যরসাত্মক প্রহসন এটি।

নকসাধর্মী হালকা রসের কয়েকটি নাটিকা প্রাক্-পঞ্চাশ বাংলা নাটকের নমুনা বহন করছে। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'রমণী নাটক' (১৮৪৮) এবং 'প্রেম নাটক' (১৮৫৩) প্রভৃতি নাম করা যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত 'বাবু' (১৮৫৪) প্রহসনটির কথাও অতঃপর উল্লেখ করতে হয়। যদিও প্রহসনের কাঠামো বা রচনারীতি এখনও কারও ঠিক আয়ত্ত হয়নি—তবু কালীপ্রসন্নের 'বাবু' বিষয়বস্তুর দিক থেকে আধুনিক প্রহসনের নান্দীপাঠ করেছে। কিন্তু কালীপ্রসন্নের এই ক্ষুদ্রাকার নাটিকাটি আমাদের হস্তগত হয়নি। ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন,

"তখনকার দিনে 'নাটক' নামে অনেক নক্‌শা বাহির হইয়াছিল। গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'বাবু নাটক' লিখিয়াছিলেন বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বাল্যকথায় উল্লেখ করিয়াছেন।"[৩]

---

১. বাংলা প্রহসনের সূচনা থেকেই ছদ্মবেশ ধারণ প্রবণতা লক্ষণীয়।

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য়/সুকুমার সেন/পৃঃ ৪৪

৩. প্রাগুক্ত/পৃঃ ৬৪

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-৮৬)

ভূমিকা : বাংলা প্রহসন সাহিত্যের পূর্বাভাষ কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' নাটিকায় পাওয়া গেলেও রামনারায়ণ তর্করত্নই প্রকৃতপক্ষে বাংলা প্রহসনের পথ নির্মাতা।[১] বাংলা সাহিত্যে সমাজচিত্র অঙ্কনের যে রেওয়াজ শুরু হয়েছিল ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫) 'নববিবি বিলাস' (১৮২৫) প্রভৃতি গ্রন্থে—প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল,' কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' যে মানসিকতার ফসল, রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রথম সার্থক নাটিকা 'কুলীনকুল সর্বস্ব'-ও (১৮৫৪) সেই মানসিকতারই ফসল। সংস্কৃত রসশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্রের উত্তরাধিকার বর্তেছিল রামনারায়ণের মধ্যে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে অজ্ঞ রামনারায়ণের রচনায় এদেশী বা লৌকিক ধারার সঙ্গে সংস্কৃত নাট্যরীতির মিশ্রণ লক্ষণীয় ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

কুলীনকুল-সর্বস্ব রচনার কারণ : উদ্দেশ্যমূলকতা : রামনারায়ণের নাট্যকাররূপে আবির্ভাবের পশ্চাতে একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব প্রাবন্ধিকরূপে। রংপুরের কুন্ডীগ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে 'পতিব্রতোপাখ্যান' (১৮৫৩) নামে গ্রন্থ রচনা করে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। জমিদার কালীচন্দ্র ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের 'সম্বাদভাস্কর' 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন—বিশেষ বিষয়কে অবলম্বন করে নাটক রচনার জন্য। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ,—

> **"পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক**
>
> এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে 'কুলীনকুল-সর্বস্ব'নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন, তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।"

কালীচন্দ্রবাবুর এই বিজ্ঞাপন দেখে প্রতিযোগিতার আসরে অবতীর্ণ হয়ে রামনারায়ণ 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' (১৮৫৪) রচনা করেন—এবং জমিদারের সঙ্কল্পিত অর্থ পুরস্কার স্বরূপ পান। প্রসঙ্গত বলা যায় কেবলমাত্র পুরস্কার প্রদান করে আপন কৃতিত্ব জাহির করার জন্য কালীচন্দ্র এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেননি। তৎকালীন সময়ে পূর্ববঙ্গে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় যে মহৎ উদ্দেশ্যে কুলীন সমাজের এক বড় কলঙ্ক বহুবিবাহ রদ করার জন্য আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলেন কালীচন্দ্র তেমন কোনও আন্দোলনে সরাসরি নিজেকে না জড়ালেও তিনি হয়তো ভেবেছিলেন নাট্যপটে আপন প্রতিচ্ছবি দর্শনে সমাজের কলঙ্ক

১. ড. সুকুমার সেন বলেছেন—"ইংরেজি শিক্ষার প্রথম সক্রিয় ফল সমজ সংস্কারে দেখা দিয়াছিল। পূর্বে হইতেই যাত্রাশালায় কবিতায় ও নক্‌শায় সমাজ অথবা শ্রেণি বিশেষের ব্যঙ্গ চিত্র জনসাধারণের চিত্ত বিনোদনের একটি প্রধান উপকরণ যোগাইয়া আসিয়াছিল। সাধুবেশী পাষণ্ডের ভণ্ডামি,—মূর্খের ধনগর্ব ও কুলাভিমান, পণ্ডিতের বিদ্যামদ মাতালের দুর্গতি, ধনীর লাম্পট্য, কুট্টনীর ছলনা, অসতীর বিড়ম্বনা এবং সতীর দুর্দশা—ইহাই ছিল সাধরণত যাত্রার সঙের এবং নক্‌শা-চিত্রের প্রধান বিষয়।"
[বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস/২য়/ ওই পৃঃ ৫৩]

সৃষ্টিকারীদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বিবেকবশত এই পাপ পথ পরিহার করবেন। নাট্যকার স্বয়ং এই নাট্যরচনার উদ্দেশ্য স্পষ্টত এভাবে ব্যক্ত করেছেন 'বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে' তা বর্ণনা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। সুতরাং এই নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা। এই শ্রেণীর রচনা সাধারণত উদ্দেশ্যের বাড়াবাড়িতে অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটিকার ঘটকের ভন্ডামি, কুলীন বরের অপদার্থতা ও বিবেকহীন পশুত্ব পুরোহিতের মূর্খতা প্রভৃতি ব্যাপারগুলি কিছু অতিরঞ্জিত রূপে পরিবেশিত। তার ফলে নাটকটির বাস্তবতা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কাহিনী সংক্ষেপ

কুলীনকুলের শিরোমণি স্বরূপ বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর বংশধর, সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি কন্যা—জাহ্নবী, শাম্ভবী, কামিনী ও কিশোরী। তাদের বয়স যথাক্রমে ৩২, ২৬, ১৫ ও ৮। নিজ অবস্থা সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও কুলপালক আপন কন্যাদের কুলীন পাত্রে পাত্রস্থ করতে না পেরে চিন্তিত। অনৃতাচার্য ও শুভাচার্য নামে দু'জন ঘটককে পাত্রের সন্ধানে প্রেরণ করেছেন তিনি। শুভাচার্য বিবেকবান ঘটক। কিন্তু অনৃতাচার্য শঠ, ধূর্ত এবং অর্থলোভী। সে বহু কুলীন কন্যাকে কেবল কথার ফাঁদে ফেলে অপাত্রে—এমন কি ভিন্ন জাতে বিবাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অনৃতাচার্য কুলপালকের চারজন কন্যার জন্য একটি ষাট বছর বয়েসের কুলীন ব্রাহ্মণকে পাত্র স্থির করে, বিবাহের দিন না থাকা সত্ত্বেও সেদিনই বিবাহের আয়োজন করতে বলে। কুলপালকের স্ত্রী ভীষণ খুশী হলেন। মায়ের মুখ বিবাহের সংবাদ শ্রবণে চার বোনের চার রকমের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল। বড় মেয়ে জাহ্নবী বলল, 'বুড়ো বয়সে এই ধেড়ে রোগ কেন?' মেজ মেয়ে শাম্ভবী বলল, 'পিতার নিকট গিয়া ইহার প্রতিবাদ করিব', সেজ মেয়ে কামিনী বলল, একমাত্র বড়দির সঙ্গে মানাইলেও মানাইতে পারে।' আট বৎসরের কিশোরী বলল, 'বে আবার কি? ওটা কি খাবার জিনিস?' শেষ পর্যন্ত বিবাহ সম্পন্ন হল। বিবাহ সভায় দেখা গেল বরের শুধু বয়স বেশী নয়—অত্যন্ত কদাকার-দর্শন আকাট মূর্খ, কালা ও বোবা। কুলপালক এমন বরের হাতেই চারটি কন্যাকে সমর্পণ করে কুলরক্ষা করলেন। শঠ ঘটক অনৃতাচার্য তার পারিশ্রমিক বুঝে নিল।

নামকরণ : 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' প্রহসনের নামকরণ সম্পর্কে কিছু দ্বিধা রয়ে গেছে অনেকেরই। কেউ বলেছেন কুলীনকুলের যথার্থ সমাজচিত্র এই নাটকের বিষয়, সে অর্থে এই নাটিকার নামকরণ 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' সার্থক হয়েছে। কারও মতে কৌলীন্য প্রথার বীভৎসতার চিত্র অঙ্কনে এই নাট্যনাম ইঙ্গিতবহ। কিন্তু ড. সুকুমার সেন অন্য একটি দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর মতে, "কুলসর্বস্ব এখানে ব্যক্তির নাম, তিনি বেদাগ 'কুলীন'। তিনিই নাট্যকাহিনীর কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। তাঁহার সবিশেষণ নামেই নাটকটির নামকরণ।"[১]

নাট্য-কাঠামো : 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটিকাকে সার্থক প্রহসন বলা যায় না। কারণ যদিও

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য়খণ্ড)/সুকুমার সেন/পৃ ঃ৫৩

এই নাটিকার মূল রস হাস্যরস, তবু এর বিস্তৃতি এবং আঙ্গিকই প্রহসন হবার পথে এর প্রধান প্রতিবন্ধক। নাটিকাটি ছয়টি অঙ্কে বিন্যস্ত। নাটিকাটির ভূমিকায় রামনারায়ণ নিজেই এই গ্রন্থের আঙ্গিক সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য জুড়ে দিয়েছেন,—"এই নাটক ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহার সূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার-ব্যবহার। চতুর্থে, শুল্কবিক্রয়ীর দোষোদ্‌ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্যে ও বিরাট পঞ্চাননের বিয়োগ-পরিবেদন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্বাহ। গর্ভাঙ্কহীন ছটি অঙ্কে বিন্যস্ত এই নাটিকাটি নাট্যকার নিশ্চিতভাবে প্রহসনের রচনার উদ্দেশ্যে রচনা করেননি। কেননা পাশ্চাত্য প্রহসনের কাঠামো সম্পর্কে তাঁর কোনও জ্ঞান না থাকলেও সংস্কৃত প্রহসনের কাঠামো সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি জানতেন, এত অঙ্ক অথবা দুই অঙ্কের মধ্যে সংস্কৃত প্রহসনের কাঠামো সংবদ্ধ। সে কথা জেনেও যখন ছয় অঙ্কে কাহিনী বিন্যস্ত করেছেন তখন স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় প্রহসন রচনার কোনও অভিপ্রায় নাট্যকারের ছিল না। সংস্কৃত নাটকের আদলে নাটক রচনাই বরং ছিল তাঁর অভিপ্রায়। প্রাচ্য নাট্যাদর্শের রীতি অনুযায়ী 'নান্দী', 'সূত্রাধার' ও 'নটী'র দ্বারা এই নাটকের সূত্রপাতের পর নাট্যকার নাটকের মুল বিষয়কে স্পর্শ করবার সুচতুর উদ্দেশ্যে কোনও দেবশক্তির বন্দনার পরিবর্তে 'কুলকুণ্ডলিনী' দেবীর বন্দনা করেছেন।

প্রথম অভিনয় : 'কূলীনকুল-সর্বস্ব' ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হলেও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের প্রথম সপ্তাহে এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। জয়রাম বসাক কর্তৃক কোলকাতার চড়ক ডাঙা স্ট্রিটে অবস্থিত নিজ বাড়ীর রঙ্গালয়ে। দ্বিতীয় অভিনয়ও হয় জয়রাম বসাকের নিজ বাড়ীর রঙ্গালয়ে, তৃতীয় বার অভিনীত হয় গদাধর শেঠের বাড়ীতে।

সমাজচিত্র : কুলীন সম্প্রদায়ের উদ্ভব : রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কূলীনকুল সর্বস্ব' প্রহসন রচনা করেছিলেন কেবলমাত্র নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার জন্য—কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। সমসাময়িক সমাজজীবনের গতি-প্রকৃতি আলোড়ন-বিলোড়নের সুসূক্ষ্ম গতিরেখা সম্পর্কে তাঁর যে সহজ স্বচ্ছ ধারণা ছিল— নাটকে ঘটেছে তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। বাংলাদেশে কুলীন সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে কুলজী প্রমাণ এই যে, এদেশের ভ্রষ্টাচারী ব্রাহ্মণদের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসেন। এঁদের ছাপান্ন জন সন্তানকে তিনি ছাপান্নটি গ্রাম দান করেন, এঁরা 'ছাপান্ন গাঁইয়া' নামে বিখ্যাত। বাংলাদেশের আদিবাসী ব্রাহ্মণেরা (সাতাশ ঘর) সপ্তশতী (অকুলীন) ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। আনুমাণিক ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বল্লাল সেন কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে আচারভ্রষ্টতা ও আচারণগত শৈথিল্য লক্ষ্য করে তাঁদের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন প্রত্যাশায় ন'টি কুললক্ষণের নির্দেশ দান করেছিলেন,—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্‌।
নিষ্ঠাবৃত্তি গুণো দানং নবধা কুললক্ষণং।।"

এই কুললক্ষণের উপর যেমন কুলকৌলীন্য নির্ভর করত, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রে সে কুলকৌলীন্য নির্ভর করত সৎকুলে কন্যাদান এবং সৎকুলজান কন্যাগ্রহণের উপর। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছিল পাঁচটি শ্রেণী—কুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ, গৌণ কুলীন ও সপ্তশতী। বল্লালী প্রথায় 'সর্বদ্বারী বিবাহ' প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের মধ্যে নানা

আধোগামিতা লক্ষ্য করে ঘটকবর দেবীবর দোষানুযায়ী সম্প্রদায় বিভক্ত করে বিবাহ পদ্ধতি বা 'মেল' প্রচলন করেন। দেবীবরের এই 'মেল বন্ধন' পদ্ধতি কুলীন সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রকে সংকুচির্ত করায় এক অনিবার্য সংকট দেখা দিল—যার কদর্য প্রকাশ বহুবিবাহ প্রচলনে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা সমস্যা প্রভৃতি কৌলীন্য সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে প্রচার শুরু করে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্তের যুগ্ম সম্পাদনায় কাশীপুরে কিশোরীচাঁদের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' (১৮৫৪?)। ১৭৬৪ শকের ভাদ্র সংখ্যার 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা এই সামাজিক অনাচার দূরীকরণের জন্য রাজদণ্ডাজ্ঞা প্রবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রথম থেকেই বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আপন মতামত ব্যক্ত করেছে। তবে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ আইন প্রণয়নের দ্বারা বহুবিবাহ প্রথা রদের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর মতে শিক্ষার বিস্তার কালক্রমে এ কুপ্রথাকে নির্মূল করে দেবে। কিন্তু ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার সুধাবর্ষণ' এ সম্পর্কে আইন প্রণয়নের পক্ষে মত দিয়েছে। 'এডুকেশন গেজেট' বলেছেন কৌলীন্য সমস্যার মূলে রয়েছে কুৎসিত মেল বন্ধন প্রথা। "এই মেল বন্ধনের বিষাক্ত জালে পড়িয়া অনুচিত কুলগৌরব রক্ষার জন্য এক এক জন অশীতিবর্ষ দেশীয় বৃদ্ধের সহিত আপনার যুবতী ও শিশুকন্যাকে এককালে পরিণয় সূত্রে সম্বন্ধ করিয়া দিতেছেন। আর বার পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুর হস্তে দুগ্ধপোষ্য হইতে স্থবিরতমা কন্যাদিগকে প্রদান করিয়া চির দুঃখভাগিনী করিতেছেন ইঁহারা কুলগর্বে অন্ধ হইয়া তনয়দিগের ভাবি অবস্থার প্রতি একটুও যেন দৃষ্টিপাত করিতেছেন না।"[১] রামনারায়ণের 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' রচনার পূর্বে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেনি কিন্তু 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বিদ্যাদর্শন', তত্ত্ববোধিনী', 'সংবাদ প্রভাকর', 'এডুকেশন গেজেট' প্রভৃতি পত্রিকায় সমাজের এই কুপ্রথা সম্পর্কে ছিল উচ্চকণ্ঠ বিরোধিতা। কৌলীন্য প্রথার সর্বাত্মক বিধ্বংসী রূপকে ব্যঙ্গাবিদ্ধ করে 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরগুপ্ত লেখেন,—

"কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে।
শতেক বিধবা হয় একের মরণে।।
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই।।"

'এডুকেশন গেজেটে'র পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যও কবিবর ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার বক্তব্যের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই 'কুলীনকুল-সর্বস্বে'। নবযুগের সামাজিক সমস্যার গভীরতা অনুভব করে সাধ্যানুসারে তার দূরীকরণে ব্রতী হয়েছিলেন রামনারায়ণ। প্রহসনের সমাজচিত্রে যে লঘুতা থাকে তাঁর এই নাটকটি তা থেকে মুক্ত ছিল। সে কারণে এই নাটিকার ফলও হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। চুঁচুড়ায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটকটি অভিনীত হলে স্থানীয় কুলীন ব্রাহ্মণেরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন—

১. এডুকেশন গেজেট/৯ বৈশাখ, ১২৭৮

"The acting of the koolin koolo-Shurboshwo Natack at chinsurah has, it appears, given great offence to the koolins of the locality...."[১]

প্রহসন কিনা : লঘুভঙ্গিতে রচিত হলেও রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যে এবং ঘটনা সংস্থাপনের কলাকৌশলে মামুলি প্রহসনের স্তর থেকে অনেক উর্দ্ধে উঠে গেছে। কিন্তু প্রহসনের কয়েকটি লক্ষণ ও 'কুলীনকুল-সর্বস্বে'র মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, সমকালীন সামাজিক সমস্যা নিয়ে এই নাটক রচিত, প্রহসনে যা কাম্য। দ্বিতীয়, হাস্যরস এই নাটিকার মূলরস ভঙ্গীটিও আগাগোড়া লঘু। তৃতীয়ত, ধারাবাহিক কাহিনীর অনুসরণ আপক্ষা খণ্ডচিত্র রচনায় বা নক্সাধর্মিতার প্রতি বিশেষ ঝোঁক। চতুর্থত, সংলাপের ক্ষেত্রে বাস্তব বা প্রাকৃত-জনোচিত সংলাপ ব্যবহার। পঞ্চমত, প্রতিটি চরিত্র প্রায় বিশেষ বিশেষ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং ষষ্ঠত, নাটকটির মূল সমস্যা যা বহু বিবাহ বা কৌলীন্য সমস্যা তা নাটকের শুরুতে যেমন ছিল শেষেও তেমনি অভেদ্য রয়ে গেছে—প্রহসনের ধর্ম তাই। তবে এই নাটিকায় আয়তনের ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রহসনের নির্দেশ পালিত হয়নি।

হাস্যরস : 'কুলীনকুল-সর্বস্বের হাস্যরস' এর হৃদয়গ্রাহিতার অন্যতম কারণ। বিতর্কিত বিষয়কে এমন আস্বাদ্য উপায়ে রামনারায়ণ পরিবেশন করেছেন যে তা তৎকালে কেবলমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব ছিল। পরিমার্জিত পাশ্চাত্য হাস্যরস ধারার সঙ্গে রামনারায়ণের বিন্দুমাত্র যোগও ছিল না। ফলত তাঁর নাটকের হাস্যরস আধুনিক পরিমার্জনা পায়নি। রামনারায়ণের হাস্যরসের মধ্যে ছিল দ্বিবিধ সংস্কার—(১) লৌকিক হাস্যরসের অনুসরণ (২) সংস্কৃত হাস্যরসের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার। বাংলা সাহিত্যের মধযুগে মঙ্গলকাব্যের শৃঙ্খলিত কাঠমোয় হাস্যরসের নির্মল উৎসারণ লক্ষ্য করা গেছে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' ভাঁড়ু দত্ত, মুরারী শীল কিংবা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ শিব চরিত্রে হাস্যরসের অনাবিল উৎসারকে বাণীবন্ধ করা হয়েছে। হাস্যরস সৃষ্টিতে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার মাত্রাটুকু এখনও চিহ্নিত হয়নি। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্কৃত জীবনাচরণ শ্লীলতা ও অশ্লীলতার ভেদরেখা জানিয়ে দেয়নি। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরহিত রামনারায়ণের নাটকে এদেশী হাস্যরসের উৎসারণ লক্ষ করা যায়, অতিরঞ্জন যায় লক্ষণ। এই হাস্যরসের মধ্যে এক নির্দিষ্ট ছক বেধেঁ দিয়েছে সংস্কৃত হাস্যরসাত্মক নাটক। তাই দেখি 'কুলীনকুল-সর্বস্বে'র হাস্যরসের বিকাশ ঘটক বা ধূর্ত চরিত্রকে কেন্দ্র করেই। যা কিছু সহজ, স্বভাবিক এবং সঙ্গত তার বৈপরীত্যে এই নাটিকায় জেগে উঠেছে হাস্যরস-ফোয়ারা। রামনারায়ণ এখানে satirist নন Humourist, তাই এ নাটিকা প্রহসন হয়েছে। হাস্যরস সৃষ্টির ঐকান্তিক প্রয়াসে রামনারায়ণ এ নাটকে অনুসরণ করেছে দুটি সুচিন্তিত প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি—(ক) কূল পালক এবং তার চার মেয়ের উপর কৌতুকস্নিগ্ধ আলোক রশ্মিপাত (খ) ঘটক, পুরোহিত, কুলীনবরের অসংলগ্ন আচরণ ও ভণ্ডামি। এছাড়া শ্লেষের মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। বিশেষ করে 'পুরোহিত' সম্প্রদায়ের লালসা, ঈর্ষা এবং ভণ্ডামির প্রতি যেন তিনি অনেকটা রূঢ়। 'পুরোহিত' শব্দের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাই তিনি বলেন—

১. Hindoo Patriot : 1858

" 'বিধাতা পুরীষের' 'পু' 'রোষের' 'রো' 'হিংসার' 'হি' এবং 'তস্করের' 'ত' এই চারটি অক্ষর একত্রিত করে হয়েছে 'পুরোহিত' শব্দ।" তৎকালীন বিখ্যাত সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে বলেছেন,—

"তর্করত্ন বড় শ্লেষোক্তি প্রিয়; তাঁহার শ্লেষবচন সকল অনেক স্থলেই প্রীতিপ্রদ হইয়াছে, কিন্তু কোনও কোনও স্থলে নিতান্ত অতিরিক্ত হওয়ার বিরক্তিকরও হইয়াছে।"

পুরুষ চরিত্র : 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটিকার প্রধান লক্ষ্য কৌলীন্য প্রথার বীভৎসতা চিত্রণ এবং সেই কৌলীন্যের শিকার কুলীন তনয়াদের বেদনাময় জীবনকথার বর্ণয়ান। পুরুষ চরিত্র এখানে শাসক ও শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও তারা গৌণ। নাটকারের নিবিষ্ট অভিনিবেশ এবং সহৃদয়তার স্পর্শের অভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে পুরুষ চরিত্রগুলি। কুলপালক কেবলমাত্র প্রথার দাস। নিজ কৌলীন্য বজায় রাখার দুর্নিবার স্পৃহায় আত্মজাগণের মুখের দিকে তাকাবার প্রয়োজনটুকু তিনি অনুভব করেননি। ঘটকের চরিত্রাঙ্কনে মঙ্গলকাব্যের নারদ চরিত্রে ছায়াপাত ঘটেছে। তবে অনৃতাকার্য ও শুভাচার্য নামে দুজন ঘটককে এনে ঘটকদের মধ্যে ভালো এবং মন্দ উভয় শ্রেণীর পরিচয় দিয়ে ঘটক সমাজের পূর্ণ চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন। পুরোহিতের মূর্খতা, ভণ্ডামি; ব্রাহ্মণের লোভ ও নীচতা যথাযথরূপে চিত্রিত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন,—

"'হিতোপদেশ' 'পঞ্চতন্ত্রের যুগ কিংবা তাহারও আরও পূর্ববর্তী বৌদ্ধ জাতকের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ সম্পর্কে যে ধারণা এ দেশের সমাজ পোষণ করিয়া আসিতেছে, রামনারায়ণের নাটকে তাহারই ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে।"[১]

পুরুষ চরিত্রগুলি স্ব স্ব শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে।

নারী চরিত্র : নারী চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার রামনারায়ণের পারদর্শিতা প্রমাণিত। অবিবাহিতা বয়স্কা কন্যার মাতার দুঃখ—তাদের কুমারীত্ব মোচনের সংবাদে তাঁর আনন্দোচ্ছ্বাস—এ সবই স্বাভাবিক এবং হৃদয়স্পর্শী। নাট্যকারের সহানুভূতি-স্পর্শে মায়ের চরিত্র জীবন্ত। অনূঢ়া কুলীন কন্যাদের বিবাহের সংবাদে তাদের যে হৃদয় আন্দোলন—তা স্বাভাবিক এবং বাস্তব। কারণ কুলীন সমাজে বিবাহ একটা ব্যবসামাত্র ছিল। শুধু অর্থ থাকলে যেমন কন্যার বিবাহ হত না, বিবাহের পর বহু অর্থ দিয়েও তেমন তাদের জীবন সুখের করা যেত না। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা এর কারণ স্বরূপ জানিয়েছে,—

"অনেকানেক দেশেই পুরুষ জাতি একের অধিক স্ত্রী বিবাহ করে বটে, কিন্তু এ দুর্ভাগ্য দেশের তুল্য আর আর কুত্রাপি বহুবিবাহের এরূপ প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। এ দেশের কোনও কোন বর্ণের মধ্যে উক্ত রীতির এত প্রাবল্য আছে যে ওই বর্ণের এক এক ব্যক্তি শতাধিক নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে ; উহাদিগের মধ্যে অনেকে বিবাহকে একপ্রকার উপার্জনের পথ জ্ঞান করে। উহাদিগের আচার ব্যবহার দেখিলে বোধ হয় যে অর্থোপার্জন ভিন্ন উদ্বাহের অপর কোনও তাৎপর্য উহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।"[২]

১. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে (১ম)/ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য/পৃ ঃ১৭৩

২. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা/১৭৭৭ শক, চৈত্র সংখ্যা

'কুলীনকুল-সর্বস্বে'র কুলপালক চক্রবর্তীর অবস্থা সচ্ছল। সামাজিক প্রতিষ্ঠা রয়েছে তবু তাঁর কন্যাদের বিবাহ হয়নি—কুলীন পাত্রের অভাব। বড়ো মেয়ে জাহ্নবীর বয়স বত্রিশ। যৌবনকাল তার শুষ্ক হয়ে গেছে, রোমান্টিক অনুভবের দিন তার অস্তগত—এবার কেবলমাত্র দিনগত পাপক্ষয়। তাই মাতার মুখে নিজ বিবাহের কথা শুনে সে বিন্দুমাত্র খুশী হতে পারেনি। বিগত যৌবনা নারী জাহ্নবী গভীর বিষাদের সঙ্গে উচ্চারণ করেছে 'কেন আর বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ?' সমকালীন সমাজের প্রতিও এক অদৃশ্য খোঁচা এই উক্তিতে লক্ষণীয়। বরের বয়স ষাট। অতিবৃদ্ধ, কানে কালা, মৃত্যুপথযাত্রী। মধ্যমা কন্যা শাম্ভবী যার বয়স বর্তমানে ছাব্বিশ বৎসর—সেও তাই খুশী নয়। তবে দিদির মতো একবারে জীবন সম্পর্কে উন্নাসিক দৃষ্টি তার এখনো আসেনি। তবে কিছুটা অবিশ্বাসী সুর তার কণ্ঠে শুনি যখন সে বলে 'আমরা কুলীনের মেয়ে আমাদের আবার বিবাহ কোথায়? কাঙ্ক্ষিত সুখের শেষরশ্মিটুকু এখনও তার চোখ মায়াকাজল পরায় বলেই শাম্ভবী তাদের বিবাহ ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেনি। ছোট দুই বোনের কাছে বরের বয়স ও কুরূপের কথা শুনে কিন্তু শাম্ভবী তার দিদির মতো নির্বিকার থাকতে পারেনি। পিতার আচরণের প্রতিবাদ করার জন্য তার হৃদয় প্রস্তুত হয়েছে। সে জানিয়েছে, 'পিতার নিকট গিয়া ইহার প্রতিবাদ করিব'। কিন্তু কুলীন কন্যার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, তার প্রতিবাদ কোনও কিছুই শেষ পর্যন্ত সমাজ কানে তোলে না। পনেরো বৎসর বয়সী কামিনীর কাছে বিবাহের একটা গভীর উত্তেজনা রয়েছে। স্বপ্নের পর স্বপ্ন সাজিয়ে যে কল্পসৌধ সে মনের মধ্যে নির্মাণ করেছে বাস্তব সংসারের নির্মম হস্তক্ষেপে আজও তার দেওয়ালে মলিন হাতের ছাপ পড়েনি— মনের ভেতর যে সানাই সুপ্রভাতের ভৈরবী মূর্চ্ছনায় ব্যাকুল, তা এখনো পূরবী রাগে সুখের দিনের অবসান-বার্তা ঘোষণা করেনি। তাই বিবাহের কথায় চাঞ্চল্য দেখা গেছে কামিনীর মধ্যে। তাকেই সবচেয়ে নাড়া দিয়েছে এই ঘটনা। 'বর যেমনই হউক, বিবাহ হইলেই হইল!' কিন্তু বিবাহের দিন বরের রূপ দেখে তার সমস্ত স্বপ্ন যখন চুরমার হয়ে গেল তখন তার বিষাদখিন্ন স্বরে উচ্চরণ আমাদের সবচেয়ে বেশী নাড়া দেয়— 'একমাত্র বড়দির সঙ্গে মানাইলেও মানাইতে পারে'। নিজের সঙ্গে নয়—নিজের বয়েসের দ্বিগুণ যার বয়েস সেই বড়দির সঙ্গে মানালেও মানাতে পারে যাকে তাকে নিয়ে কামিনীর লাভ কী! কামিনীর এই অকথিত বাণী আমাদের ব্যথিত করে তোলে। কিন্তু আট বছরের কিশোরী যখন বিবাহে কথা শুনে বিস্মিত হয় এবং বরকে খাবার জিনিস ভাবে তখন সমাজের নিষ্ঠুর প্রথা আমাদের আড়ষ্ট করে দেয়। একই বরের সঙ্গে চার কন্যার বিবাহ দেখিয়ে একদিকে যেমন বহুবিবাহ প্রথার পৈশাচিকতা ও অসারতা দেখানো হয়েছে— অন্যদিকে তেমনি আট বছরের কন্যা কিশোরীর বিবাহের ব্যবস্থা করে যে বিবাহ কাকে বলে জানে না, বাল্যবিবাহ প্রথার নিষ্ঠুরতাটুকুও দেখানো হয়েছে।

ফুলকুমারী : কুলীন কন্যাদের মর্মব্যথার সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলার গভীর ইচ্ছাতে রামনারায়ণ সৃষ্টি করেছেন ফুলকুমারীর চরিত্র। এই একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার অনায়াসে কুলীন তনয়ার জীবন-ট্র্যাজেডির বাস্তব রূপায়ণ করেছেন। আর পাঁচটা মেয়ের মতো তার জীবনেও এসেছিল রোমান্সের উতরোল অনুভব। সে বয়েসে সবারই মুখের কথা কবিতা হয়ে ওঠে। স্বামী থাকেন অন্যত্র। বিবাহ সেরে চলে গেছেন তিনি। আসেন

না আর। স্বামীর আগমন প্রত্যাশায় দিন গুণতে থাকে ফুলকুমারী। কিন্তু সেই স্বামী আসার পর আনন্দে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত ফুলকুমারীকে রাত্রিতে যখন বলেন, 'শীঘ্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি।' তখন তার সে স্বপ্নমঞ্জিল ভেঙে পড়তে লাগল। প্রত্যাশা অনুযায়ী স্বামীকে অর্থ দিতে না পারায় ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফুলকুমারীর বাবার টোলে দরমা পেতে শুয়ে রাত কাটান ফুলকুমারীর স্বামী দেবতা—পরদিন প্রভাতেই তিনি চলে যান। ফুলকুমারীর জীবনের এই যন্ত্রণাদগ্ধ চিত্র অবাস্তব নয়। বাস্তবতার চরম রূপ ফুটেছে এখানে। কুলীন রমণীর অপাত্রে বিবাহ যন্ত্রণাদায়ক সত্য, কিন্তু বিবাহের পর তিলে দগ্ধ হয়ে কীভাবে কুল-কৌলীন্যরক্ষার, ভ্রান্ত-সম্ভ্রমরক্ষার জন্য বলি হয় যে রমণীরা—ফুলকুমারী তাদেরই একজন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভঙ্গকুলীন সমাজের এই নির্মমতার চিত্র তুলে ধরেছিলেন তাঁর 'বহুবিবাহ বিষয়ক' পুস্তিকায়—

"কোনও অতি প্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়? আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি? তিনি অম্লান মুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট পাই, সেইখানে যাই।" ফুলকুমারী চরিত্রের আদলে দেবেন্দ্রনাথ সেন 'ভারতী' পত্রিকায় 'কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটিতে দেখি স্বামীসঙ্গের প্রত্যাশায় দিন-মাস গণনাকারী যুবতী বধূর প্রেম ও আসঙ্গ -কামনাকে অবহেলায় পায়ে ঠেলে অর্থপিশাচ বহুপত্নীক স্বামী তার গা থেকে জোর করে গহনা খুলে নিতে চাইলে বধূটি নিজেই সব গহনা খুলে স্বামীর হাতে তুলে দেয়। ফুলকুমারীর স্বামী যেমন 'সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই চলিয়া গেল।' কলঙ্কিনী বধূরও স্বামী তেমনি,—

"কপাট খুলিয়া,
কুলীন বধূর স্বামী গেলেন চলিয়া।"[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শ্যামা চরিত্রের পূর্বরূপ হিসেবে আমার কুলীন কন্যা ফুলকুমারীর ঐতিহাসিকতা স্বীকার করতে পারি।

বাংলা সাহিত্যে উত্তরাধিকার : 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' প্রহসন রচনার নেপথ্য কারণ, এর বিষয়বস্তু এবং বক্তব্য অনুধাবন করে কোনও কোনও সমালোচক এর প্রচারধর্মিতার নিন্দা করে নাটিকাটিকে অপাংক্তেয় রূপে চিহ্নিত করতে চান। কিন্তু এ কথা মনে রাখা উচিত মধ্যযুগের সাহিত্যের উত্তরাধিকার বাংলা নাটকে নয়, কাব্যেই প্রকট। বাংলা নাটকের এক শাখা— বাংলা প্রহসন রচনায়—প্রায় পাইওনিয়ার হয়ে রামনারায়ণ যে নাটিকা সৃষ্টি করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী পর্বগুলি সচেতনভাবে অনুধাবন করলে, 'কুলীনকুল-সর্বস্বে'র উত্তরাধিকার নজর এড়াবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র শ্যামা, রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্কৃতি'র মঞ্জুলির মধ্যে অতন্ত কিছুটা স্পর্শ রয়েছে ফুলকুমারীর। 'কুলীনকুল-সর্বস্বে'র গুরুত্ব অন্যত্রও স্বীকার্য। বাংলা নাট্যসাহিত্যে সমসাময়িক সমাজ সমস্যার প্রথম প্রতিফলন ঘটেছে এই নাটিকায়। বাংলা প্রহসন সাহিত্যের পথ নির্মাণ করেছে এই নাটিকা।

অন্যান্য প্রহসন : রামনারায়ণের প্রথম নাটিকার তীক্ষ্ণতা, বক্তব্যের গভীরতা এবং সরস

১. ভারতী/১৩০০ বঙ্গাব্দ, কার্তিক সংখ্যা

উপস্থাপন-ভঙ্গির মর্মস্পর্শী আবেদন অন্য প্রহসনগুলিতে লক্ষিত নয়। সত্য বটে ‘কুলীনকুল সর্বস্ব’ আয়তনের দিক থেকে প্রহসন পদবাচ্য হতে বাধা পায়—এর দীর্ঘত্বের কারণে, তবে এর অন্যান্য লক্ষণগুলি নাটিকাটিকে সার্থক প্রহসন করে তুলেছে। কিন্তু ‘যেমন কর্ম্ম তেমন ফল’ (১৮৬৫), ‘চক্ষুদান’ (১৮৬৯), ‘উভয় সঙ্কট’ (১৮৭২) প্রভৃতি প্রহসনগুলি আকারে ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল : ‘যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল’ (১৮৬৫) প্রহসনটির কাহিনী গ্রাম্য সঙ্‌যাত্রার আদলে তৈরী। হাস্যরস এরও মূল রস। লাম্পট্য প্রবৃত্তির-দাস মানুষেরা কীভাবে পদমর্যাদা ও সম্মান হারিয়ে পদে পদে অপদস্থ হন তার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে। কাহিনীটি এই রকম— সুমতি আর সুধীর, দুজনের সংসার। মতের মা’ তাদের সারাক্ষণের দাসী। চাকরীর জন্য সুধীরকে বিদেশে যেতে হয়। স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সে দিয়ে যায় গ্রামতুতো ভাই ধার্মিক বলে খ্যাত মুন্সেফের সেরেস্তাদার ভোলানাথের উপর। কিছুদিন পরে ভোলানাথের মতিভ্রম হয়। সে শাড়ী, মাছ পাঠাতে থাকে সুমতিকে এবং ‘মতের মা’র মারফতে জানায় ‘বৌ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, ধার কেন যত টাকা চান, আমি দিতে পারি।’ স্বয়ং মুন্সেফও সুমতির প্রতি দুর্বল। সুধীর দেশ ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে সব কথা শুনে ভোলানাথ ও মুন্সেফকে শাস্তি দেবার মতলব আঁটে। সুমতি একদিন দু’জনকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ পাঠায়। প্রথমে ভোলানাথ আসে। সুমতি তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে। এমন সময় মুন্সেফ এসে পড়ায় সুমতির বুদ্ধিতে ভোলানাথ লেপের তলায় গিয়ে ঢোকে। মুন্সেফ প্রেমের গান গেয়েছে, সুমতির সঙ্গে রসের কথা বলছে এমন সময় এল সুধীর। খবর পেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত মুন্সেফ থলির ভেতর ঢোকে সুমতির পরামর্শে। ‘মতের মা’ মুন্সেফের মাথা বাইরে রেখে থলির মুখ বেঁধে দেয় এবং তার মাথায় চাপিয়ে দেয় মাছের চুপড়ি। অতঃপর সুধীর ঘরে ঢোকে এবং সব বুঝে ফেলে। তারপর আসামী দু’জনের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দেয় মতের মা। সুধীরের নির্দেশ অনুসারে হাঁপানি রোগগ্রস্থ ভোলানাথ গাধা সেজে গাধার ডাক ডাকে। চুনকালি মাখা মুন্সেফ তার পিঠে চড়ে ঘরময় ঘরতে থাকে। হঠাৎ ‘মতের মা’ ভোলানাথের পায়ে লাথি মারে— ভোলানাথ এবং সঙ্গে সঙ্গে মুন্সেফ চিৎপটাং হয়ে পড়ে যায়। ভোলানাথ এবং মুন্সেফ দুটি চরিত্রই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের। নিজ মান মর্যাদা খুইয়েছেন তাঁরা লাম্পট্য দোষে। ‘যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল’ প্রহসনটি কোনও দিকেই প্রশংসার দাবি করতে পারে না। মধুসূদনের ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ ভক্তপ্রসাদের ছোঁয়া পেয়েও মুন্সেফ জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। যে পদ্ধতিতে সুধীর শত্রুর মুখে চুনকালি দেবার ব্যবস্থা করেছে তা গ্রাম্য ভাঁড়ামির স্তর অতিক্রম করতে পারেনি।

চক্ষুদান : মাতাল, লম্পট নিকুঞ্জবিহারীর স্ত্রী বসুমতীর জীবন বড়ো দুঃখময় হয়ে ওঠে স্বামীর চরিত্রহীনতায়। লোকের মুখে খবর পেয়ে তার মা নাপ্তে বৌকে পাঠায়। বসুমতী তাকে অকপটে জানায় তার স্বামীর কুকীর্তির কথা। স্বামীকে বশ করার জন্য নাপ্তে বৌ ওষুধ করতে বলে—কিন্তু বসুমতী রাজী হয় না, পাছে কিছু অঘটন ঘটে যায় সেই ভয়ে। পরিশেষে নাপ্তে বৌ আর বসুমতী পরামর্শ করে। গভীর রাত্রিতে নিকুঞ্জ নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। বিছানায় বসে থাকা একটি পুরুষের মান ভাঙাচ্ছে

বসুমতী। ক্রোধে অধীর হয়ে নিকুঞ্জ ঘরে ঢোকে। প্রকাশ হয়ে যায় পুরুষটি আর কেউ নয় নাপ্তে বৌ। নিকুঞ্জের চক্ষুদানের নিমিত্ত এই অভিনয়ের ব্যবস্থা। স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগিয়ে বসুমতী স্বামীকে আবার ঘরমুখী করে তোলে, যে স্বামীকে শত অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়েছে যৌবনকালে যৌবনসুখ-বঞ্চিতা বসুমতী। অত্যন্ত সাধারণ কাহিনী, কিছুটা শিক্ষা-মূলক বা উপদেশসূচক নাটিকাটিতে সমাজচিত্রের যথাযথ রূপায়ণ ঘটলেও, উদ্দেশ্যের বাড়াবড়ি 'চক্ষুদান'কে (১৮৬৯) সার্থক প্রহসন হতে দেয়নি।

উভয় সঙ্কট : 'উভয় সঙ্কট' (১৮৭২) প্রহসনে দেখানো হয়েছে বহুবিবাহের একদিক। গৃহকর্তার দুই স্ত্রী। স্বামীকে কীভাবে খুশী করে তাঁর আরও বেশী ভালোবাসা আদায় করবে এই নিয়ে দিনরাত দু'জনের মধ্যে চলে রেষারোষ। কর্তা একাদশীর উপবাস করেছেন আগের দিন—সেদিন তাড়াতাড়ি ভাত খাবেন। কাজ সেরে বাড়ী ফিরে দেখেন উনুন নেভানো—কড়ায় আধসিদ্ধ তরকারী। নিজের মতো রান্না করতে চাওয়ায় দুই সতীনের ঝগড়ার ফল এই। কর্তা ক্ষুধার্ত হয়ে চিঁড়ে মুড়ি খেতে চাইলে বড় বৌ চিঁড়ে খাবার জন্য চাপ দিল, ছোট বৌ বলল ছাতু খেতে। দু বৌয়ের মধ্যে আবার তুমুল ঝগড়া। ছোট বৌ পাড়া থেকে দই সংগ্রহ করে আনলো—বড় বৌ তা টান মেরে ফেলে দিলে। কর্তা তখন বিশ্রাম নিতে চাইলে পদ সেবার অধিকার নিয়ে ঝগড়া বেধেঁ গেল। স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা নয়—অতিরিক্ত মঙ্গল চিন্তার কারণে কীভাবে বহুবিবাহিত ব্যক্তির জীবন বিড়ম্বিত হতে পারে—তার চিত্র ফুটে উঠেছে এই প্রহসনে। নাট্য কাহিনীতে ত্রয়ী ঐক্য সার্থকভাবে রক্ষা করা হয়েছে। Humour-এর উচ্ছল স্রোত 'উভয় সঙ্কট'কে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। হাস্যরসের অনাবিল প্রকাশে 'উভয় সঙ্কট' সমর্থ। গ্রাম্যতা দোষ এতে নেই বললেই চলে।

রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' অভিনীত হবার পূর্বেই অজ্ঞাত-পরিচয় নাট্যকারের দ্বারা রচিত 'নির্বোধ বোধ' (১৮৫৫) নামে একটি প্রহসনের সন্ধান পাওয়া যায়। ছোট এই পুস্তিকায় ভাঁড়ামি রয়েছে সুপ্রচুর এবং হাসির গানও রয়েছে কয়েকটি।

বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রহসন : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হলে সারাদেশে গোঁড়া হিন্দু সমাজে যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তার ফলেই বিধবাবিবাহের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত বাঙালি নাট্যকারবৃন্দ হাস্যরত্মক প্রহসন সৃষ্টিতে মগ্ন হয়েছেন। জনৈক অজ্ঞাতনামা নাট্যকার রচিত 'বিধবা বিষম বিপদ' ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই নাটিকাটি সম্পর্কে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা জানাচ্ছে—"কয়েক দিবস গত হইল বিধবা বিষম বিপদ' নামে প্রকাশিত আর একখানি ক্ষুদ্র নাটক দেখিয়াছি তাহাও বিধবা বিবাহ উপলক্ষের রচিত হইয়াছে।"[১] বিহারীলাল নন্দী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন 'বিধবা পরিণয়োৎসব' নামে একটি প্রহসন। যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'চপলা চিত্ত চাপল্য' ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাসব রায়ের বিধবা কন্যা চপলার সঙ্গে পণ্ডিত ভূদেব বাবুর ছেলে চারুর বিবাহ এই প্রহসনের বিষয়বস্তু। অত্যন্ত সাধারণভাবে কোনও বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই কাহিনী এগিয়েছে। বিধবা-বিবাহের সমর্থন-সূচক এই প্রহসনটিতে বালবিধবাদের একাদশী পালনের নিষ্ঠুরতার চিত্রও প্রদর্শিত হয়েছে। স্ত্রী চরিত্রগুলির সংলাপের গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা তৎকালীন অন্তঃপুরচারিণীদের চারিত্রিক

১. বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য/ড. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত/পৃ ঃ ১০০

বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে। পরবর্তী কালে মধুসূদন, দীনবন্ধুর প্রহসনেও এই ধরনের অন্তঃপুরচারিণীর চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : মদ্যপানের নেশা কীভাবে উনিশ শতকের মধ্যভাগে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করেছিল তার বিশদ পরিচয় দেওয়া হয়েছে, 'একেই কি বলে সভ্যতা' আলোচনা প্রসঙ্গে। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা' (১৮৫৮) প্রহসনে শুধু মদ্যপান নয়, ভিন্ন ভিন্ন নেশাগ্রস্ত যুব সমাজের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট,—

"মদ ভাং খেয়ে বাবু চক্ষু করে ঘোর।
শুড়ির বাড়িতে সারারাত করে ভোর।।"

চার ইয়ারের এই কু-আচারের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলে নাট্যকার চেয়েছেন সমাজ পরিশোধন। অকথাপন্ন ঘরের চার বন্ধু গোপালচন্দ্র মিত্র, হরিহর মিত্র, নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গুপ্ত যথাক্রমে মদ, আফিম, গুলি ও গাঁজাখোর। নেশা তাদের সর্বস্ব গ্রাস করেছে। নাটকে তাদের দুঃখময় জীবনের চিত্র অঙ্কন ও অতীত স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে তাদের আত্মিক যন্ত্রণা অভিব্যক্ত হয়েছে। নক্সা জাতীয় রচনা এটি।

নারায়ণ চট্টরাজ ও শ্যামাচরণ দে : নিছক রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক নাটক শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণবিধি রচিত 'কলিকৌতুক নাটক' (১৮৫৮), সামাজিক ব্যঙ্গকৌতুক 'বাসর কৌতুক' (১৮৫৯) শ্যামাচরণ দের রচিত। 'কলিকৌতুক নাটক'টি পঞ্চাঙ্ক নক্সা-নাট্য। শ্রীরামপুর নিবাসী "শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্দ্র দে চত্তুর্ধুরীণ মহাশয়ের কৌতুহলার্থ শ্রীশ্রী নারায়ণ চট্টরাজ গুণবিধি কর্তৃক বিরচিত"[১] "কলিকৌতুকে সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার প্রতি কটাক্ষ করা হইলেও উদেশ্য শিক্ষাত্মক, কেননা কৌলীন্যের ও ধর্মের নামে কাপট্য এবং ব্যভিচারিতা ইত্যাদি সামাজিক দোষ উদ্‌ঘটান আছে। বইটি গদ্যে, পদ্যে লেখা, প্রাচীন ধরনের। গোড়ার দিকে প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকের প্রভাব আছে। গ্রন্থকারের রুচি মধ্যে মধ্যে শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছে।"[২]

শিমুয়েল পিরবক্‌স্‌ : বিধবা বিবাহ বিষয়ক বাদ-প্রতিবাদের সুর সবচেয়ে বেশী উচ্চকিত হয়েছিল বাংলা নাট্য শ্রেণীতে। প্রহসন আঙ্গিকে ঘটেছে সে বক্তব্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। শিমুয়েল পিরপ্‌স্‌ রচিত। 'বিধবা বিরহ নাটক' (১৮৬০) এই শাখাকে আরও পরিপুষ্ট করেছে। ষড়ঙ্ক এই নাটকটিতে বাস্তবের এক নগ্ন ও নির্মম রূপ অঙ্কন করা হয়েছে। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে লেখা এই নাটিকাটিতে ভদ্রঘরের বিধবা কন্যা পিতার ব্যভিচার পরায়ণতায় ক্ষুব্ধ হয়ে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু গৃহত্যাগের পূর্বে সেও দুর্নীতিগ্রস্থ হয়েছে ঝি-এর সহযোগিতায় নঙ্গারা নামে এক নীচ শ্রেণীর দুশ্চরিত্র মানুষের প্রলোভনে ভুলে গহনাপত্র চুরি করে তার সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। এই লজ্জায় তার বাবা মাকেও গৃহত্যাগ করতে হয়। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে রচিত এই নাটিকায় ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণকারী নাট্যকার এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছেন—

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (২য়)/সুকুমার সেন/পৃ ঃ ৬৩
২. প্রাগুক্ত/পৃঃ ৬৩-৬৪

(ক) বিধবা বিবাহের সমর্থন : 'সাগর মহাশয়ের ইহাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি নাই তিনি যৎপরোনাস্তি সাধ্য পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন' 'এটা যে সিদ্ধ হল না সে কেবল আমরা যে অবলা বিধবা আমাদেরই ভাগ্যদোষ বলতে হয়।'

(খ) সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন : "এখন চিরদুঃখিনী বিধবা যে আমরা আমাদের কর্তব্য এই যে আমরা সতত ভগবানচন্দ্রের নিকট এই প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের মহারাণীকে জয়ী করেন আর দুষ্ট সিপাইগণকে নিপাত করিয়া দেশে কুশল দেন।"

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি প্রমাণ করে গ্রন্থটি সিপাহী বিদ্রোহের সমসাময়িক কালে রচিত। তাহলে এর রচনাকাল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে অথবা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভ কাল। কিন্তু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের এটি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রসন্নকুমার পাল : ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত প্রসন্নকুমার পালের 'বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক' ব্যভিচারে মগ্ন যুব সম্প্রদায়ের অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছে। নামকরণেই এই নাটিকার বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছে। ভূমিকায় বলা হয়েছে—"কুলাঙ্গণাগণ বিরহ বেদনায় ব্যথিত হইলে তাহারদিগের শ্রেণীভুক্ত হইলে যে প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে, পরবধূ মধুপান প্রত্যাশি লম্পটগণ যে সমস্ত দুর্ঘটনার ঘটক হয়, যেরূপ উত্তেজনা এবং ক্লেশ ও অপমান সহ্য করে" এই পুস্তিকায় তাই ব্যক্ত হয়েছে হাস্যরসের আধারে।

তৃতীয় অধ্যায়
ঐশ্বর্য যুগ

ভূমিকা : উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে রেনেসাঁসের মর্মবাণী যে মানুষটিকে গভীরভাবে নাড়া দেওয়ায় বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র শাখার দ্বারোদঘাটনে তিনি স্বয়ং এগিয়ে এসেছেন, কোনও কোনও সাহিত্যশাখায় অনন্য হয়ে উঠেছেন—তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা নাটক, মহাকাব্য, পত্রকাব্য প্রভৃতির মতো বাংলা প্রহসন শাখায় প্রাণ সঞ্চারের কৃতিত্বও তাঁরই। প্রাক্-মধুসূদন পর্বে প্রহসনের রূপটি স্পষ্ট নয়। চিরাচরিত লৌকিক প্রহসনের (ভাঁড় নাচ, ভুচুং বাউল, নাটগীত, সংযাত্রা) সঙ্গে কিছু পরিমাণে সংস্কৃত আঙ্গিকের মিশ্রণে রচিত হয়েছে নব নব নাট্য-পুস্তিকা। কী আঙ্গিক প্রকরণ, কী বিষয়বস্তু, কী চরিত্র নির্মাণ কোনও ক্ষেত্রে এই রচনাগুলি খুব একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। সমকালীন সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি সম্পর্কে চিন্তনের যে পটভূমি সৃষ্টি করেছিল ইয়ংবেঙ্গল তথা নব্যবঙ্গীয় সম্প্রদায়, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ; তৎকালীন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় রয়েছে যার উজ্জ্বল স্বাক্ষর—সেই উদ্বেলিত যুগেতিহাসকে সাহিত্যিক প্রকরণে রূপ দেবার মতো প্রতিভার অভাব প্রাক্-মধুসূদন যুগের প্রহসনগুলিকে বিশেষ কৃতিত্ব লাভে বঞ্চিত করেছে। যদিও একথা সত্য মধুসূদন বা দীনবন্ধু মিত্র যে বিষয়বস্তু অবলম্বন করে প্রহসন রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের পূর্বে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি প্রমুখ সেই বিষয়বস্তুকে অনেক আগেই তাঁদের প্রহসনে স্থান দিয়েছেন। তবে মধুসূদন, দীনবন্ধুর সাহিত্যিক প্রতিভার যে বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য তা পূর্ববর্তী নাট্যকারদের রচনায় লক্ষ্য করা যায় না। মধুসূদনের হাতেই বাংলা প্রহসনের ঐশ্বর্যযুগের দ্বার উন্মোচিত হয়। দীনবন্ধু মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমৃতলাল বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের হাতে নূতন নূতন পটভূমিকায় প্রহসনের অপরূপ বিস্তার।

মধুসূদন এবং দীনবন্ধুর প্রহসনগুলির ভাষা, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে অনেকটা আত্মীয়তা অনুভব করা যায়। তাই মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রকে নিয়ে ঐশ্বর্যযুগের প্রথম পর্বের উপস্থাপনা।

মধুসূদন-দীনবন্ধু কালপর্ব
মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)

বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে মধুসূদন দত্তের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। অসংখ্য প্রহসন রচনার জন্য নয়, প্রহসন রচনার রাজপথ নির্মাণের জন্য। তিনি মাত্র দুটি প্রহসন রচনা করেছিলেন কিন্তু তার মধ্যেই তিনি সৃষ্টি করে গেছেন হাস্যরসের আধারে যুগচিত্র নির্মাণের কলাবিধি-সম্মত কৌশল। বলতে গেলে তাঁর সৃষ্ট রাজপথেই পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারবৃন্দের গতিময় স্বর্ণরথের বিজয়যাত্রা। অনেক দুঃখে তিনি প্রহসন রচনার পথ ত্যাগ করেন—কারণ তাঁর প্রহসন দুটি সমকালে অজস্র বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিল। এমন কি তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা'। (১৮৬০) ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) যে মঞ্চে অভিনয়ের জন্য রচিত হয়েছিল সেগুলি সেখানে অভিনীত হয়নি। এ প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

একেই কি বলে সভ্যতা

রচনাকাল ও প্রথম প্রকাশ : বাংলা সাহিত্যের গৌরব যুগের প্রবর্তক মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের সাহিত্যের আসরে প্রথম পদপাত নাট্যকার পরিচয়ের সূত্রে। মধুসূদনের বাস্তবমুখীন জীবন-চিন্তার এবং স্বচ্ছ স্বাভাবিক জীবনদৃষ্টির সহজতার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর প্রহসন দুটিতে। প্রহসন রচনার পূর্বানুসৃত পথ স্কেচধর্মী বা নক্সা-ধর্মী। প্রহসনের চরিত্রের অন্তরালে তার শ্রেণী লক্ষণ ছাড়াও নিজ ব্যক্তিত্বের বিশেষ পরিচয়টুকু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রকাশিত নেই। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনেও তার প্রমাণ মিলবে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনটি রচনা করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নাটিকাটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১২৬৯ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হয় দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত সংস্করণের ভূমিকায় জানানো হয়েছে যে "প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ নাই বললেই হয়।"

প্রথম অভিনয় : পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও তাঁর ভায়ের (প্রতাপচন্দ্র) অনুরোধ মধুসূদন ভাবপিনদ্ধ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলের গাম্ভীর্যকে এড়িয়ে সৃষ্টি করলেন কালজয়ী দু'টি প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ।' কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় নব্য-বঙ্গ সমাজের প্রবল চাপে বাধ্য হয়ে সিংহভ্রাতারা 'একেই কি বলে সভ্যতা?'র অভিনয় বন্ধ করে দেন। ফলে বেলগাছিয়া উদ্যানবাটীর রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে এই প্রহসনটি অচ্ছুৎ হয়ে রইল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি এই নাটকটি প্রথম অভিনয় করে লিখিত চরিত্রাঙ্কনকে সজীব করে তোলেন।

বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে 'একেই কি বলে সভ্যতা?'র অভিনয় বন্ধ হবার কারণ ইয়ংবেঙ্গলদের তীব্র বিরোধিতা—একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই বিরোধিতার কারণ কি তার যথাযথ স্বরূপ বোঝানোর জন্য 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বিষয়বস্তু এবং ইয়ংবেঙ্গলদের জীবনাচরণের মধ্যে একটা তুল্যমূল্য আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

বিষয়বস্তু : 'একেই কি বলে সভ্যতা?'র কাহিনী নব্যবঙ্গের উচ্ছৃঙ্খলতা, মদ্যপান এবং ব্যভিচারের যথার্থ রূপচিত্রণে সীমায়ত। কালী এবং নববাবু নামে দু'জন নব্যযুবকের কথোপকথনে কাহিনীর সূত্রপাত। কালী নবকে নিয়ে যেতে এসেছে তাদের প্রতিষ্ঠিত 'স্বাধীনতার দালান' জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায়। কিন্তু সেই সভার চেয়ারম্যান হলেও নব সম্প্রতি একটু অসুবিধায় পড়েছে। তার পরম বিজ্ঞ পিতা যিনি অধিকাংশ সময়েই বৃন্দাবনে থাকেন তিনি ফিরে এসেছেন বাড়ীতে। কোলকাতায়। নববাবু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। বিবাহিত। সংসারে তার সঙ্গে থাকেন তার মা, স্ত্রী, বোন প্রভৃতি। স্ত্রী ও বোন নববাবুর জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার কুকার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু নববাবুর মা তাঁর আলালের ঘরের দুলালকে অত হীন ভাবতে পারেন না। কর্তাবাবু কোলকাতায় আসায় নববাবুর বাইরে বের হওয়া মুশকিল হয়েছে, কেননা তিনি এই সর্বনেশে জায়গা কোলকাতায় ছেলেকে সদা চোখে চোখে রাখার পক্ষপাতী। কালী কৌশল করে কর্তামশায়কে ধাপ্পা দিয়ে নবকে সভায় নিয়ে গেল। কালীর কথাবার্তায় কর্তার মনে এক মৃদু সংশয় জেগে ওঠায় তাঁর প্রিয় সহচর বৈষ্ণব বাবাজীকে পুত্রের কার্যবিধির সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে বললেন। বৈরাগী সিকদার

পাড়ার গলিতে গিয়ে যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তাতে তাঁর একথা বুঝতে অসুবিধা হল না যে এ নিষিদ্ধ পল্লী। অতঃপর নববাবু ও কালীর সঙ্গে তাঁর দেখা। নববাবু বৈরাগীকে উৎকোচ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করল। অতঃপর জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় গিয়ে স্বাধীনতার চর্চার নামে মদ্যপান, হুল্লোড়, বেলেল্লাপনা এবং গনিকাচর্চার পর অধিক রাত্রে মত্ত অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করল নববাবু। নববাবুর বাড়ী ফেরার পূর্বে এবং পরে হরকামিনী ও প্রসন্নের কথোপকথনে বিপথগামী এই নব্যদের ঘর সংসারের দুঃখ চিত্রণ করা হয়েছে। মত্ত প্রলাপবাগীশ পুত্রকে দেখে কর্তা ও পুত্রের ক্রিয়াকর্ম সব কিছু বুঝতে পারলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন পরের দিনই কোলকাতার বাস উঠিয়ে দিয়ে সবাই বৃন্দাবনে চলে যাবেন।

সুতরাং 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে নব্যযুবকদের যে কয়টি সামাজিক দোষ পরিস্ফুটনের প্রয়াস করা হয়েছে সেগুলি হল—(ক) মদ্যপান (খ) গণিকাসক্তি (গ) কুখাদ্য খাওয়া (ঘ) স্বাধীনতার নামে বিশৃঙ্খল জীবনাচরণ। ক্রমানুসারে তৎকালীন যুবসমাজের বিভিন্ন আসক্তির পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

মদ্যপান : বৈদিক যুগেও মদ্যপান প্রথা প্রচলিত চিল। যাজ্ঞিকগণ সোমরস পান করতেন গো-বৎসের মাংস সহযোগে। কিন্তু পরবর্তীকালে সে প্রথা কিছুটা পরিণামে লোকাচারে গ্রস্ত হয়ে উঠে গিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার নানান কু-অভ্যাসগুলি শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করেছিল। মদ্যপান এগুলির মধ্যে অন্যতম। মদ্যপান বেড়ে যাবার কারণ স্বরূপ ড. জয়ন্ত গোস্বামী কয়েকটি বিশেষ সূত্র নির্দেশ করেছেন। সেগুলি হ'ল,—(ক) ইউরোপীয়দের মদ্যপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ (খ) প্রগতিশীলতার উত্তেজনা সঞ্জীবিত রাখবার উপায় (গ) প্রত্যক্ষ কর্ম থেকে মুক্তির অবকাশজনিত বিলাস (ঘ) মদ্যের সুলভতা।[১] প্রতিদিন মদ্যপানের ফলে মানুষের নানা ক্ষতি হয়ে থাকে—বুদ্ধিনাশ, দাম্পত্য জীবনে অশান্তি, সামাজিক সম্পর্কের অবনতি, সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রভৃতি। সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও উনিশ শতকের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় এবং পাশ্চাত্য অনুকারকের দল মদ্যপানকে পরম শ্লাঘ্য বলে মনে করতেন। সংস্কারকামী মানসিকতার প্রথম পদক্ষেপ রূপে ইয়ংবেঙ্গল চিহ্নিত করেছিল মদ্যপানকে। শুধু ইয়ংবেঙ্গল নয়, বেদান্ত-আশ্রয়ী একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মণগণও প্রথম গিকে পরিমতি মদ্যপানের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও রোজ রাত্রে, পরিমিত সুরাপান করতেন। তিনি তাঁর পুত্র ও বন্ধুবান্ধবদেরও পরিমিত মদ্যপানের উপদেশ দিতেন।

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি উনিশ শতকের মধ্যভাগের কলকাতার যুবসমাজের বিশেষ করে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলের ভ্রষ্টাচারের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে এই সময়কার যুবকদের ধর্মভ্রষ্টতা, আচারভ্রষ্টতা এবং যথেচ্ছাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'? প্রহসনে সভ্যতার নিয়ে এই প্রশ্নোচ্চারণের মূলে রয়েছে সেকালের কোলকাতার

১. সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন/ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী/ভূমিকা অংশ/পৃঃ ৯৯

ইয়ংবেঙ্গল সমাজ ও বাবুসমাজ। মধুসূদন এই প্রহসন উপক্রমণিকার চরিত্রলিপি নির্মাণ করতে গিয়ে নবকুমার এবং কালীনাথকে বাবু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত সেভাবে করেননি করেছেন অন্যচরিত্রগুলিকে।

ইয়ংবেঙ্গল সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি নবকুমার, কালীনাথ এবং বন্ধুদের আচরণ স্পষ্ট। নবকুমার এ নাটকে একটি অন্যতম প্রধান চরিত্র। তাই তার কথা বাদ দিয়েই আলোচনা করা প্রয়োজন।

কালীনাথ 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। নামে ইয়ংবেঙ্গল সমাজের অন্তর্ভূক্ত হলেও শিক্ষায়-দীক্ষায় সে যে অনেকটাই পিছিয়ে তা তার অমার্জিত কথাবার্তাতেই বোঝা যায়। সে নবকুমারকে ভালোবেসে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের গভীরতা বাড়িয়েছে। এটা ঠিক নয়। নবকুমার যেহেতু তাদের সভায় বড় অঙ্কের চাঁদা দেয় এবং অন্যান্য সময়ে অর্থের ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করে তাই সে নবকে ছাড়তে রাজী নয়।

গুরুজনদের প্রতি তার শ্রদ্ধা, ভক্তি তার একেবারেই নেই। পরম বৈষ্ণব নবর বাবা বৃন্দাবন থেকে ফিরেছেন শুনে সে তাকে অশ্রদ্ধাসূচক শব্দে চিহ্নিত করেছে। বলেছে, এই বুড়োটা নাকি অকালের বাদল এবং তাদের প্লেজার নষ্ট করার জন্যই তার আবির্ভাব। শুধু নব'র বাবার প্রতি নয়। শ্রদ্ধা তার নিজের বাবার প্রতিও নেই। তাই নব তাকে তার বাবার সঙ্গেই পরিচিত করতে চাইলে সে যে কথা বলে তাতেই বোঝা যায় তার ব্যক্তিসত্ত্বা নিয়েও চরম অস্থিরতা। সে বলেছে—"তোমাদের কর্তাকে কি বলব যে আমি বিয়েরের মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ির আলয়। তার উইলসনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই।" নব তার কাকার সূত্রে পরিচয় দিতে বললে সে বলে, " হ্যাঁ, একটা ওল্ডফুল ছিল বটে তার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।" তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব তাই নব তার নাম করেই পরিচয় দিতে বলে।

কালীর ইংরেজি শিক্ষার পরীক্ষা এ নাটকে হয়নি। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় তার পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা হয়েছে। বৈষ্ণববংশের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও সে যে ভাবে বৈষ্ণবদের দুই আকর গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছে তাতেই বোঝা গেছে অন্যভাষাতেও সে এমনি পারদর্শী। কারণ—বারবার শিখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সে শ্রীমদ্ভাগবত গীতাকে বলেছে 'শ্রীমতী ভগবতীর গীত' এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দকে বলেছে 'বোপদেবের বিন্দা দূতীর গীত'। কালী সর্বক্ষণ মদের নেশায় মত্ত হয়ে থাকে। মদ ছাড়া এক মুহূর্তও সে টিকতে পারে না। তাই নব'র বাড়িতে এসেও সে তার গলা শুকিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে এবং প্রচুর মদ্য পান করে। মদ খেয়ে মাতাল হওয়ার পর নব তাকে পান খেয়ে মুখের গন্ধ ঢাকতে বললে সে বলে "আমি ভাই পান তো খেতে চাইনে, আমি পান কত্তে চাই।" শুধু মদ্যপান নয় বারাঙ্গনার সঙ্গেও থাকতে সে অভ্যস্ত। সে নিজেই জানিয়েছে গরাণহাটার প্যারী ও তার ছুকরী বিন্দির কথা। তাদের বাড়িতে গিয়ে সে অনেক নাকি মজা করেছে। মিথ্যা কথা বলায় কালীর দোসর মেলা ভার। সে নবর বাবার কাছে গিয়ে তাই স্বচ্ছন্দে জানিয়েছে সংস্কৃত, শাস্ত্র শিক্ষা করার জন্য এবং ধর্মশাস্ত্রের আলোচনার জন্য তারা 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা' সংস্থাপন করেছে। সেখানে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক কেনারাম বাচস্পতিমশায় তাদের বিদ্যা দান করতে আসেন। কিন্তু কর্তামশাই যে তার চেয়েও বেশী ধুরন্ধর তা তার জানা ছিল না। তাই কৌশলে তাকে প্রশ্ন

করে জেনে নিতে পেরেছেন, সিকদার পাড়ার গলিতে অর্থাৎ পতিতাপল্লীতে এই সভাগৃহ। সেই কারণে বাবাজীকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। কালীনাথের বিন্দুমাত্র ধৈর্য্য নেই। নবকুমার বাবাজীকে কৌশলে বশ করছে দেখে সে নব'র ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কেননা সে চায় দু-চার ঘা লাগিয়ে বাবাজীকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করতে। বারাঙ্গনাদের কাছে সে যে অনেকটাই স্বাভাবিক তা বোঝা যায় প্রহসনের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে। নিতম্বিনীকে আহ্বান করার সময়।

অন্যান্য চরিত্রগুলি কেবল একটি দৃশ্যেই স্বল্পক্ষণের জন্য আবির্ভূত। শিবু চরিত্রটির আচরণ প্রকাশ পেয়েছে কিছুটা বৈপরীত্য। প্রথমদিকে দেখা যায় সে চৈতন্য, বলাইকে জানিয়েছে নব ও কালী বেশ লেখা-পড়া জানে। তাই তারই এই সভাকে লিড্ করতে পারে। কিন্তু মহেশের উক্তিতে জানা গেছে নব'র ইংরাজি ভাষার দৌড়। সে যে চিঠি লিখেছিল তা অজস্র ভুলে ভরা। বলাই জানিয়েছে কালী তার চেয়েও এককাঠি সরেস। চৈতন্য, বলাই, শিবু, মহেশ এদের পৃথক পৃথক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা মুশকিল। এরা সবাই মদ্যপ। সবাই বারাঙ্গনাকে নিয়ে মত্ত থাকে। নিজের সামান্য ইংরেজি জ্ঞানের বড়াই করে এবং মদ্যপান করে ইংরেজদের চেয়ে নিজেদের সভ্য ভাবে।

ইংরেজি প্রীতি এদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নব তার বিলম্বের ব্যাপারে অজুহাত দিতে চাইলে শিবু ইংরেজি করে বলে 'That's a lie'। ফলে নিজেদের মধ্যেই শুরুহয়ে যায় তুমুল বাকযুদ্ধ। শেষপর্যন্ত অবশ্য তার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। নব'র অনুপস্থিতিতে চৈতন্যকে চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। কিন্তু সামান্য বক্তব্য রাখার ক্ষমতাও তার নেই। ফলে সে চেয়ারম্যান হয়েই মদ্যপান করার নির্দেশ দিয়েছে এবং খেমটাওয়ালীদের নাচ, গান করতে বলেছে।

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে ইয়ংবেঙ্গল ও বাবু সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রগুলির উপস্থাপনে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এদের আচরণে সে যুগের সমাজের ছবি যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে। এবং তা এমনই বাস্তব হয়ে উঠেছিল যে শেষপর্যন্ত ইয়ংবেঙ্গল সমাজ প্রবল বিরোধিতা করে এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করে দিয়েছে। কেননা তারাই যে এ প্রসহনের নব-কালী-চৈতন্য-শিবু-বলাই-মহেশ।

ইয়ংবেঙ্গলের মদ্যপ্রীতি : হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র রাজনারায়ণ বসু মদ্যপান করেন জানতে পেরে তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু বলেছিলেন—'যখনি সুরাপান করিবে তখনি আমার সঙ্গে পান করিবে, অন্যত্র পান করিবে না।' পুত্রকে মদ্যপানে সংযত রাখার জন্য এ নির্দেশ দিয়েছিলেন নন্দকিশোর। শিবনাথ শাস্ত্রী জানাচ্ছেন—"এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে সে সময়কার সংস্কার পথে অগ্রসর ব্যক্তিগণ সুরাপানকে হীনচক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং ডিরোজিওর শিষ্যগণ অপরাপর দিকে অগ্রসর হওয়ার ন্যায় সুরাপান বিষয়েও যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।"[১] দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় ও তাঁর বন্ধুবর্গ সামাজিক সংস্কার কর্মে ব্রতী হয়ে মদ্যপানের মাধ্যমে কুসংস্কার ছেদনকেই পরম কৃত্য বলে মনে করেছিলেন। নিজ জীবনচরিতে তিনি জানাচ্ছেন,—

১. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ/শিবনাথ শাস্ত্রী/পৃঃ ৮৭

"আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরাপান বিশেষ দোষকর ও পাপ-জনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে, যখন এমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও সভ্য জাতীয়েরা ইহা আদর পূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিত-জনক কখনই নহে।...আমরা চারি পাঁচজন আত্মীয় কখনও কখনও তাঁহার বাসায় আহারের সঙ্গে মৃদু মদিরা পান করিতাম এবং বড়ই সুখী হইতাম।"[১]

মদ্যপান এমন ওতপ্রোতভাবে ইয়ংবেঙ্গলদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল যে কেউ মদ্যপানের আহ্বান জানালে তা প্রত্যাখ্যান করা শিষ্টাচার বহির্ভূত বলে মনে করতেন অনেকে। শিবনাথ শাস্ত্রী রামতনু লাহিড়ীর মদ্যপানের প্রারম্ভরূপে এক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই—খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক রেভারেণ্ড হাউ (Rev-Hough)-এর হাবড়ার বাড়ীতে ইয়ংবেঙ্গলদের এক সম্মিলন হয়। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় সেখানে রেভারেণ্ডের কুমারী কন্যা রামতনুকে এক গ্লাস শেরি পান করতে দেন। লাহিড়ী মহাশয় তখনও পর্যন্ত মদ্যপান করতেন না—তিনি দোনা-মোনা করছেন দেখে "দক্ষিণারঞ্জন আসিয়া কানে কানে বলিলেন, "ইংরাজ সমাজের এই নিয়ম যে, ভদ্র-মহিলারা কিছু আহার বা পান করিতে দিলে, তাহা আহার বা পান না করা অসভ্যতা অতএব পান না কর, একবার ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করাও"। বলা বাহুল্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামতনু মদের গ্লাস ওষ্ঠে ছোঁয়ালেন।"[২] শুধু ইয়ংবেঙ্গল নয় মদ কোলকাতার মানুষকে এমন ভাবে গ্রাস করে ফেলেছিল যে প্যারীমোহন সেন রচিত 'রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলিকাতা' নামক পুস্তিকায় একটি ছড়াতে লেখেন,—

"যে দিকে ফিরায় আঁখি সেই দিকে রাঁড়।
মারামারি হুড়াহুড়ি টানাটানি ভাঁড়।।
কেহ কার মেরে চূর্ণ করিতেছে হাড়।
তবু সে না ছাড়ে রোক্ যেন হট্ট ষাঁড়।।"

মদ্যপানের ব্যাপকতা : শুধু পুরুষেরা নয় নারীরাও মদ্যপান বিষয়ে কোথাও কোথাও পুরুষদের টেক্কা দিয়েছিল বলে 'সমাজ-সময়-সংস্করণ' (১৮৮৩) প্রহসনে উল্লেখ আছে। মদপান নিবারণী সভার উদ্যোক্তা প্যারীচাঁদ মিত্র 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' গ্রন্থে মদ্য অভ্যাসের বিভীষিকার এক বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,—

"কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায়, সেখানেই মদ খাবার ঘটা। কি দুঃখী, কি বড় মানুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্নত্যাগ করে।"[৩]

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষেরা মদ্যপান রূপ ভয়ঙ্কর নেশার মোহময়ী আকর্ষণে সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে দেখে সাধারণ মানুষকে এই কুপ্রথার কুফল সম্পর্কে

১. আত্মকথা / ১ম খন্ড / কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় / আত্মজীবন চরিত / পৃঃ ৬৬
২. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ / শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ ৮৬
১. মদ খাওয়া বড়ো দায় জাত থাকায় কি উপায় /প্যারীচাঁদ মিত্র /পৃঃ ১

অবহিত করার চেষ্টা করেছে 'সুলভ সমাচার', 'সংবাদ প্রভাকর', 'বিজ্ঞান মিহিরোদয়' প্রভৃতি সাময়িক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকা। 'বিজ্ঞান মিহিরোদয়' পত্রিকা লেখে,—

"মদ্যপান...সামান্য অনর্থের কারণ নহে, মদ্যপান দ্বারা লোকের বল, বীর্য্য, বুদ্ধি, বিবেক, মান অবশেষে প্রাণ পর্যন্ত বিনষ্ট হয়। মদ্যপায়িদিগের চিত্ত, অহরহ পাপ ও মোহপঙ্কে নিমগ্ন থাকে। লজ্জা, দয়া, ঘৃণা, ক্ষমা, বিনয়িতা, সত্যভাষিতা প্রভৃতি নির্ম্মল গুণগণ তাহাদিগের হৃদয় হইতে একেবারেই প্রস্থান করে।"[১]

মদ্যপানে কুফল সম্পর্কে মন্তব্য : দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র সভ্য জাতির অনুকরণে সংস্কারমুক্ত হতে মদ্যপান করেছিলেন। উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি সমাজ ইংরেজে শাসকের গুণাগুণ বর্ণনায় অনেক সময় ব্যয় করেছেন। কিন্তু তারই মধ্যে কেউ কেউ অনুযোগ করে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্যও রেখেছেন। ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'আচার' (১৮৯৬) গ্রন্থে বলেছেন—"রাজকোষের আয় বৃদ্ধি করাই রাজপুরুষগণের লক্ষ্য। বর্ষে বর্ষে মদের দোকানের বন্দোবস্ত হয়, অর্থাৎ মদ্য বিক্রয়ের নূতন অনুজ্ঞা পত্র দেওয়া হয়। যে সমস্ত রাজকর্মচারী এই অবসরে আইন বাঁচাইয়া দোকানের সংখ্যা ও রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাঁহারা প্রশংসা ভাজন হন।" জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ্ ইন্স্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভায় বেঙ্গল ক্রীশ্চন হেরল্ড পত্রিকার সম্পাদক কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে নিজ আনুগত্য-সূচক বক্তব্য রেখেও তিনি বলেন, "...সেই সঙ্গে যে একটি বিষফল উৎপাদিত হইয়াছে, তাহার নাম করিলে ফল গণনার সম্পূর্ণতা হইতে পারিত। সে ফলটি আর কিছুই না—পান দোষ।" সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্ত পাশ্চাত্য অনুকারীদের এই মদ্যপ্রীতিকে ব্যঙ্গ বিদ্ধ করে লেখেন,—

"ধন্যের বোতল বাসী ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতা সকল।।"

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর, এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক প্যারীচাঁদ সরকার প্রতিষ্ঠা করেন 'মদ্যপান নিবারণী সভা'। এই সভার সভাপতি ছিলেন তিনি। কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত 'ভারত সংস্কারক সভা'র (১৮৭০)। সুরাপান ও মাদক নিবারণ বিভাগের মুখপত্র 'মদ না গরল' নামে মাসিক পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যা হাজার খণ্ড মুদ্রণ করে বিনামূল্যে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা করেছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ ও বিদেশী শাসকের অনুগ্রহ পুষ্ট মুৎসুদ্দি, জমিদারশ্রেণী-জাত বাবু সম্প্রদায় মদ্যপানে সমানে পাল্লা দিয়ে যেত ইয়ংবেঙ্গলদের সঙ্গে। প্রচলতি এক ছড়ায় বাবুর নটি লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়,—

"ঘুড়ি ঘড়ি জম দান
আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান
অষ্টাহে বনভোজন
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।"

শিবনাথ শাস্ত্রী বাবুদের বিচিত্র স্বভাবের কথা বর্ণনা করেছেন এইভাবে,—

---

১. বিজ্ঞান মিহিরোদয় ১২৬৫ বঙ্গাব্দ ১৫ আষাঢ় সংখ্যা।

"বাবু মহাশয়েরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বলুবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, ফুল আখড়াই, হাফ আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রিকালে বারাঙ্গণাদিগের গৃহে গৃহে গীতবাদ্য ও আমোদ-প্রমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খড়দহের ও ঘোষপাড়ার মেলা এবং মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গণাদিগকে সঙ্গে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।"[১]

গণিকা সঙ্গ : বাবুদের সম্ভোগলিপ্সা ছিল তীব্রতর। বাবুদের দলে একদিকে যেমন ছিল হঠাৎ- বাবুর দল—তেমনি বিত্তবান শিক্ষিত বাবুও। নারীসঙ্গলোভী বাবুদের এই ধরনের বাবুয়ানাতে খরচের পরিমাণটিও কম হত না। ('সধবার একাদশী' প্রহসনে অটলের কথা স্মর্তব্য।) নারীর প্রতি আসঙ্গলিপ্সার দুটো রূপের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়,—

(ক) গণিকা সঙ্গ

(খ) বাঈজীদের প্রতি আসক্তি।

বারাঙ্গনা এবং বাঈজীদের নিয়ে বাবুদের হুল্লোড় প্রবণতার চিত্র এঁকেছেন শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন 'পূজা-পাঠ কবিতা'য়,—

"বাবু-বারঙ্গনা আর বারাঙ্গনা
বিভোর বিলাস-রসে।
পতি-উপপতি কাকুতি-মিনতি
করে মহাজন পাশে।।"[২]

কুখাদ্য খাওয়া : পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ-প্রয়াসী যারা তারা খাদ্যখাদ্যের ব্যাপারেও এদেশীয় সমস্ত নীতি নিয়ম লঙ্ঘন করাকেই সভ্য হওয়া বলে মনে করত। শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ খাদ্য সম্পর্কে এই বিদেশ প্রীতির বাড়াবাড়িকে সহ্য করতে পারেননি। যদিও প্রথমোক্ত তিনজন প্রথম জীবনে খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার বড় করতেন না। শুধু মুরগী মাংস, গো-মাংস প্রভৃতি নিষিদ্ধ মাংসাদি খেয়ে ইয়ংবেঙ্গলদের তৃপ্তি হত না। তারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ব্রত করার জন্যও সচেষ্ট থাকত,—

"তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মুণ্ডিত-মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য "আমরা গরু খাই গো, আমরা গরু খাই গো" বলিয়া চীৎকার করিত।"[৩]

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬—১৯২৩) খাদ্যের ব্যাপারে অন্ধ বিদেশী অনুকারীদের তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন 'বাঙালি বড় বুদ্ধিমান কে বলে সংসারে' গানে। সরাসরি তিনি বলেন,—

"দুদিন স্কুলে গেলে,
দেশী খাওয়া যান ভুলে,
পরমান্ন ছেড়ে তুষ্ট গোমাংস আহারে।"

স্বামী বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে অন্ধ বিদেশী সভ্যতার অনুকারীদের চিত্র

১. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ /শিবনাথ শাস্ত্রী/পৃঃ ৮৭
২. জন্মভূমি পত্রিকা /আশ্বিন ১৩০০/পৃষ্ঠা ৬৫৩
১. রামতুন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ /শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ ১০২

এঁকে এদেশী ব্যবস্থার সঙ্গে বিদেশী ব্যবস্থার একটা সুষ্ঠু সমীকরণের চেষ্টা করেছিলেন পরবর্তীকালে।

অন্ধ পাশ্চাত্যপ্রেমীদের য়ুরোপ প্রীতির পরিচয় দেওয়া স্বতন্ত্র পুস্তকের বিষয় এক্ষেত্রে তাই সামগ্রিকভাবে অনুকরণের স্বরূপটি তুলে ধরার জন্য লক্ষণগুলি উল্লেখ করছি,—

১। পোষাক পরিচ্ছদে সাহেবীয়ানা প্রদর্শন।
২। মাতৃভাষায় অবজ্ঞা নয়তো অজ্ঞতা—ইংরেজি ভাষা প্রীতি।
৩। ফ্যাসনপ্রিয়তা।
৪। মদ্যপ্রীতি।
৫। বিদেশি উৎসবাদির প্রবর্তনে ঐকান্তিক আগ্রহ।
৬। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ইংরেজি কেতার অনুসরণ।
৭। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি সমর্থন।
৮। হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাবের প্রকাশ।

কিন্তু ইয়ংবেঙ্গলদের পাশ্চাত্য অনুকরণের জন্যই অনুকরণ হয়ে গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। দু'চার জন ইয়ংবেঙ্গল ছাড়া অধিকাংশ ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ আদবকায়দা-সর্বস্ব বিলাত-প্রাণ জীবন কাটিয়েছে। 'নূতন ও পুরাতন' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী ইয়ংবেঙ্গলদের এই স্বেচ্ছাচারী জীবনাচরণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লিখেছেন,—

"আসল কথা, নব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজারে ন-শ নিরানব্বই জন কস্মিন কালে প্রাচীন সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। অদ্যাবধি তাঁরা কেবলমাত্র অশনে বসনে ও ফ্যাশনে সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করে আসছেন; কেননা এ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করবার দরুন তাঁদের কোনোরূপ সামাজিক শাস্তিভোগ করতে হয় না।"[১]

নব্য যুবকদের বিরোধিতার কারণ : ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যযুবকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে অঙ্কিত নব, কালী, চৈতন, শিবু প্রভৃতি নব্যবঙ্গের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি মিলিয়ে নিলেই আমরা এই প্রহসনটির প্রতি উক্ত গোষ্ঠীর ক্ষোভের কারণ বুঝতে পারব। ইয়ংবেঙ্গলদের চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলি 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে পরিস্ফুট সেগুলি নিম্নরূপ,—

১। মদ্যপ্রীতি—'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নব্যযুবকদের মদ্যপানের উল্লাস ব্যক্ত।
২। দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় ইংরেজি কেতার অনুসরণ—
 (ক) সভা আহ্বান করে সকলে সম্মিলিত হওয়া।
 (খ) বিদেশীদের অনুকরণে সভার কাজ পরিচালনা।
 (গ) বক্তৃতার মধ্যে সমর্থনসূচক অব্যয় ব্যবহার—হিপ্ হিপ্ হুররে।
 (ঘ) বিদেশীদের অনুকরণে নববাবু বোনের গালে চুমু খেয়েছে।
৩। গণিকাশক্তি—'একেই কি বলে সভ্যতায়' বারাঙ্গনা, বাঈজী উভয়ের কথাই আছে।
৪। মাতৃভাষায় অবজ্ঞা ও ইংরেজি ভাষা প্রীতি—শিবু নববাবুর কথার জবাবে বলে 'দ্যাটস্ এ লাই'—নব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—কারণটা আর কিছু নয় নববাবুকে বাংলা

১. তেল নুন লকড়ি /প্রমথ চৌধুরী /পৃঃ ১০৮

ভাষায় মিথ্যাবাদী বললে সে রাগ করত না, কিন্তু ইংরেজিতে তাকে লায়ার বলা সে বরদাস্ত করতে পারছে না।

৫। স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার ও স্ত্রী স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের কথা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারের অভীপ্সা যে নববাবুর আছে সেকথা জ্ঞান তরঙ্গিনী সভার বক্তৃতাতে তার কণ্ঠে আমরা শুনি।

৬। হিন্দু বিদ্বেষী ইয়ংবেঙ্গলের সঙ্গে এই প্রহসনের চরিত্রের মিল আছে নববাবুর বক্তৃতায় শুনি হিন্দুকুলে জন্ম হলেও এখন হিন্দু পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি তাদের রয়েছে অবজ্ঞা।

৭। ইয়ংবেঙ্গলদের মতো কুখাদ্য খাওয়ায় জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সভ্যরা ভারী খুশী। দু'জনে মুটের কথাবার্তার মাধ্যমে জানানো হয়েছে গোমাংস ভক্ষণে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সভ্যদের প্রীতির কথা।

প্রসঙ্গত 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র কার্যধারার কথা ছেড়ে দিলে দেখা যায় ইয়ংবেঙ্গলেরা ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যেমন প্রতিষ্ঠা করেছিল Academic Association, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শাস্ত্র—দর্শন, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে যে সভায় আলোচনা হত— সে সভার অনুকরণে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র উদ্ভব বলে অনেক ইয়ংবেঙ্গলের বিশ্বাস ছিল। 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা' সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের মত " 'জ্ঞানতরঙ্গিনী' সভার সভ্যদের আদর্শ নিজের ও বন্ধু সহপাঠীদের মধ্য হইতেই তিনি (মধুসূদন) পাইয়াছিলেন। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার কথায় স্বভাবতই কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎ-সাহিনী সভার নাম মনে আসে।"[১] সে কারণেই ইয়ংবেঙ্গলদের ক্ষোভ অত তীব্র হয়েছিল। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র জানিয়েছেন—'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন বাংলা ভাষায় লেখা সর্বোৎকৃষ্ট প্রহসন। ইয়ংবেঙ্গল অভিধেয় নববাবুদের দোষোদ্‌ঘোষণাই এই প্রসহনের উদ্দেশ্য। তাছাড়া এখানে যে সব ঘটনা প্রদর্শিত হয়েছে সেই ঘটনাগুলির প্রতিটিই আমাদের জানিত কোন-না-কোন নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।' রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি পত্রে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মধুসূদনের প্রতিভার বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

একদিকে যে কবি 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে'র সংগে গুরুগম্ভীর কাব্য রচনায় ব্যাপৃত সেই কবি কীভাবে একই সঙ্গে এমন হাল্‌কা স্বাদের প্রহসন রচনায় আত্ম-নিয়োগ করতে পারেন—লেখকের বিস্ময় এখানে—তিনি লিখেছেন—"It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama." সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের প্রহসন দুটির সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নির্দ্বিধায় 'একেই কি বলে সভ্যতা'কে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন,—

---

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)/ড. সুকুমার সেন/পৃঃ ৮২

"His farces, however are good. One of them, entitled.

"Is this civilization ? is the best in the language."[১]

সে কালের উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকাগুলি ও মনীষীবৃন্দ মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রাহসনিক শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে নিদ্বির্ধ মন্তব্য পোষণ করেছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের মতে 'একেই কি বলে সভ্যতা' উৎকৃষ্ট প্রহসন।

প্রহসন সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সেই আলোকে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বিচার করা যেতে পারে।

প্রহসনে জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির চিত্র আঁকা হয়—সেই চিত্র প্রহসনকারের সমকালীন সমাজ, ধর্ম, রাজনীতির দুর্বলতম, কলঙ্কময় স্থানগুলি পরিস্ফুট করে দেয়। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র কাহিনীতে আছে তৎকালীন বহু আলোচ্য কাহিনী। ডিরোজিও-র ভাবশিষ্য ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণের চিত্র এই নাটিকার উপজীব্য। ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নব্যবঙ্গের প্রতিনিধি নববাবু ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে স্বাধীনতার নামে, সভ্যতার নামে যতেচ্ছ আচরণে ব্যাপৃত। মদ্যপান, গণিকাসঙ্গ কুসংস্কার-বিরোধী বক্তৃতা করাকেই এই শ্রেণীর মানুষেরা সভ্যতার চরণতম পরিচয় বলে মনে করত। এই নব্যযুবকেরা নিজ পরিবার ও পরিজনদের প্রতি তাদের যথোচিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করত না। নবকুমারে পরিবারের বেদনাদায়ক কাহিনী এই নাটিকায় গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু একথা ঠিক এই নাটিকায় তেমন ধারাবাহিক কোনও কাহিনি নেই। সার্থক প্রহসনের মতো এই নাটিকায় কাহিনী-বিন্যাসে পূর্ণতা নেই। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"একেই কি বলে সভ্যতা' পুরোপুরি রঙ্গরসের প্রহসন, কাহিনী নাম মাত্র।"[২] ড. সুকুমার সেনের মতে 'একেই-কি-বলে সভ্যতা'য় কাহিনী বলিতে কিছু নাই।

'একেই কি বলে সভ্যতা'র কাহিনী সমকালীন বহু আলোচ্য প্রসঙ্গে হলেও অতিরঞ্জিত কিছু ঘটনার আরোপে এ কাহিনী কিছুটা অ-স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে (ক) যে কালী কর্তামশায়ের সঙ্গে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথা বলতে সমর্থ সেই কালী বার বার চেষ্টা করেও গীতগোবিন্দ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা উচ্চারণ করতে পারল না। (খ) বাবাজীর আচরণ (গ) নববাবুর মায়ের পুত্রের প্রতি নির্ভেজাল বিশ্বাস প্রভৃতি। এই যে অতিরঞ্জন, মদ্যপ নবকুমারকে দেখেও তার মা বুঝতে পারেন না পুত্রের কুকীর্তির কথা। তাছাড়া কালীর ও বাবাজীর আচরণ—বক্ষমাণ নাটিকাকে হাস্যরসোচ্ছ্বল করে তুলতে এ ঘটনাগুলি যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন প্রহসনের ক্ষেত্রে বাহ্য ঘটনার ও পরিস্থিতির বা তথ্যের অতিরঞ্জন যতটা দৃষ্ট ততটা অতিরঞ্জন লক্ষিত হয় না চরিত্রের ক্ষেত্রে। প্রকৃত-পক্ষে প্রহসনের চরিত্রগুলি হয়ে থাকে type ধর্মী, বিশেষ বিশেষ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে তারা। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রতিটি চরিত্রই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে। নব, কালী, চৈতন্য, শিবু, বলাই—নব্যবঙ্গের প্রতিনিধি। কর্তা, বাবাজী বৈষ্ণব অথবা দেবদ্বিজে

১. The Calcutta Reivew / April, 1871

২. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত /ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/পৃঃ ৪৫০

ভক্ত সমাজের প্রতিনিধি, সার্জেন্ট চৌকিদার শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি; বারাঙ্গনা, মুটিয়া, গিন্নিমা, হরকামিনী, প্রসন্ন স্ব স্ব সমাজের type চরিত্র। কিন্তু তবু চরিত্রগুলি স্ব-শ্রেণী থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র হয়েছে তাদের ব্যক্তি-লক্ষণের অনায়াস প্রয়োগে। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলির সাধারণ ধর্ম—পাশ্চাত্য অনুকরণ প্রবণতা, মদ্যপান, বারাঙ্গনাসক্তি, ভগিনীর সঙ্গে বিলিতি কায়দায় সম্ভাষণ বিনিময়, সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ প্রভৃতি। কিন্তু এই দলভুক্ত চরিত্রগুলির থেকে নব ও কালীর স্বাতন্ত্র্য তাদের চরিত্রের বিশেষ লক্ষণে প্রকাশিত। নব'র মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বদানের সহজাত ক্ষমতা, কোনও জটিল পরিস্থিতির থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল উদ্ভাবনেও সে সমান দক্ষ। পিতাকে প্রবঞ্চনা করার সহজ উপায় সে তার বন্ধু কালীকে শিখিয়ে দিয়ে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় যাবার পথ পরিষ্কার করেছে। কালীর চরিত্রে ব্যক্তি-লক্ষণ প্রকাশিত তার দুর্বল স্মৃতিশক্তিতে, অপরিণামদর্শী উদ্ধত কর্মে। শিবু, চৈতন্য, বলাই, মহেশ প্রভৃতি সভ্যেরা (যদিও তাদের চারিত্রিক সাধারণ লক্ষণ দেওয়া নেই তবু ধরে নেওয়া যায়) ইয়ংবেঙ্গলদের মতোই আচার-আচরণ-প্রবণ। তাদের চারিত্রিক বৈশেষিক লক্ষণ মানসিক স্থিতি-স্থাপকতার অভাবে পরিলক্ষিত হয়। সভাপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে তাদের চরিত্রের এই বিশেষ লক্ষণ প্রকটিত। বাবাজীর চরিত্রে ধার্মিক রূপটি দেখানো নাট্যকারের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য তার ঘুষ নেওয়ার প্রবণতাকে তুলে ধরা। সার্জেন্ট ও চৌকিদারের চরিত্রেও একই জিনিস লক্ষণীয়। এখানেই চরিত্রগুলি type-ধর্মী হয়েও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে।

কাঠামো সংস্থাপন ও ত্রয়ী ঐক্য : সার্থক প্রহসনের কাঠামো এক অঙ্ক থেকে তিনি অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। হাস্যরসাত্মক নাটিকায় হাস্যরস প্রভাহের স্বতঃস্পূর্ত ধারাকে সঞ্জীবিত রাখতে হয়। বলে নাটিকা দীর্ঘায়ত হয়ে পড়লে নাট্যরস বাধাপ্রাপ্ত হয়। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি দুটি অঙ্কে মোট চারটি গর্ভাঙ্কে রচিত। আয়তন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—আদর্শ প্রহসনের কাঠামো এটি। এ্যারিস্টটল নির্দেশিত গ্রীক নাটকের ত্রয়ী ঐক্যের আদর্শ এখানে সচেতনভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের সমগ্র কাহিনীর ঘটনাস্থল উত্তর কোলকাতার এক বনেদী অঞ্চল—সুতরাং, স্থানগত ঐক্য (unity of place) এ নাটিকায় রক্ষিত। কালগত ঐক্যও (unity of time) এই নাটিকায় রক্ষিত হয়েছে। নাট্য কাহিনীর সূত্রপাত বিকেলে। কর্তামশায়ের উক্তিতে জানতে পারি—প্রথম দৃশ্য শুরু হয়েছে প্রায় পাঁচটার সময়। 'কেন, বেলা দেখছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা বাপু, এত সকালে যাবে কেন?" (১।১) ঘটনার সমাপ্তি রাত্রিতে। খুব বেশী হলে রাত্রি দশটা হবে। কেননা প্রমত্ত নবকে জনৈক ভৃত্য জানাচ্ছে,—'তোমার পায়ে পড়ি, দাদাবাবু এত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, কত্তা মশায় ওই ঘরে ভাত খাচ্চেন।' সুতরাং নাট্যিক ঘটনার সময়কাল চব্বিশ ঘণ্টার স্থানে ছয়-সাত ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রহসনটিতে ঘটনাগত ঐক্য বা সংঘাত ঐক্য (unity of action)-ও রক্ষিত। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কালী-নব-র কথাবার্তায় তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে বৈষ্ণব কর্তামশায়ের সন্দেহের জাগরণ, দ্বিতীয় দৃশ্যে সেই সন্দেহ নিরসনকল্পে কর্তা কর্তৃক তাঁর প্রিয় সহচর বৈষ্ণব বাবাজীকে প্রেরণ, সিকদার পাড়ার গরিতে বাবাজীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ, নব ও কালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, নব কর্তৃক উৎকোচ দিয়ে বাবাজীর মুখবন্ধ করা প্রভৃতি। দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে

জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার কার্যকলাপ বর্ণন, 'একেই কি বলে সভ্যতা'র Irony এখানেই সীমাবদ্ধ। এই দৃশ্যেই এই নাটিকার কাহিনী climax স্পর্শ করেছে। অতঃপর দ্বিতীয় দৃশ্যে রয়েছে অবরোহণ (fall of Action) বা পরিণতি। সুতরাং ঘটনাধারার মধ্যেও সংঘাতগত ঐক্যটিও রক্ষিত।

সার্থক প্রহসন কিনা

প্রহসন বলতে বোঝায় হাস্যরসাত্মক স্বল্পায়তনের এক নাটককে। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রহসনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা হচ্ছে তা দেখা যায় এক বা দু'পঙ্কে প্রহসন রচিত হতে পার তোর নায়ক হবে তপস্বী অথবা বিপ্র এছাড়া থাকে একটি মাত্র কৃষ্ট বা খল চরিত্র। বাংলা ভাষায় হাস্যরসাত্মক নাটকের চল ছিল সুপ্রাচীন। হাস্যরসাত্মক এই নাটকে নিন্দনীয় বিষয় অত্যন্ত স্থূলভাবে প্রকাশ পেত। নকশাধর্মিতা ছিল এই শ্রেণীর নাটকের মূল বিষয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অবদনে মধুসূদনের হাতে যে প্রহসন গড়ে ওঠে আর মূলে পাশ্চাত্য হাস্যরসাত্মক নাটক অর্থাৎ ফার্স-এর সাদৃশ্য রয়েছে। এই নাটকের বৈশিষ্ট্য গুলি হল—

(i) এর আয়তন হয় সংক্ষিপ্ত।

(ii) এর বিষয়বস্তু হয় সমকালীন।

(iii) এই নাটকের মূলরস-হাস্যরস।

মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'—একটি স্বল্পায়তনের নাটিকা দুই অঙ্কে দুটি করে চারটি গর্ভাঙ্ক এটি নির্মিত। ফলে প্রহসনের আকার সম্পর্কে নির্দেশ একেই কি বলে সভ্যতা?—নাটিকায় রক্ষিত হয়েছে।

'একেই কি বলে সভ্যতা?'-র বিষয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতা শহরের উশৃঙ্খল নব্য শিক্ষিতদের জীবনচর্চা। এই সাধিকায় দেখা গেছে নবকুমার পরমবৈষ্ণব কর্তারা পুত্ৰ ইংরেজী ইস্কুলে পড়ার সুবাদে শিক্ষা-দীক্ষায়তার অপ্রগতি না হলেও অগ্রগমন হয়েছে মদ্যের প্রতি আগ্রহে। অসৎ বন্ধুর সঙ্গে এবং কুস্থানে যাতায়াতের আগ্রহে। কিন্তু সবচেয়ে লার ব্যাপার এটাই যে তারা তাদের এই নষ্টামীকে গুনর্তোর ভণ্ডামীর খোলসে ঢেকে রেখেছে। তাই বাবা তাকে তার যাবার জায়গার কথা জানতে চাইলে সে স্বচ্ছন্দ্যে মিথ্যা ভাষণ করে। সে উজানতরশিশু। সভায় বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছে। বন্ধুকালীও জানিয়ে দেয় সংস্কৃত কলেজের প্রধান সম্পাদক কেশারাম বাচস্পতি মহাশয় তাদের শাস্ত্র শিক্ষা দেবেন।

শাস্তেরর প্রতি আগ্রহী পুত্র ও তার বন্ধুর কথাবার্তার আচরণ বার্তা মশাইয়ের মনে তাদের প্রতি সন্দেহ জাগায়। তিনি তাঁর সঙ্গী বৈষ্ণব বাবাজুকে পাঠিয়ে দেন প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য আর তখনি জানা যায় সিকদার পাড়ার গলিতে তারা যায় মদ্যপান করে, ভ্রষ্টানারীদের নিয়ে মাতলামি করে। মাতাল অবস্থায় ফিরে আসে সব, মাতৃস্নেহের আধিক্যে তার মা-বাবা-র কোনো দোষ খুঁজে না পেলেও কর্তামশাই ঘোষণা করেছেন—এই পাপ শহর থেকে তার ছেলেকে নিয়ে তিনি বৃন্দাবনে চলে যাবেন।

সভ্যতার নামে যথেচ্ছকারা চালিয়েছে সব এবং তার সঙ্গীরা তাদের আচার-আচরণ, কথা-বার্তা প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাট্যকার হাস্যরসের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। হাসির প্রকৃতি অনুসারে পাশ্চাত্যে হাস্যরসের ধরণ কয়েক প্রকারের। 'হিউমার' অর্থাৎ সরস হাস্যরস, 'স্যাটায়ার' অর্থায় ব্যঙ্গাত্মক

হাস্যরস, 'উইট' অর্থাৎ বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস, 'যপন' অর্থাৎ কৌতুকরস ইত্যাদি। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনের সব রকমের হাস্যরসের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও স্যাটায়ারের আধিক্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ইয়ংবেঙ্গল সমাজের প্রতিনিধি হলো তাদের পদাস্খলন তাকে ব্যাথিত করত। তাই সমাজশোষনের উদ্দ্যেশে সভ্যতার নগ্নরূপকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন মধুসূদন। আর এই কারণেই ইয়ং বেঙ্গালেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এমন বাধা দেয় যে মহড়া হওয়া সত্ত্বেও বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে এই প্রহসনটি অভিনীত হয়ে পারেনি।

'একেই কি বল সভ্যতা?'-র শুরু থেকে শেষপর্যন্ত নানাভাবে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন—সব-র বাবার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে কালীর ভয়ে গেলা শুকিয়ে যাওয়া। ব্র্যান্ডি খেয়ে একটু সামলে নিয়ে নব-র কাছে তালিম দেওয়া, শ্রীমদ্ভাগবত গীতাকে এবং গীতগোবিন্দকে সে বলেছে শ্রীমতী ভগবতীর গী আর বিন্দাসূতির গীত। বারবার শিক্ষা দেওা সত্ত্বেও সে কর্তার জিজ্ঞাসার উত্তর বলে, "সগত অ্যামোলো! প্রত্যক্ষণের পরে দেখছি সাম্নে (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে শ্রীমতী ভগবতীর গীতায়—

বারবিলাসলিসের গোস্বামী বাবাজীর প্রতি উক্তিতে হাসির খোরাক আছে। প্রথম জন দ্বিতীয়জনকে বলেছে—

"ওলো বামা ওটা মোল্লানার ভাই রসের বৈরাগী ঠাকুর। ওই যে কুড়োজালি হাতে আছে।"

সে আসলে পুলিশ চৌকিদারের যে হাত পাতা স্বভাব ছিল এ নাটিকায় তাও সরসভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাবাজীকে দেখে তাকে ধরে বৈষ্ণবের মালা তার গলা থেকে নিয়ে নিজের গলায় পড়ে সার্জেন বলেছে—"হা, হা, হা, হা! বাপরে বাপ,—জামকড়া হুস্তু হুয়া। রায়ে কিসডে! হা, হা, হা, হা।" সার্জেন ধমক দিয়ে যেভাবে তার কাছ থেকে চার টাকা কেড়ে নিয়েছে সে কথা সেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাতে হাস্যরসের প্রকাশ ঘটেছে।

'জ্ঞানতরঙ্গিনী' সভা মদ্যপান এবং ইস্পিচ। "Let us enjoy ourselves" যেমন হাসি জাগিয়েছে তেমনি হাসির উচ্চমুখ একেবারে খুলে দিয়েছে তার এবং শিবুর উত্ত্যক্ত বাক্য বিনিময়। শিবু তাকে 'লাইয়র' বললে নব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সে জবাব দেয় তাতে তার হাস্যরসকতা আরও বেশি ফুটে ওঠে। সে বলে "টাইক্লিং"। ও আমাকে লাইয়র বললো—টাইক্লিং! ও আমাকে বাঙ্গাল করে বললো না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললো না কেন? তাতে কোন শালা রাগত? কিন্তু 'লাইয়র'—একি বরদাস্ত হয়।"

সুতরাং 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নাটিকার আয়তন, বিষয়বস্তু, চরিত্র এবং রস সর্বত্রই প্রহসনের ধর্ম রক্ষিত হয়েছে। সে কারণেই আধুনিক বাংলা প্রহসনের প্রথমপর্বের নাটিকা মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?'-কে সার্থক প্রহসন বলা যায়।

নক্সা বা স্কেচধর্মী : পূর্বেই বলেছি 'একেই কি বলে সভ্যতা'র কাহিনী অংশ বেশ আঁটোসাঁটো নয়—সেই কাহিনীর বিন্যাস প্রহসনের মতো নক্সাধর্মী। কতকগুলো খণ্ড খণ্ড চিত্রকে কয়েকটি শ্রেণী চরিত্রে বিশেষ আচরণ দ্বারা সংগ্রথিত করার প্রয়াস করা হয়েছে মাত্র। চিত্র আঁকা হয়েছে কয়েকটি মাত্র—প্রথম দৃশ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যে কোলকাতা শহরের নিষিদ্ধ পল্লীর চিত্র, পরের দুটি দৃশ্যে যথাক্রমে পাশ্চাত্য অনুকারীদের সভার চিত্র এবং নব'র বাড়ীর অন্দরমহলের চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে। এই নক্সাগুলি ত্রয়ী ঐক্যের দ্বারা গাঢ় নিবন্ধ।

চাতুর্যপূর্ণ নাট্যিক পরিস্থিতি : প্রহসনের মধ্যে নাট্যিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টির অবকাশ প্রহসনকার সাধারণত পান না—'একেই কি বলে সভ্যতা'র রচনাকারও তা পাননি। কিন্তু মধুসূদন প্রহসনের চিরাচরিত কাঠামোয় অনায়াসে চাতুর্যপূর্ণ নাট্য সিচুয়েশন বা নাট্যিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নিয়েছেন। ফলে একদিকে প্রহসনটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে পর পর সংঘাত এবং বৈপরীত্যসূচক ঘটনার সমাবেশে পরম স্বাদ্য হয়ে উঠেছে। পরম বৈষ্ণব পিতার পুত্র নব কারণ-বারির ভক্ত, আবার বৈষ্ণব বাবাজীও উৎকোচ বশীভূত। যে পুত্র সংসারে প্রতি কোনও কর্তব্য পালন করে না—সেই দেশের দুর্দশামোচনে, বিধবার দুঃখমোচনে প্রয়াসী, অন্তত তার বক্তৃতায় এমন উদ্দেশ্যই সে ব্যক্ত করেছে। 'একে কি বলে সভ্যতা'র চারটি দৃশ্যের মধ্যে মাঝের দুটি (১।২, ২।১) দৃশ্যে নাট্যকারের ঘটনা বিন্যাস কৌশলে চাতুর্যের পরিচয় রয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত সিকদার পাড়ার গলির সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন এবং জ্ঞানতরঙ্গিনী সবার কার্যধারাকে বিশেষ কারণে দুটিসময় দুভাগে বিভক্ত করে (একভাবে চৈতন সভাপতি অন্যভাগে নব) সভার সভ্যদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে দেন নাট্যকার। এই নাটিকায় নাট্যকার মধুসূদন দত্ত চরিত্রগুলির জীবনাদর্শগত দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যিক-দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

হাস্যরস (ক) আচরণগত অসঙ্গতি : অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টি প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অঙ্গীরসও হাস্য। নাটকে হাস্যরস উদ্ভবের পশ্চাতে সাধারণত দুটি বিশেষ কারণ ক্রিয়াশীল থাকে—(ক) আচরণগত অসঙ্গতি এবং (খ) সংলাপ। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র হাস্যরস সৃষ্টির এই উভয় কৌশল ব্যবহৃত। দেব-দ্বিজে অবহেলা-পরায়ণ নব-কালী নব'র বাবা কর্তামশায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় স্বরূপ যখন কালীর বাবার নামোচ্চারণ না করে তার বৃন্দাবনধাম নিবাসী কাকার নাম করতে বলে তখন তাদের আচরণে কমিক উপাদান লক্ষণীয়—বিশেষ করে যেভাবে সেই তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে কর্তার কাছে ছুটি পাবার জন্য পূর্বে নিজেরা এ ব্যাপারে রিহার্সাল দিয়েছে তা যথেষ্ট হাস্যরসের খোরাক জোগায়। জ্ঞানতরঙ্গিনী সবার উদ্দেশ্য এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র দুটির নাম যেভাবে কালী জানিয়েছে তাতেও এই আচরণগত অসঙ্গতিতে হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে। সিকদার পাড়া স্ট্রিটে বাবাজীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ এবং আপন সততা সম্পর্কে বক্তব্য 'ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সারজন্ বেটারও হাতপাতা রোগ আছে, তা রক্ষে....'(১।২)। এইসব ঘটনার পর নব-কালীর সঙ্গে বাবাজীর সাক্ষাৎ এবং সে 'ঘুষ খেয়ে মিথ্যা কথা কইতে স্বীকার' করেছে বলে দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে আমরা কালীর উক্তিতে জানতে পারি। নবকুমারের সভ্য হবার চেষ্টায় বোনকে চুমু খাওয়া, গিন্নির আসার আভাস পেয়ে বৌমা ও মেয়েদের তাস লুকিয়ে চাদর ঝাড়া, মদ খেয়ে মাতাল নবকুমারকে দেখে গৃহিণীর ক্রন্দন 'আমার দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ্‌টিস খাইয়ে দিয়েছ না কি?' প্রভৃতি উক্তিতে আচারণগত অসঙ্গতির মাধ্যমে হাস্যরস ক্ষরিত হয়েছে।

(খ) সংলাপ : উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক রচনা হল নাটক। নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে সংলাপ প্রয়োগের সার্থকতার উপর। 'Preface—The play-boy of the western world'-এ প্রসিদ্ধ নাট্যকার জে. এম. সিঞ্জ বলেছেন,—"In a good play every speech should be fully flavoured as a nut or an apple, and such speech cannot be written

by any one who works among people who have shut their lips on poetry." ক্লিনথ ব্রুকস ও রার্বট, বি, হেইলম্যান সার্থক নাট্য সংলাপের ছটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন—

১। Progression বা অগ্রসরণ

২। Exposition বা সূচনা

৩। The use of informative Devices অর্থাৎ সংবাদ জ্ঞান-প্রক্রিয়ার প্রয়োগ

৪। Plausibility বা ঔচিত্য

৫। Naturalness বা স্বাভাবিকতা

৬। Thmpo বা গতিবেগ।

কিন্তু সার্থক নাটকের সংলাপের সঙ্গে প্রহসনের সংলাপে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন, প্রহসনের সংলাপ কাব্যগন্ধী হলে প্রহসন হাস্যকরভাবে ব্যর্থ হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। নিকল বলেছেন প্রহসন রচয়িতার সংলাপ রচনায় দক্ষতা থাকা বাঞ্ছনীয়,—'The author must have at his command an adequate and forceful medium for his dialogue."[1] হাডসনও সংলাপ সম্পর্কে একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। প্রহসনের সংলাপ রচনায় নাট্যকারের সাফল্য নির্ভর করে চরিত্রানুযায়ী সংলাপ রচনার উপর। এ ব্যাপারে প্রহসন রচয়িতা সাধারণত কয়েকটি বিশেষ উপায়ে চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করার চেষ্টা করেন—

(ক) বিশেষ অঞ্চলের ভাষা সংলাপের মুখ্য চরিত্রগুলির ভাষা হয়ে থাকে।

(খ) সংলাপের ভাষায় মুদ্রাদোষ বিশেষ ভঙ্গীসহ ব্যবহৃত হয়।

(গ) আদিরসাত্মক প্রসঙ্গ সরস ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করা হয়, প্রবাদ প্রবচন ব্যবহারের মাধ্যমেও এ কাজ নিষ্পন্ন করা হয়।

(ঘ) তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয় প্রাকৃত শব্দের বৈপরীত্যে হাস্যরস সৃষ্টির কারণে।

পূর্বেই বলা হয়েছে উত্তর কোলকাতার পটভূমিতে স্থাপিত হয়েছে 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি। স্বাভাবিক কারণেই এই নাটকের প্রধান চরিত্রগুলির সংলাপে বাগবাজার-শ্যামবাজার সন্নিহিত এলাকার ভাষাভঙ্গির বিশেষ রূপটি চোখে পড়ে। নব, কালীর বাক্‌ভঙ্গি লক্ষ্য করলে, হরকামিনী, প্রন্নময়ী, নৃত্যকালী ও কমলার কথোপকথনেও এই ভঙ্গি লক্ষিত হয়। মুটেদের সংলাপে যশোহর-খুলনার আঞ্চলিক কথ্য ভাষার পরিচয় রয়েছে। যেমন,—

'ও কাদের মেঁয়া, মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়য়ে থাক্তি হবে?' (১।২)

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে যে সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে সে ভাষায় মুদ্রাদোষ সংযুক্ত হয়ে ভাষার স্বাভাবিকতাকে রক্ষা করেছে। আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে সে ভাষা। মুদ্রাদোষ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে সামাজিক রীতিনীতির কথা। বক্ষমাণ প্রহসনটির কাহিনীবস্তুর উৎসস্থল যে সামাজিক পরিবেশ তার যথাযথ অনুসরণের প্রচেষ্টাতেই এই মুদ্রাদোষ দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার এক বিশেষ লক্ষণ প্রতি মুহূর্তে—সভা-সমিতিতে যে ধরনের সমর্থনসূচক, প্রতিবাদ সূচক কথাবার্তা বলা হয়ে থাকে তার সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার, যেমন,—

1. British Drama / A.Nicoll / P. 57

"নব। হষ্! অত চেঁচিয়ে কথা কয়া না, বোধ করি একটা ব্রাণ্ডি আছে।
কালী। (সহর্ষে) জষ্ট দি থিং। তা আনো না দেখি।" (১।১)

এই সংলাপের মধ্যেও ইয়ংবেঙ্গলদের ভাষাভঙ্গির একটা নিদর্শন মেলে 'হষ্', 'জষ্ট দি থিং' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে। কিন্তু এই প্রহসনের প্রায় শেষ অংশে উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণে অভ্যস্ত নববাবুর জীবনের পরিণতি দেখানো হয়েছে। একটিমাত্র মুদ্রাদোষসূচক শব্দ নবকুমারের জীবনের আনুপূর্বিক অসঙ্গতির চিত্র উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে। মদ্যপানে প্রায় অচেতন নবকুমার বাড়ীতে ফিরে পয়োধরী-জ্ঞানে নিজ স্ত্রীকে আলিঙ্গন করতে গেলে এবং দ্বারবানের কাছে পিতার সম্বন্ধে 'ওল্ড ফুল' শব্দ প্রয়োগের পর যখন ক্ষুব্ধ কর্ত্তা সরোষে বলেন,—

"কর্ত্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো ! এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এই বানরটা একটু ঘুমুক—"

তখন নব'র উত্তর—'হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন।' প্রত্যুত্তরে পিতার স্বগতোক্তি—'হায়, আমার বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল? সমগ্র প্রহসনটির পশ্চাৎপটে এক সুগভীর বেদনার আলিম্পন ঘটায় এবং উপরিতটে এক উচ্ছল হাস্যতরঙ্গের সৃষ্টি করে। গিরিশচন্দ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'মাইকেল কি খেয়েই ও কথাটি লিখেছিলেন!'

'একেই কি বলে সভ্যতা' যে সমাজচিত্রের উপস্থাপন ঘটিয়েছে মাইকেল ছিলেন সেই সমাজেরই একজন। সুতরাং, সেই সমাজের ত্রুটি, স্খলন-পতনের সবটুকু ছিল মধুসূদনের জানা। নাট্যার এই গোষ্ঠীর সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশে বুঝেছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার বুজরুকিতে ইয়ংবেঙ্গল সমাজের অন্তঃসারশূন্য বাকবিন্যাসকে। যে বাক্যের সঙ্গে কাজের কখনও যুগলমিলন ঘটে না তাকে। 'সুলভ পত্রিকা' ইয়ংবেঙ্গলদের চরিত্রের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে,—

"অনেক নবীন যুবক (Young Bengal) সাম্প্রদায়িক মহাশয়েরা, কীরূপে সভ্যরাজ ইংরাজদিগের আচার ব্যবহারদি অভ্যাস করিবেন, ইহাই নিয়ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডীয় বীর পুরুষদিগের মহোৎসাহ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাদি গুণ সমস্ত যত অভ্যাস করিতে পারুন বা না পারুন, ত্বরায় তাঁহাদিগের পান দোষ ও হঠাৎ ক্রোধোদয় প্রভৃতির অনুগামি হইয়া দারুণ দুরাচার হইয়া উঠেন।"[১]

ডিরোজিও ও তৎশিষ্যসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত 'Academic Association' হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বিচারবোধ জাগ্রত করেছিল সত্য, ফলত শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞা, সামাজিক অনুশাসন, প্রথাসিদ্ধ লোকাচারের উদ্বেগহীন বাঁধানো রাজপথে অগ্রসর না হয়ে অচেনা-অজানা পথে পাড়ি জমাবার ইচ্ছা তাদের প্রবল হয়ে ওঠে। তৃতীয় দশক ও চতুর্থ দশক ইয়ংবেঙ্গাল সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার যুগ-পর্ব। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থিতধী কয়েকজন ইয়ংবেঙ্গাল দেশ ওজাতির জন্য চিরস্মরণীয় কিছু কাজ করে যান। কিন্তু অধিকাংশই বাহ্বাস্ফোটে

১. সুলভ পত্রিকা /১২৬০ ভাদ্র সংখ্যা।

পারদর্শিতা দেখিয়েছেন—কর্মের জগতে পদার্পণ করেননি কখনও। তৎকালীন একটি পত্রিকা ইংরেজি শিক্ষিত নব্যযুবকদের চরিত্রে অসঙ্গতি দেখাতে গিয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছে,—

> "আধুনিক ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ইচ্ছা হয় বাঙ্গালা ভাষায় কোনও বিষয় লিখিয়া সমাচার পত্রে প্রচার করিবেন কিন্তু লিখিতে বলিলেই দুই চক্ষু ললাট পানে উঠিয়া যায়.....'[১]

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে এই শ্রেণীর নব্যযুবকদের চারিত্রিক অসঙ্গতিকে মূল অবলম্বন করা হয়েছে। 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'য় নববাবুর বক্তৃতা প্রকৃতপক্ষে এই নব্যসমাজের সার্বিক প্রতিচ্ছবিটুকু, ফুটিয়ে তুলেছে। সুতরাং এই বক্তৃতাটি বিশ্লেষণ করে সমাজচিত্রগুলি খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে।

> দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নবকুমার তার বক্তৃতায় প্রথমেই বলেছে,—
> "জেণ্টেলম্যান এই সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা—আমরা সকলে এর মেম্বর—আমরা এখানে মীট করে যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে থাকি—এণ্ড উই আর জলি গুড ফেলোজ্।"

নবকুমারের বক্তৃতায় এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রবাহকে ডিরোজিও সাহেবের অনুপ্রেরণায় প্রথম Academic Association প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় জ্ঞানচর্চা, কাব্যচর্চা, ধর্মচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা, স্বদেশভাবনা প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বহু সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু অন্ধ পাশ্চাত্যপ্রীতিতে প্রতিষ্ঠিত এই সভা-সমিতিগুলিতে কতটা যে জ্ঞানচর্চা হত তার কিছুটা আভাস জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার[২] কার্যক্রমেই প্রকাশিত। এই সভার জ্ঞানচর্চা মূল বিষয় নাকি সংস্কৃত চর্চা! নাটিকার প্রথম দৃশ্যে কালী অন্তত আমাদের সেই তথ্যই দেয়। কর্তাকে সে জানায়,—

> "আজ্ঞে, আমাদের কলেজে থেকে কেবল ইংরাজি চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।" (১।১)

যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠার সপক্ষে যারা তাদের প্রতিষ্ঠিত সভার ভিত্তিতেই এই ধরনের মিথ্যালাপ এই সবার গোপন ক্রিয়াকলাপের দিকে আমাদের অভিনিবেশ প্রত্যাশা করে।

নবকুমারের বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ—'জেণ্টলম্যান, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরিষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি..." নবকুমার জানিয়েছে—(১) এখন তারা আর পৌত্তলিকতাবাদে বিশ্বাস করে না (২) তারা সামাজিক সংস্কার (সোসীয়াল রিফরমেশন) প্রত্যাশা করে। ইয়ংবেঙ্গলদের এই ধরনের আচরণ ইতিহাসসম্মত। মাধবচন্দ্র মল্লিক একজন বিখ্যাত ইয়ংবেঙ্গল। 'Athenium' পত্রিকায় তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় লেখেন,—

১. সম্বাদ ভাস্কর /১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে; ১৫ জানুয়ারি

২. রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের আত্মীয়সভা?

"If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism."

রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদী বেদান্ত-নির্ভর ব্রাহ্মসমাজ প্রথম হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জানাচ্ছে,—

> "....রাজা পৌত্তলিক ধর্ম্মের অনাদর পূর্ব্বক যখন সর্ব্বত্র তত্ত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন অনেকেই তাঁহার সংসর্গে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহবাস ও আলাপাদি পরিত্যাগ করিলেন, কেবল শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীকিঙ্কর ঘোষাল, জয়কৃষ্ণ সিংহ ও গোপীনাথ মুনসির সহিত তাঁহার হৃদ্যতা স্থিরতর রহিল।"[১]

বক্ষমাণ নাটিকায় নবকুমার প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গলদের কর্মধারা অন্তত একথা প্রমাণ করতে সমর্থ নয় যে তারা সংস্কারমুক্ত হয়েছে। সংস্কারমুক্তির প্রথম শর্ত সত্যবাদিতা ও স্পষ্টবাদিতা—পূর্বেই আলোচনা করেছি কীভাবে কালী নব'র পিতার সঙ্গে মিথ্যাচার করেছে—সুতরাং সংস্কারমুক্তির কথা অন্তত তাদের কণ্ঠে শোভা পায় না। তারা সংস্কারমুক্ত হতে গিয়ে আরও বেশী সংস্কারের পাকে জড়িয়ে পড়েছে সে সংস্কার ইউরোপীয় আদব-কায়দার সংস্কার। পোষাক-আষাক, কথাবার্তায়, মদ্যপ্রীতিতে, হিন্দু বিদ্বেষে সেই প্রীতির প্রকাশ। যদিও এই পাশ্চাত্যপ্রীতির আত্যন্তিকতার মূলে কিছুটা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ধর্মসভার রুক্ষতা দায়ী তবু ইয়ংবেঙ্গলদের আচরণের অশালীনতার মাত্রা যেন তার চেয়েও বেশী রূঢ়। বিলাতফেরতা সমাজে নিন্দিত দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় জবানন্দীর ঢঙে 'এক ঘরে' প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম ও সমাজের আচরণের রূঢ়তার কথা বলেও পরিশেষে বলেছেন—

"আমরা যেমন এখানে হিন্দুর আচরণে ও প্রথায়, দুঃখে ও লজ্জায়, ঘৃণায় মরিয়া যাই, বিজাতীয় কেহ হিন্দুর নিন্দা করিলে যথাসাধ্য হিন্দুকে অন্যজাতির শ্লেষ ও বিদ্রূপের ভল্ল হইতে রক্ষা করি, কারণ, তাহাতে আমাদেরও গায়ে লাগে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল একথা লিখতে পেরেছিলেন কারণ তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে একটা স্বচ্ছতা একটা পূর্বাপর সামঞ্জস্যসূত্র ছিল। কিন্তু যে ইয়ংবেঙ্গলদের চিত্র 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় অঙ্কিত—তাদের মধ্যে তা ছিল না। তৃতীয় উক্তির কয়েকটি বিশেষ অংশ—

(ক) 'তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর'—সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার জবানবন্দীতে বোঝা যায় ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী প্রথম থেকেই স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের পক্ষে মত দিয়ে এসেছে। ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধারগণও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে দেশের অগ্রসরণের পথ সহজ করার কথা বলেছেন বার বার।[২] 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ও ১৩ এপ্রিল সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হয়,—

> "এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা ইদানিং বিদ্যাভ্যাস করেন না। কিন্তু বিদ্যাভ্যাস কারণে দোষ লেশও নাই। যদ্যপি শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক দোষ থাকিত তবে পূর্ব্বতন সাধ্বী স্ত্রীগণেরা বিদ্যাশিক্ষাতে অবশ্য পরাঙমুখ হইতেন।"

১. তত্ত্ববোধিনী /১৭৬৯ শক; আশ্বিন সংখ্যা
২. সমাচার দর্পণ /১৮২২ খ্রীঃ; ৬ ও ১৩ এপ্রিল।

কিন্তু 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে উদিষ্ট যুবকদের স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করা কতখানি যুক্তিযুক্ত তা গভীর তর্কের বিষয়। নবকুমারের নিজের বাড়ীর মেয়েরাই যে শিক্ষা সম্পর্কে খুব আগ্রহী তার সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(খ)'....তাদের (নারীদের) স্বাধীনতা দেও—' নারী স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিল ইয়ংবেঙ্গল। ব্রাহ্মসমাজ নেতা সমাজসংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনই প্রথম নারীকে অন্দরমহলের চৌহদ্দির বাইরে নিয়ে এসে নারীমুক্তি আন্দোলনের তথা পর্দানশিনতার বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। সেই ঘটনার দিকে একবার ফিরে তাকানো যাক,—

"কেশবচন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে যাত্রা করেছিলেন—১৭৮৪ শকের ১ বৈশাখ রবিবার ভোর পাঁচটায়। এই বছর এই দিন এবং এই সময় থেকে আমাদের দেশে নারীপ্রগতি ও নারীমুক্তি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। কেশবচরিতকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন,

'Keshub followed by his timid, youthful wife (she could not be more than fifteen at the time), her Sari hanging in a long veil before her bashful face, came out of his own room, and with suppressed exitement walked past the marshalled groups of angry relatives."

পাগড়ি-বাঁধা গুন্ডা প্রকৃতির লোকেরা কেশবচন্দ্রের বাড়ির ফটক আগলে দাঁড়িয়েছিল। ধীর পদক্ষেপে স্ত্রীর হাত ধরে এগিয়ে এসে কেশবচন্দ্র শুধু দারোয়ানদের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, ফটকের তালা ও খিল খুলে দাও'। পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল যারা তারাই খিল ও তালা খুলে রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। কেশবচন্দ্র স্ত্রীকে পাশে নিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে এসে দাঁড়ালেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন ঃ 'Thus was laid the first stone of women's education and emancipation.......'[১]

'একেই কি বলে সভ্যতা'র চিত্রটি অন্যরূপ। নারী স্বাধীনতা তথা নারীপ্রগতির অন্যতম লক্ষণগুলি তাদের শিক্ষায়, মার্জিতরুচিতে, সংস্কৃতিপ্রীতিতে, স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার দৃপ্ততায় নিবদ্ধ থাকার কথা। কিন্তু সভ্য নব্যবাবুবৃন্দ মুখে সংস্কৃতির এবং নারী স্বাধীনতার সম্পর্কে ওজস্বী বক্তৃতা করলেও নারীকে পর্দানশীন রাখার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁদের অনেকেই। নববাবুর সংসারের চালচিত্র প্রমাণ করে নব'র স্ত্রী, বোনের কেউই মার্জিত রুচির ধার ধারে না। তাদের রহস্যালাপ গ্রাম্য রসিকতার স্তরোত্তীর্ণ হতে পারে নি। তাস খেলা অবসর বিনোদনের এক মাত্র খেলা, সেই খেলার মূলেও রয়েছে গোপন সতর্কতা। সরলা দেবী চৌধুরাণী যিনি নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ এক সময় তিনিও দুঃখ করে বলেছিলেন—

"বাইরের লোকেরা বলেন লেখাপড়া শিখে আমরা বাবু হয়ে পড়েছি, সেটা সম্পূর্ণ যে মিথ্যা তা বোধ হয় নয়—বাইরের চাকচিক্য নিত্য নতুন পোষাক, কাজে আলস্য,

২০. বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ /বিনয় ঘোষ /পৃঃ ২২৭

গল্পে আরাম, এগুলো যে বেশ পরিপাটী রকমে আমাদের ভিতরে এসে পড়েছে তা একেবারে ভুল নয়।"[১]

(গ) 'জাতভেদ তফাৎ কর—' ইয়ংবেঙ্গলদের সমাজসংস্কারমূলক কর্মসূচীতে জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ, অস্পৃশ্যতা বিমোচনের ঘোষণাও ছিল। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় তাঁদের সংস্কারমূলক অভিচিন্তন প্রকাশিত হত। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সঙ্গে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সংস্রব ত্যাগ এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের চাকরি লাভের ফলে এই পত্রিকার স্বাভাবিক অবলোপ ঘটলেও এই পত্রিকার সামগ্রিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'ক্যালকাটা কুরিয়র' পত্রিকা ১৮৪০ সালের ২৬শে নভেম্বর লেখে,—এই পত্রিকা '·····Merely with a view of keeping alive a spirit of liberal enquiry amongest the Hindoos and combating the prejudices of the orthodox party····'[২] বক্ষমাণ নাটকে—এই বাক্যটি কথার কথা মাত্র।

(ঘ) —'আর বিধবাদের বিবাহ দেও'। বিধবাদের বিবাহ দেবার প্রস্তাব উনিশ শতকে রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'য় (১৮১৫) প্রথম উত্থিত হয়েছিল। আত্মীয় সভার বৈঠকে যে সব সামাজিক প্রথার আশু সংস্কারে উপর গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হত সেগুলি হল সতীদাহ, বিধবা সমস্যা, বহুবিবাহ সমস্যা প্রভৃতি। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী তাদের সমর্থন জানায় দৃঢ়ভাবে। Bengal Spectator পত্রিকায় বিধবা বিবাহের সমর্থনে জনৈক ইয়ংবেঙ্গল যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন, সেটিই বিদ্যাসাগরের দ্বারা এ সম্পর্কে উদ্ধৃত বিধবা বিবাহের সপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। 'পরাশর সংহিতি'-র এই শ্লোকটি,—

'নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।"

Bengal Spectator-এর এই সংখ্যার শ্লোকটি মদনমোহন তর্কালংকার ও শিবনাথ শাস্ত্রীর গোচরে এসেছিল, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে সে কথার প্রমাণ মিলবে।

'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে বিধবাদের বিবাহ দেবার কথা উল্লেখ নবকুমারের গোষ্ঠী নির্দেশসূচক বাক্য ছাড়া আর কিছু নয়।

সামগ্রিকভাবে বক্তব্যের তৃতীয় অংশটির বিশ্লেষণ নবকুমারের বাক্‌পটুতার নিদর্শন। যে অপটুত্বের কারণে চৈতন্য, কালী, শিবু তার জন্য সভার কাজ শুরু করা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। শিবু দ্বিধাহীন ভাষায় জানিয়েছে 'কিন্তু ওরা দুজনে লেখাপড়া বেশ জানে'— কিন্তু সেই লেখাপড়ার সীমা বক্তৃতা এবং মদ্যপানে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। কালীর স্মৃতিশক্তির প্রাখর্য (?) সংস্কৃত গ্রন্থ দুটির নাম উচ্চারণেই প্রকাশিত।

নবকুমারের বক্তৃতার চতুর্থ অংশ—'এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবর্‌টি হল্‌ অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান।'

১. মেয়েদের সম্বন্ধে গুটি কতক কথা /Sarala Roy centenary vol./ পৃঃ ৯৫

২. বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ /ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় /পৃঃ ৪২

এবং বক্তার আহ্বান 'জেন্টেলম্যান, ইন্ দি নেম্ অব ফ্রীডম, লেট অস এঞ্জয় আওয়ারসেল্ভস্।' স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর পরিচয় দানই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র উদ্দেশ্য। 'স্বাধীনতা' অর্থে নবকুমার যার যা-খুশী তাই-করাকে বুঝিয়েছে। সংসারকে মস্ত জেলখানার সঙ্গে নব তুলনা করেছে সম্ভবত জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় আসার পথে নিজগৃহে পিতৃদেবের বাধা এবং পথিমধ্যে তৎপ্রেরিত গোঁসাইজীর মুখোমুখি হওয়া প্রভৃতি ঘটনাকে স্মরণে রেখেই।

আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন : ইয়ংবেঙ্গলদের সভায় বার বার যে শব্দগুলি মুদ্রাদোষের মতো পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়েছে সেগুলি লক্ষ্য করা দরকার। 'হিয়র্, হিয়র্, আমি এ মোসন সেকেণ্ড করি', 'এতে দেখছি কারো অবজেক্সন নাই', 'হিয়র্, হিয়র্, 'হিপ্, হিপ্, হুরে, হুরে' 'ব্রাভো হিয়ার,' 'ব্রাভো, ব্রাভো', 'আগে তোমার ইস্পীচ'—প্রভৃতি বাক্য বিভিন্ন চরিত্র উচ্চারণ করেছে। দিনরাত সভায় তারা যে ভাষায় কথা বলেছে বাড়ীতেও তার বিরুদ্ধ কিছু বললে তা বরং স্বভাববিরুদ্ধই হত। প্রথম দৃশ্যেও তাই নবকুমার বাবুর গৃহে কালীর জিজ্ঞাসার উত্তরে নব তার ঘরে ব্রাণ্ডি আছে এ কথা জানালে কালী বলেছে 'জষ্ট দি থিং'। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নববাবুর শয়ন মন্দিরে যে দৃশ্যের উন্মোচন ঘটল সেখানে কর্তার উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে নবকুমারের উক্তির আপাত অসংলগ্নতার অন্তরালে এক ধারাবাহিক ক্রমানুসৃতি লক্ষণীয়।

১। "কর্ত্তা। (সরোষে) সোনার নব! হ্যাঁ! ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে পারনি?
নব। হিয়র, হিয়র, হুরে।"

২। "কর্ত্তা।·····তুমি কি দেখতে পাচ্চ না যে ও লক্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে?
নব। হিয়র, হিয়র।"

৩। "কর্ত্তা। (সরোষে) চুপ, বেহায়া, তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই?
নব। ড্যাম্ লজ্জা, মদ্ ল্যাও।"

এই তিনটি উক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই কলকাত্তাই নব্য সভ্যতা সম্পর্কে কর্তার অভিমত ব্যক্ত হয় 'এ কল্‌কাতা মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোনও ভদ্রলোকের বসতি করা উচিত?' এই বক্তব্যের জের ধরেই তিনি গৃহিণীকে বলেন,—

"কর্ত্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো! এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এই বানরটা একটু ঘুমুক—
নব। হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন।"

নবকুমারের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কয়েকটি কথা বলার আছে। প্রথমত, সভার কাজে বক্তব্যের সমর্থনসূচক উক্তি যেভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে, কর্তার গিন্নিকে বলা কথার উত্তরে সেইভাবে সাড়া দিয়ে গিয়েছে নব। 'হিয়র হিয়র' প্রভৃতি সমর্থনসূচক শব্দ সে কথাই প্রমাণ করে।

দ্বিতীয়ত, নবকুমারও যেন মনে করে যে তার মতো সন্তান যে কোনও গৃহস্থের পক্ষে ধর্মের ষাঁড়, তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে প্রসবের পরই নুন খাইয়ে হত্যা করাই উচিত

ছিল। তাই প্রথমে অসচেতন অবস্থায় তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে 'হিয়র হিয়র' শব্দ। কর্তা যখন বলেছেন লক্ষ্মীছাড়া মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে তখনও সে একই কথা বলেছে। কিন্তু কর্তা যখন তাঁকে নির্লজ্জ বলেছেন, তখন সে বলেছে 'ড্যাম্ লজ্জা'। অতঃপর কোলকাতার এই নরক থেকে পুত্রকে নিয়ে সপরিবারে কর্তা যখন বৃন্দাবন যাওয়ার উদ্দেশও ব্যক্ত করেছেন তখনই নবকুমার এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছে 'আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন'। অর্থাৎ এ ধরনের পরিস্থিতিতে দেখেকে বাঁচাতে এইভাবে চলে যাওয়া সেও সমর্থন করে।

উদ্দেশ্যমূলকতা : কেউ কেউ বলেছেন এই উক্তির মাধ্যমে এই প্রহসনে অসংগতিজনিত হাস্যরসকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মনের চেতন-অবচেতন স্তর নির্বিশেষে সেই অসংগতির বীজ যেহেতু আরও গভীরে নিহিত, সেহেতু তা প্রহসনের রসটিকে সম্পূর্ণ ঘনীভূত করে তুলেছে এবং তা সম্ভব হয়েছে উক্ত কথাটি আকস্মিকভাবে নবকুমারের উচ্চারণ করার ফলেই। কিন্তু শুধু কি তাই, এই উক্তিগুলির ক্রমবিন্যাসও কি এই নাটিকার উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করে না? নবকুমারের 'হিয়র হিয়র', 'আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে তার কর্তার কর্মকে সমর্থন জানানোর ব্যাপারটি কি আমরা একেবারে অস্বীকার করতে পারি? ইয়ংবেঙ্গলের স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারের প্রকৃত রূপটি ফুটিয়ে তুলে নাট্যকার পরিশেষে যেন একজন নব্য প্রতিনিধির মুখ দিয়েই এই ভয়ংকর শহরের হাত থেকে মুক্ত হবার আকাঙক্ষা ব্যক্ত করালেন। কেননা প্রহসনটি এই উক্তির পরেই শেষ নয়। স্বেচ্ছাচারী নব্যদের সভ্যতাভিমানী রূপটিকে আরও খোঁচা দেবার জন্য নব'র স্ত্রী, বোনের মুখে কয়েকটি সংলাপ যোগ করা হয়েছে, যেখানে হরকামিনী অত্যন্ত তিক্ত কণ্ঠে নাট্যকারের মতকেই যেন পুনরায় সমর্থন করেছে,—

'মদ্ খাস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?
—একেই কি বলে সভ্যতা?'

তবে একথাও সত্য এই প্রহসনে নাট্যকারের উদ্দেশ্য কোথাও সরাসরি ব্যক্ত নয়—সে কারণেই এর কাহিনী আদর্শ প্রহসনের কাহিনী হয়ে উঠেছে।

চরিত্র বিচার (ক) নবকুমার : 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের চরিত্রগুলি কতটা প্রহসনের সুর ধরে রাখতে পেরেছে এবার সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। যদিও আমরা জানি প্রহসনের বিষয়বস্তুতে চরিত্রের কোনও বিবর্তনের রেখাঙ্কন করা হয় না, কেননা ঘটনাই সেখানে প্রধান, চরিত্রগুলিও টাইপধর্মী। বক্ষমাণ নাটকের প্রধান চরিত্ররূপে তবু আমরা নবকুমারকে চিহ্নিত করতে পারি, কারণ তাকে অবলম্বন করেই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ঘটনাপুঞ্জও আবৃত্ত। দুটি অঙ্কের চারটি দৃশ্যেই সে উপস্থিত, যে অংশে সে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নয়—সেক্ষেত্রে অন্যান্য চরিত্রের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে সে-ই। নব্যবঙ্গ সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে আরও অনেক চরিত্র সৃষ্টি করা হলেও সেই তার সমাজের প্রতিনিধি। প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন,—

'একেই কি বলে সভ্যতা'র নায়ক নববাবু একটা শ্রেণীরূপের প্রতিনিধি।

এমন কি নববাবু যে কোনো ব্যক্তির নাম নয়, ইংরাজি-পড়া নূতন নববাবুর দল বা ইয়ংবেঙ্গল, তাহা তৎকালীন লোকেরাও বুঝিয়েছিলেন।''[১]

১. বাংলা সাহিত্যে নরনারী/প্রমথনাথ বিশী।

অধ্যাপক বিশীর এই মতকে আংশিক সমর্থন করা যায় মাত্র। ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিনিধিরূপে একমাত্র চরিত্র হিসেবে যদি নবকুমার এই প্রহসনে উপস্থাপিত হ'ত তাহলে বলা সম্ভব হত নববাবু...কোনো ব্যক্তির নাম নয়, ইংরাজি-পড়া নূতন নববাবুর দল'।[১] কিন্তু নব'র চরিত্র এখানে একসঙ্গে দ্বিবিধ কার্য সমাধা করেছে। নাটকের প্রথম অংশে মদ খেয়ে মাতাল হবার পূর্ব পর্যন্ত নবকুমারের চরিত্র এবং মদ্যপান করে জ্ঞান-তরঙ্গিনী সভা থেকে ফিরে আসার পর তার চরিত্রের তুল্যমূল্য আলোচনা করলে দেখা যাবে—

(১) নবকুমার কেবলমাত্র ইয়ংবেঙ্গলের শ্রেণী-প্রতিনিধি নয় তার মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ স্পষ্ট।

(২) ইয়ংবেঙ্গলদের ব্যঙ্গ করা নয়, অত্যধিক মদ্যপানের বিরোধিতা করাই নাট্যকারের অভিপ্রেত ছিল। সে কারণেই নাটকের মধ্যে বার বার মদ্যপানের কথা আছে। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা-দৃশ্যে বারাঙ্গনা উপস্থিত থাকলেও মদ্যপানের চিত্রই সেখানে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কর্তামশায় নবকুমারকে নির্লজ্জ বলে ধিক্কার দিলে সে বলেছে 'ড্যাম্ লজ্জা, মদ ল্যাও'। এবং নাটকের পরিসমাপ্তিতে বিষাদের করুণ সুর যখন উচ্ছ্বসিত হাস্যতরঙ্গের অভ্যন্তরে ফল্গুস্রোতে বহমান তখন নব'র স্ত্রী বলেছে 'মদ্ মাস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?'

নবকুমারের চরিত্রের দুটি অংশই অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথম অংশে সে ভদ্র, বিনয়ী, পিতৃভক্ত সদ্‌বংশজাত সন্তানের মতই তার আচরণ। মদ্যপান করাকে সে ঘৃণিত কাজ বলে মনে করে না সত্য, তবে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবিনত। পিতা বাড়ীতে আছেন বলে কালীকে সাবধানে কথা বলার জন্য অনুরোধ করে। কালী মদ্যপান করতে চাইলে নব তার অনুগত ভৃত্য বোদেকে দিয়ে মদ আনিয়ে দিলেও সে গৃহের অভ্যন্তরে খুঁটিনাটি বিষয়ে সচেতন সাবধানী দৃষ্টি রাখে। বাড়ীতে বসে মদ্যপানের সংকোচ ও পিতার প্রতি তার শ্রদ্ধাজনিত ভয়ে সে কালীকে পান খেয়ে মুখের গন্ধ দূর করতে বলে। এখানে তার সৎ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নবকুমার এই অংশে সংযতবাক, অযথা পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে সর্বস্বান্ত হতে চায় নি। তাই কালীকে জানিয়েছে, তার পক্ষে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কালী যখন তাকে ভীষণ ভাবে অনুরোধ করেছে—তখন সে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, কালীকে তার বৃন্দাবনবাসী পিতৃব্যের পরিচয়ে নিজের পিতার কাছে পরিচিত হতে বলেছে। পরম বৈষ্ণব পিতাকে অভিভূত করার কৌশল যে বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের অজুহাত—একথা নবই কালীকে জানিয়েছে এবং 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থের নাম নিজ পিতার কাছে উচ্চারণ করতে বলেছে—তাঁর মন জয় করার জন্য। পিতৃসন্নিধানে কালী সব কথা ঠিক ঠিক বললেও গ্রন্থ নাম বিকৃতভাবে উচ্চারণ করার সাথে সাথেই নব প্রত্যুৎপন্নমতির মত কালীর ভ্রম সংশোধন করে পিতার হাতে ধরা পড়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এই অংশে তার চরিত্রের প্রবঞ্চক রূপটি ফুটে উঠেছে। পিতাকে বন্ধুর মিথ্যা পরিচয় দিতে তার বাধে নি।

নবকুমারে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বুদ্ধির প্রাখর্য ও বাস্তববোধের পরিচয় মেলে পিতৃপ্রেরিত

---

১. বাংলা সাহিত্যে নরনারী/প্রমথনাথ বিশী।

চর বৈষ্ণব গোঁসাই-এর হাতে ধরা পড়ার পর। কালী নবকে বার বার উত্তেজিত করতে চেয়েছে বাবাজীকে ঘা কতক দিয়ে বিদেয় করার জন্য, কিন্তু নব তা করে নি। কারণ সে জানে বাবাজীকে মিষ্টি কথায় তুষ্ট করতে না পারলে তার পরিণাম সুখের হবে না। যথার্থ দূরদর্শীর মতো সে তাই বাবাজীকে উৎকোচ দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। যে কোনও ভাবে কর্মসিদ্ধির কৌশলটি যে তার মজ্জাগত তা তার এই আচরণে প্রমাণিত।

নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা থাকে তারই যে প্রয়োজনের মুহূর্তে ছাড়া উত্তেজিত হয় না, যে প্রত্যুৎপন্নমতি, যে বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন, যে ভালোভাবে অথচ অতি সত্বর নিজ সহগামীদের মানসিক চাহিদাটুকু আঁচ করে নিতে পারে। নবকুমারের মধ্যে দলনেতা হবার উপরোক্ত গুণগুলো ছিল। শুধু তার সাক্ষাতে নয়, তার অনুপস্থিতিতেও জ্ঞানতরঙ্গি নী সভার সভ্যগণ সে কথা স্বীকার করেছে। এই সভার সভ্যগণ সবাই ইংরেজি বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তবে নব'র মধ্যে সেই বিদ্যা পুঁথিগত হয়ে থাকে নি—তা কার্যকরী হয়েছে তাকে নেতৃপদে আসীন করে। পূর্বেই তার বক্তৃতা সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছি এক্ষেত্রে তার পুনরুক্তি ঘটাব না। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় ইয়ংবেঙ্গলদের অভীপ্সিত প্রায় সমস্ত সমাজ-সংস্কারমূলক কর্মের ফর্দ নবকুমার তার বক্তৃতায় পেশ করেছে। এর ফলে তাকে ইয়ংবেঙ্গলরূপে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। স্ত্রীশিক্ষা, নারী-স্বাধীনতা সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেও তার আপন গৃহে স্ত্রী-স্বাধীনতার পরিচয় নেই। শুধু তাই নয়, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীসুলভ সম্পর্কটুকু রাখার প্রয়োজনও সে অনুভব করে না। তাই তার স্ত্রী হরকামিনী প্রসন্নকে বলেছে, 'তোকে বলতে কি ভাই, এই সব দেখে-শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি।'

নব চরিত্রের দ্বিতীয় অংশের সূত্রপাত মদ্যপান করে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা থেকে বাড়ী ফেরার পর। মদ্যপান-জনিত প্রতিক্রিয়া তার চরিত্রের এক বিরাট ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। এখন সে অসংযত, অপরিণামদর্শী, বাচাল, বাস্তববোধহীন। ইয়ংবেঙ্গল প্রতিনিধি নবকুমারের এ এক অসাধারণ 'টাইপ'-রূপ। এখন সে পিতৃভক্তির ধার ধারে না। প্রথম দৃশ্যে যে নবকে দেখেছিলাম পিতার প্রতি ভয়ে ও শ্রদ্ধায় বিনম্র, শেষ দৃশ্যে সেই নব অনায়াসে ভৃত্যকে বলতে পেরেছে 'ডেম কত্তা মশায়! আমি কি কারো তক্কা রাখি?' এবং পিতার এক কথার জবাবে অনায়াসে বলতে পেরেছে লজ্জা করতে সে লজ্জা পায়, সে মদ চায়, মদ। সে এখন বোনের সঙ্গে সাহেবী কেতায় মেলামেশা করতে চায়। ইংরেজিতে গালিগালাজ সে বরদাস্ত করে না, সেটা বাংলায় হলে চলতে পারে। শিশুর সঙ্গে তার বিতর্কে কে কথা প্রমাণিত।

নবকুমারের চরিত্রের এই দুই রূপের মধ্যে কর্তার সংলাপকে সংস্থাপিত করে এ প্রসঙ্গে র উপসংহারে যাওয়া যায়,—কর্তা বলেছেন,—

'এ কল্‌কাতা মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী,
এখানে কি কোনও ভদ্রলোকের বসতি করা উচিত?'

কর্তা কোলকাতাকে বলেছেন 'মহাপাপ নগর'—এই নগরের মহাপাপের মূলে বাবুয়ানীর 'নবধা লক্ষণ'। প্রকারান্তরে এখানে এক একে সবগুলি উল্লেখিত হলেও মদ্যবিলাসই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। কারণ নবকুমার যে প্রকৃতই ভালো ছেলে তার অন্তত একটা আপতিক

ছবি কোনও কোনও অংশে দেওয়া হয়েছে তার মদ পানের পূর্ব দৃশ্য ত্রয়ে। কিন্তু মদ্যপানের পরই তার চরিত্রে যাবতীয় শৈথিল্য প্রকাশিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশেই সভ্যতাভিমানী নব্যযুবকদের আদর্শ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পেরেছে সে।

কালীনাথ : কালীনাথ একজন ইয়ংবেঙ্গল। নবকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু সে। এই প্রহসনে কালীনাথের ভূমিকা শুধু চরিত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করার তাগিদে নয়। ঘটনা সংঘটনেও তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। প্রহসনের বিষয় ঘটনা সংস্থাপনের উপর নির্ভরশীল হলেও সে ঘটনাগুলি গড়ে তোলে কয়েকটি বিশেষ চরিত্র। কালীনাথের চরিত্র এমনি একটি চরিত্র। নববাবুর চরিত্রে নেতৃত্বের বোঝা আরোপিত হওয়ায় যে দিকগুলি স্পষ্ট ব্যক্ত হতে পারে নি কালীনাথ সেই দায়ভারের বাহক নয় বলে ইয়ংবেঙ্গালের চারিত্র্য লক্ষণ তার মধ্যে একেবারে জীবন্ত। ত্রিশের দশকের ডিরোজিও-পন্থী কালাপাহাড়ী মেজাজের ইয়ংবেঙ্গাল না হলেও কালীনাথের মধ্যেও সেই সময়কার স্বশ্রেণীভুক্ত গোষ্ঠীর চারিত্র্য লক্ষণ অনেকটাই মিলে যায়। সেদিক থেকে বলা যায় নবকুমারের চেয়ে কালীনাথই তার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে গোষ্ঠীর স্বরূপ উপস্থাপনে অধিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

কালীনাথের সহায়তায় নবকুমার জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় যেতে পেরেছে, নব'র যুক্তিতে হলেও, সেই কর্তার সচেতন প্রহরার বেষ্টনী থেকে নবকুমারকে কৌশলে বার করে নিয়ে গিয়েছে। প্রহসনের কাহিনীতে এখানেই তার গুরুত্ব। তার চরিত্রের আদল অত্যন্ত স্থূলরেখায় অঙ্কিত। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও বিশৃঙ্খল জীবনাচরণের জন্য তার রুচি এবং মেজাজ উভয়ই নিম্নগামী হয়েছে। তাই নবকুমারের কাছে নিজের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে রসিকতা করে সে যখন বলে 'সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ির আলয়, আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই' তখন আপন রসিকতায় মুগ্ধ হয়ে আপনি চরম আত্মপ্রসাদে সে 'হা-হা' করে হেসে উঠলেও—এই কথাগুলি তার চরিত্রের বিকৃত রুচির সম্পূর্ণ পরিচয় উদঘাটিত করেছে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। অধোগামিতার চরম অতলে তলিয়ে গিয়েছে সে। বেশ্যালয় সোনাগাছি, উইলসনের মদের দোকানে তার নিত্য যাতায়াত। নবকুমারের চরিত্রে দেখানো হয়েছে মদ্যপানের পরিণাম কিন্তু কালীনাথের চরিত্রে দেখানো হয়েছে মদ্যবিলাসীদের মদ্যপানে আগ্রহ এবং মদের দ্বারা ক্রমশ পান হয়ে যাবার চিত্র। পিতার কাছে মদের গন্ধ লুকোবার জন্য যখন নবকুমার কালীনাথকে পান খেতে পরামর্শ দেয় তখন তাই সে অনায়াসে বলতে পারে 'আমি ভাই পান তো খেতে চাই নে, আমি পান কত্তে চাই?' এ শুধু কথার কথা নয়। মদ্য পানের আকাঙক্ষা চরিতার্থ করার জন্যই তারা জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা স্থাপন করেছে এবং পরিকল্পনা মাফিক নবকে তাদের সর্দার করেছে কারণ 'মনি ম্যাটারে এই বিশেষ সাহায্য করে'। সুতরাং নব সভার সঙ্গে সংশ্রব পরিত্যাগ করলে যে তাদের এ ব্যাপারে সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে একথা কালীনাথ জানে। এবং একথা জানাতেও দ্বিধা করে না সে।

কালীনাথের চরিত্রে অসংখ্য বদগুণের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে তার স্মরণশক্তির দীনতা। অনেক সমালোচক 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' এবং 'গীতগোবিন্দ'—এই দুটি বৈষ্ণব আকরগ্রন্থের নামোচ্চারণে তার ব্যর্থতায় সে দীনতা প্রমাণিত বলে মনে করেন। কিন্তু যে কালীনাথ নবকুমারের পিতার সঙ্গে অমন পরিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় নিখুঁত কথা বলে গেল 'এই সভাটি

সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি' ধরনের সাধু-গন্ধী গদ্য উচ্চারণ করে গেল, সে যদি 'গীতগোবিন্দ' শব্দের উচ্চারণ করে 'বিন্দা দূতীর গীত'—তা হলে বুঝতেই হবে, তার এ উচ্চারণ স্বেচ্ছাকৃত এবং স্থূল হাস্যরসের পরিবেশনের জন্য সে যেমনভাবে নিজ আত্মপরিচয় দিয়েছিল এও তেমনি। অবশ্য নবকুমার কালীর এ ধরনের ভ্রমাত্মক উচ্চারণের পর তার 'মেমরি'কে দোষ দিয়েছে। নবকুমারের কালীর কাছে গ্রন্থনামের বিকৃত উচ্চারণ স্বেচ্ছাকৃত হলেও নব'র পিতার কাছে তা স্বেচ্ছাকৃত নয় অনবধানবশত অশ্লীল শব্দ উচ্চারণপটু জিহ্বার স্খলিত উচ্চারণ। গোঁড়া হিন্দু এবং বৈষ্ণবদের উপর ইয়ংবেঙ্গলের জাতক্রোধ কালীনাথের বাবাজীর প্রতি ক্রোধেও অভিব্যক্ত। এ নাটিকায় কালীনাথের বাড়ীর খবর আমাদের দেওয়া হয়নি, তবে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'-রূপ স্বাধীনতার দালানে বসে যে-মানুষ বারাঙ্গনার হাত হাতে নিয়ে প্রমত্ত অবস্থায় বলে 'আহা! কি নরম হাত।' তার বাড়ীর স্ত্রীলোকের দুরবস্থা সহজেই অনুমেয়।

জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সভ্যবৃন্দ : কালীনাথের চরিত্র বিস্তৃত কিন্তু সেই একই ছাঁচে ঢালা জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার অন্যান্য সভ্যদের চরিত্র সংক্ষিপ্ত। দু'একটা আঁচড়ে ইয়ংবেঙ্গলের জীবনযাত্রা তৎকালীন যুগ পরিবেশের পশ্চাৎভূমিতে অনায়াসে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার চৈতন্য, বলাই, শিবু, মহেশ প্রভৃতির মাধ্যমে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফলটুকু গ্রহণ না করে তার কুফলটুকু, যা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতার ঘোলাজলের আবর্তে উত্থিত, সহজাকর্ষক—তাই তারা গ্রহণ করেছে। মুহুর্মুহু মত পরিবর্তনে দক্ষ সাধারণ মানুষ তারা। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় মিলিত হয়েছে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। দোলাচল চিত্তবৃত্তির অধিকারী চৈতন্যেরও নবকুমারের নেতৃত্বে আস্থা রয়েছে। সে স্পষ্ট ভাষায় জানায় যে নব 'আছে বলে তাই আজও সভা চলছে।' শিবু কালী ও নব'র বিদ্যাশিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, 'ওরা দুজনে লেখাপড়া বেশ জানে। কিন্তু পর মুহূর্তেই নবকে ছাড়াই চৈতন্যকে সভাপতি করে সভার কাজ শুরু করা হয়েছে। নবকুমার কালীনাথের সঙ্গে দেরী করে সভায় প্রবেশ করে। তার দেরীর কারণ স্বরূপ সে তাদের বিশেষ কর্মের কথা উল্লেখ করে। কিন্তু ক্ষণপূর্বে নব'র সমর্থক শিবু প্রমত্তভাবে নবকে বলে 'দ্যাটস এ লাই।' শুরু হয়েছে তীব্র বিতণ্ডা। পারস্পরিক ভর্ৎসনা। বলাই ও মহেশের চরিত্রেও রয়েছে নব'র প্রতি ঈর্ষাকাতর নানা ভাবের পরিচয়। ইংরেজদের অনুকরণে সভার কাজ কোরম করে শুরু করা হয়েছে। সভাপতির নাম প্রস্তাব, সমর্থন ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কাজের পর সভাপতির সভা পরিচালনা—বলা বাহুল্য, সে সভা মদ্যপানের বৈঠকের তৎসহ নৃত্য ও গীত নবকুমারের সূচনা। প্রবেশের পর সে-ই সভাপতির স্পীচ দেয় এবং তাতে সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে সমাজচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ইয়ংবেঙ্গলদের এই সভাচিত্র সমাজের এক দুর্নিবার্যরূপকে ফুটিয়ে তুলেছে। প্রতিটি চরিত্র সামগ্রিকভাবে একটা সমাজের ছবিকে স্পষ্ট করে তুললেও প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় তাদের অস্থির চিত্তবৃত্তিতে।

কর্তা : নবকুমারের পিতা কর্তামশায়ের চরিত্র ঘোর প্রাচ্য-পন্থীদের চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একদল মানুষ অন্ধভাবে বিদেশীয়ানার অনুসরণ করতে শুরু করলে 'ধর্মসভা'র পৃষ্ঠপোষকতাধন্য গোঁড়া হিন্দুসমাজ

অন্ধ-প্রাচ্যপন্থী মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকে। কর্তামশায়ের চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে সমাজের সেই অংশের চিত্র। পরম বৈষ্ণব কর্তামশায় অধিকাংশ সময়ই বৃন্দাবনে বসবাস করেন। স্বাভাবিক কারণেই বৈষ্ণব শাস্ত্রের সম্পর্কে তাঁর ভাবালুতার প্রকাশ ঘটেছে। বৈষ্ণবদের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান কর্তামশায়কে কালীনাথ নবকুমারে পরামর্শে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে অনায়াসে জয় করে ফেলে। শিক্ষিত কালীনাথ অতঃপর কর্তামশায়ের দুর্বলতম জায়গাগুলিতে মৃদু চাপ দিয়ে আপন কর্মসিদ্ধির পানে এগিয়ে যায়। কালী জানায় কলেজে পাঠকালে কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষা হয়েছিল, প্রাচ্যভাষায় বিন্দুমাত্র জ্ঞান তাদের জন্মে নি—তাই তারা সংস্কৃত ভাষা-চর্চার জন্য এই সভার প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়া সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক যাঁকে নবর পিতা যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, সেই কেনারাম বাচস্পতিমশায় তাদের সংস্কৃত শিক্ষা দিয়ে থাকেন এমন কথাও বলেছে এই ঘোরতর প্রাচপন্থীকে। পরিশেষে কর্তা যখন শুনলেন নব, কালী জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় 'শ্রীমদ্ভগব্দগীতা' ও 'গীতগোবিন্দ' অধ্যয়ন করে থাকে তখন পরম বৈষ্ণব কর্তা ভাববিহ্বল হয়ে পড়েন। 'জয়দেব? আহা-হা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-সাগর' কালীর বাক্যজালে জড়িত হয়ে কর্তা নবকে তার সঙ্গে জ্ঞানতরঙ্গি ণী সভায় যেতে দিলেও প্রবাসী পিতা বাস্তব-সচেতন। ভাবাকুলতা ও বাস্তবতা এই উভয়ের সংমিশ্রণে নির্মিত হয়েছে কর্তার চরিত্র। সংশয়ী মানুষ তিনি। পুত্র এবং পুত্র বন্ধুর আচরণে সঞ্জাত সংশয় অপনোদনের জন্য বাবাজীকে তাদের কার্যাবলী গোপনে প্রত্যক্ষ করার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। শেষ দৃশ্যে নবকুমার প্রমত্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরে এলে গৃহিণী পুত্র-স্নেহবশত পুত্রকে অসৎকর্মে লিপ্ত ভাবতে না পারলেও কর্তামশায় মুহূর্তে মদ্যপ পুত্রের অধোগামিতা বুঝে নিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁক আবেগপ্রবণ মনে হলেও মুহূর্তে তিনি বাস্তবানুগ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 'কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো।'

বাবাজী : বৈষ্ণব সমাজের ভেকধারী বাবজী শ্রেণীর রূপ উদ্‌ঘাটিত করতে গিয়েও 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের বাবাজী স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান—তার উৎকোচ গ্রহণ প্রবণতায়। বাবাজী চরিত্রটি শুধু হাস্যরস সৃষ্টির এক যন্ত্র হিসেবে এই প্রহসনে ব্যবহৃত নয়। নক্সাজাতীয় রচনা থেকে নাটিকাকে প্রহসনধর্মী রচনায় উত্তীর্ণ করতে বাবাজীর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাবাজীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র স্থান শিকদার পাড়ার গলির চিত্র দর্শকের সামনে তুলে ধরার পর ওই সভার কার্যধারা সম্পর্কে দর্শক হৃদয়ে পূর্ব প্রস্তুতি গড়ে ওঠে। কর্তাবাবুর ঘরে যে কাহিনীর সূত্রপাত সে কাহিনীর বিস্তৃতি সিকদার পাড়ার গলিতে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা পর্যন্ত। এই উভয় স্থানের মধ্যেও সংযোগকারী চরিত্র হিসেবে এই নাটিকায় বাবাজী অপরিহার্য চরিত্র। বাবাজী কর্তামশায়ের অনুচর। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কর্তামশায় তাকে নিযুক্ত করেছেন নবকুমারের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বাবাজীর বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভের কাহিনী। বারবিলাসিনীদ্বয় তাকে 'তুলসী বনের বাঘ' বলে, মাতাল তাকে 'সং সেজেচ' বলে ধিক্কার দেয়, সারজেন্ট তার কাছে উৎকোচ নিয়ে অনায়াসে তাকে ছেড়ে দেয়। পরবর্তী মুহূর্তে নিজেই নববাবুর কাছে উৎকোচ নিয়ে তার অপকর্ম কর্তার, কাছে বলবে না বলে অঙ্গীকার করে। কালীর উক্তিতে দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে সে কথা জানতে পারি।

সার্জেণ্ট : সারজেন্টের চরিত্র তার স্বশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। তার আচরণে চরিত্রানুযায়ী ঔদ্ধত্য, বিচারবোধহীন দম্ভ প্রকাশ পেয়েছে। সহকর্মী চৌকিদারের প্রতিও তার পুরুষ উক্তি ['ড্যাম' 'সুওর'] লক্ষ্য করার মত। এদেশীয় মানুষদের প্রতি ইংরেজ সার্জেণ্টের

ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে 'ব্লডী নিগর', 'ইউ ব্ল্যাক্ ব্রুট', 'ইউ সূটি ডেভল্' প্রভৃতি উক্তিতে। হিন্দুধর্মের প্রতি সাহেবের ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে বাবাজীর জপের মালা নিয়ে 'হাম বড়া হিণ্ডু হুয়া—রাঢ়ে, কিস্‌ড়ে' প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক উক্তিতে। জানি না, মধুসূদন সার্জেণ্টের এই আচরণ কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে চিত্রিত করেছেন কিনা—এক্ষেত্রে সার্জেণ্টের এরকম আচরণ না দেখালেও প্রহসনের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হত না।

মুটিয়াদ্বয়, যন্ত্রীবৃন্দ, ফুলওলা, বরফওলা, বোদে : মুটিয়াদ্বয়ের কাজ জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় নিষিদ্ধ মাংস নিয়ে যাওয়া। এদের চরিত্রে স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়েছে। শোষক-শোষিতের দূরত্বটুকু তাদের উক্তিতে ব্যক্ত। তাই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে দ্বিতীয় মুটে বলে,—'এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে ন্যেলে।' বরফওলা, বেলফুলওলার চরিত্র সমাজচিত্ররূপ ফুটাতে সহায়তা করেছে বাদক, যন্ত্রীদের আচরণেও শোষিত মানুষের কষ্ট ব্যক্ত। তবে উনিশ শতকের মধ্যভাগে মদ্যপানের নেশায় গ্রস্ত যে কেবল ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী নয়, সাধারণ মানুষও, এই চরিত্রগুলির সামান্য বোতল-তলানি মদ্যের জন্য লালায়িত ব্যবহার—সে কথা প্রমাণ করে। নববাবুর ভৃত্য বোদে বুদ্ধিমান চাকর। সে জানে, নব মদ পান করে, কর্তা সে কথা জানতে পারলে অনর্থ করবেন। তাই সে নবকুমারকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছে। শেষ দৃশ্যে অন্তরালে যে ব্যক্তি মত্ত নবকুমারকে সাবধান করে দিচ্ছিল সম্ভবত সে বোদে। এই অপ্রধান চরিত্রগুলি ইয়ংবেঙ্গলদের বিচিত্র জীবনধারার সহগামী হলেও তাদের জীবনধারার সঙ্গে এদের কিছু প্রভেদ আছে। এই চরিত্রগুলির সংলাপে আমরা জানতে পারি—(১) নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণে পটু ইয়ংবেঙ্গলদের কথা, যে মাংসের গন্ধ পেয়ে বাবাজী বলেছে 'রাধেকৃষ্ম কি দুর্গন্ধি!' (২) ধর্ম সম্পর্কে ইয়ংবেঙ্গলদের উন্নাসিকতা। একজন মুটে বলেছে ওরা 'না মানে আল্লা, না মানে দেবতা'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যখন এদেশে এলেন, তখন তিনি লক্ষ্য করলেন হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ডিরোজিও-রিচার্ডসনের ছাত্রেরা হিন্দুধর্মের প্রতি ভীষণ বিতৃষ্ণ। ডাফের জীবনীকার প্যাটন লিখেছেন—

> "He (Krishnamohan) and his friends were reformers but they knew themselves to have nothing to give in place of that which they were resolved to demolish. They believed Hindooism false, but what was true they knew not."[১]

সুতরাং জনৈক মুটের ইয়ংবেঙ্গলদের ধর্মবোধ সম্বন্ধে উক্তি বাস্তবসম্মত।

নারীচরিত্র : হরকামিনী : 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে নারী চরিত্রগুলির ভূমিকা কেবলমাত্র দুঃখ সহনে এবং নিদারুণ অন্তর্ব্যথায় সদীর্ঘশ্বাস হাহাকারে। আপাত-চটুল পশ্চাৎপট ব্যবহার করে মধুসূদন নবকুমারের অন্তঃপুরের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলছেন তা উনিশ শতকের স্বচ্ছল হিন্দুর পারিবারিক চিত্রকেই উপস্থাপিত করেছে। ইংরাজি আদব কায়দায় অভ্যস্ত, সভ্যতাভিমানী নবকুমারের স্ত্রী হরকামিনী এই প্রহসনের সবচেয়ে দুঃখী চরিত্র। উগ্র আধুনিক আদব কায়দায় অভ্যস্ত স্বামীর প্রায় অশিক্ষিতা অন্তঃপুরচারিণী বাঙালী কুলবধূ সে। স্বামীর সঙ্গে তার মিলনের অবকাশ ঘটে নি, কারণ স্বামী জ্ঞানতরঙ্গিণী

১. বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ /ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় /পৃঃ ২০১

সভা থেকে যখন ফেরে—তখন সে প্রথমত, স্বাভাবিক থাকে না। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীর সবচেয়ে লজ্জা স্বামী বারাঙ্গনা-বিলাসে অভ্যস্ত হয়ে এসে তাকেও বারবিলাসিনীর-র মতই সম্বোধন করে। তৃতীয়ত, মদ ও পেঁয়াজের দুর্গন্ধে হরকামিনী ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে। স্বামীর দৈনন্দিন অপকর্মের জন্যে দুঃখে তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। এই দুঃখী অনুভবটুকু ছাড়া পরচর্চা, তাসখেলা এবং আদি-রসাত্মক রসিকতার মধ্য দিয়েই ননদদের সঙ্গে সে দিন কাটায় আর পাঁচ জন বাঙালী নারীর মত।

প্রসন্নময়ী : স্বামী পরিত্যক্তা নবকুমারের বোন প্রসন্নময়ী। সে সদা সচেতন। গৃহিণীর ডাক সে-ই প্রথম শুনতে পায়। তারই নির্দেশে 'তাস লুকিয়ে' হরকামিনী ও অন্য দুজন খেলুড়ে বিছানার চাদর ধরে ঝাড়তে থাকে, গৃহিণীর তাস খেলার প্রতি সতর্ক পাহারাকে এড়িয়ে যায়। অন্য নারী তিনজনের মতো সে সব সময় আদি-রসাত্মক রহস্যালাপ পছন্দ করে না। তবে সূক্ষ্ম রসবোধ তার রয়েছে। বৌদি হরকামিনী তার দাদা প্রমত্ত হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কীভাবে চুমু খেয়েছিল সে কথা বারবার বলতে বললে প্রসন্ন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। মত্ত নবকুমার অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকলে হরকামিনী যখন প্রসন্নকে বলে যে সে কিছু বুঝতে পারছে কিনা! তখন প্রসন্ন দাদার অপকীর্তির কথা কিছু ঠাহর করতে পেরেও সহাস্যে বলেছে 'ও, ভাই, তোদের কথা, আমি ওর কি বুঝবো?' প্রসন্ন জানে, হরকামিনী বৃথাই বিলাপ করছে, 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'য় অমন জ্ঞানই হয়ে থাকে।

নৃত্যকালী, কমলা : নৃত্যকালী এবং কমলা হরকামিনীর তাস খেলার সঙ্গী। নৃত্যকালী নবকুমারের খুড়তুতো বোন। কমলা সমবয়সী প্রতিবেশিনী। তাস খেলায় মগ্ন হলে তারা দু'জনেই বিস্মৃত হয়ে যায়। আদিরসাত্মক রসিকতায় উভয়েই খুব পটু।

গৃহিণী : পুত্রস্নেহে অন্ধ মাতা এবং বৃন্দাবনবাসী পিতার জন্যই আলালের ঘরের দুলাল নবকুমার অধঃপাতের চরম সীমায় যেতে পেরেছে। নবকুমারের মাতা সংসারের গৃহিণী। সংসারে সবকিছুর প্রতি তিনি যেমন অতি-সচেতন দৃষ্টি রাখেন, পুত্রস্নেহের আতিশয্যে নবকুমারের প্রতি তাঁর দৃষ্টি তেমনই ঢিলেঢালা। বউমা ও কন্যাদের তিনি 'কলিকালের মেয়ে' বলে খোঁটা দেন তাদের কর্মে অমনোযোগিতা ও শ্লথতার জন্য। কন্যার প্রশ্নের উত্তরে গৃহিণীর মুখেই আমরা শুনি নব 'ওই যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে—' সেখানে গেছে। সুতরাং পুত্রের গতিবিধি সম্পর্কে তাঁর কোনও খোঁজ নেই। পুত্র প্রমত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরলে এবং চলতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেলে—সাধারণ ঘরের মায়ের মতো পুত্রের প্রতি তাঁরও বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগ্রত হয় না। তিনি ভাবেন তাঁর 'দুধের বাছাকে কেউ বিষটিষ খাইয়েছে।' কর্তামশায় যখন গৃহিণীকে জানালেন নব মদ্য পান করেছে, কেউ তাকে বিষ খাওয়ায় নি; তখনও গৃহিণী বাৎসল্যের বশে বলেন,—'ওমা, আমার এ দুধের বাছাকে এ সব কে শেখালে গা?' কর্তা যখন জানালেন মহাপাপ নগর এই কোলকাতা, এখানে ভদ্রলোকের বসতি করা উচিত নয়। তখন গৃহিণী বলে ওঠেন 'তাই তো, এত কে জানে,·····'গৃহিণীর চরিত্রে একদিকে যেমন তার পুত্র স্নেহাধিক্য দেখিয়ে নব'র পতনের পথকে দেখানো হয়েছে অন্যদিকে তাঁর এই সমস্ত শিশুসুলভ উক্তি যথেষ্ট হাস্যরসের যোগান দিয়েছে।

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ

ভূমিকা : মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাট্যপ্রতিভার অসাধারণ বিস্ময়কর নমুনা তাঁর প্রহসন দুটি, কিন্তু তাঁর প্রথম প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র থেকে 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ কোনও কোনও অংশে শ্রেষ্ঠত্বের অঙ্গীকারে নন্দিত এ কথা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিপূর্ণ বিকাশ যেমন 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র ছন্দোবৈচিত্র্যে—একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রাহসনিক আঙ্গিক তেমনি আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে। কারণ 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে নাট্যকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও তাঁর বক্তব্য একেবারে অস্পষ্ট থাকে নি। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে নাট্যকারের নীতিবোধ ব্যক্ত হয়ে প্রহসনের ক্ষতি করেনি।

নামকরণ : কবি মধুসূদনের ব্যঞ্জনাগর্ভ নামকরণে 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটিকার বক্তব্য অনেকটা তীক্ষ্নতা লাভ করেছিল। 'ভগ্ন শিবমন্দির' নামকরণের পশ্চাতে কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে বলে মনে হয়। কারণগুলি এই, এক ভগ্ন শিবমন্দির এই নাটকের climax-এর পশ্চাৎপট। সে কারণেই এর উপরোক্ত নামকরণ। দ্বিতীয় কারণ, এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক প্রাচীন ব্যক্তি, জমিদার। জমিদার ভক্তপ্রসাদ প্রাচীন বলেই বহু জীর্ণতার দাগ রয়েছে তাঁর মধ্যে। ভগ্নমন্দিরের মধ্যে যেমন থাকে বহু নোংরা আবর্জনা, ভক্তপ্রসাদের মধ্যেও রয়েছে তাই। সেদিক থেকে তাঁকেই ভগ্ন শিব মন্দিরের সঙ্গে অভিন্ন ভেবে বক্তব্যে গভীরতা আনা হয়েছে। প্রহসনের নামকরণে সূক্ষ্ম রেখা কার্যকরী নয় একথা বুঝতেন পাইকপাড়ার সিংহভ্রাতারা। তাই একটু ইঙ্গিত বজায় রেখে কিছুটা স্থূল দাগে এই নাটিকার নাম পরিবর্তনের কথা বলেন। মধুসূদনও এ ব্যাপারে সম্মত হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এই নাটিকার নাম পরিবর্তন করে নিজ ব্যয়ে মুদ্রণ করেন। নামকরণ-এ সার্থক কেননা নাটকের মূলকাহিনী এক ধর্মধ্বজী জমিদারকে নিয়ে। সালিকের ঘাড় বৃদ্ধ বয়েসে রোঁয়া-বিহীন হয়। 'রোঁয়া' যৌবনের প্রতীক। বুড় বয়সে ঘাড়ে রোঁয়া—ময়ুরপুচ্ছধারী কাকের আচরণের সমতুল্য। ভক্তপ্রসাদের আচরণের এই বৈপরীত্য এখানে মূল অবলম্বন।

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের আদি নাম ছিল 'ভগ্ন শিবমন্দির'। এই তথ্য জানা যায় ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে। এই চিঠিতে তিনি তাঁর কাছে নাটিকাটির পরিণাম সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছিলেন, "What about the farce, The ভগ্নশিবমন্দির"? পত্রপ্রাপক কেশবচন্দ্র তার উত্তর কি দিয়েছিলেন সে কথা জানা যায়নি। নামকরণের ব্যাপারে তাই সমালোচকদের মধ্যে একটা দ্বিমতের অবকাশ গড়ে উঠেছে। একপক্ষের মতে আদি নামকরণ যথাযথ ছিল আর অন্য পক্ষ নতুন নামাঙ্কনকেই গুরুত্ব দিয়েছেন অনেক বেশী পরিমাণে।

'ভগ্নশিবমন্দির' এই নাটকের ক্লাইম্যাক্সের ক্ষেত্রস্থল। ভক্তপ্রসাদ ফতেমার সঙ্গে মিলিত হতে গিয়েছিল এই ভগ্নশিবমন্দিরে। ধনী ব্যক্তি ভক্তপ্রসাদ ধর্মধ্বজী। গোঁড়া হিন্দুবৈষ্ণব ভক্তপ্রসাদ প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বরের নাম জপ করে থাকে। বাইরে তার এই লোক দেখানো আচরণ

আর ভেতরে ভেতরে সে লম্পট এবং সব ধরনের বদ কাজেতেই যথেষ্ট পারঙ্গম। শিবমন্দির এখানে প্রতীকি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। শিব হলেন মঙ্গলের দেবতা। তিনি যেখানে পবিত্রতা সেখানে শান্তি, সেখানে মানব মঙ্গল সেখানেই। আর যেখানে ঘটে তার বিপরীত ঘটনা সেখানেই তিনি হয়ে ওঠেন ভৈরব। তার রুদ্ররূপের আবির্ভাবে সব কিছু হয়ে যায় বিশৃঙ্খল।

প্রহসনের শেষদিকে ভক্তপ্রসাদ-জঙ্গল সমাকীর্ণ ভগ্নশিবমন্দিরে এসেছে পুঁটির নির্দেশমতো। শিবমন্দির অক্ষত থাকলে তা দুশ্চিন্তার কারণ ছিল ভক্তপ্রসাদের। কিন্তু মন্দির ভগ্ন হওয়ায় সে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত। তাই পুঁটি যখন ভক্তপ্রসাদকে বলে,—

"পুঁটি। কত্তাবাবু, ফতির ভয় হচ্যে সে পাছে কেউ ওকে এখানে দেখ্‌তে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভালো হয়।

ভক্ত। (চিন্তিতভাবে) অ্যাঁ—মন্দিরের মধ্যে? হ্যাঁ; তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি।"

ভগ্নশিবমন্দির ভক্তের মতে পবিত্র জায়গা নয়, ফলে সেখানে সামাজিক দৃষ্টিতে অপবিত্র কাজ করা অপরাধ নয়। আর, অপরাধ হলেও শিব এখানে নিষ্ক্রিয়, কারণ শিবমন্দির ভগ্ন। অশ্বত্থগাছ, শিবমন্দির, মসজিদ, দৈববাণী প্রভৃতির উল্লেখ এখানে ভারতীয় সচেতন ভাবনাকে আকর্ষণীয়রূপে তুলে ধরেছে। ফলে আদর্শগত দিক থেকে, আভ্যন্তরীণ তত্ত্বগতদিক থেকে এ নামাঙ্কন ঠিক ছিল বলেই প্রথম পক্ষের অভিমত।

কিন্তু প্রহসনে কোনো তত্ত্ব তুলে ধরা ঠিক নয়। মধুসূদন সম্ভবত তা করতেও চাননি। কিছুটা হিউমার ও প্রবল স্যাটায়রের খোঁচায় তিনি গোঁড়া ধর্মধ্বজীদের মুখোশকে খুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর তীব্র আক্রমণে তাদের সর্বসমক্ষে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছেন। সম্ভবত সেই কারণেই ক্ষুব্ধ এই সমাজের প্রবল বাধাদানে রিহার্সালের পরও এই নাটিকাটি মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি।

পরিবর্তিত নামের ব্যাখ্যাও প্রসঙ্গত করতে হয়। তরুণ বয়সে শালিক পাখির ঘাড়ে রোঁয়া দেখা দেয়। এর মাধ্যমেই সে স্ত্রী শালিককে আকৃষ্ট করে। কিন্তু বুড়ো বয়সে তার ঘাড়ে আর রোঁয়া থাকে না। ভক্তপ্রসাদ বৃদ্ধ অথচ এই লম্পট মানুষটি নারীসঙ্গের জন্য বেশবাস থেকে শুরু করে আচার-আচরণে তরুণদের মতো সেজে ওঠার চেষ্টা করেছে। ভক্তপ্রসাদের ভৃত্য সম্পর্কে জানিয়েছে সে পড়েছে, 'শান্তিপুরের ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ।' তাজ পার কারণ ব্যাখ্যায় জানানো হয়েছে, মুসলমানি ফতেমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তার যাত্রা। তাই যেহেতু মুসলমানেরা তাজ ভালোবাসে আর এই টুপির দ্বারা টিকিটিও ঢেকে রাখা সম্ভব তাই তাজ মাথায় দিয়েছে সে। আরশিতে মুখ দেখে রূপচর্চা করেছে, গায়ে আবার মেখেছে, এই আচরণ বৃদ্ধ সালিকের তরুণ সাজার মতো হাস্যকর। সেই কারণেই ভক্তপ্রসাদ যেন বুড়ো সালিকের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

নতুন নামকরণে একদিকে যেমন গভীরতর ব্যঞ্জনা আছে অন্যদিকে তেমনি আছে হাস্যরসের স্বতোৎসার। তাই 'ভগ্ন শিব-মন্দির' নামকরণটি তাৎপর্যপূর্ণ হলেও মধুসূদন তাঁর প্রহসনের এই নতুন নামকরণ সঙ্গত কারণেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

সমাজচিত্র : অষ্টাদশ-উনিশ শতকের সমাজ কাঠামোর দিকে তাকালে দেখা যাবে ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজ বাক্‌সর্বস্ব মুখ্য বা প্রধানের ইঙ্গিতে চলমান। তাঁদের রূঢ়তায় সমাজের অন্যান্য মানুষের জীবন সশঙ্ক। উনিশ শতকের প্রারম্ভে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত ইয়ংবেঙ্গল-সমাজ সামাজিক গন্ডী ভাঙার উদ্দেশ্যে যে বিশৃঙ্খল আচরণ করেছে সে কথা 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসন আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। কিন্তু ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্তদেব বাহাদুর পরিচালিত ধর্মসভার সদস্যবৃন্দও সবাই ধোয়া তুলসী পাতা ছিলেন না। বাইরে ফোঁটা-তিলক-কাটা পবিত্রতার প্রতিমূর্তি ব্রাহ্মণ। অভ্যন্তরে পাপাচারের ডিপো। ডিরোজিওকে পদচ্যুত করার পর ক্ষিপ্ত ইয়ংবেঙ্গল এই শ্রেণীর মানুষদের মুখোশ খুলে দেবার চেষ্টা করে। ধর্মসভার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজিতে একটি ছোটো নাটিকা লেখেন—'The persecuted or Dramatic Scenes Illustrative of the Present state of Hindoo Society in Calcutta." এই নাটিকার তীব্র ব্যঙ্গ ধর্মসভার সভ্যবৃন্দকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করেছিল, পরিণামে কৃষ্ণমোহনকে করেছিল গৃহচ্যুত। সম্ভবত এই নাটিকা পরবর্তী কালে (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে) আর এক ইয়ংবেঙ্গল মধুসূদন দত্তকে ধর্মধ্বজী হিন্দু সমাজের কর্ণধারকে নিয়ে নাট্যরচনায় আগ্রহী করে তুলেছিল। এই নাটিকার মূল বিষয় নাট্যকার রচিত প্রহসনের শেষে সন্নিবিষ্ট ছড়ায় লক্ষিত হয়,—

"বাইরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম্ম ধোয়া।।
পুণ্য-খাতায় জমা শূন্য,
ভন্ডামীতে চারটি পোয়া।।
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।।
যেমন কর্ম্ম ফল্‌লো ধর্ম্ম,
"বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।

অর্থনৈতিক কারণ এবং কৌলীন্য প্রথা আমাদের দেশে মর্মান্তিক অসম বিবাহ প্রথা চালু করেছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তৎকালীন সামাজিক প্রতিচ্ছবি হিসেবে এই বিবাহের চিত্র উপস্থিত। সমাজিক প্রতিপত্তি এবং আর্থিক সচ্ছলতার সুবাদে বৃদ্ধ যোড়শী কন্যার পাণিগ্রহণ করেছেন, যদিও এ প্রথা সমাজ অনুমোদিত, তবু একে ব্যভিচার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন,—

"কিন্তু নৈতিক ব্যভিচার যে কেবলমাত্র মদ্য এবং পতিতার সঙ্গেই জড়িত ছিল, তাহাই নহে পূর্বেই বলিয়াছি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা চিরকালই নিজের রুচি এবং মনোবৃত্তি অনুযায়ী ইহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই বিষয়ে সর্বপ্রথম যে উল্লেখযোগ্য নাটক বা প্রহসনটি রচিত হইয়াছিল তাহা মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ' ; ইহার সঙ্গে মদ্য কিংবা ব্যবসায়ী পতিতার প্রত্যক্ষ কোনও সংস্রব না থাকিলেও ইহার মধ্য দিয়াও সে যুগের সমাজের রুচি ও নীতিবোধের ইঙ্গিত লাভ করিতে পারা যায়। ইহা পল্লীর সমাজ-জীবনের একটি নিখুঁত

চিত্র ; পূর্বেই বলিয়াছি, নাগরিক জীবনে মদ্য ও পতিতা যেভাবে ব্যভিচারের সহায়তা করিয়াছে, পল্লীজীবনে তাহা তত করিতে পারে নাই। 'বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ' তাহারই আলেখ্য।"[১]

প্রথম অভিনয় : মধুসূদন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে যে সমাজচিত্র এঁকেছেন তা অত্যন্ত বাস্তব। সঙ্কীর্ণমনা, রক্ষণশীল, ধর্মধ্বজী, প্রাচীন সম্প্রদায় দিনরাত মালা জপ-রূপ ধর্মীয় কর্মে আপনাকে নিযুক্ত রাখলেও তাঁরা অনেকেই যে ধর্মের বিন্দুমাত্র ধার ধারতেন না—অর্থশোষণ এবং হীন উপায়ে জৈব তাড়নার নিবৃত্তিতে নিরত থাকতেন—তাঁদের কথাই মধুসূদন বলেছেন ভক্তপ্রসাদ চরিত্রের মাধ্যমে। ফল হয়েছিল ভয়ঙ্কর। বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ির মঞ্চে অভিনয়ের জন্য লেখা এই প্রহসনটির অদৃষ্টেও 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুরূপ সম্ভাষণ জুটেছিল। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতায় সিংহভ্রাতারা এই প্রহসনটিও মঞ্চস্থ করতে সাহসী হননি। তীব্র ক্ষেভে মধুসূদন প্রহসন রচনা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর এই ক্ষোভ কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে 'কৃষ্ণকুমারী'নাটক রচনায় সময় কেশবচন্দ্র সেনকে লেখা চিঠিতে। তিনি বলেছেন, —একবার তাঁরা তাঁর ডানা ভগ্ন করেছেন, এবার যদি সে জাতীয় কোনও ঘটনা ঘটে তবে এখানেই তিনি বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনায় ইতি টানবেন, সেক্ষেত্রে তিনি হিব্রু অথবা চৈনিক ভাষায় নিজ সাহিত্য সাধনার ধারাকে অব্যাহত রাখবেন—বাংলা ভাষায় আর নয়। মধুসূদন লেখেন,—"mind, you broke my wings once about the farce; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese!" ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হবার পর এটি প্রথম অভিনীত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মার্চ রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমনি ফলে'-র আগে।[২]

মধুসূদন নিজেও সার্থক নাট্য পরিবেশনের জন্য বহুপূর্বে প্রত্যাশা করেছিলেন সর্বসাধারণের জন্য জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার। একটি পত্র তিনি জানিয়েছেন,-

> "....as yet we have not established a National Theatre. I mean, we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste and therefore we ought not to have Farces."

কাহিনী সংক্ষেপ : 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের কাহিনী নিম্নরূপ—নাটিকার শুরুতেই ধর্মধ্বজী বৃদ্ধ ধনী কৃপণ জমিদার ভক্তপ্রসাদের ব্যভিচারী রূপের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে পুঁটি এবং গদাধর নামে তাঁর কুকর্মের দুই অনুচরের কথোপকথনে। পুঁটির বক্তব্যে জানা

১. বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন / ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য / পৃঃ ৩১৩—৩১৪

২. এমারেল্ড থিয়েটার স্থাপিত হবার (১৮৮৭) পর বছর থেকে বুড় সালিকের ঘাড়ে রো প্রহসনটি বহুবার অভিনীত হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারির অভিনয় ভক্তপ্রসাদ সেজেছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। একবছর আরও কয়েকবার অভিনীত হয় এই প্রহসনটি। ৩ মার্চের অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধি স্তম্ভ নির্মাণের উদ্দেশ্যে গঠিত অর্থ-তহবিলে প্রদত্ত হয়। ১১ এপ্রিল, ২৫ জুলাই 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' আবার অভিনীত হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মার্চ এমাফেল্ড থিয়েটারে এই প্রহসনটি অভিনীত হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি বীনা থিয়েটার অভিনীত হয়।

যায় প্রায় ত্রিশ বৎসরের বেশী সময় ধরে সে জমিদারের সঙ্গে কাজ করছে এবং এই সময়ে 'কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল' যে জমিদার নষ্ট করেছেন— তার ইয়ত্তা নেই। অথচ বাইরে ভক্তপ্রসাদ পরম বৈষ্ণব, মালা ঠক ঠক করেন অহোরাত্র। হানিফ গাজী জমিদারের একজন মুসলমান রায়ত। দারুণ খরার জন্য অজন্মায় তার ক্ষেত্রের ফসল নষ্ট হওয়ায় সে খাজনা দিতে পারেনি। জমিদার হানিফের শত অনুনয় বিনয়ে তার খাজনা মাফ করেন না, হানিফ খাজনার কিছু অংশ শোধ দেওয়া সত্ত্বেও জমিদার পীড়াপীড়ি করতে থাকেন খাজনার সমূহ বকেয়া শোধ করার জন্য। এই সময় ভক্তপ্রসাদ গদাধর মারফৎ জানতে পারেন হানিফের ঘরে উনিশ বৎসরের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী আছে—যার এখনো ছেলেপুলে হয়নি। তাকে পাবার আশায় উল্লসিত জমিদার হানিফের খাজনা মকুব করে দেন।

জমিদার ভক্তপ্রসাদের সর্বগ্রাসীরূপ ফুটে উঠেছে পঞ্চানন বাচস্পতির ব্রহ্মত্র-ভূমি গ্রাস করার ঘটনায়। মাতৃদায়গ্রস্ত পঞ্চানন ভক্তপ্রসাদের কাছে এসেছিলেন যৎসামান্য সাহায্য প্রাপ্তির আশায় কিন্তু জমিদার তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। শুষ্ক বিনয়ে তাকে বিদায় দিয়ে পীতাম্বর তেলীর যুবতী কন্যা পাঁচীর প্রতি লোলুপদৃষ্টি দিয়ে তাকে পেতে চাইলে গদাধর জানায় অর্থে সব হয়। জমিদার তখন অর্থ খরচে কার্পণ্য করেন না।

জমিদারের সহচর পুঁটি ফতেমার সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া সংক্রান্ত কথাবার্তা সেরে ফেলে। হানিফের নির্দেশে ফতোমা টাকা নেয়, তবে হানিফ ফতেমাকে সাবধান করে দেয় বুড় যেন না তার গায়ে হাত দিতে পারে। শোষিত পঞ্চানন ও হানিফ উভয়েই ভক্তপ্রসাদের উপর ক্রুদ্ধ। ভক্তপ্রসাদ পঞ্চাননের মাতৃদায়ে অত সাধাসাধির পর মাত্র পাঁচ টাকা সাহায্য দিয়েছিলেন।

পুঁটি ফতেমাকে জানায় ভক্তপ্রসাদ থাকবেন ভাঙা শিবের মন্দিরে। সময় স্থিরীকৃত রাত 'চার ঘড়ি'। পুঁটি তাকে নিয়ে যাবে নির্দিষ্ট গাছতলা থেকে। ফতেমা তামাসার মন নিয়ে যেতে রাজী হয়। সাজসজ্জা করে নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব থেকেই ভক্তপ্রসাদ অস্থির হয়ে উঠেছেন। নেড়েরা পছন্দ করে বলে গায়ে আতরও মেখেছেন। সাজসজ্জা শেষ করে তিনি ভাঙা শিব মন্দিরে গেলেন। মন্দিরেরপাশে অশ্বত্থগাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকে পঞ্চানন আর হানিফ। পঞ্চাননের নিনর্দেশ পেলেই হানিফ গিয়ে ভক্তপ্রসাদকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দেবে পরিকল্পনা ছিল এই।

ফতেমাকে সঙ্গে নিয়ে পুঁটি অরণ্যসঙ্কুল ভাঙা মন্দিরের কাছে এলে সে ভয়ের ভাণ করে জানায় হানিফ জানলে কুরুক্ষেত্র করবে। ভক্তপ্রসাদ পূর্বে নেড়ের গায়ের পেঁয়াজের গন্ধ সহ্য করতে না পারার কথা জানালেও ফতেমাকে দেখার পর এর জন্য স্বচ্ছন্দে হিন্দুয়ানী ছাড়তেও স্বীকার করলেন। গদাধরকে বাইরে দূরে থাকতে বলে ভীতা ফতেমার আঁচল ধরে ভক্তপ্রসাদ তাকে প্রেম জানাতে যান। এই সময় মন্দিরের ভেতরের গম্ভীর আওয়াজ শোনা যায় 'বটে রে পাষন্ড নরাধম দুরাচার। ভূত মনে করে পুঁটি মূর্ছা যায়।

ফতেমাকে ছেড়ে ভক্তপ্রসাদ ভগবানের নাম জপ করে বুষ্ট শিবকে সন্তুষ্ট করতে চান। এই সময় কাপড়ে মুখ আবৃত করে হানিফ এসে গদাধরকে এক চড়ে মাটিতে পেড়ে ফেলে, অতঃপর পুঁটির কপালেও জোটে লাথি। ভক্তপ্রসাদ হানিফের ঘুঁসিতে যখন নিতান্ত কাতর ঠিক সেই সময় হানিফ দ্রুত প্রস্থান করে। মঞ্চে প্রবেশ করে পঞ্চানন। সে জানতে

চায় হানিফের স্ত্রী এখানে কেন? ভক্তপ্রসাদ পঞ্চাননকে তার ব্রহ্মত্র জমি ফিরিয়ে দেবার এবং পঞ্চাশ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একথা কাউকে বলতে নিষেধ করেন অতঃপর হানিফ প্রবেশ করে। ফতেমার তল্লাস করতে করতে সে নাকি এখানে এসে পড়েছে। ভক্তপ্রসাদ হানিফের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তাকে দুশো টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। সমুচিত শিক্ষা পেয়ে ভক্তপ্রসাদ নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করেন 'এমন দুর্ম্মতি যেন আমার কখন না ঘটে।'

ত্রয়ী ঐক্য : 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে নাটকের ত্রয়ী ঐক্য রক্ষিত হয়েছে। প্রহসনের সংক্ষিপ্ত কাঠামোয়—unity of time, unity of place এবং unity of action রক্ষা করার দুরূহ কর্ম সুসম্পন্ন হয়েছে। নাটিকার প্রারম্ভ দ্বিপ্রহর। কেননা গদাধরের সঙ্গে কথাবার্তা সেরেই ভক্তপ্রসাদ বলেছেন এখন যাই, সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় উপস্থিত হল" ইতোপূর্বে তিনি গদাধরকে বলেছেন তিনি গদাধরকে বলেছেন 'আজ রাত্রে ঠিকঠাক্ কত্যে পারবি তো?' দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হচ্ছে ভক্তপ্রসাদের স্বগতোক্তিতে আর! বেলাটা আজ আর ফুরবে না? এবং নাটিকার climax রাত্রিতে। সুতরাং ২৪ ঘন্টাও পুরো সময় নেওয়া হয়নি। Unity of time এখানে রক্ষিত। কর্তামশায়ের জমিদারিভুক্ত এলাকা খুব একটা বড়ো নয়। পায়ে হেঁটে কিছুক্ষণের মধ্যেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া যায়। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক পুষ্করিণী তটে বাদামতলা, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক হানিফ গাজীর বাড়ী। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক ভক্তপ্রসাদবাবুর বৈঠকখানা, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ভগ্ন শিবমন্দির —এই হল ঘটনাস্থল। সুতরাং, unity of place রক্ষিত 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁর কাহিনী একমুখীন তাই unity of Action ও অবহেলিত নয়। কেউ কেউ বলেছেন মাত্র কয়েক ঘন্টায় মধ্যে ফতেমা বিবির মতো মহিলাকে ভক্তপ্রসাদের কাছে আসায় রাজী করানো, হানিফকে সংযত করা সহজসাধ্য নয়, স্বাভাবিকও নয়। আমাদের মনে হয় সেটাই বরং সহজসাধ্য—ক্রোধী, হঠকারী ব্যক্তিকে স্বল্প-সময়ের মধ্যে কিছুকালের জন্য নিজ মতে চালানো যায়। দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পনা করলে বাচস্পতির মত অনুসারে হানিফের না-চলাটাই স্বাভাবিক ছিল। তা ছাড়া হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাহিনীর বাঁধন সম্পর্কে অতখানি ছুঁৎমার্গ দেখালে রসসৃষ্টিতে বিঘ্নিত হতে বাধ্য। মধুসূদন এই শৈল্পিক কারুকর্ম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই হাস্যরসোদ্বোধক প্রহসনের সংক্ষিপ্ত কাঠামোয় কোন কোন প্রয়োজনীয় কাজ অতি দ্রুত মিটিয়ে নিয়েছেন।

কাহিনীগত বাস্তবতা : প্রহসন কিনা : 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' একটি সার্থক প্রহসন। এর কাহিনী এবং চরিত্র সমকালীন যুগচিত্রকে প্রতিবিম্বিত করেছে। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু জানিয়েছেন, 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি কোনও কোনও পরিচিত ব্যক্তির চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন। তাঁর এক নিকট সম্পর্কিত আত্মীয় ভক্তপ্রসাদরূপে কল্পিত হয়েছেন। তাছাড়া হানিফ গাজী, পাঁচী তেলেনী প্রভৃতি চরিত্রের নামগুলিও নাকি মধুসূদন তাঁর স্বগ্রামের চেনা কোন-না-কোন স্ত্রীপুরুষের নাম থেকে গ্রহণ করেছিলেন। প্রহসনের কাহিনী বিশেষ কালের বহু আলোচিত বিষয়কে নিয়ে গড়া হয়ে থাকে। সমাজচিত্র প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি ব্যভিচারী জমিদার বা ধর্মধ্বজী গ্রাম প্রধানেরা কীরূপ নৈতিক পঙ্কিলতায় দিবারাত্র ডুবে থাকতেন। ভক্তপ্রসাদ এই শ্রেণীর চরিত্রের

প্রতিনিধি। গদাধর আর পুঁটি ভক্তপ্রসাদের কুকার্যের দুই সহচর। তবে এদেরও একেবারে মানবতা বিবর্জিত ভাবে আঁকেননি নাট্যকার। ভক্তপ্রসাদ যখন বলেন 'হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায়' প্রভৃতি উক্তি; তখন গদাধর স্বগতোক্তি করে 'নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না।' হানিফ শোষিত কৃষক সমাজের প্রতিনিধি হলেও তার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। একদিকে তার শরীরে রয়েছে আসুরিক শক্তি, সাহস, অন্যদিকে জমিদারের কাছে ভীতপ্রাণ শশক। এছাড়া তার চরিত্রের দুর্বলতার রন্ধ্রপথ দেখানা হয়েছে অর্থের ব্যাপারে—কাছায় বেঁধে খাজনার টাকা এনেও সে তা দিতে দ্বিধা করেছে। সামাজিক এক জঘন্য ব্যাধিকে নিয়ে এই প্রহসন লিখিত হলেও সমাজ সংস্কারের কোনও গভীর অভীপ্সা নাট্যকারের ছিল না; যদিও নাটিকার পরিশেষে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করার পর ভক্তপ্রসাদ জানিয়েছেন এমন দুর্মতি যেন, আর তাঁর কখনও না হয়। জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়ে, বিত্তবান বৃদ্ধ জমিদার এই শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি। তার প্রবৃত্তির মধ্যে ফুটে উঠেছে চিরন্তন মানবিক দুর্বলতা।

সংলাপ : সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও মধুসূদন অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রহসনের অঙ্গীরস হাস্যরস। সে রসের বাহন চরিত্রের শৈমিল্য এবং সরস সংলাপ। মধুসূদন সে কথা জানতেন। চরিত্রের শৈথিল্যের কথা চরিত্র পর্যালোচনা প্রসঙ্গে দেখব। এক্ষেত্রে দেখা দরকার চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি বা সংলাপ।

সংলাপ হল নাটকের প্রাণ। পাশ্চাত্য সমালোচকের মতে 'Dialouge is soul of Drama'। উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক রচনা। তাই এর সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমেই নাটকে বিষয় যথাযথভাবে পরিবেশিত হয় এবং নাটকটি সামগ্রিকভাবে সার্থক হয়ে ওঠে। সংলাপের দ্বারা নাটকের কাহিনী সফলভাবে এগিয়ে যেতে পারে সার্থক নাট্য সংলাপের কয়েকটি লক্ষণ আছে।—

(i) সংলাপ অতিদীর্ঘ হবে না। কারণ দীর্ঘ সংলাপ শ্রোতার পক্ষে ক্লান্তিকর এবং নাটকের গতির পক্ষে হানিকর।

(ii) চরিত্রের নিজস্ব সংলাপ অর্থাৎ শ্রেণী অনুযায়ী সংলাপ প্রয়োগে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে।

(iii) সংলাপের প্রয়োগ যথাযথ হওয়া দরকার। অযথা কাব্যময়তা কিংবা রুক্ষতা উভয়ই নাট্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে অস্বস্তিকর।

(iv) নাট্য সংলাপে এমনভাবে শব্দবিন্যাস ঘটানো দরকার যাতে নাটকের কাহিনী দ্রুত অগ্রসর হয় এবং দর্শকের কাছে প্রত্যক্ষবৎ হয়ে ওঠে অভিনীত বিষয়।

মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' দুটি অঙ্ক এবং দুটি করে গর্ভাঙ্ক নিয়ে গড়া। এই প্রহসনে নানা শ্রেণীর চরিত্র আছে। জমিদার, কৃষক, দরিদ্র প্রজা এবং আছে নানা ধরনের নারী চরিত্র। এরা প্রায় সবাই নিম্ন শ্রেণীর। মধুসূদন তাঁর সমসাময়িক কালে লেখা নাটকগুলিতে বিদ্যাসাগরীয় সাধুগদ্য সংলাপে প্রয়োগ করেছেন। দীনবন্ধুও করেছেন। কিন্তু প্রহসনের ক্ষেত্রে মধুসূদন কেবলমাত্র চলিত গদ্যের ওপর ভরসা রেখেছিলেন। তাই জমিদার থেকে শুরু করে প্রায় সব চরিত্রই মূলত চলিত ভাষায় কথা

বলেছে। তবে জমিদার ভক্তপ্রসাদের ভাষার সুর আর হানিফের ভাষার সুর একরকমের নয়। বাচস্পতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—তাঁর ভাষা তাই কিছুটা সাধুঘেঁষা।

ভক্তপ্রসাদের সংলাপে গ্রামীণ শব্দ প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। তার উক্তিতে রয়েছে কিছু তাচ্ছিল্যভাব। নাই হানিফকে সে সম্বোধন করেছে—"হ্যারে হান্‌ফে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত। তুই খাজনা দিসনে কেন রে বল তো? (মালা জপন)" হানিফ দরিদ্র মুসলমান কৃষক। তার সংলাপে কিছু কিছু আরবী শব্দ লক্ষ্য করা যায়। সে উত্তর দিয়েছে—"আগ্যে কত্তা, এবারহার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ্ হয়েছেন।" ভক্তপ্রসাদ সমাজের গণ্যমান্য মানুষ তাই চরিত্র বিশেষের সঙ্গে কথা বলার সময় তার সংলাপ বদলে যায়। যেমন—বাচস্পতির সঙ্গে কথা বলার সময় ভক্তপ্রসাদ বলেছে—"তা তুমি ভাই অন্যত্তরে চেষ্টা কর। দেখি, এরপরে যদি কিছু কত্যে পারি।" আনন্দের সঙ্গে সংলাপের সময় ভক্তপ্রসাদ যে ভাষায় কথা বলেছে তাও অনেকাংশেই সাধুভাষা। ইংরেজি জানেন না তিনি। কিন্তু তিনি যে সমাজ মেনে এবং আবর্তন মেনে চলতে চান তা বুঝিয়ে দিয়েছেন একটি সংলাপে। তিনি আক্ষেপ করেছেন—"কি সর্বনাশ! হিন্দুয়ানির মর্যাদা দেখ্‌চি আর কোনো প্রকারেই রৈলো না।"—"এমন কনকপদ্মটি তুলতে পাল্‌লে না হে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় কর্যে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হল্যেন।" পুঁটি ফতেমার সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর ভাষা হয়েছে একেবারে লৌকিক ভাষা। ভক্ত বলেছেন—"আহা, যবনী হোলো তার বয়্যে গেল কি? ছুঁড়ি রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এ যে আস্তা কুঁড়ে সোনার চাঙ্গাড়।"

ভক্তপ্রসাদের সংলাপে মাকেই একটি মুদ্রাদোষ লক্ষ্য করা গেছে। অসৎ মানুষ ভক্তপ্রসাদ কথায় কথায় ঈশ্বরের নাম নিয়েছেন—'দীনবন্ধো, তুমিই যা কর,' 'প্রভো, তোমারই ইচ্ছা' 'রাধেকৃষ্ণ' ইত্যাদি। বাচস্পতি চরিত্রটি ভদ্র চরিত্রের শ্রেণীভুক্ত। তার সংলাপে চলিতের ভাব থাকলেও সাধুভঙ্গী রয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে সংস্কৃত বলে বলেছে বাচস্পতি। যেমন—'গতস্য শোচনা নাস্তি'। বাচস্পতির হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার পর কিছু অর্থের বিনিময়ে ভক্তপ্রসাদকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছেন তিনি। একথা শুনে বাচস্পতি ভক্তকে জানিয়েছেন—"যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্যে স্বীকার হলেন, তখন তার তো একপ্রকার প্রায়শ্চিত্তই করা হলো।"

অন্ত্যজ শ্রেণীর চরিত্র হানিফ। তার সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে অজস্র আরবী, ফার্সী শব্দ। ঈশ্বর বিশ্বাসী হানিফ মাঝে মাঝেই 'পীর'-'আল্লা', 'খোদাতাল্লা' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করেছে। 'তোবা', 'ইজ্জত', 'থোড়া', 'বাৎচিত' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। নিরক্ষর গ্রামবাসী যে তাই 'স'-ধ্বনি তার শব্দে হয়েছে 'ছ' ধ্বনি। যেমন—'ছিন্নি' 'মোছলমান' ইত্যাদি। তার সংলাপে অজস্র গালিগালাজ এবং নিন্দাসূচক শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। যেমন—'কাফের', 'গোরুখোর', 'হারামজাদা', 'কসবিগিরি' ইত্যাদি। হানিফ অত্যন্ত ক্রোধী পুরুষ। তাই কথায় কথায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এবং তার ক্ষোভের কারণে যে তার মাথা ভাঙতে চেয়েছে। পুঁটিকে দেখে সে বলেছে—'হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি তা হলি গা জুড়ায়।"

ফতেমার সংলাপেও প্রকাশ পেয়েছে গ্রামীণ সংলাপের মেজাজ। অত্যন্ত ধূর্ত রমণী সে। প্রথম থেকে ভেবেছে কর্তাকে জব্দ করার কথা। পুঁটি তার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করার

পর তার ভয়ের কথা শুনলে যখন বলে—"তুই হলি নেড়েদের মেয়ে তোদের তো তার কুলমান নাই, তোরা রাঁড় হল্যে আবার বিয়ে করিস্।" পুঁটির এই তির্যক কথার উত্তর বুদ্ধিমতী ফতেমা তির্যকভাবেই দিয়েছে। হাসতে হাসতে বলেছে—"মোরা রাঁড় হলি নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস্ বল্ দেখি।" পুঁটির সংলাপেও রয়েছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ফতেমাকে অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে নিজের হিসেব বুঝে নিয়ে সে বলে, "তুই সাঁঝের বেলা ঐ আঁববাগানে যাস্।"

কর্তাবাবুর চাকর গদাধরের সংলাপেও কিছু আরবী-ফার্সী শব্দ আছে। যেমন সে হানিফকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে—'আমিও তোর হয়ে দু'এক কথা বলতে কসুর করবো না।' তার সংলাপে রয়েছে অমার্জিত শব্দ। সে ফতেমাকে বলেছে হানিফের 'মাগ'। ক্ষেত্রবিশেষে প্রবাদ-প্রবচন প্রয়োগ করেছে গদাধর—'কর্ত্তা আজকে কল্পতরু', 'গো মড়কেই মুচির পার্বণ' ইত্যাদি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। কর্তার কাছাকাছি থাকলেও তার সব আচরণকে গদাধর মেনে নিতে পারেনি তার পরিচয় মেলে নিম্নোক্ত সংলাপে।—"নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বাঃ! কর্ত্তাবাবুর কি বুদ্ধি!"

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকে চরিত্রানুযায়ী সংলাপ প্রয়োগ করে নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সংলাপ প্রয়োগের গুণে প্রহসন জাতীয় এই নাটকে হাস্যরসেরও সৃষ্টি হয়েছে। কখনো সম্পূর্ণ সংলাপে, কখনো তির্যক উচ্চারণে, কখনো দু-একটি শব্দ প্রয়োগে এই সিদ্ধি এসেছে।

মধুসূদনের পরিচিত পূর্ববঙ্গীয় গ্রাম্যভাষার কথাবার্তা বলেছে এই প্রহসনের অপ্রধান চরিত্রগুলি। সেই কারণেই হানিফের ক্রোধ তারই ক্রোধ হয়ে উঠেছে—এমন গরুখোর হারামজাদা কি হিঁদুদের বিচে আর দুজন আছে? ফতেমার ভয়ের ভাণের ভাষাও বড় বাস্তব ..."না ভাই মোরে বড়ো ডর লাগে, এ বোনের মদ্দি সাপেই খাবে না কি হবে, কিছু কতি পারি নে।" ভক্তপ্রসাদের কাম-লোলুপতার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সংলাপে। পাঁচীকে দেখে তিনি স্বগতোক্তি করেছেন,—

"মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া, অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।"

আহা! "কুচ হইতে উঁচু মেরুচূড়া ধরে।
শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে।"

প্রহসনের সংলাপের যে বড়ো গুণগুলি—স্পষ্টতা, সহজতা, সংক্ষিপ্ততা, সরসতা—সবগুলিই 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁতে উপস্থিত। গ্রাম্যভাষা ব্যবহারে প্রহসনের গ্রামীণ চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলার যে পথ মধুসূদন নির্মাণ করে দিলেন অতঃপর সে পথেই এলেন উত্তরসূরী প্রহসনকারেরা।[১]

চরিত্রবিচার : ভক্তপ্রসাদ : বৃদ্ধ ভক্তপ্রসাদ গ্রামীণ জমিদার। তাঁর চরিত্রের দুটি বদগুণ পাশাপাশি দেখানো হয়েছে —(১) নারীলোলুপতা এবং সে কারণে যথেচ্ছ অর্থ অপচয় করা এবং (২) প্রজাশোষণ, অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রজাদের নিপীড়ন এবং শত অনুনয় বিনয়

১ অবশ্য বাংলা নাটকে গ্রাম্যভাষা সংলাপ হিসেবে ব্যবহার করার কৃতিত্ব দীনবন্ধুর। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নীলদর্পণে' অপ্রধান চরিত্রগুলির মুখে তিনি গ্রাম্যভাষা ব্যবহার করেছেন।

সত্ত্বেও প্রয়োজনে কাকেও কোনরূপ সাহায্য না করা। প্রথম এবং দ্বিতীয় লক্ষণ এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে যে তাতে তার চরিত্রের মূল ভিত্তি স্পষ্ট বোঝা যায়। হানিফ গাজী ভক্তের একজন প্রজা। খরাজনিত অজন্মায় ফসল না-হওয়ায় সে ভক্তের কাছে খাজনা মকুবের আবেদন জানিয়েছে, ফল পায় নি। অগত্যা এগার সিকে খাজনার পরিবর্তে তিন সিকে খাজনা দিতে চায়। ভক্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। হানিফ তখন গদাধরের সাহায্য চায়। গদাধর গোপনে ভক্তকে জানায় ছেলেপুলে-না-হওয়া হানিফের উনিশ বছরের বিবির কথা। বিবিকে পাবার আশায় ভক্তপ্রসাদ হানিফের খাজনা মকুব করে দেন। ভক্তপ্রসাদের এই ধরনের চরিত্রাঙ্কন গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও সমাজপতিদের খুশী করতে পারে নি। রামগতি ন্যায়রত্ন মধুসূদনের তীব্র নিন্দা করে বলেছেন 'গোঁড়া হিন্দুরা অপরাপর অপকর্মে রত হইলেও জাতিভ্রষ্টশংকর যবনী সংযোগে কখনই ব্যগ্র হন না।' কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্ন মধুসূদনের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। নাট্যকার ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের মাধ্যমে সমস্ত গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজকে ব্যঙ্গ করতে চাননি—ভক্তপ্রসাদ ভন্ড ধর্মধ্বজীদের প্রতীক। এ নাটিকার আরও একজন ব্রাহ্মণ আছেন পঞ্চানন বাচস্পতি। ভক্তের ভন্ডামির প্রতিফল যাঁর বুদ্ধিতে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ভক্তপ্রসাদ মুখে মুসলমানদের তীব্র ঘৃণা করেন। কিন্তু মুসলমানের নারীকে অপহরণ করে ভোগ করতে তাঁর ঘৃণা নেই। মুসলমানের খাদ্য গ্রহণে আবার ফতেমাকে দেখার পর তার জন্য স্বধর্ম ত্যাগেও তাঁর আপত্তি নেই। এই অদ্ভুত বৈপরীত্যই ভক্তপ্রসাদ চরিত্রকে বাস্তব এবং প্রহসনের আদর্শ চরিত্র করে তুলেছে। ফতেমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যাহার পূর্বে ভক্তপ্রসাদের সাজসজ্জার ঘটা—তাঁর চরিত্রের ছদ্ম-মুখোশকে টেনে খুলে দিয়েছে। সাজগোজের পর তাঁর স্বগতোক্তি,—

"এই তাজটা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়ে মাগীরে এই সকল ভালোবাসে; আর এতে এই একটা আরও উপকার হচ্ছে যে টিকিটা চাপা পড়েছে।"

বাচস্পতি যে পদ্ধতিতে হানিফের সহায়তায় ভক্তের শাস্তি বিধান করেছে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং স্থানোচিত ঔচিত্য বজায় রেখেছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভক্তপ্রসাদই এই নাটিকার উপজীব্য। সুতরাং তিনিই এই প্রহসনের প্রধান চরিত্র। সমগ্র প্রহসনের গতিবিধি তাঁর চিন্তাযুক্ত পদক্ষেপ নির্ভর। তাঁর অর্থশোষণস্পৃহা, কৃপণতা এবং ইন্দ্রিয়চর্চায় অপব্যয় সবই যথাযথরূপে চিত্রিত। ভক্তপ্রসাদের ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ বোধের পরিচয়টুকুও দেওয়া হয়েছে কোলকাতাবাসী পুত্রের বন্ধু আনন্দের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে। নিজ পুত্রের সম্পর্কে খবরাখবর নিতে গিয়ে ভক্তপ্রসাদ আনন্দকে জিজ্ঞেসা করেছেন—

"ভক্ত।....ভালো, আমি, শুনেছি যে, কলকেতায় নাকি সব এককার হয়ে যাচ্ছে?....."

আনন্দ প্রত্যুত্তরে জানায় যে সে কথা সত্য।"

ভক্তপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করেন, "শুনেছি—কলকেতায় না কি বড়ো বড়ো হিন্দুসকল মুসলমান বাবুর্চী রাখে?

আনন্দ। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে।

ভক্ত। থু! থু! বল কি? হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায়? রাম! রাম! থু! থু!

ভক্তপ্রসাদ প্রমুখ বকধার্মিকদের চরিত্র এই উক্তিতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। নেড়ের ভাত খেতে তাঁর আপত্তি, নেড়ের নিকে করা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে আপত্তি নেই। ভক্তপ্রসাদ

আচারসর্বস্ব হিন্দুয়ানীর ভক্ত। চারিত্রিক সমুন্নতি বলতে তিনি কেবল আচার পালনকেই বুঝেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর পুত্র কোন অধর্মাচরণ করে কিনা। অধর্মাচরণের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন 'এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খৃষ্টিয়ানী মত—'ভক্তের বকধার্মিক রূপটি অনাবৃত হয়েছে নিম্নোক্ত সংলাপে,

'আমার বোধ হয়, অম্বিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকর্ম্মাচারী হবে না— সে আমার ছেলে কি না।'

পঞ্চানন বাচস্পতি : বাচস্পতির চরিত্র সৎব্রাহ্মণের চরিত্র। দারিদ্র্যের সুযোগে তার সর্বস্ব দখল করে নিয়েছেন গ্রামীণ জমিদার ভক্তপ্রসাদ। প্রতিবাদ করার পান নি তিনি কিন্তু বুদ্ধির জোরে অনায়াসে তিনি সে জমিদারের কাছ থেকে তাঁর আপন সম্পত্তি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে। নাটিকায় পঞ্চানন বাচস্পতি বুদ্ধিদাতার কাজ করে হানিফের মতো গোঁয়ার গোবিন্দকে সুশৃঙ্খল পথে চালিত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাহিনীকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন। পঞ্চাননের কথামতই ভক্তপ্রসাদকে হানিফ দু' এক ঘা লাগিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। নিজের খুশী অনুসারে হানিফ কাজ করলে ভক্তপ্রসাদের নিস্তার ছিল না।

ব্রাহ্মণ জমিদার ভক্তপ্রসাদের একজন মুসলমান কৃষক প্রজা হানিফগাজী। জমিদারের প্রতি তার শ্রদ্ধা ভক্তি কম নেই। তাই কিছুটা ভক্তিতে কিছুটা ভয়ে ফসল না হলেও জমিদারের খাজনা মিটিয়ে এসেছে। অনাবৃষ্টির কারণে ফসল না হওয়ায় খাজনা মেটানো তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছে। কারণ—খাজনা দিতে গেলে তার লাঙল-গরু তো দূরের কথা বাপ-দাদার ভিটেটাও চলে যাবে। কখনই তার মনে কোনো প্রতিবাদী ভাবনা জাগেনি। সব কিছুকেই 'খোদাতালার মজ্জি' বলে মেনে নিয়েছে। জমিদার অত্যাচার করলে সে প্রতিবাদ করেনি। রূঢ় কথা বললেন সে অনুগত ভৃত্যের মতো নিজেকে তার বান্দা বা গোলাম বলে উল্লেখ করেছে। সবিনয়ে বলেছে—
"আপনার খায়্যে পরেই মানুষ হইচি, এখনে আর যাব কনে?"

আপাতদৃষ্টিতে সরল সাদাসিধে হানিফ বিষয়বুদ্ধিতে অত সাদা-সিধে নয়। সে সুকৌশলী। তাই জমিদারের প্রাপ্যটি সঙ্গে এনে দারিদ্র্যের কথা বলেও ছাড় নেওয়ার কথা বলেছে। তার ধুতির সামনের দিকে গাঁটে তিনটে সিকি বেঁধে রেখেছিল আর কাছার খুঁটে বেধে রেখেছিল চারটে সিকি। সে পরিকল্পনা করেছিল জমিদার চাপাচাপি না করলে এই টাকা সে দেবে না। তার এই তঞ্চকতা আপাতদৃষ্টিতে গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হলেও এটা তার কঠোরতর জীবন সংগ্রামের একটা কৌশল মাত্র।

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের প্রথম অঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্কে তাই তার লুকোনো পয়সা অজ্ঞাত কারণে বেঁচে যাওয়ায় সে উল্লসিত হয়েছে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক দেখা যায়—হানিফের আত্মমর্যাদা বোধও কম নেই। ফতেমার কাছে সে যখন শুনেছে যে ভক্তপ্রসাদ তার সঙ্গে মিলনের শূন্য কুটনী নারীর মাধ্যমে পঞ্চাশ টাকা দেবার অঙ্গীকার করেছে সে কথা শোনা মাত্রই ক্রোধে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।—"এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেদুদের বীচে আর দুজন আছে?" বুদ্ধিমান হানিফ যথাযথ ভাবে বুঝেছে ভক্তপ্রসাদের শাসন-শোষণ এবং ব্যাভিচারের পদ্ধতি। "শালা রাইওৎ বেচারিগো জানে মার্য়ে, তাগোর সব লুটে লিয়ে, তারপর এই করে।" সে ভেবেছে ভক্তের আস্পর্ধা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাই তারা গরীব বলে তাদের ওপর এই ধরনের অত্যাচার করার সাহস দেখিয়েছে। সে তার স্ত্রীর কাছে বলেছে, তার বাপ দাদা নাকি

কখনো নবাবের সরকারের চাকরি করেছে। তাদের বংশে কেউ কখনো দেহ বিক্রি করেনি। তাই সে দেখতে চেয়েছে এই কোম্পানীর এলাকায় কোনও আইন আছে কিনা?

হানিফ কথায় কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে তৎক্ষণাৎ কুটনী পুঁটির মাথা ভাঙার জন্য এগিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু ফতেমা তাকে অনেক কষ্টে ঠাণ্ডা করেছে। ফতেমা তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তাই তার কাছেই সে বশ মানে। হানিফ আড়াল থেকে পুঁটির কথা শুনে এমনই ক্ষিপ্ত হয়েছে যে তৎক্ষণাৎ সে তার মাথা ভাঙতে উদ্যত হয়েছে। কারণ মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করতে চেয়েছে সে। ফতেমাকে আবার সম্পূর্ণ রূপে নিষেধ করতেও পারেনি। কারণ অর্থের দিক থেকে গরীব সে, তাই কৌশলে অর্থ রোজগারের উপায় থাকলে সে বাধা দেয় কেমন করে। তবে সে ফতেমাকে সাবধান করে দেয় সব কিছু সে যেন ভেবে চিন্তে করে। সে যেমন ভাবে বলেছে তেমন ভাবেই যেন এগোয়। কোনো ভাবেই যেন ভক্ত তার গায়ে হাত দিতে না পারে— "দেখিস্ ফতি, যা কয়ে দিছি, যেন ইয়াদ থাকে, আর তুই সমঝে চলিস, বেটা বড় কাফের, যেন গায়টায় হাত না দিতি পায়।"

বাচস্পতির সঙ্গে হানিফের কথোপকথনের সময় দেখা যায় ভক্তপ্রসাদের প্রতি হানিফ বীতশ্রদ্ধ ক্ষুব্ধ হলেও বাচস্পতির প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল। বাচস্পতি বলা মাত্রই সে কুডুল হাতে তেঁতুল গাছ কাটার জন্য বেরিয়ে পড়ে। সে জানে ভক্তপ্রসাদের জন্যে বাচস্পতি অনেক কিছু ভাবে। তাই তার বিশ্বাস ছিল তার মায়ের শ্রাদ্ধে জমিদার অনেক টাকা দেবে। কিন্তুমাত্র পাঁচ টাকা দিয়েছে শুনে বুদ্ধিমান হানিফ বাচস্পতিকে ও নিজের চতুর খেলায় যুক্ত করে নেয়। ফলে বাচস্পতির বুদ্ধি কৌশল হানিফও সতর্ক ভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করে।

দ্বিতীয় অঙ্গের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাচস্পতি হানিফ উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দিরের কাছে পৌঁছোয়। তার স্ত্রীকে নিয়ে এই নিদারুণ খেলা। তাই বাচস্পতি তাকে অশ্বত্থগাছের ওপরে উঠে লুকিয়ে থাকতে বললে হানিফ প্রথম প্রশ্ন করে যে, সেভাবে তো থাকতে রাজী—"লেকিন আমার সাম্‌নে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোনোরকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখনই সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টান্যে ছিঁড়ে ফেলাবো।" হানিফ বলল নিজের এলাকায় অন্যকে শাসন করলে তার শাস্তি হতে পারে কিন্তু এখন সে তো অন্যের এলাকায় রয়েছে। তাই তাকে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না।

বাচস্পতির কথামতো সে অশ্বত্থগাছের উপরে উঠে লুকোতে গিয়েছে। বাচস্পতি তাকে শান্ত হতে বললে সে জানিয়েছে—"আমার লহু গরম হয়ে উঠ্‌তেছে"। রক্ত গরম হয়ে উঠছে আর হাত দু'খানা মারবার জন্য নিসপিস করছে। এখন শুধু তাকে পেলেই হয়। মনের সাধে তাকে মেরে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু বাচস্পতি জানান সেক্ষেত্রে এসবের মধ্যে তিনি থাকবেন না। কারণ তার মূল উদ্দেশ্য ভক্তপ্রসাদকে বাগে ফেলা এবং আখেরে লাভ পাওয়া। হানিফ বাচস্পতির ক্রোধে স্বভাবতই অসহায় বোধ করে। সে তার কাছে শেষবারের মতো জানতে চায় যে চুপ করে থাকলে "আখেরে তো শালারে শোধ দিতি পারবো?" বাচস্পতি তাকে আশ্বস্ত করলে সে কথা দেয়—এখন ঠাকুর যা বলবে সে তাই করবে। অতঃপর সে গাছে উঠে বসে। এক চরম মুহূর্তে বাচস্পতির নির্দেশে সে মুখে কাপড় জড়িয়ে উপস্থিত হয় গদাকে প্রহার করে ভক্তকে কিল ঘুসি মেরে পুঁটিকে পদাঘাতে ফেলে দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যায়। আবার, তারই নির্দেশে একসঙ্গে স্বাভাবিক বেশে তারা ভক্তপ্রসাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

হানিফ ভক্তপ্রসাদকে জানায়, তার এই জঙ্গলে আসার কারণ ঘরে ফতেমাকে খুঁজে না পেয়ে তাঁকে খুঁজতে খুজতে সে এখানে চলে এসেছে। কারণ—সকলেই জানালো সে নাকি পুঁটির সঙ্গে এই দিকেই এসেছে। অতঃপর তির্যক ভাষায় ভক্তপ্রসাদকে বিদ্ধ করে সে বলে যে, তার মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা হয়েছে শুনলে, "ফতি তো ফতি ওর চেয়েও সোনার চাঁদ আপনারে আন্যে দিতে পারতাম।" ভক্তপ্রসাদ হানিফের হাতে পায়ে ধরতে গেলে হানিফ আরো আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সে জানায়, যে মুসলমানদের তিনি এত গাল পাড়তেন, "এখনে আপনি-খোদ্ সেই নাড়্যে হত্যি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হতি পারে?" সে ভক্তপ্রসাদদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয় যে একথা সে তার আত্মীয়-স্বজনদের বলবেই। এই উক্তিগুলির মধ্যে যতখানি না আছে প্রতিশোধ স্পৃহা, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে, ভক্তপ্রসাদকে ভয় পাইয়ে অর্থ রোজগারের আকাঙক্ষা।

হানিফ গাজীর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য তার অসাধারণ সাহস ও প্রবল গোঁয়ার্তুমি। বাংলার মুসলমান কৃষক সমাজের প্রতিনিধি সে। তার ক্রোধ প্রকাশ, তার হঠকারী পদক্ষেপ যেন নীলদর্পণে'র তোরাপের আবির্ভাব লগ্ন ঘোষণা করেছে। বাচস্পতি তার ভালো চায়—একথা বুঝতে পেরে সে তার কথা মত চলেছে। পঞ্চানন ও হানিফ গাজীর মিলনে অত্যাচারী লম্পট ভূস্বামীকে শায়েস্তা করার মাধ্যমে বাংলা নাটকে প্রথম সংঘশক্তির বিজয় ঘোষিত হয়েছে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বাভাবিক গ্রাম্য চরিত্রকে এভাবে ইতোপূর্বে বাংলা সাহিত্যে স্থান দেওয়া হয় নি।

মধুসূদন দত্তের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে পুরুষ চরিত্রের প্রাধান্য। বৃদ্ধধর্মধ্বজী ভক্তপ্রসাদ নাটকের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। এই চরিত্রের নানা সংকট এবং পরিবর্তনের অঙ্গীকার এই নাটিকায় গুরুত্ব পেয়েছে। ফতেমা, পুঁটি, ভোগী, পঞ্চী, ইচ্ছা প্রভৃতি নারী—এই নাটিকায় এসেছে নাটকের মূল বক্তব্যকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে। কুটিল চরিত্র পুঁটি ছাড়া অন্যচরিত্রগুলি সমাজের নানা স্তরের নারী কেউ হিন্দুর ঘরের বৌ, কেউবা মুসলিমের। আর ইচ্ছা ভট্টাচার্য ভক্তপ্রসাদের এক প্রাক্তন রক্ষিতা।

ফতেমা চরিত্রটি 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের একটি অন্যতম নারী চরিত্র। মুসলমান কৃষক হানিফের স্ত্রী সে। হানিফের পূর্বে ফতেমা বিবাহ করেছিল আরেক জনকে। সে বিধবা হলে হানিফ তাকে 'নিকা' করেছে। ফতেমার রূপের কথা জানা যায় ভক্তপ্রসাদের ভৃত্য গদাধরের উক্তি থেকে সে জানিয়েছে—"মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্‌বো। বয়স বছর উনিশ, এখনও ছেলেপিলে হয়নি, রং যেন কাঁচা সোনা।" ভক্তপ্রসাদ তার রূপের কথা শুনেই যেন অস্থির হয়ে উঠেছেন। প্রথমে ভেবেছেন মুসলমানীর মুখ থেকে পেঁয়াজের গন্ধ ভক্ ভক্ করে বেরোয়। পরে তার রূপের কথা ভেবে ভেবেছেন নারী সাক্ষাৎ প্রকৃতি স্বরূপা—তাই হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ সেখানে না করাই ভাল।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ফতেমা চরিত্রের প্রথম প্রত্যক্ষ দর্শন মেলে। হানিফের বাড়ির সামনে সে হানিফের সঙ্গে কথা বলেছে। ভক্তপ্রসাদের কুটনী পুঁটি যে খারাপ কাজের জন্য তার কাছে এসেছিল একথা সে হানিফকে বলেছে আর এও জানিয়েছে, এজন্য পঞ্চাশ টাকা দেবে বলে লোভ দেখিয়ে গিয়েছে। দরিদ্র হানিফের বিবি ফতেমা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। সে চেয়েছে কৌশলে ঐ টাকা হস্তগত করতে। তাই পুঁটিকে আসতে দেখেই সে জোর করে হানিফকে নিয়ে আড়ালে সরে

দাঁড়িয়েছে। তারপর সেখান থেকে পুঁটির আচরণ লক্ষ্য করে তার আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভালোভাবেই বুঝতে পারে সে, আর তখনই সে দেখা দিয়েছে পুঁটিকে।

পুঁটির কথামত কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুত টাকা নিয়ে সে এমনভাবে দর কষাকষি করেছে যাতে কারো মনে একবারও এ সন্দেহ হয়নি যে সে কৌশলে শুধু টাকাটুকু হাতাতে চাইছে। সে তার নিজের ভয়ের কথা বলে তাকে জানিয়ে দেয় সন্ধ্যেবেলা সে তার বাড়িতে যাবে। তারপর যেখানে যাওয়ার সেই নিয়ে যাবে। একথা বলেই সে তার কাছে অগ্রিম টাকা চায়। পুঁটি জানায়সে পঁচিশ টাকা এনেছে কিন্তু দেওয়ার সময় সে তাকে মাত্র উনিশ টাকা (১ কম ৫ গণ্ডা টাকা) দেয়। কেননা ওই ছয়টি টাকা নাকি পুঁটির দস্তুরী বা কমিশন। কিন্তু ফতেমা কৌশল করে আরও দু'টাকা আদায় করে। টাকা পাওয়ার পর সে পুঁটির মনে তার স্বামীর সম্পর্কে একটা ভীতি জাগিয়ে দেয়। বলে—"আমার আদ্‌মি একথা টের পাল্যি আমাগো দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।" পুঁটি চলে যাওয়ার পর ফতেমা মনে মনে বলেছে, "দেখি, আজ রাত্তির বেলা কি তামাসা হয়।" ফলে ফতেমা যে তামাসা করতে চলেছে একথা এখানে স্পষ্ট।

দ্বিতীয় অঙ্কের— দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ফতেমাকে পুঁটির সঙ্গে দেখা যায়। ফতেমা এখানে যেন লজ্জাশীলা, ভীতা এক রমণী। পাপ কাজ করতে যেতে ইচ্ছে বলে সে নীলদর্পণের ক্ষেত্রমণির মতো কাতরতা দেখিয়েছে। তবে ক্ষেত্রমণিকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল আর ফতেমা নিজেই গিয়েছে চুক্তি অনুসারে। একটি উদ্যানের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে যাওয়ার সময় সে তার ভয়ের কথা জানিয়েছে। ভয়ের কারণ একদিকে সাপ, অন্যদিকে ভূত। পুঁটির মুখে ভূতের কথা শুনে সে বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কর্তামশাই তখনো এসে না পৌঁছানোয় ফতেমা ভীত কণ্ঠে বলেছে, "মোর আদ্‌মি একথা মালুম কত্যি পাল্যি মোরে আর আস্তো রাখবে না।" পুঁটি ভেবেছে ফতেমা সত্যিই ভীত হয়ে পড়েছে। কারণ তার চালাকি এবং ফন্দি সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। তাই সে একবার মাত্র অনুরোধ করতেই ফতেমা যেন অনুগত নারীর মতো বলেছে—সে যদি তাকে না ছাড়ে তবে আল্লা যা করে তাই হবে। সে চেয়েছে তাদের মসজিদের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে। কারণ এখানে যদি কেউ তাদের কোনো দিক থেকে দেখে ফেলে তবে বড় বিভ্রাট হবে। ভক্তপ্রসাদকে আসতে দেখেই সে ফিরে যাওয়ার জন্য যেন ব্যাকুল হয়ে পড়ে। পুঁটিকে বলে, "মুইতোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল্।" কারণ তার নাকি ভয় হয়েছে যে বাড়ি ফিরে হানিফ তাকে খোঁজ করে না পেলে অনর্থ বাধাবে। আর তাই সে পালাতে চেয়েছে। কিন্তু ভক্তপ্রসাদ তার অঞ্চল ধরে তাকে আকর্ষণ করেছে।

বাচস্পতি ও হানিফের হাতে নির্যাতিত হয়ে ভক্তপ্রসাদ যখন নাকে কানে খত দিয়ে বলেছে এমন কর্মে আর নয়, তখন ফতেমা তাকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে দুটি কথা বলেছে—"কেন, কত্তাবাবু নাড়্যের মায়্যে কি এখনে আর পছন্দ হচ্চে না?" সে তাকে তির্যক কণ্ঠ বলে এক্ষুনি সে তার কলজে হচ্ছিল, আরো কি কি যেন হচ্ছিল তার—আর এখন কর্তা তাকে দূর করতে চায়। ফতেমার বুদ্ধির কাছে হেরে গিয়েছে পুঁটি এবং তার মালিক। একদিকে সে তার ক্রোধী স্বামীকে সামলেছে। অন্যদিকে বাচস্পতির কথামত কাজ করে ভক্তপ্রসাদের কাছ থেকে বেশ কিছু অর্থ আদায় করেছে। শুধু তাই নয় ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের পরিবর্তন পরবর্তীকালে প্রকৃতই ঘটেছিল কিনা এটা তর্ক সাপেক্ষ আলোচনা। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, মুসলমানী ফতেমা

অন্তত সাময়িকভাবে ভক্তপ্রসাদের চরিত্রকে নাড়া দিয়েছে। যার ফলে এ নাটিকায় হাস্যরস স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়েছে।

ফতেমা হানিফ গাজীর যোগ্য বিবি। দরিদ্র হয়েও সে সম্মান ও ধর্মরক্ষাকেই বড়ো বলে জেনেছে। অর্থের কাছে নিজেকে বিক্রয় করে দেয় নি। যখন পুঁটি এসে তাকে হীন প্রস্তাব দিয়েছে, সে তা স্বামীকে জানিয়ে দিয়েছে। ফতেমার চরিত্রে আমরা নীলদর্পণের ক্ষেত্রমণির পূর্বাভাস পাই। বিশেষ করে সে যখন কুট্রিনী পুঁটিকে বলে—"পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মুকে হেতা থেকে নিয়ে চল্।" তখন মনে পড়ে যায় রোগ সাহেবের কামরায় ক্ষেত্রমণির কাকুতি মিনতি—"মোরে ছেড়ে দে, মোর বাড়ী রেখে আয় তোর পায় পড়ি, (৩।৩)" প্রভৃতি উক্তি। ফতেমা বিবি হানিফের মতো হঠকারী নয়, দক্ষ অভিনেত্রী সে। সে হানিফকে শান্ত সংযত থাকার পরামর্শ দেয় আখেরে লাভের জন্য। মূলত ফতেমার সহায়তায় এবং বাচস্পতির বুদ্ধি কৌশলেই হানিফ একদিকে ভক্তপ্রসাদের উপর তার ক্রোধের প্রতিশোধ নিতে পেরেছে অন্যদিকে অর্থের দিক থেকেও আখেরে লাভবান হয়েছে।

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে উপস্থিতি এবং ক্রিয়াগত দিক থেকে প্রায় সব নারী চরিত্রই অপ্রধান। তবু, সক্রিয় ভূমিকার দিক থেকে ফতেমা ও পুঁটিকে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বলা যেতে পারে। কিন্তু পঞ্চী ওরফে পাঁচী, ভোগী, ইচ্ছা প্রভৃতি নারী চরিত্রগুলি একেবারেই অপ্রধান। ভোগী ও পঞ্চী যথাক্রমে মা ও মেয়ে। ভোগী পীতাম্বর তেলীর পত্নী। আর পঞ্চী তার মেয়ে। কয়েকটি সংলাপেই তাদের চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে।

ভোগী মধ্যবয়সী নারী। সংসারের নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি হয়েছে পরিষ্কার। গ্রামের জমিদার ভক্তপ্রসাদ যে দোর্দন্ড প্রতাপশালী এবং বিত্তবান মানুষ সে কথা তেলী পত্নী ভোগীর জানা আছে। আর্থিক থেকে নিজে দুর্বল বলে এতকাল বড়ো মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ভোগী সঙ্কুচিত হয়ে থাকত। কিন্তু বয়স হেঁট হয়ে আমায় পরপুরুষের কাছে আর তার সংকোচ নেই। বরং তার কিছুটা গর্ব হয়েছে কন্যাকে বিত্তবান ছেলের হাতে দেওয়ায়। তাই ভক্তপ্রসাদ তার কাছে তার সঙ্গের মেয়েটির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে জানিয়ে দেয়, 'আপনি আমার পাঁচিকে চিন্‌তে পারেন না' গ্রামের সেই অবহেলিত মেয়ে পাঁচী বিবাহের পর তার আসল নাম পঞ্চী ফিরে পেয়েছে। কারণ ভোগীর কথায় তার বিয়ে হয়েছে খানাকুল কৃষ্ণনগরের পালেদের বাড়িতে। ভক্তপ্রসাদ জানেন যে পালেরা বড়োমানুষ। এরপরেও ভক্তপ্রসাদ জামাইয়ের রূপ সম্পর্কে জানতে চাইলে ভোগীর মুখ খুলে যায় আরও। সে তার গর্ব করার আরো কয়েকটি উপকরণ সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করে,—

(i) 'জামাই দেখতে সুন্দর'—'জামাইটি দেখতে বড় ভাল।'

(ii) সে লেখাপড়া শেখে—'কল্‌কেতায় থেকে লেখাপড়া শেখে।'

(iii) সে সমাজে যথেষ্ট গণমান্য হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই—'লাট সাহেব তারে নাকি বড় ভালবাসেন।'

(iv) তার অন্যতম গর্ব বড়ো ঘরে মেয়ে দেওয়ার জন্য পঞ্চী তার কাছে আসতেই পারে না।

ভোগীর বুদ্ধিসুদ্ধি তেমন পাকা নয়, তাই ভক্তপ্রসাদ কি ধরনের সুযোগ সন্ধানী তা জানা

সত্ত্বেও সে তার কাছে সব গোপন কথাও জানিয়ে দেয়। জানিয়ে দিয়েছে, মেয়ের সঙ্গে জামাই তার বাড়িতে আসেনি। একমাসের জন্য সে মেয়েকে তার কাছে এনেছে। আর একথাও জানিয়েছে পীতাম্বর কেশবপুরের হাটে গেছে নুন আনতে। চার পাঁচ দিনের মধ্যে ফিরে আসবে। সে যে ভক্তপ্রসাদকে তাদের গৃহের চার-পাঁচ দিনের অরক্ষিত অবস্থার কথা জানিয়ে দিয়েছে এটা তার মনে একবারও আসেনি। কন্যার গর্বে গর্বিত ভোগীর চরিত্রটি স্বল্পাবকাশে একটি উজ্জ্বল চরিত্র।

পঞ্চীর চরিত্রটি 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে সৌন্দর্যের দিক থেকে যেন গোবরে পদ্মফুল। নারীসঙ্গ লোলুপ লম্পট বৃদ্ধ জমিদার ভক্তপ্রসাদ পঞ্চীকে দেখেই তার রূপে মুগ্ধ হয়ে উঠেছেন। মনে মনে তিনি যে কথা বলেছেন তাতেই জানা গেছে পাঁচী চরিত্রটির রূপ কতখানি আকর্ষণীয়। নবযৌবনকাল উপস্থিত। ডাগোর-ডোগর হয়ে উঠেছে ইত্যাদি উক্তিতে বোঝা গেছে গর্ব করার মতো দৈহিক সম্পদ পঞ্চীর আছে। তার স্বামী শিক্ষিত এবং ধনী। স্বাভাবিক ভাবেই সে অনেকটাই সপ্রতিভ। তাই ভক্তপ্রসাদকে সে তার মায়ের মতো গুরুত্ব দেয়নি।

মায়ের নির্দেশে পঞ্চী ভক্তপ্রসাদকে প্রণাম করেছে। সে সময় এই বুড়োর আচরণ তার মোটেই ভালো লাগেনি। সে ভেবেছে "এ বুড় মিন্‌সে তো কম নয় গা। একি আমাকে খেয়ে ফেলতে চায় না কি?" ভক্ত তার শরীরের দিকে এমনভাবে তাকিয়েছে যে পঞ্চী মনে মনে তাকে গালিগালাজ করছে। পঞ্চীর উক্তি একটিই। সে শুধু মায়ের অনুগামী হয়েছে তার চরিত্রটিকে উপস্থাপনের মূল কারণ ভক্তপ্রসাদের চারিত্রিক দুর্বলতার সবটুকু নিঃশেষে তুলে ধরা।

ইচ্ছা ভট্টাচার্য নামে আরেকটি নারীর কথা এ নাটিকায় এসেছে ভক্তপ্রসাদের অপকর্মের দৃষ্টান্ত হিসেবে। গদাধর জানিয়েছে, ইচ্ছাকে ভক্ত নষ্ট করায় সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বেশ্যালয়ে ছিল। ভক্তপ্রসাদের তার জন্যও দীর্ঘশ্বাস পড়ে, "ছুড়িকে দেখতে ছিল ভাল বটে,"। হানিফের স্ত্রী ফতেমার রূপ যে তার চেয়েও বেশী একথা বোঝানোর জন্যই এই চরিত্রটিকে আনা হয়েছে।

গদাধর ও পুঁটির চরিত্র বর্ণনায় মধুসূদন চিরপ্রচলিত টোটকাই ব্যবহার করেছেন। চাকর-বাকর, দাস-দাসী সম্পর্কে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যে রূপের চিত্রণ লক্ষ্য করি এখানেও তাই অনুসৃত। বাবুর অধঃপতনে গদাধরের উল্লাস, অসৎকর্মে সহায়তা করার জন্য পুঁটির অর্থপ্রাপ্তি প্রভৃতি তাদের চারিত্রিক type ঢঙটিকে প্রকাশ করে কিন্তু বাবু ভক্তপ্রসাদ যখন নেড়ের ভাত খাওয়া সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করেন, তখন গদাধরের উক্তি—নেড়ের মেয়ে সম্ভোগে আপত্তি নেই, ভাত খেলে জাত যায় এবং পরিশেষে 'বাবুর কি বুদ্ধি' প্রভৃতি গদাধরের চারিদিক স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছে। ভগ্ন শিবমন্দিরের কাছে পুঁটি যখন ফতেমার কথার উত্তরে স্বগতোক্তি করেছে—'হায় আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাঁস পেকে শক্ত হলে আর তাকে কে খেতে চায়?" তখন পুঁটির দীর্ঘশ্বাস আমাদের তার অন্তর্বেদনার সঙ্গেও পরিচিত করিয়ে দেয়।

অপ্রধান প্রহসনকার

হরিশ্চন্দ্র মিত্র (১৮৩৮-৭২) : বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে হরিশ্চন্দ্র মিত্র একজন অনালোকিত দিগন্তের নাট্যকার। সমকালীন সমাজ ও জাতীয়-জীবনের আলোড়নের ছোঁয়া তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। হাস্যরসের নির্দোষ অবকাশে তিনি জীবনের নানান দিকে ফেলেছেন তাঁর সন্ধানী টর্চের রঙীন আলোর রেখা—সে আলোয় বড়ো বিসদৃশ অথচ উপভোগ্যরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন প্রহসনের চরিত্রগুলি। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল—বিধবাবিবাহের সমর্থনকারী প্রহসন[১]—'শুভস্য শীঘ্রং' (১৮৬১), বহুবিবাহ প্রথার বিরোধিতা করে লেখা—'সপত্নী কলহ' (১৮৭২) 'বেশ্যাসক্তির অসারতা প্রতিপাদন করে লেখা—'ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে' (১৮৭২), পঠন-পাঠন ও অর্থনীতির অসারতা বোঝানো হয়েছে 'হতভাগ্য শিক্ষক' (১৮৭২) প্রহসনে। 'ম্যাও ধরবে কে' নামে একটি প্রহসনও তিনি রচনা করেন। হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রহসন রচনা করতে গিয়ে 'ব্যোমচাঁদ বাঙ্গাল' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন, অন্যের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় : সাহিত্যের দিক থেকে গুরুত্ব থাকা বা না-থাক প্রহসন রচনার সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে একটি অবশ্য উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর রচিত প্রহসনগুলি হল—'কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে (১৮৬৩) কন্যাপণ প্রথার জঘন্যতা পাদর্শিত হয়েছে এতে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক রঙ্গব্যঙ্গ-মূলক নাটিকা 'কিছু কিছু বুঝি'। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রহসনগুলি,—'ষষ্ঠী বাঁটা বিষম ল্যাঠা' (১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৭১), 'কলির বৌ হাড়জ্বালানি' (১০ মার্চ ১৮৬৯), 'ননদ ভাজের ঝগড়া' (১৮৬৯), 'মোহন্তের চক্রভ্রমণ' (তারকেশ্বরের মোহন্তের কেলেঙ্কারীকে কেন্দ্র করে লেখা প্রহসন, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪) , 'ভ্যালারে মোর বাপ' (১৮ আগষ্ট, ১৮৭৬), 'কাশীতে হয় ভূমিকম্প, নারীদের একি দম্ভ' (১৮৬৩), 'দুই সতীনের ঝগড়া' (১১ মার্চ ১৮৬৯, ২য় সং,) 'কলির বৌ ঘরভাঙ্গানি' (১৮৬৯) 'আকাট মূর্খ' (১৮৭৩), প্রভৃতি। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম ছিল 'মন্শী নামদার'। সমসাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক অধিকাংশ রচনাই তাঁর পথপুস্তিকা ধরনের; ঐতিহাসিক বা সামাজিক মূল্য এগুলির যতটা আছে ততটা সাহিত্যিক মূল্য নেই।

'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এটি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'বুঝলে কিনা' (১৮৬৬) প্রহসনের জবাব।[২] 'বুঝলে কিনা' প্রহসনটি মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাট বঙ্গ-নাট্যালয়ে অভিনীত হয়।

১. বিধবাবিবাহের সমর্থন করে বেশ কয়েকটি নাটিকা এ সময় রচিত হয়। যথাসময়ে সেগুলির উল্লেখ করব। এক্ষেত্রে সাময়িকতার দিক থেকে সমসাময়িক দীনবন্ধু মিত্রের কাব্য 'সুরধনীর নামোল্লেখ করা যায়। এখানে দীনবন্ধু বিধবাবিবাহকে সমর্থন করেছেন।

২ গ্রাম্য সঙ্ত্যাত্রার মূলে যে বিদ্রূপ, 'কিছু কিছু বুঝি'র মধ্যেও সে বিদ্রূপই লক্ষ্য করা যায়। একে ঠিক পরিচ্ছন্ন তীক্ষ্ণ Wit এর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। সেদিকে থেকে গ্রাম হাস্যরসাত্মক নাটিকার উত্তরসূরী 'কিছু কিছু বুঝি।'

এই প্রহসনে সমকালীন কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তাই সমাজ-সচেতন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করে 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনটি রচনা করেন। শৌরীন্দ্রমোহনের দন্তরোগ ছিল বলে 'দন্তবক্র' চরিত্রের অবতারণা করে তাঁকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী এই প্রহসনে দন্তবক্র, মুরাদ আলি ও চন্দনবিলাস— একসঙ্গে এই তিনটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। প্রসঙ্গত এখানে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে—

(১) অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনে অভিনেতরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

(২) 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনে অভিনয়ের জন্য অর্দ্ধেন্দুশেখরের পরিবার এক তীব্র অর্থসঙ্কটের মুখে পড়ে। অর্দ্ধেন্দুশেখরের পিসতুতো দাদা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন। অর্দ্ধেন্দুর পিতা শ্যামাচরণ মুস্তাফির আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না বলে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে তাঁদের বৃত্তি দিতেন বা সাহায্য করতেন। কিন্তু 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ২য় বিদ্যাভারতী সংস্করণ থেকে জানতে পারি—

> "তাঁহারা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ি হইতে বরাবর মাসে মাসে যে বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনে অভিনয়ের পর হইতেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়।"

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ২ নভেম্বরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাহাটার বাড়িতে 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসন অভিনীত হয়। এবং এই প্রহসনে অভিনয়ের অপরাধে অর্দ্ধেন্দুশেখর পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ি থেকে বিতাড়িত হন।

দীনবন্ধু মিত্র [১৮১৯-৭৩]

দয়ার সাগরের যুগের এই ব্যক্তিত্ব সে অর্থে দীনের বন্ধু নয়, ম্রিয়মান হৃদয়ে ম্লান বক্ষের দীন থেকে তিনি গিয়ে নিয়ে আসেন বন্ধুর প্রসন্নতা, সহৃদয়তা।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে দীনবন্ধু মিত্র একটি স্বয়ং-স্বতন্ত্র অধ্যায়। ডাক বিভাগের পদস্থ কর্মী দীনবন্ধু মিত্রের সমকালজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। যুগের মর্মবাণীকে ব্যক্ত করার ক্ষমতায় তিনি ছিলেন মুখর। বাংলা নাটকের জন্মলগ্নে অনুবাদ-স্পৃহায়-ব্যাকুল দুর্বল নাট্যকারদের মৌলিক নাট্য কল্পনা-বিমুখতায় নবসৃষ্টির অনুৎসাহে যখন ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল, তখন তিনিই তাঁর সবল লেখনী চালনার দ্বারা দেখিয়ে দিলেন বাংলা ভাষায় নাট্যসৃষ্টির অযুত সম্ভাবনাকে। দিনগত পাপক্ষয়ের মাধ্যমে যে পরাধীন দেশবাসী কালগুজরাণে রত ছিল—তিনিই প্রথম সেই সমুচিত, ভীত, সুপ্ত জাতির মনে জাগালেন বিপ্লবের অগ্নিবাণী। প্রচন্ড এক ধাক্কায় ছুটিয়ে দিলেন তাদের সুপ্তি—'নীলদর্পণে'র মাধ্যমে। 'নীলদর্পণ' রচয়িতা দীনবন্ধু এবং তাঁর পূর্বসূরী মধুসূদন দত্তের প্রচেষ্টায় বাংলা নাটক শৈশব ছেড়ে অতি দ্রুত কৈশোরত্বে এবং অচিরে যৌবনে পদার্পণ করেছে। কিন্তু দীনবন্ধুর সমগ্র নাট্যগ্রন্থগুলির আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। কেবল যে নাটিকাগুলি অনাবিল হাস্যরসের দোলায় স্পন্দিত, প্রহসন নামে বন্দিত সে গ্রন্থগুলিই এ আলোচনায় অবাধ প্রবেশ অধিকার স্বীকৃত। দীনবন্ধু মিত্রের প্রায় সব রচনাতেই অল্পবিস্তর হাস্যরসের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,—

"তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসের গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত হাস্যরসপটুতার শতাংশের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না।"[১]

কিন্তু দীনবন্ধুর অপ্রকাশিত কবিত্বে আমাদের প্রয়োজন নেই। তাঁর প্রতিভার সীমা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

"দীনবন্ধু এই জীবনকে যতটুকু দেখিয়াছিলেন ততটুকুরই যথার্থ নাট্যরূপ দিয়াছেন, কিন্তু যতটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ততটুকুতেই ভুল করিয়াছেন।"[২]

দীনবন্ধুর নাট্য বৈশিষ্ট্য : দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যের বৈশেষিক লক্ষণগুলি যথাযথরূপে ধরেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর মতে, দীনবন্ধুর বৈশিষ্ট্যগুলি হল,—

(ক) "দীনবন্ধু অনেক সময়ই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গড়িতেন; সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজ শুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন।" (খ) দীনবন্ধুর ছিল এক 'সর্বব্যাপী সহানুভূর্তি-পরায়ণ মন। (গ) দীনবন্ধুর ছিল গভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা'। কিন্তু গভীর সমাজ-অভিজ্ঞতা থাকলেও দীনবন্ধুর মধ্যে কল্পনাশক্তির দীনতা ছিল—যে কারণে এই অভিজ্ঞতা নব নব সৃষ্টিতে অভিনব হয়ে উঠতে পারে নি।

দীনবন্ধুর প্রহসনের সংখ্যা তিনটি—'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী', 'জামাই

১. বঙ্কিম রচনাবলী। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/ পৃঃ ৮২৯

২. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস/১ম খণ্ড) / ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য/পৃঃ ২৫৯

বারিক'। দীনবন্ধুর প্রহসনের সংখ্যা তিনটি—'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক'। এগুলিতে হাস্যরস সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা প্রকাশ ঘটেছে রঙ্গরসের উতরোল প্রবাহের অন্তরালে বেদনার উৎস আবিষ্কারে। প্রসঙ্গত 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ চরিত্র স্মরণীয়। মানুষের বিকৃতি, তার পাপ ও বিবেকর স্বপ্নোচ্চার-যন্ত্রণা প্রেমবঞ্চিত চরিত্রের অস্তিত্বের অবতলে স্নিগ্ধ কামনা-বাসনার সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্র দীনবন্ধুকে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রহসনগুলিতে তাই লক্ষ্য করি, সেই সব চরিত্রের জীবনই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে; যারা নীচ সম্প্রদায়ের, যারা নেশাগ্রস্ত, যারা উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণে অভ্যস্ত—জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত; এই মানুষেরাই তাদের পরাজয়ের দীর্ঘশ্বাসসহ উঠে এসেছে দীনবন্ধুর নাটিকার পৃষ্ঠায় কৌতুকরসের পরিবেশন সূত্রে। ভদ্র ও ভব্য চরিত্রাঙ্কনে দীনবন্ধুর ক্ষমতার সীমা ছিল বলয়িত। কিন্তু ভদ্রেতর চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ তাই যথার্থই বলেছেন, যে, ভদ্রচরিত্রের সংলাপের আড়ষ্টতা নেই ভদ্রেতর চরিত্রের ক্ষেত্রে এবং 'সেখানে সংলাপ ব্যক্তিত্বের মুখশ্রী, প্রবাদ-প্রবচনে তা উচ্চকিত, হাস্যের ছটায় চমকিত ব্যঙ্গের আঘাতে বিপর্যস্ত, উপযুক্ত পরিবেশে ছড়ায়-গানে সে এক মত্ত কলরোল।'

পূর্বানুসৃতি ও স্বাতন্ত্র্য : দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধিকাংশ সমালোচক বলেছেন, তিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা বা চরিত্র ছাড়া নূতন সৃষ্টিতে সমর্থ ছিলেন না। সুতরাং তাঁর রচনায় অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্তেছে পূর্বসূরীদের অনুসরণ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—

"বাঙ্গালা সাহিত্যে চারি জন রহস্যপটু লেখকের নাম করা যাইতে পারে,—টেকচাঁদ, হুতোম, ঈশ্বর গুপ্ত এবং দীনবন্ধু। সহজেই বুঝা যায় যে ইহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রথমের শিষ্য এবং চতুর্থ তৃতীয়ের শিষ্য। টেকচাঁদের সহিত হুতোমের যতদূর সাদৃশ্য, ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ (wit) প্রধান; দীনবন্ধুর লেখায় হাস্যপ্রধান। কিন্তু ব্যঙ্গ এবং হাস্য উভয়বিধ রচনায় দুই জনেই পটু ছিলেন,—তুল্য পটু ছিলেন না। হাস্যরসে ঈশ্বর গুপ্ত দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন।"[১]

কিন্তু তবু গ্রন্থগুলির বিস্তৃত পরিচয় নেবার পূর্বে আমাদের একথা মনে রাখা দরকার যে দীনবন্ধু রচিত তিনটি প্রহসনই হয় বিষয়বস্তু, নয় কাহিনীবিন্যাস, নয়তো বা চরিত্রসৃষ্টিতে পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের পথেই এগিয়েছে। স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই আছে সে কথা পূর্বেই বলেছি। স্বাতন্ত্র্য wit-এর স্থলে Humour-এ। স্বাতন্ত্র্য। তির্যক আক্রমণের স্থলে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণে, স্বাতন্ত্র্য, রঙ্গরসের উতরোল প্রবাহের অন্তরালে চরিত্রগুলির বেদনার উৎস আবিষ্কারে।

বিয়ে পাগলা বুড়ো

ভূমিকা : উনিশ শতকের মধ্যভাগে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকে, নানান সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকে, কখনও সমর্থন ও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে অসংখ্য প্রহসন রচিত হয়েছে। হিন্দু সমাজের একটা বড়ো সমস্যা বিবাহসমস্যা। বহুবিবাহের ছাড়পত্র-পাওয়া কুলীনসমাজ অনায়াসে অন্তর্জলি যাত্রার পূর্বে কমপক্ষে একজন নব সতীকে সহমরণে

---

১. বঙ্কিম রচনাবলী/রায় দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী...../বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়/পৃঃ ৮২৪

নিয়ে যাবার কিংবা বিধবা করে যাবার জন্য কুলীনকে অধিকার দিয়ে রেখেছিল। সে সমস্যা আর এক রকম। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের জোর কমে যাবার সাথে সাথে বিত্তবান কিছু মানুষের কামপ্রবণতা কীভাবে বেড়ে ওঠে সমাজ তার সাক্ষী। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে বৃদ্ধের বিবাহপ্রসঙ্গ এক রসাল বিষয়। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে বিয়ে করতে গিয়ে বৃদ্ধের নির্যাতনের গল্প-কথা। মধুসূদন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে দেখিয়েছেন কাম-প্রবণ বৃদ্ধ ভণ্ড ভক্তপ্রসাদের কামাচারী মনোবৃত্তি ও তার পরিণিতি। ভক্তপ্রসাদের সাজার পরিমাণ সেখানে বড়ো বেশি হওয়ায় হাস্যরস প্রতিশোধজনিত হাল্‌কা বীররসের মিশ্রণে কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটিকায় বিবাহ বাতিকগ্রস্ত বিপত্নীক বৃদ্ধের দুর্দশা ও হেনস্তা দেখিয়েছেন অতি সাধাসিধাভাবে।

প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয় : ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' দীনবন্ধুর প্রথম প্রহসন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি 'লীলাবতী' মঞ্চস্থ হবার পর দুই অঙ্কে রচিত এই প্রহসনটি অভিনীত হয় বলে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ৬ মাঘ সংখ্যার 'মধ্যস্থ' পত্রিকা জানিয়েছে। 'সধবার একাদশী' অভিনয়ের সপ্তম রাত্রিতে চোরবাগানের লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে 'সধবার একাদশী'র পর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায়। গিরিশচন্দ্র 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সেই বেশেই (নিমচাঁদের বেশে) 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনের প্রস্তাবনা করেন নিম্নলিখিত ছড়াটি আবৃত্তি করে,—

"মাতলামীটে ফুরিয়ে গেল,
দেখুন বুড়োর রং।
বাসর ঘরে টোপর পরে
কিবা বিয়ের ঢং॥
আয় না নসে রতা কোথা যা পারিস তা বল।
ক্ষমা করিবেন দোষ রসিক মন্ডল॥
আসছে এবার ছোঁড়ার দল, ভুবনো নসে রতা।
সভ্যগণ নমস্কার, ফুরালো আমার কথা॥"

'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনটি অভিনীত হবার সংবাদ জানিয়েছে। প্রহসনটির প্রশংসার সাথে সাথে প্রশংসা করেছে রাজীবলোচনের ভূমিকাভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীরও।[১] 'মধ্যস্থ' পত্রিকাও রাজীবলোচনের ভূমিকাভিনেতার প্রশংসা করে লেখে,—

> "রাজীবের অভিনয় সন্তোষজনক ও হাস্যোদ্দীপক হইয়াছিল। গৃহে বসিয়া পাঠ অতিথির সহিত প্রসঙ্গাতঃ আপন বৃদ্ধদশার কথা অর্ধোক্তিতে বলিয়া আপনা আপনি অপ্রস্তুত হওয়া এবং ঘটকরাজের সহিত কথোপকথন ও তাৎকালিক অঙ্গাভঙ্গী ইত্যাদি দেখিয়া আমাদের এমত ভ্রম হইয়াছিল যে, আমরা প্রকৃত ঘটনাস্থলেই উপস্থিত আছি। সর্বাপেক্ষা সুশীল অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছে। এত অল্পবয়সে এরূপ সুন্দর অভিনয় করা অল্প ক্ষমতার কাজ নহে।"[২]

১. ইন্ডিয়ান মিরর/১৮৭৩, ২২ জানুয়ারি
২. মধ্যস্থ/১২৭৯ বঙ্গাব্দ ৬ মাঘ

সমকালীন সমস্যা : 'বিয়ে পাগলা বুড়ো প্রহসনকে ঠিক 'অসম বিবাহ' পর্যায়ে ফেলে আলোচনা করা যায় না। কারণ বুড়োর সঙ্গে অল্পবয়স্কা রমণীর বিয়ে কেউ ইচ্ছে করে দেয় না। মঙ্গলকাব্যের নারীগণের পতিনিন্দা অংশে বৃদ্ধের স্ত্রীর খেদোক্তির মূলে রয়েছে সামাজিক অনুশাসন। কন্যার পিতা দারিদ্র্য এবং সামাজিক রীতিনিয়মের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহ্ উপযুক্ত অকুলীন পাত্রের সাথে দিতে পারেন নি। বাধ্য হয়েছেন কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে কিশোরী কন্যার বিবাহ্ দিয়ে নিজ কুলরক্ষা করতে। স্বাভাবিক কারণেই সেখানে পিতামাতার ব্যবহারের বিরুদ্ধে, সামাজিক আচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জাগে।—একটা ছড়ায় আছে,—

কনের মাথায় টাকা।
এমন বরে বিয়ে দিয়েছে,
গোঁপ দাড়িটা পাকা।।
চোক খাক তার মা বাপ,
চোক খাক তার খুড়ো,
এমন বরে বিয়ে দিয়েছে
তামাক-খেকো বুড়ো।"[১]

শুধু আদি মধ্যযুগে কেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক কিংবা উনিশ শতকের মধ্য-ভাগেও কুলীনসমাজের নারীমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ থাকে নি। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বহুবিবাহ প্রথা ও কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে গোঁড়া হিন্দু-সমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু তবু কি এ সমস্যা মিটে গেছে! মিটলে রবীন্দ্রনাথ লিখতেন না 'নিষ্কৃতি'র মতো কবিতা, শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে রাজলক্ষ্মীর বিয়েটা ওভাবে দেখাতেন না। কিন্তু সে সব সমাজের অত্যাচারের কথা। কিন্তু 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে আছে লুব্ধতার কথা—অনাচারের কথা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বয়স্কের বিবাহ-সংক্রান্ত একটি কাহিনী পরিবেশন করেছে 'সমাচার দর্পণ'। কোনও কোনও অংশে 'বিয়ে পাগলা বুড়োর' সঙ্গে সে কাহিনীর সাদৃশ্য আছে বলে সংবাদটি পুরোপুরি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি,—

আশ্চর্য বিবাহ্

জেলা নদিয়ার মোতালক সাঁকোমথনপুর গ্রামে শ্রীরামরাম চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণ থাকেন তাঁহার দুই সহোদর জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম ৪৫ কনিষ্ঠের ৪০ বৎসর এতাবৎ কেবল কার্ত্তিক ব্রতে যাপন করেন কিন্তু বিব্রত প্রযুক্ত ওই ব্রত উদ্যাপন করিতে পারেন না তাহাতে সর্ব্বদা মনোদুঃখী ও সর্বত্র যাতায়াত করেন কোনও ক্রমে কোথাও বিবাহ্ সঙ্গতি হয় না তাহার নিজে বংশজ তাহাদের সংসারে ১২/১৪ বর্ষীয় দুইটি ভাগিনেয় মাত্র আছে। এবং অনির্বৃতি ব্যতিরিক্ত অন্য কন্যা না থাকাতে পরিবর্ত্তও সম্ভবে না। পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোনও মহা প্রতারকের মন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া মোকাম শ্যামনগরের এক ব্রাহ্মণের সহিত পরিবর্ত্ত

১. বাংলার লোকসাহিত্য (২য় খণ্ড)/আশুতোষ ভট্টাচার্য/পৃঃ ৪৪৬

সম্বন্ধ স্থির করিয়া সেখানে প্রকৃত কন্যা দেখিয়া তুষ্ট হইলেন কিন্তু যখন শ্যামনগরের বরকর্ত্তা এখানকার কন্যা দেখিতে আইলেন তখন রামরাম চক্রবর্ত্তী প্রতিবাসীর এক বিবাহিতা কন্যা দেখাইলেন। অনন্তর লগ্ন স্থির হইল এবং ওই লগ্নানুসারে উভয়পক্ষ পরস্পর কন্যাকর্ত্তার বাটীতে বিবাহার্থে উপস্থিত হইয়া রামরাম চক্রবর্তী যথার্থরূপে বিবাহ করিলেন। কিন্তু চক্রবর্তীর বাটীতে তাহার এক ভাগিনেয়কে কল্পিত কন্যাবেশ করিয়া রাখিয়াছিল শ্যামনগরের বর আসিয়া কন্যাকর্ত্তার বাটীর ছালনাতলায় উপস্থিত হইলে এ কন্যাকে সভাতে আনিল। বরযাত্রেরা ওই পুরুষকন্যা দেখিয়া পরস্পর কানাকানি করিতে লাগিল যে ভাই বিবাহ করিবে তো এমনি বিবাহ করিবেক দিব্য কন্যা উপযুক্ত বটে যা হউক অমুকের ভাগ্য ভালো। বরও কোনক্রমে ওই কন্যা দর্শন করিয়া কত মনোরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু সংপ্রদানের পরে বাসর ঘরে সহবাসে সে সকল বিপরীত হইল। আর কি করিবেক, অতি প্রত্যুষে তাবৎ বরযাত্র শ্যামনগরে গিয়া ওই চক্রবর্ত্তীকে নানা প্রকার প্রহার করিয়া কেবল প্রাণাবশেষ করিল এবং যে কন্যা তাহাকে বিবাহ দিয়াছিল তাহাকে পাঠাইয়া দিল না।"[১]

কাহিনী সংক্ষেপ : এবার সংক্ষেপে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনের কাহিনী বিবৃত করা যেতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক হয়েছেন বিত্তবান গ্রামীণ মানুষ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। দুই কন্যা তাঁর—রামমণি আর গৌরমণি। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে ভরা যৌবনে বিধবা হয়ে সামাজিক প্রথারক্ষার্থে ধর্মীয় বিধিনিষেধে কৃচ্ছ্রসাধনায় দিনাতিপাত করছে তারা। কোনও শুভানুধ্যায়ী রামমণির পুনর্বিবাহের কথা বললে রাজীবের মাথার ঠিক থাকে না। স্কুল ইন্সপেক্টর সাহেবের উপর তিনি খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন এই কারণেই। রতার মুখ থেকে আমরা জানতে পারি ইন্সপেক্টর সাহেব বলেছিলেন,

"আপনার ষাট বৎসর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে অধীর হয়ে পুনর্বার দারপরিগ্রহের জন্য উন্মত্ত হয়েছেন, অতএব আপনার পনেরো বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা পুনর্দ্ধার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কি না বিবেচনা করে দেখুন।" (১।১)

ষাট বৎসর বয়সেও রাজীবের বিয়ে করার ইচ্ছে ষোলো আনা। এজন্য তিনি নিজের বয়স কম করে বলেন। গোপালের মুখে রাজীবের কথা শুনতে পাই,—

"বুড়ো বল্‌তে লাগ্‌লো, দেখ দেখি আমার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্চে, বেটী (পেঁচোর মা) এখন কিনা বলে আমি ওর অপেক্ষা বড়ো, আমি যখন পাঠশালে লিখি তখন বেটীকে ওইরূপ দেখিচি।" (১।১) পেঁচোর মা রাম্‌জি ডোমের বিধবা পত্নী। শুয়োর চরিয়ে দিন কাটায় সে। রাজীবের প্রকৃত বয়স সবাইকে সে জানিয়ে দেয় বলে রাজীব তার উপর এত ক্ষুব্ধ। পেঁচোর মার একটি গোপন ইচ্ছে রাজীবকে বিয়ে করে সে ব্রাহ্মণী হয়। পাড়ার অকালপক্ক বালকবৃন্দ রাজীবকে খ্যাপাবার জন্য ছড়া বলে,—

"বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর।।" (১।১)

রাজীব বিয়ে করার জন্য অস্থির হয়েছেন। তখন কৃপণ রাজীবলোচন অতিথিকে দূর করে দেন খরচের ভয়ে। অথচ তার পরেই ঘটক আসে। ঘটকবর কনক রায়কে চারখানা

১. সমাচার দর্পণ/১৮২২, ২৪ আগষ্ট; ১২২৯ বঙ্গাব্দ ৯ ভাদ্র

জমি ছেড়ে দিয়ে পাত্রীর সন্ধান করার কথা বলেছেন। ঘটকের বাকচাতুর্যে মোহিত হয়ে রাজীব নিজেকে রসিক বালক প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। যেন ঘটক নয়, কন্যার অভিভাবককে তুষ্ট করার দায় বর্তেছে তাঁর উপর। আদিরসের কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন তিনি,—যেটি আবার নাকি তাঁর নিজের রচনা,—

"পীরিতি তুল্য কাঁটাল কোষ।
বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ।।
পঙ্কজ মূল ভাল কি লাগে।
কন্টক নাগ না যদি রাগে।।
চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত।
মৌমাছি খোঁচা না যদি রৈত।।
আইল বিষ পীযুষ সঙ্গে।
অঙ্কিত মৃগ মোমের অঙ্গে।।" (১।২)

ভুবন, নসি, রতা নাপতে প্রভৃতি পাড়ার যুবকেরা যে তাঁকে জব্দ করার জন্য যে ঘটককে পাঠিয়েছে, তা রাজীব ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। রাজীব ফ্যাসাদে পড়ে যান ঘটকের সামনে মেয়ে রামমণির অকস্মাৎ পিতৃসম্বোধনে। ঘটকরাজ জানিয়ে দেয়, রামমণি যদি রাজীবের কন্যা হয়, তা হলে এ বিবাহ অসম্ভব। বিবাহ-লুব্ধ রাজীব তখন নিজ প্রয়াত পত্নীর সতীত্বের প্রতি কটাক্ষ করতেও ছাড়েন না।—'কোলে করে ফিরেছেন, কি হাত ধরে ফিরেছেন, তা কি আমার মনে আছে।' (১।২) রামমণি এবং তার মার সম্পর্কে এরকম কদর্য উক্তি করার পরই হঠাৎ রাজীবের মুখ ফস্কে বেরিয়ে আসে—'সে কি আজ্‌কের কথা তা আমি তোমায় ঠিক্ করে বল্‌বো, আমার বিবাহের দিন পলাসির যুদ্ধ হয়—....(১।২) অতঃপর ঘটককে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বিবাহ স্থির করতে অনুরোধ করেন। ঘটক বলে রামমণি যদি রাজীবের নূতন স্ত্রীকে মা বলতে রাজী থাকে তবে এ বিয়ে সম্ভব। কিন্তু রামমণি বেঁকে বসে। তবু ঘটকের পায়ে ধরে রাজীব বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করার ব্যবস্থা করেন। ঘটক অতঃপর রাজীবের কামনাকে খুঁচিয়ে দিয়েছে তাঁর ভাবী পত্নীর রূপ-লাবণ্য বর্ণনা করে। ঘটককে খুশী করার জন্য রসিকের মতো রাজীবলোচনও আদিরসের ছড়া বলেছেন,—

"কুচ হতে কত উচ্চ মেরুচুড়া ধরে,
কাঁদেরে কলঙ্কি চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে"—(১।২)

ঘটক চলে যাবার পর রতা নাপ্‌তের পরামর্শ মত ছেলেরা সোলার সাপের মুখে বাবলা কাঁটা এঁটে দেয়। অতঃপর জানলার বাইরে থেকে লুকিয়ে তার কাঁটা গায়ে ফুটিয়ে সেই সাপ তাঁর গায়ে ফেলে দেয়। ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে সাপটি সরিয়েও নেয়। মৃত্যু ভয়ে ভীত রাজীবের চিকিৎসা করতে আসে রতা নাপ্‌তে। সে বলে,—

"রেতে কাটে জাত সাপ
রাখতে নারে ওঝার বাপ।।" (১।২)

তবু সে শেষ চেষ্টা করার নামে মনের সুখে রাজীবকে চপেটাঘাত আর ঝাঁটার ঘা

মারে। শুধু সে নয়, ভুবনও চড় মারে। রতা নাপিত মন্ত্র পড়তে থাকে। রাজীবকে জব্দ করার জন্য সে কৌশলে পেঁচোর মার নামও বার বার মুখে নেয়,—

"ঝাঁটার চোটে, আগুন উঠে
কেউটের ভাঙ্গে ঘাড়।
হাড়ি ঝি, পেঁচোর মার আজ্ঞা,
শিগ্‌গির ছাড়।।" (১।২)

রতা নাপ্‌তে রাজীবকে যে আরক পান করায় তাতে আছে—"এতে ভাঁট পাতার রস আছে, শিউলিপাতার রস আছে, বুড়ো গোরুর চোনা আছে, ভ্যাণ্ডার তেল আছে, প্যাঁজ রসুনের রস আছে, কুইনাইন আছে, লবণ আছে; এর নাম 'নরামৃত'।

নরামৃত কল্যে পান।
সশরীরে স্বর্গে যান।।

নরামৃতের সহস্র গুণ—

"বাসি পেটে বাঁজা বউ নরামৃত খায়।
সাত ছেলে, পায় কোলে, পতি পড়ে পায়।।" (১।২)

রামমণি ও গৌরমণি দু'জনেই বিধবা। তাদের বাসনা,—

"যিনি সমরণের পদ্যি উঠিয়ে দিলেন, তিনি যদি বিধবা বিয়ে চালিয়ে যেতেন তাহলে বিধবাদের এত যন্ত্রণা হত না।" (১।৩)

কিন্তু রাজীব বিধবার উপপতি বরদাস্ত করতে পারেন, পুনর্বিবাহ মেনে নেবেন না। সংস্কৃত কলেজে পড়ে গৌরমণির মাসতুতো ভাই সুশীল—সে পেঁচোর মাকে জিজ্ঞাসা করেছে রাজীবকে সে বিয়ে করতে চায় কিনা! আহ্লাদে গদগদ হয়ে পেঁচোর মা জানিয়েছে,—

"স্বপোন যদি ফলে।
ঝোল্‌বো তানার গলে।।
হাতে দেব বূলি।
মোম দেব চুলি।।
ভাত খাব থালা থালা।
তেল মাক্‌বো জালা জালা।।
নকের মুকি দিয়ে ছাই।
আতি দিনি শুয়োর খাই।।" (১।৩)

শনিবার দিন যথা নির্দিষ্ট স্থানে—বাগানের আটচালায় বর বেশে রাজীবের প্রবেশ। ভুবন, নসিরাম, কেশব নানা জন নানা ছদ্মবেশ ধরেছে। কেউ হয়েছে কনের কাকা, কেউ মেসো, কেউ বা দাদা। রতা নাপ্‌তেকে কনে সাজিয়ে বিবাহের উদ্যোগ শুরু হল। রাজীবকে নানাভাবে পর্যুদস্ত করা হয়েছে। কাকার কথার উত্তর দিতে গিয়ে রাজীব জানিয়েছেন যে বাঁশি বাজিয়ে অল্পবয়সেই তাঁর দাঁত পড়ে গেছে, নইলে তাঁর বয়স এমন কি! রাজীবকে বিবাহের জন্য নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও বড়ো অভিনব—নাপিত মুখের দিক ধরে—ঘটক পায়ের দিক ধরে—চ্যাদোলা করে তাকে বিবাহ সভায় নিয়ে যাওয়া হল। অতঃপর নারীর বেশে সজ্জিতা ভুবন আর কেশব রাজীবকে অস্থির করে তোলে—কান মনে, নাক মলে,

রাজীব এবং কনে-বেশী রতার রসালাপ শুরু হয় কবিতায়। পরিশেষে কামোন্মত্ত রাজীব রতার পায়ে ধরেছেন। কিন্তু কৌশলে রতা পালিয়ে গেছে। এরপর ছেলেরা পেঁচোর মাকে কনে সাজিয়ে ঘোমটা দিয়ে রাজীবের সঙ্গে তার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। রাজীব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন—'...আমার স্বর্ণলতা বাড়ী এসে পেঁচোর মা হল—' (২।৩)। পেঁচোর মা রাজীবের কোলে শুয়োর ছানা দিতে গেল। কারণ "তানারা (ছেলেরা) বলে দিয়েলো, শোরের ছাড়া কোলে দিলি তোরে খুব ভালোবাস্‌বে, ভাতার বশ করা কত ওষুধ জানি, শোরের ছাড়া গায় দেওয়া নতুন শেকলাম।" (২।৩) রতা নাপিত অতঃপর সমস্যার সমাধান করে দেয়। সে গত রাত্রে রাজীবের বাক্সের চাবি হাতিয়েছিল, তা রামমণিকে দিয়ে দেয়—আর দেয় পঞ্চাশ টাকা। পেঁচোর মাকেও ভুলিয়ে-ভালিয়ে তারা তার কুঁড়েতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

কাহিনী উৎস : তুলনা : 'সমাচার দর্পণে'র কাহিনীর সঙ্গে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনের মিল রয়েছে এক জায়গায়—সেটি, ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে বুড়োর সঙ্গে বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করায়। রাজীবলোচনের বিবাহবাতিক ও বিবাহবাসরে সঙ্গোমেচ্ছাও পূর্ববর্ণিত ঘটনার সঙ্গে মিলে যায়।[১] তবে 'বিয়ে পাগলা বুড়'র কাহিনীর সঙ্গে উপলিখিত কাহিনীর মিলের চেয়ে গরমিল বেশি। মধুসূদনের 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁর ভক্তপ্রসাদের আচরণের সঙ্গেও রাজীবের আচরণের কিছু মিল রয়েছে।

ছদ্মবেশ ধারণ রীতি : 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনে চরিত্রগুলির ছদ্মবেশ ধারণ একদিকে বাংলার লৌকিক রীতি অনুযায়ী, অন্যদিকে সেক্সপীয়রীর প্রভাবরূপে—গণ্য করা যায়। লক্ষণীয়, সেক্সপীয়রের নাটকে কোথা কোথাও প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্র বা অভিসন্ধির কথা পূর্বেই দর্শকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীনবন্ধু 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনে সেই রীতিটি গ্রহণ করছেন। ফলে দর্শকবৃন্দ পূর্বাহ্নেই ছদ্মবেশ ধারণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকায় কৌতুকের মাত্রা একটু বেশি হয়েছে। ড. চিত্তরঞ্জন লাহাও বলেছেন,—

> "বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনের প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে রাজীব মুখোপাধ্যায়কে জব্দ করার জন্য রতা·তার পরিকল্পনা এবং প্রতিজ্ঞার কথা দর্শকদের জানিয়ে দিয়েছে এবং ফলে পরবর্তী গর্ভাঙ্কগুলিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রাজীব, রামমণি ও গৌরমণির আশা-আনন্দ এবং উদ্বেগ-অনুশোচনা দর্শকের প্রচুর আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে।"[২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় ছদ্মবেশ ধারণ রীতিটি বাংলা নাটকের সূচনা পর্বেই যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মধুসূদন দত্ত তাঁর নাটকে অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান-কল্পে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়েছেন তাঁর চরিত্রকে বা চরিত্রগুলিকে।[৩] দীনবন্ধুর নাটকেও এই রীতিটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে।[৪] অন্য প্রহসনে এই রীতি অবলম্বনের কথা পরে বলব—

১. বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন,—'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।"/দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী.......সমালোচনা/বঙ্কিম রচনাবলী/সংসদ/পৃঃ ৮২৭

২. বাংলা নাটকের টেকনিক/ড. চিত্তরঞ্জন লাহা/পৃঃ ১০৪ ঙ—চ

৩. 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক দ্রষ্টব্য

৪. 'নবীন তপস্বিনী', লীলাবতী', কমলে কামিনী' নাটকে।

আপাতত 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনের অনুসৃত ছদ্মবেশ রীতির কথাই ধরা যাক। এখানে দেখা যায় বৃদ্ধ রাজীব মুখোপাধ্যায়কে জব্দ করার উদ্দেশ্যে বিয়ের সময় রতা নাপ্‌তে কনে সেজে রাজীবকে উত্তেজিত করেছে, পরে রামজী ডোমের বিধবা পত্নী পেঁচোর মাকে কনে সাজিয়ে ঘরে পাঠানো হয়েছে; কেশব হয়েছে বড়ো ঠাকুরঝি, ভুবন হয়েছে 'শ্যালিকা' বা 'কনের বিয়ান', নসিরাম শালাজ, আরও চারজন লোককে সাজানো হয়েছে কনের সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজন। রতা জানিয়েছে,—

"রতা। বর আস্‌বের সময় হয়েছে আমরা সাজি গে।

ভুবন। এঁদের বাড়ী কোথায়?

রতা। সে কথা কাল বলবো—ইনি হবেন কনের কাকা, ইনি হবেন কনের মেসো, ইনি হবেন কনের দাদা, ইনি হবে পুরোহিত।" (২।১)

উদ্দেশ্য : দীনবন্ধুর প্রথম প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে নাট্যকারের কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য পরিস্ফুট নয়। নাট্যকারও স্বয়ং সে কথা জানিয়েছেন। বন্ধু সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করতে গিয়ে গ্রন্থের ভূমিকা অংশে দীনবন্ধু লিখেছেন,

"যাহাকে ভালোবাসা যায় তৎসম্বন্ধীয় কোনও বস্তু নিকটে থাকিলে কিয়দংশে মনের তৃপ্ততা জন্মে—এই প্রত্যয়ে নির্ভর করিয়া নির্দোষ—আমোদপ্রদ মৎপ্রণীত এতৎ প্রহসনটি তোমার হস্তে ন্যস্ত করিলাম।"

নাট্যকারের বিবৃতিতেই একথা স্পষ্ট যে, কোন বিশে, উদ্দেশ্যে এটি রচিত নয়—এই প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য দর্শকদের নির্দোষ আমোদপ্রদান। সমাজসংস্কারের কিংবা ধর্মীয় প্রথার বিরুদ্ধে জনমানসকে উদ্বুদ্ধ করার কোন অভিসন্ধি নাট্যকারের ছিল না। প্রহসনের শেষ অংশে পূর্বোক্ত মন্তব্যের প্রমাণ মিলবে। বৃদ্ধ বয়সে বিবাহবাতিকগ্রস্ত মানুষ রাজীবলোচনের আচার-আচরণ এবং এই আচরণের জন্য তাঁর সরল শাস্তি-বিধানে প্রহসনের পরিসমাপ্তি।

হাস্যরস : দুটি অঙ্কের প্রতিটিতে তিনটি করে গর্ভাঙ্ক রয়েছে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনে। নাটিকাটির মূল রস, বলাবাহুল্য, হাস্যরস। আগাগোড়া হাস্যরসের উতরোল তরঙ্গ ভঙ্গ। হাস্যরসসৃষ্টির মূল ভিত্তি চরিত্রের আচরণজনিত অসঙ্গতি। দীনবন্ধুর চোখে সেই হাস্যকরতা সদা-প্রত্যক্ষ। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন,—

"রাজীবলোচনের নিদারুণ আশাভঙ্গে, পেঁচোর মার অকপট কৌতুকাভিনয়ে নাকটিতে শেষ পর্যন্ত একটি হাস্যকরুণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে।"[১]

ড. সুশীলকুমার দে বলেছেন,—

'নিছক প্রহসন হইতে বেদনার অশ্রুদীপ্ত হাসি পর্যন্ত হাস্যরসের নিরবচ্ছিন্ন স্ফূর্তি কথাবার্তায় ভঙ্গী ভাবে চরিত্রচিত্রে ঘটনা সংস্থানে সর্বত্র যে বিচিত্র ও উচ্ছ্বসিত রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে কোথাও নাট্যকারের ক্রোধ বা ঘৃণা নাই, আছে শুধু স্নিগ্ধ রসকল্পনার সহজ উদার প্রীতি। চড়চাপড় কানমলা আছে সত্য, কিন্তু তাহার সবটাই আনন্দ। তথাপি

১. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১ম)/ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য/পৃঃ ৩৮১

এই অনাবিল আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসিকের চক্ষু যেন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কেবল করুণরসকে হাস্যরস সমুজ্জ্বল করে নাই হাস্যরসও করুণরসে স্নিগ্ধ হইয়াছে।"[১]

'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনটির হাস্যরস প্রসঙ্গে এটাই শেষ কথা যে এ কখনও Satire-এর পর্যায়ে উঠে নি—Humour-এ শুরু Humour-এই শেষ।

সংলাপ : হাস্যরস সৃষ্টির মূল উপাদান যেমন চরিত্রের আচরণে অসঙ্গতি—অন্যদিকে তার সংলাপও এই রসসৃষ্টির বিশেষ সহায়ক। এই প্রহসনে গদ্যসংলাপের সঙ্গে পদ্য বা ছড়া জাতীয় সংলাপের—যা প্রাচীন যাত্রার সংলাপের অনুগামী—মিশ্রণ ঘটিয়ে দীনবন্ধু হাস্যরসের উতরোল তরঙ্গভঙ্গ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি ষাট বৎসরের বৃদ্ধ রাজীবলোচন নিজেকে কলেজে পড়ুয়া যুবক প্রমাণের জন্য কীভাবে আদিরসাত্মক ছড়া আওড়েছেন, ছদ্মবেশী রতার (কনের) সঙ্গে আদিরসাত্মক পদ্যবন্ধে প্রেম করেছেন—এখানে পুনরায় উদ্ধৃতি দেওয়া—তাই নিষ্প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে একথা বলা যেতে পারে, এ প্রহসনে কোথাও কোথাও শব্দ ও বাক্যপ্রয়োগে রুচির মুখরক্ষার দিকে দীনবন্ধু লক্ষ্য করার সময় পান নি। সেক্ষেত্রে ভাষায় কিছুটা গ্রাম্যতার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে। বিদগ্ধ সমালোচক যথার্থ বলেছেন,—

"খাঁটি বাঙালি অর্থে এই বুঝায়, বিদেশি প্রভাব সত্ত্বেও তাঁহার মানস-প্রকৃতি ছিল বাঙালির নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতি দিয়া গঠিত; প্রকাশভঙ্গী ছিল বাঙালির নিজস্ব পদ্ধতি; ভাষাটিও ছিল বাঙালির দৈনন্দিন সহজ ভাষা, যাহা কেবল অভিজাত সমাজে নয়, মাঠে ঘাটে হাটে বাজারে অন্তঃপুরেও বোধগম্য।"[২]

দীনবন্ধু প্রকৃত অর্থে মনে প্রাণে খাঁটি বাঙালি ছিলেন।

চরিত্রচিত্রণ : ড. ভবানীগোপাল সান্যাল 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনের কাহিনীতে বেন জনসনের লেখা 'এপিসিনি' বা 'দি সাইলেণ্ট উওম্যান' প্রহসনের প্রভাব আবিষ্কার করেছেন। সেই নাটকে বৃদ্ধ তার ভাগিনেয়কে বঞ্চিত করবার জন্য সংযতবাক যে তরুণীকে বিয়ে করে, পরিণামে দেখা গেল, সে অত্যন্ত মুখরা ও কলহপ্রিয়া। বৃদ্ধের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ভাগিনেয়কে অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে ছদ্মবেশী স্ত্রীর হাত থেকে মুক্তি পায়।[৩] কিন্তু এ সাদৃশ্য কল্পনা নেহাৎ কষ্টকল্পিত। কারণ ছদ্মবেশ ধারণ ছাড়া আর কোথাও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র কাহিনীর সঙ্গে এর মিল নেই। বরং 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র চরিত্রসৃষ্টিতে দীনবন্ধু রচিত 'নবীন তপস্বিনী'র জলধর চরিত্রস্রষ্টার সরল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু বাল্যবিধবার স্বাভাবিক রূপ রামমণি ও গৌরমণির চরিত্রে প্রতিফলিত। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে তাদের কথোপকথনে হিন্দু বিধবার দুঃখ, বিধবাবিবাহের প্রতি তাদের সমর্থনও সরসভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। যৌবন-হারা শিথিলেন্দ্রিয় বৃদ্ধ যযাতির মতো রাজীবলোচনের যৌবনকামনার পরিস্ফুটনেও নাট্যকার সমর্থ হয়েছেন। দৃষ্টি এখানে বিদ্রূপাত্মক নয়, অনুকম্পার। তাই বৃদ্ধ রাজীবের আচরণে কিছু বাড়াবাড়ি দেখানো হলেও তাঁর শাস্তির মাত্রাকে কখনও অমানবিক স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাঁর শাস্তি বিধান করেছে

১. দীনবন্ধু মিত্র/ড. সুশীল কুমার দে/পৃঃ ৬২
২. ঐ/পৃঃ ৩৪—৩৫
৩. দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য সমীক্ষা/ড. ভবানীগোপাল সান্যাল/পৃঃ ১০০

যে রতা নাপ্‌তে, তার চরিত্রসৃষ্টিতেও নাট্যকার বাস্তববুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন। কখনই তা মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় নি। তবে কোন কোনও ক্ষেত্রে চরিত্রগুলির আচরণ গ্রামীণ সঙ্‌যাত্রার চরিত্রের তুল্য হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে চরিত্রগুলি তাদের বয়সের তুলনায় কিছু বেশি ভাঁড়ামি করেছে—ফলে কোনও কোনও জায়গায় শ্লীলতার মাত্রাও লঙ্ঘিত হয়েছে। লোকপ্রচলিত কাহিনীকে প্রহসনে গ্রহণ করার কারণেই সম্ভবত প্রহসনের এই অংশগুলিতে সামান্য বিচ্যুতি লক্ষিত হয়েছে। না হলে পাড়ার ছেলেদের চরিত্র অঙ্কনে, পেঁচোর মা, সুশীল, ঘটক প্রভৃতির চরিত্রাঙ্কনে তামাসাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীই প্রযুক্ত হয়েছে।

সধবার একাদশী

ভূমিকা : সমাজ-মনস্ক যুগসচেতন বাঙালি নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম বাংলা নাটকের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁর অবিস্মরণীয় দুটি গ্রন্থের জন্য—একটি নীলকর সাহেবদের অমানবিক কার্যকলাপের জ্বলন্ত প্রতিভাস—'নীলদর্পণ'; অন্যটি হাস্যরসের আধারে বিধৃত সমকালীন শিক্ষিত যুবমানসের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নব-চারণগীত—'সধবার একাদশী'। একটি সিরিযাস ঢঙে বর্ণিত শোষকশ্রেণীর শোষণে বিষাদময় পরিণতিসহ করুণ কাহিনীর লিরিক, অন্যটি বাহ্যিক হাস্যরসের অন্তরালে শিক্ষিত পথভ্রান্ত যুবকদের বিবেক-বেদনার অন্তস্পর্শী সিম্ফনী। উদ্দেশ্যের নির্দিষ্ট সীমায় মহাকাশের বৈচিত্র্য দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু মহৎ হৃদয়ের গগনব্যাপী বিস্তৃতি দেখানো অসম্ভব নয়, অন্তত সার্থক প্রতিভাধরের পক্ষে। দীনবন্ধু তাঁর প্রতিভার মহান উৎকর্ষ দেখিয়েছেন এই দুটি গ্রন্থে। তাই উদ্দেশ্যের সীমালগ্ন হয়েও এই দুটি নাটক অনায়াসে উদ্দেশ্যসর্বস্বতাকে অতিক্রম করে গেছে। বস্তুতপক্ষে দীনবন্ধু যদি আর কিছু না লিখে এই দুটি নাটকই শুধু রচনা করতেন, তাহলেও বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয় : 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র পর[১] ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুর দ্বিতীয় প্রহসন 'সধবার একাদশী' প্রকাশিত হয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে দুর্গা সপ্তমীর রাত্রিতে বাগবাজারের মুখুজ্জে পাড়ায় ৺প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে 'সধবার একাদশী'র প্রথম অভিনয় হয়।[২] দ্বিতীয় অভিনয় হয় এক সপ্তাহ পরে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন শ্যামপুকুরে ৺নবীনচন্দ্র দেবের বাড়িতে (গিরিশচন্দ্রের শ্বশুরালয়)। তৃতীয় অভিনয় হয় গড়পাড়ে জগন্নাথ দত্তের গৃহে এবং চতুর্থ অভিনয় হয় দেওয়ান রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের শ্যামবাজারের বাড়িতে।[৩] প্রথম রাত্রিতে 'সধবার একাদশী' নাটকে অভিনয় করেছিলেন নিম্নোক্ত শিল্পীবৃন্দ,—

নিমচাঁদ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
অটল—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কেনারাম—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী

১. বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"'সধবার একাদশী' 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা তৎপূর্বে লিখিত হইয়াছিল।"
২. The Story of the Calcutta Theatres (1753–1980) . S. K. Mukherjee /p. 28
৩. দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য সমীক্ষা/ড. ভবানীগোপাল সান্যাল/পৃঃ ১১৯

রামমাণিক্য—রাধামাধব কর
জীবনচন্দ্র—ঈশানচন্দ্র নিয়োগী
নকুল—মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কুমুদিনী—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু)
সৌদামিনী—মহেন্দ্রনাথ দাস
কাঞ্চন—নন্দলাল ঘোষ
নটী—নগেন্দ্রনাথ পাল

গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ অভিনয় দক্ষতার পরিচয় এই প্রহসনেই প্রথম পরিস্ফুট হয় নিমচাঁদের চরিত্রাভিনয়ে। ৪র্থ রাত্রিতে শ্যামবাজারে 'সধবার একাদশী' অভিনয় দেখে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিতে গিয়ে সারদাচরণ মিত্র লেখেন,—

"বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলার নব্য ধরনের নাট্যকর সৃষ্টিকর্তা; সেদিন কবিবর গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নিমচাঁদ। 'সধবার একাদশী' পূর্বে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, বিশেষত নিমচাঁদের অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। বয়োবৃদ্ধিবশত ক্রমশ অনেক জিনিস ভুলিয়াছি। আরও কতগুলি ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃত অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নামমাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধ হয় কখনও ভুলিব না।"[১]

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীপঞ্চমীর রাত্রিতে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়িতে 'সধবার একাদশী'র চতুর্থ অভিনয় দেখতে এসেছিলেন স্বয়ং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। সেদিন নিমচাঁদ সেজেছিলেন গিরিশচন্দ্র আর জীবনচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর মস্তাফী। দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্রের ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন—

"দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্রকে বলেন 'তুমি না থাকলে এ নাটক অভিনয় হত না। নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যই লেখা।' আর অর্দ্ধেন্দুশেখরকে বলেন, 'আপনি অটলকে যে লাথি মেরে চলে গেলেন, ও improvement on the author আমি এবার সধবার একাদশীর নতুন সংস্করণে অটলকে লাথি মেরে গমন লিখে দেবো।"[২]

অমৃতলাল বসু গিরিশচন্দ্র ঘোষের অসামান্য অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে লেখেন,—

"মদে মত্ত পদতলে
নিমে দত্ত রঙ্গাস্থলে।
প্রথম দেখিল বঙ্গ
নব নট গুরু তার।"

গিরিশচন্দ্র স্বয়ং দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র গুরুত্ব ভুলতে পারেননি কখনও। তিনি ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা এবং তার অগ্রগতির ইতিহাসে দীনবন্ধু মিত্রের কৃতিত্ব স্মরণ করে বলেছেন,—

"মহাশয়ের নাটক (সধবার একাদশী) যদি না থাকিত এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাশন্যাল থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহস করিত না।"

১. বঙ্গদর্শন/১৩২১, অগ্রহায়ণ/প্রবন্ধ দীনবন্ধু মিত্র/সারদাচরণ মিত্র।
২. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান/শঙ্কর ভট্টাচার্য/পৃঃ ১৪

প্রশংসা ও নিন্দা : 'সধবার একাদশী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দের কাছ থেকে দীনবন্ধু একদিকে যেমন প্রভূত প্রশংসা পেয়েছেন—অন্যদিকে নিন্দাও কম কুড়োন নি। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু বহুভাষাবিদ লোকেন পালিত 'সধবার একাদশী' প্রহসনের ভূয়সী প্রশংসা করে অকুণ্ঠ চিত্তে বলেছেন,—

> "আটটি ভাষায় নাটক শ্রেণীর বহুতর গ্রন্থ আমি পাঠ করিয়াছি। কিন্তু 'সধবার একাদশী'র তুলনা কোথাও দেখিতে পাই নাই।....."

'সধবার একাদশী' প্রহসনটির প্রশংসা করে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখেছিল,— 'সধবার একাদশী'র অভিনয়টি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।'[১] বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর রচনার সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন যে দীনবন্ধু সহানুভূতির সঙ্গে কোনও বন্দোবস্ত করতে নারাজ ছিলেন বলেই তাঁর প্রহসনের কিংবা নাটকের পাত্রপাত্রী রুচির মুখরক্ষা করে কথা বলে নি।[২] সুশীলকুমার দে 'দীনবন্ধু মিত্র' গ্রন্থে 'সধবার একাদশী' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, দীনবন্ধু এই নাটকের মধ্যে কুরুচির জন্য কুরুচি চিত্রিত করেন নি, তবে একথাও সত্য যে প্রহসনকার এখানে নীতি শিক্ষকের ভূমিকাও গ্রহণ করেন নি। পরিশেষে এই নাটিকার উৎকর্ষ স্বীকার করে নিয়ে তিনি যে কথা বলেছেন তা অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি। সুশীলকুমার দে লিখেছেন,—

"নাটকটির মধ্যে নব্যবঙ্গের চিত্রকরের আন্তরিক বেদনাও মর্ম স্পর্শ করিয়াছে। 'সধবার একাদশী' নামটিও সেই বেদনা ও আক্ষেপের নিদর্শন।"

কিন্তু একতরফা সুনাম দীনবন্ধুর ভাগ্যে জুটেনি—নিন্দা বা ধিক্কারও জুটেছে প্রভূত পরিমাণে। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ রূঢ়ভাবে এই প্রহসনের সমালোচনা করেছেন। তিনি সরাসরি আঘাত করেছেন এর কাহিনীচয়ন প্রচেষ্টাকে। এই নাটিকার সরস রসিকতাকে তিনি 'গ্রাম্যরসিকতা'-রূপে বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, সম্পাদকের ক্রোধ এমন ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, দীনবন্ধু মিত্রকে তিনি 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকীয় কলমে আক্রমণ করেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে। দ্বারকানাথ লিখেছিলেন,—

> "দীনবন্ধু ছেবলা লেখক; ছেবলাদিগকে সন্তুষ্ট করা তাহার অভিপ্রেত; সুতরাং এই সকল গ্রাম্য-রসিকতার তাহার লেখার মধ্যে বিস্তর পাওয়া যায়।"[৩]

অন্ধ-কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে রক্ষণশীলদের মত সংকীর্ণ দৃষ্টিতে 'সধবার একাদশী'র বিচার করতে গিয়ে এর প্রতি অবিচার করেছেন তৎকালীন আর এক দিকপাল সমালোচক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। তাঁর মতে,—

> "If this trash be ever put on the stage, we cannot recommend a better place for its performance than sonagachi and fitter audience than its immates and their patrons."[৪]

১. অমৃতবাজার পত্রিকা/১৮৭৩ ২ জানুয়ারি
২. দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী.....সমালোচনা/বঙ্কিম রচনাবলী/সাহিত্য সংসদ/পৃঃ ৮৩৩
৩. সোমপ্রকাশ/দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ
৪. সধবার একাদশী প্রসঙ্গে ড. প্রদ্যোত সেনগুপ্তের মত

ড. প্রভুচরণ গুহঠাকুরতাও 'সধবার একাদশী' সম্পর্কে কঠোর মতামত পোষণ করেছেন—তিনি লিখেছেন যে 'too many tipsy scenes and too much talk about wine and drunkenness' প্রহসনটিকে বিনষ্ট করেছে।[১] রামগতি ন্যায়রত্ন ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক। 'সধবার একাদশী' প্রহসনটি দেখে তিনি রূঢ়ভাবে মন্তব্য করেন,—

> "'সধবার একাদশী' খানি মদের কথাতেই আরব্ধ এবং মাতালের কথাতেই পর্যবসতি। ইহাতে হাস্যোদ্দীপক অনেক বিষয় বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু আদ্যোপান্ত অশ্লীল বখামি ও মাতলামির কথাতেই পরিপূর্ণ।"[২]

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনের অশ্লীলতাকে সরাসরি সমর্থন না করেও যে কথা বলেছেন তার ফলে 'সধবার একাদশী'র উপর নিন্দার ঝাঁজ কিছুটা মন্দীভূত হয়ে পড়ে। তিনি বলেছেন,—

> "আমি এমন বলিতেছি না যে, দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। গ্রন্থে রুচির দোষ না ঘটে, ইহা সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সংশয় কি? আমি যে কয়টা কথা বলিলাম তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা নিন্দা নহে। মানুষটা বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। দীনবন্ধুর রুচির দোষ তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে নাই, তাঁহার তীব্র সহানুভূতির গুণেই ঘটিয়াছে।"[৩]

কিন্তু সমালোচকদের নিন্দা প্রশংসা 'সধবার একাদশী' যেমন প্রচুর পরিমাণে পেয়েছিল, তেমনি এটি অসাধারণ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। তাই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার গোষ্ঠী ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এ্যাসোসিয়েশনের দাতব্য বিভাগের সাহায্যকল্পে টাউন হলে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় করেছিল। এ সম্পর্কে ঐদিনের 'ইংলিশম্যান পত্রিকায় নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়,—

'National Theatre ! National Theatre !!
TOWN HALL ! TOWN HALL !!
This evening, Saturday, 5th April 1873
For the Benefit of
The charitable Section of Indian reform Association,
The most Laughable entitled
"SODHABAR AKADASI"
To conclude with the lamenations
of Bharut matta
with her children
Door open at 7 P. M., play to commence at 8 P. M.
Tickets to be had at the Town Hall on Friday and Saturday.[8]

১. The Bengali Drama (London, 1930) P. C. Guha Thakurda /p. 114-115
২. বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭৪)/রামগতি ন্যায়রত্ন
৩. দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী.......সমালোচনা/বঙ্কিম রচনাবলী/সাহিত্য সংসদ/পৃঃ ৮৩৩
৪. Englishman/1873, 5 April উদ্ধৃত 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান/শঙ্কর ভট্টাচার্য/পৃঃ ৭

'সধবার একাদশী'র জনপ্রিয়তার কথা পরে উদ্দেশ্যমূলকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে আমরা তাই এ প্রসঙ্গ আর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি না।

নামকরণ : সুশীলকুমার দের উদ্ধৃতিতে আমরা দেখেছি যে 'সধবার একাদশী' প্রহসনের নামটিকেই তিনি 'বেদনা ও আক্ষেপের নিদর্শন' রূপে বর্ণনা করেছেন। কারণ এই নাটিকার পরিসমাপ্তিতে কঠিন শিক্ষাপ্রাপ্ত নিমচাঁদ পুনরায় এ ধরনের অসমাজিক কর্মে রত হবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। এবং তারপরেই সে একটি ছড়া আবৃত্তি করেছে। এই ছড়াটিতে প্রহসনকার সুকৌশলে প্রহসনটির নামকরণ সম্পর্কে এক সূত্র নির্দেশ করেছেন ও নিমচাঁদের প্রতিজ্ঞার হাস্যকরতা প্রতিপন্ন করেছেন। নিমচাঁদ প্রহসনের শেষ দৃশ্যে অটলকে বলেছে,—

"কি বোল বলিলে বাবা বলো আরবার
মৃতদেহে হল মম জীবন সঞ্চার!
মাতালের মান তুমি গণিকার গতি
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি।"

বলা যায়, অটল সম্পর্কে উচ্চারিত নিমচাঁদ-আবৃত্ত এই ছড়াটিই এই প্রহসনের নামকরণ নির্ণায়ক। কিন্তু একথা বললেই প্রহসনটির নামকরণ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলা হয়ে যায় না। কারণ 'সধবার একাদশী' নামকরণ আপাতদৃষ্টিতে যত চটুল ভাবই পরিবেশন করুক না কেন, এর গভীরে রয়েছে অতলান্ত ব্যাপ্তি। 'সধবার একাদশী' নামকরণটি 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' কিংবা 'সোনার পাথর বাটি'র মতই উদ্ভট। কারণ বিধবা হিন্দুরমণীই একাদশীর পারণ, করে থাকেন সধবারা একাদশী করেন না। কিন্তু নববাবু অটলের মতো স্বামী যাদের মদ্যপ, লম্পট, তাঁদের স্ত্রী স্বামী থেকেও বিধবা। কোন্ শ্রেণীর বধূ সধবা হয়েও বিধবা তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অতঃপর নিমচাঁদের পূর্বোদ্ধৃত চারটি পংক্তির বিশ্লেষণে আসা যেতে পারে,—

(i) ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুয়ানীতে অভ্যস্ত অটল মদ্যপ। সাধারণ মানুষের জগতের সঙ্গে তার নিজস্ব জগতের রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। তাই স্বাভাবিক কারণেই স্বাভাবিক জীবন ছন্দের তাল তার জীবনযাত্রায় রক্ষিত নয়। আবার অটলের মতো টাকার কুমীরের ছেলেরাই মদ্যপদের মদের পয়সা জোগিয়ে যায়। মদ্যপেরা নিজেদের প্রয়োজনেই অটলদের দলের শিরোমণি করে রাখে। তাই অটলের মতো মানুষেরা 'মাতালের মান'। প্রসঙ্গত স্মরণীয় নিমচাঁদ জানিয়েছে অটলের মতো একটি বড়োলোকের ছেলেকে দলে টানতে পারলে 'দ্বাদশটি মাতাল' প্রতিপালিত হয়। তাই তার মদ্য ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞায় ভীত হয়ে উঠেছিল নিমচাঁদ। অটল যখন আবার তাকে মদ্যপানে আহ্বান জানাল, তখনই সে বলে 'মৃত দেহে হল মম জীবন সঞ্চার'।

(ii) শুধু মদ নয়, বাবুয়ানীর জন্য দরকার পঞ্চমকারের সাধনা। সঙ্গীদের সহযোগিতায় অটলের মত ব্যক্তিদের তার অভাব হয় না কখনও। সে গণিকা সঙ্গেও আসক্ত হয়ে ওঠে অচিরে। তখন কাঞ্চন হয় তার নিত্যসঙ্গী। বেশ্যা কাঞ্চনের জন্য সে পিতা, মাতা, শ্বশুর প্রত্যেকের সঙ্গে ঝগড়া করে। নির্লজ্জের মতো মায়ের কাছে আবদার করে "আমায় কাঞ্চনকে এনে দাও, তা নইলে আমি গুলি খেয়ে মরবো, নয় গঙ্গায় ডুবে মরবো।"

বাড়ীতে সুন্দরী স্ত্রী কুমুদিনী অথচ বারাঙ্গনা কাঞ্চনের জন্য অটলের এই ক্রন্দনের কারণ কি? কারণ নিজেকে শহরের সেরা বাবু বলে পরিচিত করানো তার জেদ—কেননা যার বাড়ীতে শহরে সেরা বারাঙ্গনার যাতায়াত, সেই তো শহরের সেরা বাবু! দুঃখে, তীব্র অভিমানের কুমুদিনী ভেঙে পড়েছে, অথচ ছেলের ক্রন্দনে বিচলিত হয়ে মা বারাঙ্গনা কাঞ্চনকে স্বেচ্ছায় পুত্রবধূর সম্মুখেই তুলে দিয়েছেন অটলের হাতে। স্বামীর এই কদর্য রুচিতে ঘৃণায় ধিক্কারে বধূ কুমুদিনী সৌদামিনীকে বলেছে,—

"এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভালো—আমি ভাই আর সইতে পারি নে,·····"(২।১)

মদ্যপ অটল আত্মবিস্মৃত হয়ে নিমচাঁদের নিষেধ সত্ত্বেও নিজের খুড়শাশুড়ী গোকুলবাবুর সুন্দরী স্ত্রীকে অপহরণ করতে হিঁজ্‌ড়ে নিয়োগ করে। ভুলক্রমে সে কুমুদিনীকে ধরে নিয়ে আসে। সৌদামিনীও দাদার কুকীর্তির সাক্ষী। সে তার বৌদি কুমুদিনীর দুঃখ অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পেরেছে। আবার কাঞ্চনের কাছে প্রতারিত হয়েছে এরকম অনুমান করে অটল যখন বারাঙ্গনার উপর অভিমান করে গলায় রুমাল বেঁধে আত্মহত্যার চেষ্টা করে, এবং এইভাবে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়, সারা বাড়ীতে তখন একটা হৈ হৈ শুরু হয়ে যায়। গিন্নিমা তখনও পুত্রকে ধমক না দিয়ে সামান্য বারাঙ্গনার জন্য পুত্রের এই নষ্টামিকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন। তখন অটলের বোন সৌদামিনী মায়ের এই ব্যবহার দেখে মর্মাহত হয়ে ভাবে,—

"সৌদা। (স্বগত) সাদে বৌ বলে, বিধবা হয়ে থাকা ভালো—সাত জন্ম থুব্‌ড়ো হয়ে থাকি সেও ভালো, তবু যেন দাদার মতো ভাতারটি না হয়।"(৩।২)

সুতরাং, 'সধবার একাদশী' নামকরণের মূলে রয়েছে শুধু অটলের কুকীর্তির ফিরিস্তি, এটা ঠিক নয়—এই কুকার্যের প্রতিটিই যার হৃদয়কে যন্ত্রণায় দীর্ণ করে দিয়েছে সেই কুমুদিনীও রয়েছে পর্দার অন্তরালে। এই চিত্রকে সুপরিস্ফুটনের জন্য অটল, নিমচাঁদের চরিত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলি পরতে পরতে খুলে খুলে দেখিয়েছেন নাট্যকার। আবার অন্যদিকে তাকালে 'সধবার একাদশী' নামটি অটলের আচরণ সম্পর্কে প্রযোজ্য বলেও মনে হয়। বেড়ালের তপস্বী হওয়া যেমন সম্ভব নয়—অটলের মত মদ্যপের মদ্য ত্যাগও তেমনি সম্ভব নয়। কেননা সেটা যে সধবার একাদশী করার মতো অসম্ভব—এটা বোঝাতেই হয়তো নাট্যকার এই নামকরণ করেছেন। নাট্যশেষে রামধনের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে নিমচাঁদ এবং অটল যখন ক্লান্ত, তখন সেই মার খাবার বেদনা ভুলতে অটল আবার মদ্যপান করতে চেয়েছে,—

"অটল্। নিমচাঁদ ওঠ, বাবা না আস্‌তে আস্‌তে আমরা বাগানে যাই, যে মার খেইচি অনেক ব্রাণ্ডি না খেলে বেদনা যাবে না।" (৩।৩)

অটলের এই আচরণ পূর্ব মন্তব্যের পরিপোষকতা করেছে। সুতরাং বলা যায় দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' প্রহসনটির নামকরণ গভীর ব্যঞ্জনাদ্যোতক, সার্থক এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজচিত্র : ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফলের সাথে সাথে কুফলের যে বীজটি বপিত হয়েছিল—সমগ্র সমাজের সহস্র বৎসরের ভিত যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণে টলে যেতে বলেছিল 'সধবার একাদশী' প্রহসনের মধ্যে নাট্যকার সমকালীন

সে-ই বিষয়ক চিত্রই অঙ্কন করেছেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের তরঙ্গ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে এদেশের নব্যশিক্ষিতদের মনে আছড়ে পড়লে সেই অকাল তরঙ্গের ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে এদেশের নব্যশিক্ষিতদের মনে আছড়ে পড়লে সেই অকাল তরঙ্গের ধাক্কায় যুবসমাজ পথভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডাফ সপরিবারে এসে পৌঁছালেন এদেশে, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। তিনি ক্রমে ক্রমে অনিকেত হয় পনা, শূন্যতাবোধে গ্রস্ত এই যুব সমাজের কাছে তুলে ধরলেন যিশুখ্রীষ্টের মহান আদর্শ কথা। খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হল অনেক যুবক। গোঁড়া হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল বক্ষে কাঁপন ধরিয়ে দিলেন আলেকজাণ্ডার ডাফ। সম্মিলিতভাবে হিন্দুরা বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। শুধু ধর্মান্তর নয়—যেন মর্মান্তর হয়ে গিয়েছিল এই সব যুবকদের। অনেকে ধর্মান্তরিত না হলেও আচারে আচরণে অন্ধ বিলাতিয়ানার অনুকরণ করতে গিয়ে স্ব সমাজে হাস্যকর হয়ে উঠল। কেননা এই সব যুবকেরা প্রকাশ্যে মদ্যপান করত এবং পিতামাতার সামনেও বারাঙ্গনাবিলাসে লজ্জিত হত না। শুধু অটলবিহারীর মতো স্বল্পশিক্ষিত অপরিণামদর্শী ভ্রষ্টযুবকের মধ্যেই এই বারাঙ্গনাসক্তির প্রকাশ ঘটেনি, নকুলেশ্বরের মতো নামী উকিল ও কেনারামের মতো সমাজে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত মান্যগণ্য ডেপুটিও নিজ নিজ পদমর্যাদার কথা অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে এই পথের পথিক হয়েছেন। হিন্দু সমাজের এই সব ভ্রষ্টাচার, দুনীর্তির প্রতি বিরক্ত হয়েই ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধারেরা ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কালক্রমে সেই সমাজেও দেখা যায় একই রোগ। দীনবন্ধু ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কিছুটা নরম মনোভাবপন্ন ছিলেন কারণ,—

(ক) ব্রাহ্ম সমাজ স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে।

(খ) নারীর বাল্যবিবাহকে নিষিদ্ধ করার সপেক্ষ এবং বিধবার বিবাহ দেওয়ার পক্ষে আন্দোলন করেছে ব্রাহ্মসমাজ।

(গ) সুরাপানের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

(ঘ) সমাজকল্যাণমূলক নানান কর্মে ব্রাহ্মসমাজ এসময় নিজেকে নিযুক্ত করেছে। কিন্তু তবু এই ব্রাহ্মসমাজ যে কিভাবে অপদার্থ, মিথ্যাবাদী, সুবিধাবাদী মানুষের হাত পড়ে ক্রমে নষ্ট হতে বসেছিল তার এক চিত্রও দীনবন্ধু এই প্রহসনে এঁকেছেন। কেনারাম ডেপুটির মতো একজন সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে চিত্রিত করেছেন নাট্যকার। সুতরাং সামগ্রিকভাবে 'সধবার একাদশী' প্রহসনে রয়েছে তিনটি শ্রেণীর চরিত্র—(অ) হিন্দু বা গোঁড়া হিন্দু, (আ) নব্যশিক্ষিত, (ই) ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কিন্তু বিস্তৃতভাবে প্রতিটি চরিত্রে শ্রেণী পরিচিতি নিলে দেখা যায়—এরা এক এক বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। যেমন,—

(i) **অটলবিহারী**—উচ্চবিত্ত, বারাঙ্গনা বিলাসী। সে মদ্যপান করে নিজেকে সভ্যরূপে জাহির করতে আর সে বাবুগিরির জন্য বারাঙ্গনা রাখা জরুরী মনে করে। যেখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বেতন মাসে দু'শ টাকা, সেখানে সে মাসে তিনশ টাকা দিয়ে বারাঙ্গনা রাখে—প্রয়োজনে চারশ' টাকা দিতেও পিছপা নয়।

(ii) **রামমাণিক্য**—পূর্ববঙ্গীয় জমিদার। অশিক্ষিত। বারাঙ্গনাসক্ত। সে মদ্যপান করে ও অন্যান্য দুষ্কর্ম করে কোলকাতার মানুষদের মতো সভ্য হবার জন্য।

(iii) **ভোলা**—অকালপক্ক যুবক। বড়োলোকের জামাতা। Badoo's class-এ পড়া অর্ধশিক্ষিত—ইংরেজি বলতে পারে না, তবু বিদ্যা জাহিরে জন্য কথায় কথায় ইংরেজি তার বলা চাই। মদ্যপানে তার প্রবল আসক্তি।

(iv) **নকুলেশ্বর**—নামাজাদা উকিল। বারাঙ্গনাসক্ত। মদ্যপ। সুযোগ পেলেই বারাঙ্গনা নিয়ে বাগানবাড়ীতে যান।

(v) **নিমচাঁদ**—ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। শিক্ষিত পথভ্রষ্ট যুবক। বড়োলোকের জামাতা নিমচাঁদ বুঝতে পারে তার পথ ঠিক নয়, তবু সে ফিরে আসতে পারে না। বড়োলোকের মোসাহেবী করে সে বিনাপয়সায় মদ্যপান করবে বলে।

(vi) **দামা**—বড়োলোকের ভৃত্য। মদ্যপানের প্রতি গভীর আসক্তি। প্রভুর প্রসাদ পেয়ে থাকে রোজই। মদ্যপ প্রভুর যথাসর্বস্ব অপহরণের ধান্দায় রত রয়েছে সে।

(vii) **কাঞ্চন**—বারাঙ্গনা। মদ্যপ। কীভাবে অর্থ রোজগার করতে হয় তা সে জানে। এবং অটলের উপর সবগুলির নিখুঁত প্রয়োগ করে।

উপরোক্ত মদ্যপায়ী চরিত্রগুলির পাশাপাশি আরও কতকগুলি চরিত্র এঁকেছেন দীনবন্ধু, এর ফলে এক অপূর্ব নাট্যিক বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

(i) **কেনারাম ডেপুটি**—কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মুর্খ ও নির্বোধ ডেপুটির প্রতিনিধি। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এই মানুষটির বারাঙ্গনাসক্তিও বড়ো কম নয়।

(ii) **আরদালি**—ডেপুটির যোগ্য ভৃত্য।

(iii) **জীবনচন্দ্র**—ধনবান ব্যক্তি। পত্নীভীত—স্ত্রীর প্রশ্রয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া পুত্রের পিতা ইনি।

(iv) **গোকুলচন্দ্র**—অটলের খুড়শ্বশুর। ধনবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। জীবনচন্দ্রের পুত্রের চরিত্রের সংশোধন প্রয়াসীদের একজন।

(v) **রামধন রায়**—অটলের পিতৃব্য। ধনবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনিও অটলের চরিত্র সংশোধন করতে চান।

(vi) **বৈদিক**—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কিছুটা ক্রোধী। রক্ষণশীল হিন্দু।

(vii) **গিন্নী**—অটলের মা। আলালের ঘরের দুলাল অটলের সমস্ত পাপকার্যের প্রশ্রয়দানকারী পুত্রগতপ্রাণা মহিলা। অটলের চরিত্রর সংশোধনের প্রধান অন্তরায় গিন্নির আস্কারা।

(viii) **সৌদামিনী**—হিন্দু কুলবধূ। বাঙালি রমণী। অটলের বোন।

(ix) **কুমুদিনী**—বাঙালি বধূ। নির্যাতিতা রমণী। অটলের স্ত্রী।

অতি শৈশবে পুত্রের দুষ্কর্মের নিরাকৃতির দ্বারা তাকে সঠিক পথে না চালিয়ে আলালের ঘরের দুলালের মতো তাকে উন্মার্গগামী হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিলে স্বচ্ছল পিতার পুত্র কীভাবে আস্তে আস্তে সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যায়—তারই এক হৃদয়গ্রাহী চিত্র—এঁকেছেন প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে। দীনবন্ধু মিত্র মাতা বা পিতার এই স্নেহান্ধ দুর্বলতা কি বিপত্তির সৃষ্টি করে তাই হাস্যরসাত্মক পটভূমিকায় উপস্থাপিত করেছেন 'সধবার একাদশী' প্রহসনে।

মদ্যপানের কুফল : মদ্যপান এক সুপ্রাচীন সামাজিক ব্যাধি। বিদেশি শাসন ও বিদেশি

শিক্ষার প্রসার এদেশী মানুষকে যখন বিদেশের প্রতি অতিমাত্রায় আকর্ষণ করতে শুরু করেছিল তখন বিদেশিদের আর পাঁচটা ভালো গুণের সাথে মদ্যপানরূপ বদগুণও এদেশী নব্য শিক্ষিতদের বেশ কব্জা করে ফেলে। এদেশী ছাত্রদের মনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তীব্র আকর্ষণ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সফলতম অধ্যাপকের নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯—১৮৩১)। তিনি হিন্দু কলেজে তাঁর ছাত্রদের মনে জাগিয়ে তোলেন যুক্তিবাদ। ফলে তাঁর অনুগামীরা হিন্দুধর্মের কুসংস্কার, পৌত্তলিকতাভিত্তিক ধর্মাচরণ প্রভৃতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে। সারা সমাজ নড়েচড়ে বসে। ডিরোজিওর শিক্ষা ক্রমে হিন্দু ছাত্রদের নিজ ধর্মের প্রতি আস্থাহীন করে তুলবে—এই আশঙ্কায় প্রাচীনপন্থী পন্ডিতবর্গের চাপে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল ডিরোজিওকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। ডিরোজিও অনুগামীরা এতদিন মদ্যপান করাকে সভ্যতার নিদর্শন বলে মনে করত—এখন এই আঘাত তাদের এমনভাবে উত্তেজিত করল যে হিন্দুধর্মের উপর চরম আঘাত হানার জন্য তারা গোমাংস ভক্ষণ করতে, মুসলমানের তৈরী বা সাহেবদের তৈরী বিস্কুট খেতে শুরু করল। শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন,—

> "সে সময়ে সুরাপান করা কুসংস্কার ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রমপূর্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতেন, তিনি সংস্কারকদের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। স্বয়ং রাজা রামমোহন রায় পরোক্ষভাবে সুরাপান শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে, তিনি রাত্রিকালে বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে টেবিলে বসিয়া ইংরাজি রীতিতে খানা খাইতেন।....রাত্রিতে ভোজন করিবার সময় রামমোহন রায়ের পরিমিতরূপে সুরাপান করিবার নিয়ম ছিল।"

রাজনারায়ণ বসু হিন্দু কলেজে পড়ার সূত্রে মাত্র ১৬।১৭ বৎসর বয়সেই মদ্যপান অভ্যাস করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর বাবা রাজনারায়ণের মদ্যপানের মাত্রা ঠিক রাখার জন্য তাকে নিয়ে একত্রে মদ্যপান করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—"হিন্দু কলেজের ষোলো সতের বৎসরের বালকেরা সুরাপান করাকে শ্লাঘার বিষয় মনে করিত।" ১৭৭২ শকে শ্রাবণ সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সাধারণ মানুষের মদ্যপানের ফলে ক্রম চারিত্রিক অবনতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিষাদের সঙ্গে এক সারগর্ভ নিবন্ধ রচনা করেছে,—

"...সংপ্রতি এই ভারত রাজ্য ইংরাজ জাতির অধিকৃত হওয়া অবধি মদ্য প্রস্তুত হইবার স্থান ও মদ্যালয় দিন দিন যাদৃশ বাহুল্য হইতেছে, তৎসহকারে পান-দোষ ও অতি ভয়ঙ্কররূপে প্রবল হইয়া আসিতেছে।...

...যখন রাজার আজ্ঞাক্রমে মদ্য প্রস্তুত করিবার স্থান স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং এই একমাত্র কলিকাতার মধ্যেই শতাধিক মদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তখন ইহা কে না কহিবে যে রাজাই এই পাপানল প্রবল করিবার প্রধান কারণ?...."

'তত্ত্ববোধিনী' দৃঢ়স্বরে জানিয়েছে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মদ্যপান পূর্বে কিছু সংখ্যক নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, "কিন্তু এইক্ষণে উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মধ্যেও সুরাপান অধিক দৃষ্ট হয়; বিশেষত নব্যসম্প্রদায়ী

প্রায় তাবৎ বিদ্বান ও ধনি যুবককে ইহাতে অতিশয় লিপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে।" 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত পাশ্চাত্য অনুকারী মদ্যপায়ীদের বিদ্রূপ করে লিখলেন,—

"ধন্য রে বোতলবাসী ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতা কেবল।।"

'সংবাদ প্রভাকর', 'বিজ্ঞান মিহিরোদয়' প্রভৃতি পত্রিকা এদেশীয় মানুষদের মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে বার বার সাবধান করে দিয়েছে। পাশ্চাত্যপ্রীতি, ইংরেজি ভাষা প্রীতি ও মদ্যপ্রীতির—এক হাস্যকর চিত্র দ্বিজেন্দ্রলাল পরবর্তীকালে এঁকেছেন তাঁর বাংলা ইংরাজি ভাষায় মেশানো কক্‌টেল-জাতীয় কবিতায়,—

"You are not far wrong if you think
যে আমরা করি একটু বেশী Drink
কিন্তু Considering our evolution এবং state
আমাদের Morals নয় খুব loose."

শুধু ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী নয়, Badoo's class-এর ছাত্ররা, ইংরেজি শিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে মদ্যপানের প্রবণতা এমনভাবে সংক্রামিত হয়েছিল যে প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ সম্মিলিতভাবে 'সুরাপান নিবারণী সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন। তাতেও এই ভয়ংকর নেশার নিবৃত্তি ঘটেনি। 'সধবার একাদশী' লেখা হয় এই সময়।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দুমেলার এক অধিবেশনে সুরাপানের কুফল সম্পর্কে হিন্দুমেলার কর্ণধার বক্তব্য রাখেন এবং এ ব্যাপারে কিছু করার জন্য উদ্যোগ নেন। ১৭৭৪ শকের কার্তিক সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে আমরা জানতে পারি,—

"সুরাপান রূপ মহাপাপ এ দেশে প্রবিষ্ট হওয়াতে যে অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইতেছে, তাহা এক্ষণে সকলেরই বিদিত হইয়াছে এবং তাহার নিবারণার্থ হিন্দু ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ি লোকে ইংলন্ডস্থ পার্লিয়ামেন্ট নামক রাজসভায় আবেদন করিয়াছেন।"

'সধবার একাদশী' প্রহসনে দীনবন্ধু মিত্র এই সর্বনেশে মদ্যপানের, কুফল অত্যন্ত নির্মম এবং যথাযথরূপে দেখিয়েছেন। নাটকটি প্রকাশিত হবার পর মদ্যপান নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠাতা প্যারীচরণ দীনবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন,—"আপনার যে বহি বাহির হইয়াছে এখন আমাদের সোসাইটি উঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে।'

উদ্দেশ্যমূলকতা : 'সধবার একাদশী' উদ্দেশ্যমূলক প্রহসন হয়েও শেষ পর্যন্ত এটি উদ্দেশ্যসর্বস্বতাতেই পর্যবসিত হয়নি—কেননা এর শিল্পমূল্য উদ্দেশ্যমূলকতার দ্বারা নষ্ট হয়নি। আর সেই কারণে আজ একশ' বাইশ বৎসর পরেও 'সধবার একাদশী'র জনপ্রিয়তা অম্লান। এখনও এই প্রহসন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিত। 'সধবার একদাশী'র এই অদ্বিতীয়ত্বের কারণ নাটিকাটির মধ্যে প্রহসনের সবগুণ-গুলিই বর্তমান; তাছাড়া এই নাটিকায় উপহাসের আঘাতের চেয়ে পরিহাসের মৃদু হস্তাবলেপই বেশী ফুটে উঠেছে। এই প্রহসনের সার্থকতার কারণ বিচার করতে গিয়ে ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন,—

"মনে হয়, নাট্যকার যেন রঙের পিচকারি দিয়া সমাজের চতুর্দিকে ইতঃস্তত তরল রঙ ছড়াইয়া দিয়াছেন, এবং যাহারাই রঞ্জিত হইয়াছে তাহারা যেন লজ্জিত, অপ্রতিভ

ও হাস্যাস্পদ হইয়া পলায়ন করিতেছে। লোকে লাঠির বাড়ি সহ্য করিতে পারে কিন্তু লোকের মধ্যে লজ্জা সহ্য করিতে পারে না।"

দীনবন্ধুর নাটক 'সধবার একাশী' উদ্দেশ্যমূলক প্রহসনে পর্যবসিত হয়নি, কারণ এর মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট শিল্প লক্ষণ লক্ষিত হয়েছে।

১। এই প্রহসন উদ্দেশমূলক হলেও এর উদ্দেশ্য কখনও প্রকট হয়ে ওঠে নি। কোথাও এটি প্রচারধর্মিতায় নষ্ট হয়নি।

২। মদ্যপানের কুফল বোঝাতে নাট্যকার অন্য চরিত্রে মুখে ভর্ৎসনা ছাড়াও নিমচাঁদের মুখে তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে এক দীর্ঘ স্বগতোক্তি বা একোক্তি; দিয়েছেন। মদ্যপ, বিপথগামী নিমচাঁদের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের অপরিসীম যন্ত্রণার পরিচয় দিতে গিয়েই কৌশলে মদ্যপানের ভয়াবহ সর্বনাশের সম্পর্কে নাট্যকার আমাদের সজাগ করেছেন এভাবে।

৩। ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকতার স্পষ্ট প্রমাণ নেই। সার্থক প্রহসনের মতো এখানে দীনবন্ধু জীবনের বিকৃতি এবং অসঙ্গতিকেই নির্মল কৌতুকে ও ব্যঙ্গের কৌতুকী ছোঁয়ায় প্রকাশ করেছেন।

৪। 'সধবার একদাশী'র হাস্যরস উচ্চকিত কিন্তু এ-ই সব নয়। এই নাটিকার হাস্যরসের অন্তঃস্তলে প্রবাহিত হয়েছে করুণ রসের নিরবচ্ছিন্ন ফল্গুপ্রবাহ।

৫। 'সধবার একাদশী'কে উদ্দেশ্যসর্বস্ব প্রহসন বলা চলে না—সে সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ উপস্থিত করা যায় এখানেই যে এ নাটিকার উপসংহার অংশ বিবৃতিধর্মী নয়। এই প্রহসনের যেখানে শুরু সেখানেই শেষ। শুরু মদ্যপানে সমাপ্তিও মদ্যপানে। মদ্যপানের জন্য বার বার শাস্তি প্রাপ্ত নিমচাঁদ ও অটল বার বার মদ ছেড়ে দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই সেই প্রতিজ্ঞা তারা ভেঙেছে। নাটকের শেষে দেখা যায়, প্রহারে জর্জরিত অটল ও নিমচাঁদ আবার বাগানে গেছে মদ্যপান করতে। নাট্যকারের নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই এখানে নীতির সুর স্পষ্ট নয়।

গঠনশৈলী : 'সধবার একাদশী' প্রহসন তিন অঙ্কে রচিত প্রহসন। অথচ প্রহসনের কাঠামো দুই অঙ্কে গঠিত হওয়া উচিত, সুতরাং সেদিক থেকে এই নাটিকাকে প্রহসন বলা যাবে কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। 'সধবার একাদশী' যদিও তিন অঙ্কে রচিত তবু এটি প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধা নেই—কারণ প্রহসনের অন্যতম লক্ষণ সংক্ষিপ্ত। এই নাটিকা নিঃসন্দেহে সংক্ষিপ্ত কাহিনী-ভিত্তিক। এই কাহিনী নক্সার মতো খণ্ড ক্ষুদ্র অংশে বিচ্ছিন্ন নয়। একটা ধারাবাহিক কাহিনীস্রোত এর বিভিন্ন অঙ্ক গর্ভাঙ্কের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় হাস্যের উজ্জ্বলতায় করুণ রসের গভীর কালিমায় মুদ্রিত। অটলের সংসার—সেই সংসারের দুঃখম্লান চিত্র। স্বামী থেকেও স্বামীবঞ্চিত কুমুদিনীর জীবন-যন্ত্রণা, মদ্যপ নিমচাঁদের এক মুহূর্তের জন্য অতীত স্মৃতিচারণ—হাস্যরসের হাল্‌কা অনুভূতির মধ্যে মধ্যরাত্রের প্রগাঢ় শ্বাসরোধকারী কুয়াশা-আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে। খণ্ড খণ্ড কয়েকটি চিত্রও দুঃখের মর্মন্তুদ সুতোয় গ্রন্থিত হয়ে তার গলদেশে নাগমাল্য পরিয়েছে।

হাস্যরস : 'সধবার একাদশী' প্রহসনের অঙ্গীরস হাস্য। জীবনের এক বিশেষ অবস্থার

স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হাস্য। জীবন ও সংসারের গভীর কথাটি, সংস্যার পর সমস্যাগুলির নক্সা সিরিয়াসভাবে চিত্রিত করলে যেখানে অধিকাংশ মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় না, সেখানে সেই গভীর কথাটি হাল্‌কা রসের মাধ্যমে ব্যক্ত করলে মানুষের কাছে তার পরম কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠে। 'সধবার একাদশী'র হাস্যরস শিক্ষিত অভিজাত সমাজে একটু না-পাক গোছের। নাক-উঁচু স্বভাবের মানুষ—যাঁরা ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্তের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁরাও দীনবন্ধুর প্রহসনের ভার সইতে পারলেন না। তীব্র চীৎকারে অশ্লীলতার অজুহাতে এই নাটিকাকে নস্যাৎ করতে লাগলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং দীনবন্ধুর গুণগ্রাহী হলেও 'সধবার একাদশী' প্রহসনটি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন তাঁকে। সে নিষেধ দীনবন্ধু শোনেননি। কিন্তু সন্দেহ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য বলে যা উদ্ধৃত, তা সত্য সত্যই তাঁর বক্তব্য ছিল কি না! কারণ তা যদি সত্যই তাঁর উক্তি হত তবে এই নাটকের সংলাপ রচনার যথাযথতা সম্পর্কে সপ্রশংস উক্তি করতেন কেন? এই রহস্যের উত্তর মেলে না। 'সধবার একাদশী' রচিত ও প্রকাশিত হবার পর দীনবন্ধুর অদৃষ্টে সুনাম দুর্নাম প্রায় সমপরিমাণে জুটেছিল—সে সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করেছি। সে আলোচনায় বিরত হয়ে তাই আমরা এই নাটিকার হাস্যরস সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

'সধবার একাদশী' হাস্যরসের অনাবিলতা সম্পর্কে সংশয়সূচক প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। এই নাটিকায় অশ্লীলতার চূড়ান্ততা দেখানো হয়েছে বলে যাঁরা মন্তব্য করেছেন তাঁদের অভিযোগ প্রধানত দুটি (১) চরিত্রগুলির আচার-আচরণ অত্যন্ত অভব্য এবং গ্রাম্য। (২) চরিত্রগুলির ভাষার মধ্যেও রয়েছে গ্রাম্যতা-দোষ। দীনবন্ধুর নাট্যকৃতির বিচার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন দীনবন্ধুর বাস্তবতা, সমাজ-সচেতনতা ও ভূতপূর্ব সহানুভূতির কথা। বাস্তব ছাড়া অন্য কোনও চিত্র কল্পনার দ্বারা আঁকতে গেলে দীনবন্ধু ব্যর্থ হতেন। তাই তাঁর অধিকাংশ নাটকে যে চরিত্র যত বাস্তব হয়েছে সেটার মূলে রয়েছে নাট্যকারের বাস্তব-অভিজ্ঞতা এবং অপার সহানুভূতির কারণে তার নিজের ভাষা তার কণ্ঠে প্রয়োগ। প্রকৃতপক্ষে চরিত্র জীবন্ত হয় স্থানীয় পরিবেশের প্রেক্ষাপটে তার নিজস্ব সংলাপে। যে স্থানে মানুষটি জন্মেছে, বেড়ে উঠেছে, পাড়ার পাঁচজনের সঙ্গে সুখ-দুঃখের ভাব বিনিময় করেছে সেই ভাষাতেই সে সহজ সাবলীল এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। 'সধবার একাদশী' প্রহসনে দীনবন্ধু এই স্বাভাবিক পথে চলেছেন। তাছাড়া এই প্রহসনের অধিকাংশ চরিত্র মদ্যপান দোষে দুষ্ট হয়ে এমন সব জায়গায় যাতায়াত করেছে যে তাদের ভাষা অভিজাত সমাজের কানে কিছুটা অস্বাভাবিক ঠেকেছে। কিন্তু এটাও তো সত্য যে ওই চরিত্রগুলির কণ্ঠে ওই ভাষাই যথার্থ! এত যুক্তিবিন্যাসের পরও কোথায় যেন একটু ফাঁক রয়ে যায়। সন্দিগ্ধ সমালোচকদের মত অনুসরণ করে একবার বলতে ইচ্ছে করে—যথাযথ শব্দপ্রয়োগে চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে সত্য, কিন্তু সে ভাষা প্রয়োগ যদি অতিরিক্ততা দোষে দুষ্ট হয়, তাহলে সে ভাষাকে কী অশ্লীল বলা অন্যায়? সমগ্র প্রহসন জুড়ে দীনবন্ধু অসংখ্য গ্রাম্য অশ্লীল শব্দপ্রয়োগ করেছেন, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ব্যবহৃত এই অশ্লীল শব্দগুলি সব সময় যে গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে তাও নয়—তবে অনেক স্থানেই এই ধরনের শব্দ-প্রয়োগ যথার্থ হয়েছে।

রস বিচার : 'সধবার একাদশী' প্রহসনধর্মী রচনা। প্রহসনের অঙ্গীরস করে তাকে হাস্যরস। সুতরাং এই নাটকটির মূলরসও হাস্যরস। হাস্য জীবনের এক বিশেষ অবস্থার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। সমাজ এবং সংসারের গভীর কথাটি, যেটি গভীরভাবে বললে উপহাস উপহার পায়—সেই কথাটি হাল্কা চালে জীবনঘন হাস্যরসের স্বাদ সহ পরিবেশিত হলে মানুষের কাছে হয় পরম কাঙ্ক্ষিত। দীনবন্ধু 'সধবার একাদশী' প্রহসনে সেই জীবননিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণে যে শৈথিল্য অথবা ত্রুটি-বিচ্যুতি তাকে অনাড়ম্বর ভাবে পরিবেশ সহ উপস্থাপিত করেছেন। দর্শকগণ প্রহসনের তাৎপর্য অনুধাবন করে তদনুরূপ আচরণে জীবনছন্দ নির্মাণ করলেই নাট্যকারের শ্রম সার্থক।

কিন্তু বক্ষমান প্রহসনটির সম্পর্কে দীনবন্ধু সমকালীন অনেক সমালোচক এক মত পোষণ করেন নি। এঁদের কেউ কেউ দীনবন্ধুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও সধবার একাদশী'র শিল্প সার্থকতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং নাকি দীনবন্ধুকে এই প্রহসনটি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। তা যদি সত্য হয় তা হলে বলবো দীবন্ধু সে কথা শোনেননি বলেই যে প্রহসনের হাস্যরস প্রাণ এবং সমাজশোধন যার উদ্দেশ্য—সেই রকম একটি আদর্শ প্রহসন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই শ্রেণীর সাহিত্যের মুখপাত্র হতে হয়েছে। দীনবন্ধুকে এই নাটক প্রকাশে বঙ্কিমের নিষেধ প্রসঙ্গে একটা সংশয় কিন্তু থেকেই যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যদি দীনবন্ধুকে নিষেধ করবেন তবে 'সধবার একাদশী' প্রহসনে নিমচাঁদ চরিত্রে সংলাপ চরিত্রের যথাযথতা নিয়ে সপ্রশংস উক্তি করবেন কেন?

সে যাই হোক, যুক্তি ও বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে 'সধবার একাদশী' সম্পর্কে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে এই প্রহসনটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যকারের ভাগ্যে সুনাম এবং দুর্নাম দুই-ই জুটেছিল প্রচুর পরিমাণে।

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন 'সধবার একাদশী'র সবচেয়ে রূঢ় সমালোচক। শুধু 'সধবার একাদশী' নয় 'নীলদর্পণ' সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যও তাঁর দূরদর্শিতা সম্পর্কে আমাদের সংশয় জাগায়। 'নীলদর্পণের নামটি ব্যতীত আর কিছুই ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের পক্ষে যাইবে না'—এই মন্তব্য দীনবন্ধু এবং তাঁর কালজয়ী নাটক নীলদর্পণ সম্পর্কে তাঁর বিচারশৈলীর প্রমাণবহ। 'সধবার একাদশী'র হাস্যরসকে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'গ্রাম্য রসিকতা' বলে। তিনি দীনবন্ধু সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন—তা এই 'দীনবন্ধু ছেবলা লেখক ঃ ছেবলাদিগকে সন্তুষ্ট করা তাহার অভিপ্রেত; সুতরাং এই সকল গ্রাম্য রসিকতা তাহার লেখার মধ্যে বিস্তর পাওয়া যায়।'

Friday Review পত্রিকার এক সংখ্যায় রেভারেন্ড লালবিহারী দে খ্রীস্টান পিউরিট্যানিজম্ এর দিক থেকে 'সধবার একাদশী'র বিচার করতে গিয়ে নাট্যকার এবং নাটকের পৃষ্ঠপোষকদের সম্পর্কে সহিষ্ণু মন্তব্য করতে পারেন নি।

গোঁড়া হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৪) গ্রন্থে এই প্রহসনের তীব্র নিন্দা করেছেন। অনেক সময় মনে হতে পারে রেভারেন্ড দের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি যেন শোনা গেছে রামগতির বক্তব্যে,—

"সধবার একাদশী খানি মদের কথাতেই আরব্ধ এবং মাতালের কথাতেই পর্যবসিত। ইহাতে হাস্যোদ্দীপক অনেক বিষয় বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু আদ্যোপান্ত অশ্লীল বখামি ও মাতলামির কথাতেই পরিপূর্ণ।"

কিন্তু শুধু নিন্দাবাদ নয় 'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুকে প্রতিষ্ঠিত করেছে জীবননিষ্ঠ নাট্যকারের পদে। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন 'দীনবন্ধুর অলৌকিক সমাজ অভিজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির' ফলে তাঁর নাটক প্রণয়ন সম্ভব হয়েছিল। 'সধবার একাদশী'র ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে যে নিন্দাবাদ উচ্চারিত তার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম। তাঁর মতে দীনবন্ধুর রচনায় রুচির যে দোষ সংলাপের প্রয়োগে লক্ষ করা গেছে তা তাঁর তীব্র সহানুভূতির জন্য। কথাবার্তার প্রকৃত রূপ ফুটিয়ে চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করেছেন বলেই 'সধবার একাদশী'র সংলাপে শ্লীলতার অভাব ঘটেছে, অবশ্য 'রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।'

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের দুর্গা সপ্তমীর রাত্রিতে 'সধবার একাদশী' নাটকের প্রথম অভিনয় মঞ্চস্থ হয়। এই দিন গিরিশচন্দ্র নিজেই নিমচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বঙ্গীয় জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে গিরিশ ঘোষের অবদান অবিস্মরণীয়—কিন্তু তিনি দীনবন্ধুকেও এই কৃতিত্বের অংশীদার করেছেন এই বলে যে—

"মহাশয়ের নাটক (সধবার একাদশী) যদি না থাকত এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাশ্যানাল থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহস করিত না।" গিরিশচন্দ্র 'সধবার একাদশী' প্রহসনের অভিনয় যোগ্যতা এবং সমাজসচেতনার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন প্রসঙ্গক্রমে।

রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু বহুভাষাবিদ লোকেন পালিত এই প্রহসনটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন,—

"আটটি ভাষায় নাটক শ্রেণীর বহুতর গ্রন্থ আমি পাঠ করিয়াছি। কিন্তু 'সধবার একাদশী'র তুলনা কোথাও দেখিতে পাই নাই।......সংযমের অভাবে বিফলীকৃত শিক্ষার অপূর্ব চিত্র গ্যেটে তাঁহার 'ফাউস্টে' দেখাইয়াছেন। কলিকাতার ফাউস্টেও আমরা সেই চিত্র দেখিতে পাই।"

বিদগ্ধ সাহিত্যতাত্ত্বিক সুশীল কুমারদের মন্তব্য যেন রামগতি ও লালবিহারীর মন্তব্যের প্রতিবাদ। 'দীনবন্ধু মিত্র' গ্রন্থে 'সধবার একাদশী'র বিচার প্রসঙ্গে তিনি লেখেন,—শুধু কুরুচির জন্য চিত্রায়ন নাট্যকারের লক্ষ্য নয়। তিনি 'সধবার একাদশী'তে নীতি শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। "নাটকটির মধ্যে নব্যবঙ্গের ও নির্বুদ্ধিতার যে হাস্য সমুজ্জ্বল চিত্র রহিয়াছে তাহাকে আন্তরিক বেদনা ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়াছে। সধবার একাদশী সেই বেদনা ও আক্ষেপের নিদর্শন।"

'সধবার একাদশীর যথার্থ মূল্যায়নে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা। এই পত্রিকার ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'আনন্দলহরী' নামে একটি পুস্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন,—

"স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' পারিচাঁদ মিত্রের হুতোমের নকসা (?) ইন্দ্রনাথবাবুর 'কল্পতরু', 'ভারত উদ্ধার'—এ সকল পড়িয়া কি আর হাসিতে পারা যায়?

যাঁদের শরীরে কণামাত্র মনুষ্যত্ব আছে, যাঁহার ধমনীতে বিন্দুমাত্র মনুষ্যের রক্ত প্রবাহিত হয়, তিনি কখনই এ সকল পড়িয়া বা দেখিয়া হাসিতে পারিবেন না—হাসিতে গিয়া অশ্রু যেন তাঁহার অনিবার্য হইয়া পড়িবে।"

চারিত্রিক অধোগামিতা : 'সধবার একাদশী' প্রহসন সৃষ্টির পশ্চতে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুসরণ লক্ষিত হয়। কিন্তু দীনবন্ধুর প্রহসনে অটল প্রথম থেকেই যথেচ্ছভাবে ভদ্র-সজ্জন, বাবা-কাকাকে গালিগালাজ করেছে। পিতা-পুত্রের সংলাপ অংশে মদ্যপ চরিত্রহীন পুত্রের অধোগামিতার যথার্থ প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটন সম্ভব হলেও অটলের ভাষা ব্যবহারে দীনবন্ধু আর একটু সংযত হলে বোধ হয় দর্শক ও সমালোচকেরা কিছুটা স্বস্তি পেতেন। পিতা জীবনচন্দ্রের উপস্থিতিতে পিতৃতুল্য গোকুলবাবুকে আত্মবিস্মৃত অটল বলেছে,—

"গোকুলবাবু, ধরে বেঁধে পীরিত আর ঘষে মেজে রূপ কখনই হয় না।" (১।২) গোকুলবাবুকে একটু পরেই বলেছে,—

"আহা! কি রসের কথাই বল্লেন, অঙ্গ শীতল হয়ে গেল—কাল আমি দশ হাজার টাকা ভেঙে তার গহনা কিনে দিলেন, ঘর সাজ্য়ে দিলেন, আজ আমি তাকে ছেড়ে দিই আর উনি গিয়ে ভর্তি হন….(১।২)"

এই দুটি উক্তিতে অটলের অধোগামিতার বাস্তবচিত্র অঙ্কন সম্ভব হয়েছে সত্য, কিন্তু যেভাবে এই চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে নাট্যকারের রুচির সম্পর্কে সংশয় জাগে। শুধু অটল নয়। নিমচাঁদও যে আচরণ করেছে তাকে বলা যায় মাতালস্য নানা ভঙ্গি। অটলের পিতার প্রতিও সে শ্রদ্ধা দেখাতে পারেনি। জীবনচন্দ্র যখন হতাশভাবে তাঁর সম্পত্তি নষ্টের জন্য দায়ী করে নিমচাঁদের কাছে অনুযোগ করেছেন—তখন অত্যন্ত রূঢ়ভাবে এবং কিছুটা অশ্লীলভাবে নিমচাঁদ উত্তর দেয় "হাঁ বাবা, আমি তোমার কাল নিমে মামা।" (২।৩) শুধু অটলের বাবা নয় তার মাতার প্রতিও নিমচাঁদ কু-ইঙ্গিত করেছে। সে জীবনচন্দ্রকে বলেছে "তোমার মন্দোদরী আমার ভাগে পড়েছে—"(২।৩)

অশ্লীলতা : হাস্যরস সৃষ্টির জন্য নাট্যকার যুগরুচির উপর নির্ভর করে থাকেন। শুধু নাট্যকার কেন প্রত্যেক সাহিত্যিক দর্শক পাঠকের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করেন। গ্রন্থের জনপ্রিয়তার শর্তই এটি। 'সধবার একাদশী'র মধ্যে ভাষাগত, শব্দগত দিক দিয়ে যে অশ্লীলতার প্রকাশ লক্ষিত হয়েছে তা যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক দর্শকের চিত্ত পরিবর্তনের জন্যই ঘটেছে। সুতরাং দীনবন্ধুর নাটকের মধ্যে যে অশ্লীলতাটুকুর প্রকাশ ঘটেছে তাকে তৎকালীন যুগের প্রেক্ষাপটেই বিচার করা উচিত, নতুবা বিচারে কোথাও ভুল থেকে যেতে পারে। দীনবন্ধুর সপক্ষে মন্তব্য করতে গিয়ে আমরা দীনবন্ধুর পূর্বযুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে উনিশ শতকের পূর্বার্ধ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ রাজনৈতিক আবর্তের সাথে সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এক তীব্র জটিলতার মুখোমুখি হয়েছিল। রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হাত বদলের কালে একদল ম্যুৎসুদ্দি শ্রেণীর মানুষ বেনিয়া ব্রিটিশদের সহায়তা করে প্রচুর মুনাফা করে রাতারাতি হঠাৎ নবাব বনে গিয়েছিলেন। সেই হঠাৎ বড়োলোকেরা শিক্ষা দীক্ষায় ছিলেন পশ্চাৎপদ। কিন্তু বড়লোকের বাড়ীতে সংস্কৃতির চর্চা প্রয়োজন, নাহলে জাতে

ওঠা যায় না। সুতরাং কবিগান, টপ্পা, খেউড় এই অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত বিকৃত রুচির মানুষদের সংস্কৃতির চর্চার খোরাক জোগাতে লাগল। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে (১ম খণ্ড) এক স্থানে দেখি জামাইকে শ্বশুরালয়ে আটকে রাখার একান্ত মানসে শ্বশুর তাঁকে বলেছেন,—

"নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নতুন নতুন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।।"

এতো গেল অষ্টাদশ শতকের ব্যাপার। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কিছু সংখ্যক মানুষ। দেশের অধিকাংশ অবশিষ্ট-মানুষের অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরম্। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের মধ্যে যে রুচিহীনতা ও নীতি শৈথিল্য বাসা বেঁধেছিল তা তো এতটুকু নড়ল না বরং পাশ্চাত্য শিক্ষা সে সব মানুষকে যথার্থ মানুষ না করে অনুকরণসর্বস্ব, হুজুগপ্রিয় করে গড়ে তুলেছিল তাদের মধ্যে সভ্যতার ছদ্মবেশে গ্রাম অশ্লীলতার প্রকাশ ঘটতে লাগল। যুগসন্ধির ক্ষণে আবির্ভাব ঘটেছিল ঈশ্বর গুপ্তের। তাঁর রচনায় রয়েছে এর ছাপ। দীনবন্ধুও এই সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন। মধুসূদনও তাই। দীনবন্ধু এবং মধুসূদনের প্রহসনের নারী চরিত্রের স্বভাবের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় উভয় স্থানেই বৌদি ও ননদেরা এমন ভাষায় ঠাট্টা করেছে যা, আর যাই হোক, শ্লীল ও রুচিসঙ্গত নয়। যুগসন্ধির নাট্যকার দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিকে' রয়েছে বিকৃত গ্রাম্য সমাজের কথাচিত্র, আর 'সধবার একদাশী' প্রহসনে রয়েছে পথভ্রষ্ট এক মদ্যপ ইয়ংবেঙ্গলের জীবনের মর্মান্তিক পরিণতির চিত্র।

দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ উত্থাপনের মূলে তাঁর স্বাভাবিক (গ্রাম্য বা অসংস্কৃত) ভাষা প্রয়োগ। লৌকিক ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিমার্জনের ইচ্ছা দীনবন্ধুর ছিল না। তার ফলে শিষ্ট সমাজে নিন্দিত ভাষা সাহিত্যে প্রয়োগের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন নাট্যকার। বাক্য প্রয়োগে দীনবন্ধুর এই নাটকে অশ্লীলতার আঁচ রয়েছে কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতিতে,—

(ক) **শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ঃ** দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রহসনের মধ্যে সমাজে নিন্দিত মানুষদের চরিত্রই নিয়েছে প্রধান ভূমিকা। সুতরাং স্বাভাবিক-ভাবেই তাদের নিজস্ব শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। সমস্ত প্রহসন জুড়ে ব্যবহৃত হয়েছে অশ্লীল শব্দরাজি।

প্রথম অঙ্ক ঃ নেমোক্‌হারাম (১।১), পীলে (১।১), উপপতি (১।১) ব্রাণ্ডির ভাঁটি (১।১), মাইরি (১।১), বাঞ্চৎ (১।১) গুওটার (১।২) জাবর কাটা (১।১), সতাত বাপ (১।১)

দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ ভাতার (২।১), সুঁটকো মাগী (২।১), ছুক্‌রি (২।১) দূর ব্যাটা গর্ভস্রাব (২।২), রসকেলি (২।২), শালা (২।২), পুঙ্গির পুত (২।২), পুঙ্গির বাই (২।২), রমানাথের এঁড়ে (২।২), ফ্যাল্‌সানি (২।২), রেণ্ডি (২।৩), কুটনী (২।৩), পাতি লম্পট (২।৩) বেল্লিকটে (২।৩), আঁচাচ্চে (২।৪), আঁটকুড়ীর ব্যাটা (২।৪)

তৃতীয় অঙ্ক ঃ স্বর্ণখুরে গর্দভ (৩।১), বাণ্ডিল (৩।১), রারী (৩।১) ঘরের মাগ (৩।১), হালার পুত্র (৩।১) দূর বেটী কম্‌বক্তি (৩।২), দূর আবাগি

(৩।২) সাত জন্ম থুবড়ো (৩।২), শালা মাগমুখো (৩।২) আস্তাবলের বাঁদর (৩।২) মাগ কপালে (৩।৩), মর্কট (৩।৩), হারামজাদা (৩।৩), লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ি (৩।৩),

(খ) বাক্য ও বাগধারা প্রয়োগের মাধ্যমে অশ্লীল ইঙ্গিত ঃ 'সধবার একাদশী' প্রহসনের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগের মূল কারণ বাক্যপ্রয়োগে অশ্লীল ইঙ্গিত ও বাগধারা চয়নে অশ্লীলতার আমদানি। প্রকৃতপক্ষে অশ্লীল প্রসঙ্গের উপমা ও বাগধারা ব্যবহারে দীনবন্ধুর জোড়া মেলা ভার। কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক—

প্রথম অঙ্ক ঃ (১) তোমার স্ত্রীরও কি সংস্কার হয়েছে (১।১)

(২) বাবা ব্রান্ডির ভাঁটিতে না চোঁয়ালে ক্ষুধা হয় না (১।১)

(৩) নিম। তুচ্ছ কথা—তোমার বাবা যে বিষয় করেছেন, অমন বিষয় আমার থাক্‌লে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখ্‌তেম। (১।১)

(৪) ····তোর সঙ্গে যদি আর কথা কই কাঞ্চন যেন আমার মাগ হয়। (১।১)

(৫) ধরে বেঁধে পীরিত আর ঘষে মেজে রূপ (১।২)

দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ (১) তুই যে ভাতার কাম্‌ড়া তুই আবার অন্য লোককে দিবি (২।১)

(২) কিন্তু তোমার ভেয়ের কিছুই কত্তে পাল্যেম না—তুমি যে নবীন ছুক্‌রি রূপের ডালি ঘরে রয়েছ, তাই বুঝি হেরে যাচ্চি। (২।১)

(৩) তুই বুঝি লুক্‌য়ে লুক্‌য়ে দেখিস্, আর ভাবিস্, কিছাঁ-ই বেরালে মেরেচ!····(২।১)

(৪) জগন্নাথ বেতারিবৎ নয়, দাদার মুখে কাপড় দিয়ে রসকেলি করেন (২।২)

(৫) ব্যাটা খাবেন ব্রাণ্ডি, মন্ত্রের ধূম দেখ, ভাদ্রবয়ে'র কাছে শোবেন, মাজে একটা বালিস দিয়ে,····(২।২)

(৬) হালা বাহ হালা, ই কি তোর কলকত্তাই মাগ, উনি লোকের লগে খারাপ কাম্ করবে—বাগ্যদরী বাইবাতার করবে, স্যাও বালো, পরের লগে দেহ দেবে না কোন দিন। (২।২)

তৃতীয় অঙ্ক ঃ (১) বলতে কি, বড়ো রাণীর অধর চুম্বন করে থুথু খেয়ে মরিচি, লোকলজ্জা ভয়ে মাগীর তামাক পোড়া মাথা থুথুগুলোকে সুধা বলিচি,···(৩।১)

(২) ···এহানে অ্যাসে দ্যাহো, পুঙ্গির বাই হালা মাতাল হইয়া ম্যারে ফেল্‌চে, বাগ্যদরীরে রারী কর্‌চে,....(৩।১)

(৩) আমাগোর মাষ্টের বঙ্গোচন্দ্র বলেন, কোম্‌ডা গর্বস্রাব, কোম্ আহেনও, যানও আর কহন কহন থাহেন্। (৩।১)

'সধবার একাদশী' প্রহসনের অসংখ্য অশ্লীল সংলাপের এগুলি গুটি কয়েক দৃষ্টান্ত মাত্র। কুমুদিনী সৌদামিনীর কথোপকথনের মাধ্যমে বধূ ও ননদের মধ্যে পারস্পরিক স্থূল পরিহাসের

যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা বঙ্গগৃহের বাস্তব চিত্র হলেও একথা অস্বীকার করে লাভ নেই সংলাপগুলি আদৌ মার্জিত নয়; শ্লীল নয়। তাছাড়া পিতা-পুত্রের সংলাপ অংসে মদ্যপ চরিত্রহীন পুত্রের অধোগামিতার সম্ভব প্রতিচ্ছবি দেখানো সম্ভব হলেও নাট্যকার অটলের ভাষা ব্যবহারে আর একটু সংযত হলে বোধ হয় ভালো হত।

নিছক প্রহসন কিনা : নাট্যতাত্ত্বিকদের মতে সার্থক প্রহসনের উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলি নিম্নরূপ—

(i) প্রহসনের কাঠামো এক অঙ্কে বিন্যস্ত হয়। 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে প্রহসনের অঙ্ক সংখ্যা উচিত দুটি। কিন্তু কারও কারও মতে প্রহসনের কাহিনী তিন অঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

(ii) প্রহসন হবে স্বল্পায়তন বিশিষ্ট। সধবার একাদশী ও স্বল্পায়তনের নাটিকা।

(iii) প্রহসনের চরিত্রগুলি হবে টাইপ ধরনের। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে এই চরিত্রগুলি। এ সম্পর্কে চরিত্র চিত্রায়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

(iv) প্রহসনের বিন্যাস সাধারণত হয় নক্সাধর্মী। একটা ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার প্রত্যক্ষ মিল খুঁজে পাওয়া সবসময় সম্ভব হয় না। 'সধবার একাদশী' এ শর্তের কিছু বাইরে থেকেছে।

(v) চরিত্রগুলির সংলাপ হয় জীবন্ত, কেননা তারা তাদের নিজেদের ভাষায় নিজ নিজ পরিবেশে কথা বলে। প্রহসনের সব চরিত্রই জীবন্ত।

(vi) প্রহসনে মানুষের জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির চিত্র আঁকা হয়। এখানেও তা দেখা গেছে।

(vii) হাস্যরস প্রহসনের অঙ্গীরস—তবে আধুনিক জীবন যন্ত্রণার বেদনা প্রহসনের হাল্কা শরীরে কারুণ্যের মৃদু ছোঁয়া রেখে যাচ্ছে।

(viii) প্রহসন নীতি শিক্ষা দেয় না—সমাজ ও সামাজিকের দুর্বলতম স্থানগুলি দেখায় মাত্র—সংশোধনের দায়ভাগ নেয়না সে।

প্রহসনের এই আঙ্গিকগত লক্ষণগুলি দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকে সার্থক-ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কাহিনীর সংক্ষিপ্ততায়, তিন অঙ্কের কাহিনীবিন্যাসে—প্রতি অঙ্কে দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের স্বল্পতায় স্পল্পাবকাশে বক্তব্যের ক্ষেত্রে মহাকাব্যিক বিশালতা এনেছেন নাট্যকার।

সধবার একাদশী নাটকের চরিত্রগুলি টাইপধর্মী। এরা এক একজন এক এক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে। অটলবিহারী, রামমাণিক্য, ভোলা, নকুলেশ্বর নিমচাঁদ, দামা, কাঞ্চন, কেনারাম ডেপুটি, জীবনচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র প্রভৃতি চরিত্র স্ব স্ব শ্রেণীর ভূমিকা যথাযথ পালন করেছে। পূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তারা যে ভাষা ব্যবহার করেছে তা কোলকাতার কক্‌নিবুলি ক্যানারিজম্ ও আছে এই ভাষায়। সমস্ত প্রহসন জুড়ে 'জাবরকাটা', 'সতাত বাপ' 'দূর মাগী', 'দূর ব্যাটা বক্কেশ্বর' 'হাঁড়ি চাঁচা', 'সোমত্তো মাগ', 'সুঁট্‌কো মাগী' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে একদিকে যেমন চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে অন্যদিকে সেই চরিত্রগুলির সাথে সাথে তৎকালে শাঁখারী পাড়ার একটা চিত্রও স্পষ্ট হয়েছে অর্থাৎ স্বপরিবেশে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়েছে তাদের নিজস্ব সংলাপে।

প্রহসনে সাধারণত সমাজের কোনো বিকার কিংবা সামাজিক চরিত্রে কোনো

অসঙ্গতি দেখানো হয়ে থাকে। দীনবন্ধু তাঁর 'সধবার একাদশী' প্রহসনে সমাজের নানা দোষ-ত্রুটির বাস্তবচিত্র এঁকেছেন। এই প্রহসন রচনার পেছনে দীনবন্ধুর যে একেবারে কোনও উদ্দেশ্য ছিল না এমন নয়—সমাজশোধন করার একান্ত ইচ্ছাতেই তিনি প্রহসন রচনার ব্রতী হয়েছিলেন, 'নীলদর্পণে'র সফলতাই প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সমাজ হিতব্রতী করে তুলেছিল। জীবনের হাস্যকর অসঙ্গতির চিত্র আঁকতে গেলে চরিত্রগুলি বিশেষ ছাঁদের হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে 'সধবার একাদশী' প্রহসনেও দেখা যায় মদ্যপের টাইপ চরিত্র নিমচাঁদ, 'কলকাত্তা'ই হবার চেষ্টায় যথাসাধ্য চেষ্টিত গ্রাম্য জমিদার চরিত্রের ছাঁচে রামমাণিক্য, গণিকা সমাজের প্রতিকারি অর্থলিপ্সু কাঞ্চন, কতিপয় অযোগ্য মূর্খ ডেপুটি সমাজের প্রতিনিধি কেনারাম, ধনবান পিতার উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের প্রতিকারি চরিত্র অটলবিহারী।

'সধবার একাদশী' প্রহসন জাতীয় রচনা। হাস্যরস এই নাট্যকেরও অঙ্গীরস। কিন্তু হাস্যরসই এই নাটকের একমাত্র রস নয়। সুগভীর সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'তে একই সঙ্গে ট্র্যাজিক ও কমিক উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দীপ্ত সূর্যের অসহ দহনে দগ্ধ দ্বিপ্রহরের পর সান্ধ্য মিলনের স্নিগ্ধ অবকাশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা এখানে নেই। ঘটনাশ্রয়ী চরিত্রকেন্দ্রিক স্খলন-পতনের হাস্যরসটুকুই এখানে উপভোগ্য—সাথে সাথে উপভোগ্য নিমচাঁদ চরিত্রের অবক্ষয়িত অন্তর্জীবনের গভীর বেদনাও আত্মিক সংকটের তীব্র হাহাকার।

'সধবার একদাশী' প্রহসনের মধ্যে শিক্ষায়, দীক্ষায়, মনুষ্যত্বের উপলব্ধিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র নিমচাঁদ। তার একমাত্র দোষ অতিরিক্ত মদ্যপান। ইংরেজি শিক্ষার সুরাপানেও সে মাতাল। নিজ উচ্চশিক্ষা ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সে মাতলামির মধ্যেও পূর্ণ সচেতন। উচ্ছৃঙ্খল, অনাচারী ইয়ংবেঙ্গল দলের প্রতিনিধি সে। তার বক্তব্যের মধ্যে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ মাঝে মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মদ্যপান এবং অনাচারে তার সেই প্রতিভার অপমৃত্যুটুকুও একই সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। নিমচাঁদের অনাচার আর কিছুতে নয় মদ্যপানে এবং মদ্যপানে। নারীঘটিত চারিত্রিক অবনমনের স্তরে নামতে তার রুচিতে বাধে। তবে বেশ্যার বাড়ীতে যাতায়াতে সে বেশ স্বচ্ছন্দ। সেটা মদ্যপানের লোভেও হতে পারে। ইংরেজি শিক্ষাভিমানে অহঙ্কারী নিমচাঁদের মর্ম যন্ত্রণার একমাত্র কারণ স্বাধীনচেতা হয়েও তাকে শ্যালকের বাড়ীতে বসবাস করতে হচ্ছে। সে অকপটে স্বীকার করে সে পরাশ্রয়ী, সে বড়লোকের মোসাহেবী করে মদের খরচ চালায়। নেশার ঝোঁকে তাই সে যখন আত্মধিক্কারে ভেঙে পড়ে তখন নিমচাঁদের প্রকৃত সত্তাকে আমরা যেন ছুঁতে পারি। ঠিক সেই মুহূর্তে মদ্যপ পরাশ্রয়ী নিমচাঁদ—পিতা-মাতার আশাভঙ্গের বেদনায় ব্যথিত নিমচাঁদ, স্ত্রীর করুণ মুখ স্মরণকারী নিরুপায় নিমচাঁদ, আত্মীয়বর্গের স্নেহসম্পদ-বঞ্চিত নিমচাঁদের আচরণগত শৈথিল্যে আমরা হাস্যমুখর হয়ে উঠতে পারি না। তাই প্রহসনে রসমন্ত উপাদান থাকা সত্ত্বেও 'সধবার একাদশী' নিছক রঙ্গরসাত্মক প্রহসন হয়ে যায় নি। ড. সুশীলকুমার দে 'সধবার একদাশী'র মূল্যায়ন করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন,—

> "যাহারা ইহাকে (সধবার একাদশী) কেবল জঘন্য মাতলামি ও বখামির বিবরণ মনে করেন, তাঁহারা ইহার মর্মগ্রহণ করেন না।"

সংলাপ : দীনবন্ধুর সাহিত্য কীর্তির সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান এর চরিত্রগুলির সংলাপ।

কেননা এই সংলাপই একদিকে চরিত্রগুলির বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিচারের সহায়ক হয়েছে অন্যদিকে এই সংলাপ প্রয়োগ নিয়েই তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছে। সার্থক সংলাপ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে স্বাভাবিকতা এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই প্রহসনে যে শ্রেণীর চরিত্রসৃষ্টি করা হয় তার ভাষাও তার নিজস্ব হওয়া প্রয়োজন। দীনবন্ধু এই সহজ কথাটা জানতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও দীনবন্ধুর এই মানসিকতাকে যথার্থভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। তিনি তাই দীনবন্ধুর নাটক প্রহসন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর স্বাভাবিকতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর জোর দিয়েছেন। দীনবন্ধু ছিলেন বাস্তব অভিজ্ঞতার রূপকার, সুতরাং রুচি-অরুচির মুখ রক্ষা করতে গিয়ে চরিত্রগুলির সংলাপকে মার্জিত বা পরিবর্তিত করার পক্ষপাতি ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলেছেন,—

> "...তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মতো থাকে না, আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না, নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মত থাকে না।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাই দীনবন্ধুর সম্পর্কে উত্থাপিত অশ্লীলতার অভিযোগের প্রত্যুত্তরেই যেন জানিয়েছেন যে রুচির মুখ রক্ষা করে দীনবন্ধু 'সধবার একাদশী'র চরিত্রগুলির মুখে মার্জিত ভাষা প্রয়োগ করেন নি বলেই,—

"....আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখরক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী ভাঙা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।"

'—সধবার একাদশী' সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশংসা ও নিন্দা যে এর সংলাপের উপর নির্ভলশীল সে কথা পূর্বেই বহু উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করেছি।

'সধবার একদাশী'র সংলাপে জীবন্ত ভাব আছে সত্য কিন্তু সে জীবনের রঙ বড়ো ঘোলাটে। পঙ্কিল আবর্তের ভিতর থেকে ছিট্‌কে আসা মিথেন গ্যাসের মতো মাঝে মধ্যে তা শুচিবায়ুগ্রস্ত মনকে বড় পীড়িত করে। শ্লীলতা ও অশ্লীলতার মাত্রাবোধক কোনও স্পষ্ট সীমারেখা এখানে টানা বড়ো দুষ্কর। জেলেপাড়ার বাড়ীর দেওয়ালগুলোতেও যেমন আঁশটে গন্ধ স্থায়ী হয়ে যায় 'সধবার একাদশী'র অধিকাংশ উপমা প্রয়োগ, বাগ্‌ধারা প্রয়োগেও তেমনি মেলে অশ্লীলতার অস্বস্তিকর গন্ধ। নিমচাঁদের কথার বাঁধন ছাঁদন নেই। সে বার কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত করেছে। কথা প্রসঙ্গে সে অটলকে বলেছে "...তোর সঙ্গে যদি আর কথা কই কাঞ্চন যেন আমার মাগ হয়।" (১।১) নারী চরিত্রগুলিও অশ্লীল ইঙ্গিত করায় পিছিয়ে নেই। বৌদি কুমুদিনী ননদকে বলে—"কিন্তু তোমার ভয়ের কিছুই কত্তে পাল্যেম না—তুমি যে নবীন ছুকরি রূপের ডালি ঘরে রয়েচ, তাই বুঝি হেরে যাচ্চি।" (২।১) বাঙ্গাল রামমাণিক্যের ব্রাণ্ডি খাবার জন্য মন্ত্রপাঠ দেখে নিমচাঁদ বলে "ব্যাটা খাবে ব্রাণ্ডি, মন্ত্রের ধূম দেখ, ভাদ্রব'য়ের কাছে শোবেন, মাজে একটা বালিশ দিয়ে।" (২।২)

'সধবার একাদশী' প্রহসন সংলাপ রচনায় দীনবন্ধুর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সুগভীর সহানুভূতিবোধের কথা স্বীকার করেও বলা যায় দীনবন্ধু পূর্বসূরীদের প্রভাবকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মতই কাজে লাগিয়েছেন। দীনবন্ধুর সাহিত্যগুরু 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক

ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব এই প্রহসনে প্রায়ই দৃষ্ট হয়—বিশেষ করে স্বতঃস্ফূর্ত গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে। মাইকেল মধুসূদনের প্রহসন দু'টি—বিশেষ করে, তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের প্রভাব দীনবন্ধু অতিক্রম করতে পারেন নি। ভাব, বক্তব্য এবং সংলাপ সজ্জায় অনেক স্থানে এই দুই নাট্যকারের নিম্নোক্ত দুটি গ্রন্থের অংশ বিশেষের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়,—

একেই কি বলে সভ্যতা

"প্রসন্ন। ছি, যাও মেনে বউ।
নৃত্য। ও মা, ছি! ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা!

প্রসন্ন। তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লো?
হর। কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাতেও যায় না, আর বোনের গায়েও হাত দেয় না; আর যা করুক,..."

❑ সধবার একাদশী

"সৌদা। তবে ইংরেজি পড়ার দোষ।
কুমু। কেন গোকুল কাকা কি ইংরিজি পড়েন নি? চন্দ্রবাবু যে কালেজে পাঁচ বচ্ছোর চাল্লিশ টাকা করে জলপানি পেয়েচেন, বিরাজের ভাতার যে ইংরেজি টোলের ভট্‌চায্যি হয়ে বেরুয়েচে, এরা কি মাগকে একা রেখে বাগানে কাঞ্চনকে নিয়ে আমোদ করে...."

এই দৃশ্যেই কুমুদিনী যে ভাষায় তার ননদের সঙ্গে রসিকতা করেছে, তা ওই সময়কার বিশেষ সামাজিক মানসকে উদঘাটিত করেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে সে মধুসূদন ও দীনবন্ধু উভয়ের রচনাতেই একই ধরনের অন্তঃপুর দৃশ্য রয়েছে—রসিকতাটিও একই ধরনের—

একেই কি বলে সভ্যতা

হর। "...সে যা হউক, ঠাকুরঝি, তুই ভাই তোর দাদাকে নে না কেন? আমি না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি..."

সধবার একাদশী

"কুমু। তোর বশের যদি এত জোর, তোর ভাইকে দিয়ে কেন দেখা না?
সৌদা। তোদের বুঝি হয়ে থাকে তাই বলচিস।"

নিমচাঁদের উক্তিতে একদিকে যেমন রয়েছে অশ্লীলতার প্রাধান্য অন্যদিকে সে যে ইংরেজিটা বেশ ভালো জানে এটা বার বার বোঝানো হয়েছে তার উক্তিতে ইংরেজি কোটেশান যোগ করে।

একেই কি বলে সভ্যতার সঙ্গে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য : ভাষা, বিষয়বস্তুগত দিক থেকে কিছু কিছু মিল লক্ষ্য করে কেউ কেউ বলেছেন মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের অনুসরণে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রহসনের সৃষ্টি। উভয় নাটকে মাতাল এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাতের দৃশ্যের ভাষাটিও প্রায় একরকম। সার্জেন ও পাহারাদারের আগমন—তাদের সঙ্গে 'সধবার একাদশী'র মাতাল নিমচাঁদের কথোপকথন দৃশ্য 'একেই

কি বলে সভ্যতা'র বাবাজীর সঙ্গে সার্জেন ও চৌকিদারের কথাবর্তার দৃশ্য 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বাবাজীর সঙ্গে সার্জেন ও চৌকিদারে কথাবার্তার মূল ভাবে, কিছু মিল আছে। কিন্তু বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নববাবুর মধ্যে নেই নিমচাঁদের পাণ্ডিত্য কিংবা আত্মাভিমান, নেই রক্তাক্ত হৃদয় সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখা প্রতিচ্ছবি। নববাবু শেষ পর্যন্ত তার পিতার নির্দেশ মেনে নিয়েছে। মদ্যপানের হাত থেকে পুত্রকে রক্ষা করার জন্য পিতা তাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাবার কথা ঘোষণা করেছেন—কিন্তু 'সধবার একাদশী'তে রামধনের হাতে প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হয়েও অটল বা নিমচাঁদ কারও চৈতন্য হয়নি। উভয়েই আবার এই প্রহারের যন্ত্রণা ভোলার উদ্দেশ্যে বাগানে গিয়েছে মদ্যপান করতে। তাই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র উদ্দেশ্য প্রকট—প্রহসনে চিরাচরিত লক্ষণগুলি সেখানে উপস্থিত কিন্তু 'সধবার একাদশী প্রহসনে প্রহসনের ধারায় এক নূতন মাত্রা যোগ করেছেন দীনবন্ধু—সে মাত্রা আধুনিক জীবন যন্ত্রণার। পরবর্তীকালে উৎকৃষ্ট প্রহসন রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে যে গ্রন্থগুলি সেগুলির মধ্যে রয়েছে হাসির অন্তরালে অশ্রু।

অটল : ধনী পিতামাতার একমাত্র পুত্র অটল। স্বল্প শিক্ষায় আধা-মার্জিত, কুসংসর্গে পড়ে বাবু কালচারে সিদ্ধ। সামান্য শিক্ষা যা সে পেয়েছে তাতে তার অন্তরের সঙ্কালতা ঘোচেনি। নিমচাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত সুচতুর কথা তাৎপর্য অনুধাবন করা তার সাধ্যাতীত। কিন্তু তবু সে যখন আপন শিক্ষাভিমান চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নিমচাঁদকে বলে যে সে 'মেঘনাদবধ কাব্য' কিনেছে, প্রত্যুত্তরে স্পষ্ট বক্তা নিমচাঁদ জানায়—এই গ্রন্থের ভালো মন্দ বোঝা তার সাধ্যাতীত কেননা তার পূর্বপুরুষেরা দাশরথি কাশীদাস পড়েছেন, সুতরাং তাদের উত্তরপুরুষের হাতে 'মেঘনাদ বধ' যেন 'কাঠুরের হাতে মানিক'। অটল নিমচাঁদের কথার প্রতিবাদ করতে পারে না।

অটলের ঘরে সুন্দরী স্ত্রী। স্বামী অনুরক্তা সাধ্বী পত্নী তার, কিন্তু বারবণিতার বিলাসে এমন মোহান্ধ সে যে বেশ্যা ছাড়া তার একদিনও চলে না। তার এই বেশ্যা কামনা প্রকাশ্য—বেশ্যাগমনও প্রকাশ্য—পিতা, মাতা, ভগিনীর সাক্ষাতেই সে এই হীনকর্মে প্রবৃত্ত হয়। শুধু তাই নয়, আলালের ঘরের দুলালের মতো বাবা-মার কাছে আবদার করে বেশ্যাকে তার কাছে এনে দেবার জন্য। মদ্যপ অটল কাণ্ডজ্ঞান বর্জিতভাবে বেশ্যার প্রসঙ্গ নিয়ে বাবা ও শ্বশুরের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলেছে তাও যথেষ্ট নিন্দনীয়, পিতৃপ্রতীম জীবনচন্দ্র তাঁকে বেশ্যা সংসর্গ ত্যাগ করার উপদেশ দিলে অটল বলে,—

"বেরয়ে এলেম বেশ্যা হলেম
কুল কল্যেম ক্ষয়।
এখন কিনা ভাতার শালা
ধমকে কথা কয়!" (১।২)

দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রহসন মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আদর্শে রচিত হয়েছিল। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় নববাবুর কথাবার্তা আচার আচরণ অনেকটাই অটলের চরিত্রে সুপরিস্ফুট।

অটলের গৃহে সুন্দরী ও গুণবতী স্ত্রী তবু সে বারবনিতা বিলাসী; এর মূলেও দায়ী

তার বাবু কালচার। অন্যের চোখে বাবু হবার মদগর্বী বড়মানুষীর কারণেই সে কাঞ্চনের মত বেশ্যাকে ডেপুটির চেয়ে বেশি মাসিক বেতন দিয়ে রেখেছে। তার গর্বোদ্ধত উক্তি—

'সহরের প্রধান চিজ কাঞ্চনমণি মাথায় ধরিচি।' (২।২) অটলের স্ত্রী কুমুদিনী স্বামীর এই বাবুগিরির কথা জানে। তাই সৌদামিনীকে বলেছে নিজের দুঃখের অনুভূতির কথা— বাবু কালচারে অভ্যস্ত অটল সম্পর্কে তার স্ত্রীর ধারণা,—

"রূপ, গুণ, বয়েস তোমার দাদা ও চায় না, কিসে লোকে বাবু বল্‌বে, কেবল তাই দেখে...."(২।১)

বাবু সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক মদ্যপ অটল যখন বারবনিতার কাছে আঘাত খেয়েছে—শত ঘাটের জলের সঙ্গে সম্পর্ক যে পতিতার, তাকে আগলে রাখতে গিয়ে যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখন দুর্দৈবের বশবর্তী হয়ে সে ঘরের কুলবধূকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। যাকে নিয়ে তার এই কু-পরিকল্পনা—সেই রমণী গোকুলবাবুর স্ত্রী—সম্পর্কে অটলের কাকীমা। অটলের নিযুক্ত হিঁজড়া গোকুলবাবুর স্ত্রীকে অপহরণ করতে গিয়ে সামান্য ভুলের জন্য তুলে নিয়ে এসেছে অটলের স্ত্রীকেই। এই দৃশ্যে গোকুলবাবুর স্ত্রীর বদলে কুমুদিনীকে দেখতে পেয়ে অটলের যে ব্যবহার তা ঐ শ্রেণীর মানুষের চরিত্রের রূপকে আরও স্পষ্ট করে। নৈতিক শিক্ষা দিয়ে আঘাতের মাধ্যমে চরিত্রের আমূল পরিবর্তনের কোন দূরভিসন্ধি নাট্যকারের ছিল না। তাই রামধনের হাতে অপকর্মের জন্য প্রহৃত হয়ে অটল যখন বেদনায় কাতরাচ্ছে তখন কুমুদিনীর এক কথার উত্তরে অটল তিক্তকণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠেছে,—

> "তোমার আর লেক্‌চার দিতে হবে না, তুমি আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর যাও, উনি আবার আমার কাছে গিন্নীপনা কত্তে এলেন।" (৯৩।৩)

শুধু তাই নয়, রাগে ক্ষোভে কুমুদিনী 'যমের বাড়ী যাই' বলে বেরিয়ে গেলেও এবং মদ না খাবার প্রতিজ্ঞা করলেও অটল দোসর নিমচাঁদকে পেয়ে গায়ের ব্যথা কমানোর জন্য মদ্যপান করতে আবার বাগানে চলে গেল।

সুতরাং অটল চরিত্রটি একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে সেই শ্রেণী—বাবু শ্রেণী। শুরুতে তার চরিত্রের অবস্থান যেখানে নাট্যকাহিনীর শেষ সেখানেই। অর্থাৎ অটল চরিত্রে কোনও ধারাবাহিক রূপান্তর বা বিবর্তন নেই। টাইপ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাই-ই।

নিমচাঁদ : 'সধবার একাদশী' প্রহসনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র নিমচাঁদ। এই চরিত্রের পরিকল্পনায় নাট্যকার দীনবন্ধুর চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। কোনও কোনও সমালোচক মনে করেছেন, বাস্তবের ঘটনা ও চরিত্র ছাড়া কোনও সাহিত্য রচনায় অসমর্থ দীনবন্ধুর এই জনপ্রিয় চরিত্রটির মূলে একজন সচল ব্যক্তি ছিলেন তিনি মধুসূদন দত্ত। কিন্তু একথা সর্বাংশে মেনে নেওয়া যায় না। দীনবন্ধুকে সে কথা জিজ্ঞাসা করায় নাট্যকার উত্তর দিয়েছিলেন 'মধু কি কখনও নিম হয়?" প্রকৃতই তাই হয় না। মধু কখনও নিম অর্থাৎ তেতো হয় না। মধুসূদনের সমগ্র কার্যাবলীর মধ্যে তাঁর উচ্চশিক্ষার পরিচয়ের সাথে সাথে এক উচ্চতর প্রতিভার স্পর্শ মিলে—নিমচাঁদের চরিত্রে তা নেই। আসলে নিমচাঁদের শিক্ষার ফল অধিকাংশ ইয়ংবেঙ্গলের মতই বাইরে রয়ে গেছে, মজ্জায় গিয়ে প্রবেশ করে উচ্চতর জীবনাদর্শ গঠনে সহায়তা করতে পারেনি।

নিমচাঁদ দত্তের চরিত্রে সবই গুণ দোষ কেবলমাত্র মদ্যপান। কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান নিমচাঁদ

মদ্য পান করে করে নিজ জীবনকে নিয়ে চলেছে এক অতলান্ত গভীর খাদের দিকে। বাবুদের অন্ধ মোসাহেব নয় সে—অটলবিহারী এবং নকুলেশ্বরবাবুর মতো সমাজের মাথাদের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সমর্থ। কেননা এক অহং তেজস্বিতায় প্রতিনিয়ত টগবগ করে যেন ফুটেছে সে। সে নিজে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন—সে জানে শিক্ষার শক্তিতে সে অন্যের থেকে কতখানি শক্তিশালী। অটল তার পিতৃপ্রতীম গোকুলবাবুকে বলেছে—'নিমচাঁদ যে ইংরিজি জানে তোমাকে জলে গুলে খেয়ে ফেল্‌তে পারে।' নিজের ইংরাজী শিক্ষা তথা পাণ্ডিত্যের সম্পর্কে নিমচাঁদের আত্মম্ভরিতাও বড়ো কম নয়। সে আপন শিক্ষাভিমানে একধার থেকে সবাইকে আহত করতে চেষ্টা করেছে। কেনারাম ডেপুটি, ভোলা, অটল কেউ ভাবে বাদ যায় নি। অটল যখন বলেছে সে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' কিনেছে তখন নিমচাঁদ তির্যক ভঙ্গিতে তাকে একহাত নিয়েছে। আবার কেনারাম ডেপুটির সঙ্গে কথোপকথনের সময় কেনারামকে সে যেভাবে আক্রমণ করেছে তা প্রমাণের জন্য কয়েকটি সংলাপ তুলে ধরলেই যথেষ্ট,—

"অটল। ডেপুটি বাবু ইংরিজিতে খুব লায়েক।

নিম। কেটে জোড়া দেন। বুদ্ধির দৌড় ঘটিরামেই প্রকাশ হয়েছে।

কেনা। আপনি কোথায় পড়েছেন?

নিম। গৌরমোহন আড্‌ডির স্কুলে।

কেনা। আমি পড়িছি কালেজে। গৌরমোহন আড্‌ডির স্কুলে পড়লে খুব বিদ্যা হয় না, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও হতে পারে না।

নিম। আর কলেজে পড়লে ঘটিরাম ডেপুটি ও হ'তে পারে, কেব্‌লা হাকিমও হ'তে পারে—বাবা, সুকৃতলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছে, বিদ্যার জোরে হও নি..." (২।২)

আত্মশক্তি-সচেতন নিমচাঁদের গরল উদগীরণের এক অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ এটি। তার চরিত্রের এক বড়ো বৈশিষ্ট্য আত্মাভিমান। এই বৈশিষ্ট্যের বশেই সে গরল উদগীরণ করেছে বিভিন্ন সময়ে—কখনও ঈর্ষায়, কখনও ব্যঙ্গে, কখনও প্রতিবাদ জানাতে। বস্তুত পক্ষে নিজ জীবনের অপূর্ণতা এবং হতাশা সদা সর্বদা নিমচাঁদকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ডেপুটির উন্নতি তার কাছে ঈর্ষণীয় বলেই সে তাকে আঘাত করেছে—'বাবা, শুকতলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছ, বিদ্যার জোরে হওনি।' সঙ্গে সঙ্গেই আত্মাভিমানী নিমচাঁদ জানিয়ে দিয়েছে নিজ বিদ্যার বিস্তৃতির কথা। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির চাপে সর্বরকম ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আপন শিক্ষার প্রচণ্ড অহংকারে উত্তেজিত হয়ে সে বলেছে,—

"তোমার কালেজের একটাকে দেখাও দেখি আমার মত ইংরিজি জানে—I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English.····"(২।২)

নিমচাঁদের সরলতা, কুটিলতা ও দ্বেষ সবই কটুতাপূর্ণ। তার খররসনা সদা সর্বদা সর্বত্র বিস্তারী বিষ বর্ষণ করেছে। নকুলেশ্বর সুরাপান নিবারণী সভায় নাম লেখাবার কথা উত্থাপন করা মাত্রই সে বলে,—

"বাবা ব্রাণ্ডির ভাঁটিতে না চোয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না; তুমি নাম লেখালে, সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা নিতে হবে।" (১।১)

রামমাণিক্য সর্বসমক্ষে মদ পান করার কালে মদ্যশোধন করতে শুরু করলে নিমচাঁদ তিক্ত ভাষায় তাকে ব্যঙ্গ করে,—

"ব্যাটা খাবে ব্রাণ্ডি, মন্ত্রের ধূম দেখ, ভাদ্রব'য়ের কাছে শোবেন, মাজে একটা বালিস দিয়ে—' (২।২)

গর্বিত আত্মভিমানী, উন্নতচেতা নিমচাঁদের চরিত্রের আসল ক্ষত তার পরনির্ভর সাংসারিক দিনযাত্রার বেদনায়। স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি তার। সেই যন্ত্রণার ক্ষত সারাবার জন্যই বুঝি তার মদ্যপান এবং এই শ্যালক নির্ভর কুৎসিৎ জীবনযাপন। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসও সে করতে পারেনি কোনও এক অজ্ঞাত কারণে। বেশ্যালয়ে যায় সে অটলের মতো বাবুদের মোসাহেব হয়ে কেবল বিনা পয়সায় মদ্যপান করার সুযোগ পাবে বলে। কিন্তু কুলনারীদের সম্পর্কে সম্ভ্রমবোধ তার চিরকাল অটল। তাই নিমচাঁদের কাছে অটল যখন গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বের করে আনার প্রস্তাব করে এখন নিমচাঁদ অটলের এ প্রস্তাব কোনমতেই সমর্থন করতে পারে না। লাম্পট্যের শিখরজয়ী বাবু অটল সহচর নিমচাঁদের এ কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বলে,—

"অটল। তুই তবে তোর মেগের কাছে যা।

নিম। Thou stickest a dagger in me. অটল কি গালাগালিই তুই দিলি।" (৩।২)

নিমচাঁদের এই অন্তর্বিদারী আর্ত চীৎকারই তার দাম্পত্য সম্বন্ধের পূর্ণ চিত্রের উদ্ভাস ঘটায়। নিমচাঁদ চরিত্রে ট্রাজেডির বীজ এখানে উপ্ত। শুধু তাই নয় আত্মগর্বী নিমচাঁদ যে আজ অদৃষ্টের ফেরে শ্যালকের অন্নে প্রতিপালিত। ভদ্রলোকের কাছে সে বলতে পারে না তার এই পরজীবী হয়ে থাকার লজ্জার কথা। কেনারামের প্রশ্নের উত্তরে সে পাশ কাটাতে চাইলে তার ব্যথার স্থানে খুঁচিয়ে দেয় নির্বোধ অটল। সবাইকে জানিয়ে দেয় সে—ঘরজামাইকে সবচেয়ে ঘৃণা করে যে নিমচাঁদ, যে নিমে দত্ত 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়' বলে আস্ফালন করে, সেই নিমচাঁদ ঘোষের বাড়ীর ঘরজামাই। কষ্ট করে দিয়ে রাখা আবরণ টান মেরে দিলে দেওয়ার সেই মুহূর্তে নিমচাঁদ ক্ষোভে, অভিমানে, মদ্য-বিকারের পদ্ধতিক্রমে নিদারুণ যন্ত্রণায় উচ্চারণ করেছে,—

"ধর্ম অবতার।...শ্রুত আছেন, স্বনামো পুরুষো ধন্য পিতৃনামে চ মধ্যম, শ্বশুরের নামে অধম, শালার নামে অধমাধম—বিচারপতি আপনি হাকিম, ঘটিরাম, আমি সেই অধমাধম—শ্যামবাজারের মহেশ্বর ঘোষ আমার শালা, তাঁর বাড়ীতে থাকি; সেই শালার নাম না কল্যে, কোন শালা চিন্‌তে পারে না-হুজুর। বন্দা মজুর, ধামার ধামা দামার চাইতেও অধম।" (২।২)

নিমচাঁদের জীবনের এই অপূর্ণতার মূলে রয়েছে তার অর্থনৈতিক দৈন্য এবং নৈতিক অধঃপতন। দাম্পত্য জীবনে পড়েছে তারই ছাপ। স্ত্রীকে প্রতিপালন করার সামর্থ্য তার নেই বলেই সে দূর থেকে আরও দূরে সরে থাকতে চায়। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা, বাবা মার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তার মনের কোণে একবার হলেও উঁকি দিয়ে গেছে এবং তখন তার মনে হয়েছে—সে কি ছিল কী হয়েছে!

"রে ধর্মলজ্জামানমর্য্যাদা পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ। তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ। তুমি স্কুল হতে বেরুলে

একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যত দূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ। (৩।২)

নিমচাঁদ আত্মবিশ্লেষণ পরায়ণ হয়ে উঠেছে। আত্মবিকৃতি সম্পর্কে সে সচেতন। কিন্তু পরিশোধন করা তার সাধ্যের বাইরে।

নিমচাঁদ চরিত্র তাই নিছক কমেডি চরিত্র নয়—ট্র্যাজেডি চরিত্রও নয়—ট্র্যাজি-কমেডি চরিত্র। তার চরিত্র উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশের এক বিশেষ শ্রেণীর চরিত্রের প্রতিনিধি। গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে যে নিমচাঁদ তখনকার দর্শককে মদ্য পানের ভয়ঙ্করতা সম্পর্কে প্রতিনিয়ত জীবন্ত প্রমাণ দিত—মদপান নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠাতা প্যারীচরণ সরকার সম্ভবত এই চরিত্রটির দিকে তাকিয়েই দীনবন্ধুকে বলেছিলেন—তার যে বই (সধবার একাদশী) বের হয়েছে এবার তাঁর মদ্যপান নিবারণী সভা উঠিয়ে দিলেও চলে।

অপ্রধান চরিত্র : নাটকে অপ্রধান চরিত্রে ভূমিকা অপরিসীম। ক্ষণিকের জন্যে হলেও এই চরিত্রগুলির রূপায়ণ তখনই সার্থক বলে বিবেচতি হয়, যখন নাটকের প্রেক্ষাপটে এরা একটি গভীর প্রভাব রেখে যায়। নাটকে চরিত্রে সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্যই অপ্রধান চরিত্র সৃষ্টি নয়—এই শ্রেণীর চরিত্রে কয়েকটি বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে—

(i) প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি থেকে অপ্রধান চরিত্রগুলি প্রধান চরিত্রকে উজ্জ্বলতা দান করে।

(ii) কেবল প্রধান চরিত্রকে নিয়ে কাহিনী সম্পূর্ণ নয়; কাহিনীকে পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুট করে তুলবার জন্যে অপ্রধান চরিত্রের প্রয়োজন হয়।

(iii) প্রহসন বা নাটকের তত্ত্বকে পরিপুষ্টি দেবার প্রয়োজনেও অপ্রধান চরিত্রের ভূমিকা স্বীকার্য।

(vi) নাট্যকাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে অপ্রধান চরিত্র।

(v) নাটকীয় ব্যঞ্জনার অনেক সূক্ষ্ম যোগ রক্ষা করতে সমর্থ হয় এই শ্রেণীর চরিত্র।

তাই নাটকে বা প্রহসনে অপ্রধান চরিত্রের ভূমিকা সর্বতোভাবে স্বীকৃত।

'সধবার একাদশী' প্রহসনের কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনটি—অটল না নিমচাঁদ—তা নিয়ে মতদ্বৈধতা থাকতে পারে। অধিকাংশ সমালোচকই মনে করেন অটল এ প্রহসনের সব দৃশ্যেই প্রায় আছে, কিন্তু নিমচাঁদ যে দৃশ্যেই অটলের পাশে নেই, সে দৃশ্য অত্যন্ত একঘেয়ে মনে হয়েছে। তাই নিমচাঁদই এই প্রহসনের নায়ক। কেননা সেই অটলকে মদ ধরিয়েছে নিজের স্বার্থে, সেই স্বার্থরক্ষার খাতিরে সে অটলকে বেশ্যাসক্ত করিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে এক প্রচণ্ড অহংবোধ, অন্যদিকে অটল যেন নিমচাঁদের ছায়া—সচেতনভাবে সে তাকেই অনুসরণ করে গেছে। তা ছাড়া অটলের মধেও রয়েছে হীনমন্যতাবোধ। সুতরাং নিমচাঁদই এ কাহিনীর নায়ক।

অটল নিমচাঁদ ছাড়াও এই নাটকে অনেকগুলি চরিত্র আছে যেগুলি এই প্রহসনের মধ্যে এক এক শ্রেণীর চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করছে। তারা প্রহসনের কাহিনীতে কতটা অপরিহার্য এবার সে আলোচনায় প্রবিষ্ট হওয়া যাক—

নকুলেশ্বর : মদ্যপ এবং লম্পট। উকিল শ্রেণীর বিকৃত চরিত্রের প্রতিনিধি। একবার মদ্যপান অভ্যাস করে আর সহজে পরিত্রাণ পাচ্ছেন না। চেষ্টা করেও ছাড়তে পারছেন

না মদ। আত্মপক্ষ সমর্থন করে তাই তিনি বলেন—'রোগে জর্জরীভূত হয়ে মদ ছাড়া না ছাড়া সমান' (১।১) তাঁর মদ্যাসক্তির প্রকৃত উদাহরণ তাঁর আত্মস্বীকারোক্তি—'এত ভাবি, কম করে খাব, কিন্তু কেমন আকর্ষণ, দেখিবামাত্র প্রাণটা লাপ্‌য়ে ওঠে।' (১।১) নকুলেশ্বর চরিত্র কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য—নিমচাঁদ ও অটলের মুখে কিছু বক্তব্য বলিয়ে নেবার জন্য ব্যবহৃত। সেদিক থেকে নাটিকাটিতে নকুলেশ্বরের চরিত্র সংযোজন সার্থক।

গোকুলচন্দ্র : অটলের খুড়শ্বশুর। অটলের শুভানুধ্যায়ী। আস্তিক। বিপথে চলে যাওয়া অটলকে তিনি সৎপথে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসী। সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। পূর্বে তিনিও মদ্যপান করতেন—কিন্তু মদ্যপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হবার পর সে সভার প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করে মদ একেবারে ত্যাগ করেছেন।

জীবনচন্দ্র : ধর্মশালী ব্যক্তি—অটলের পিতা। স্ত্রীর দ্বারা বশ্য তিনি। অটল মাতার প্রশ্রয়ে দিন দিন কুপথে চলে যাচ্ছে, অথচ তিনি কিছুই করতে পারছেন না—এই দুঃখে সদাই ম্রিয়মান। গোকুলচন্দ্র, কেনারাম ডেপুটিকে দিয়ে তাই তিনি অটলকে সৎ-অসৎ দুয়ের পার্থক্য বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পথভ্রষ্ট ছেলেকে ফেরাতে না পারার দুঃখে তিনি কাতর হয়ে পড়েন। অথচ নষ্ট পুত্রকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে হলে পিতা-মাতাকে যে পরিমাণ কঠিন হতে হয় তা তিনি হতে পারেন না। পিতৃহৃদয়ের দুর্বলতায় আলালের ঘরের দুলাল অটল তাই তার স্বপথে অটল থাকে।

দামা : ভৃত্যশ্রেণীর প্রতিনিধি। বড়লোকের বাড়ীর চাকর বাবুর চরিত্র ভরষ্ঠতার সুযোগে কীভাবে নিজের আখের গুছায় তা দামার উক্তিতেই পরিস্ফুট—"বোকা বাবুর কাছে নইলে চাকরি পোষায়? কত জিনিস ভাংচি, কত জিনিস চুরি কচ্চি, বাবুর হিসেবও নেই কিতেবও নেই। দামার ভাবনা কি, বাবু যে মদ ধরেছেন, কোটা বালাখানা করে ফেল্‌বো।" (২।২)

ভোলা : মুক্তেশ্বর বাবুর জামাই। Badoo's class এ পড়া যুবক। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী হয়ে দেখা দিয়েছে তার ক্ষেত্রে। ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে কথা বলে সে। তার চরিত্রের মুদ্রদোষ 'সার সার' করা। বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান বোধও নেই তার। অটল এবং নিমচাঁদের মোসাহেবী করেছে সে। কৌতুকরস সৃষ্টির জন্যই এই চরিত্রের সৃষ্টি।

কেনারাম ডেপুটি : কিছু অপকৃষ্ট ডেপুটি শ্রেণীর প্রতিনিধি। ভ্রমক্রমে মুচিরাম ফরিয়াদীকে ঘটিরাম নামে সম্বোধন করে সে। অতঃপর নিজ বক্তব্যের সপেক্ষ বলে মুচিরাম কখনও নাম হতে পারে না, মুচিরাম যদি নাম হয়, তবে কেন বামনরাম নাম হক না? সেই থেকে সে ঘটিরাম ডেপুটি নামে পরিচিত হয়ে যায়। ঘটিরাম ডেপুটির মধ্যে যত কিছু খারাপ গুণ থাকার সবই আছে। নিজের বিবেকের কাছে সে কখনও পরিষ্কার নয়। তার সঙ্গে ভোলার কথোপকথনের মধ্যেও কৌতুককর হাস্যরস পরিস্ফুট হয়েছে। কেনারাম ডেপুটি তার আচরণগত শৈথিল্যে এই প্রহসনে হাস্যরসের এক নূতন মাত্রা যোগ করেছে। কেনারাম নিজের বিদ্যার জোরে ডেপুটি হয়নি—হয়েছে জুতোর শুকতলার জোরে—অর্থাৎ ধরাধরি করে এবং উপরওলার মন জোগিয়ে। নিমচাঁদের কথার প্রতিবাদ যখন সে করে নি তখন তার বিরুদ্ধে উত্থিত অভিযোগ সত্য এটা ধরে নিতে বাধা

নেই। কালেজে পড়লেও কেনারামের চিত্তবৃত্তির সার্বিক স্ফূর্তি ঘটে নি—ডেপুটি হলেও তার মধ্যে গড়ে ওঠেনি আত্মসম্ভ্রমবোধ। তাই কোনও কথার ফয়সালা করতে আর্দালিকে সাক্ষী মানে সে। 'কেব্‌লা' শব্দের অর্থ বুঝতে না পারায় কি বিপত্তির মুখে পড়েছিল, সে কথা প্রথম পরিচয়েই সে অন্যকে জানিয়ে দেয়। এতেই বোঝা যায় কেনারামের চরিত্র এখনও অগঠিত—ব্যক্তিত্বের ধার কাছ দিয়ে যায় না তা। কেনারাম আবার ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকও। বৈপরীত্যের আর এক নাম যেন ঘটিরাম। লক্ষ্য করা যেতে পারে ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক সে অথচ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তার চরিত্র। যে ব্যক্তি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক তার মুখে নিম্নোধৃত সংলাপটি অন্তত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, কেশবচন্দ্র সেনের আসনে বসা মানুষের মুখে মানায় না,—

"আমি সমাজের সম্পাদক, আমি আর কিছু বুঝতে পারি নি।" (২।২)

বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত ডেপুটি চরিত্রের এই রূপ বিকৃতি এবং সাথে সাথে সমগ্র নাটকটিতে অশ্লীল প্রসঙ্গ বার বার নিয়ে আসার জন্যই দীনবন্ধুকে এই নাটকটি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন।

রামমাণিক্য ঃ বিক্রমপুরের জমিদার। গ্রাম্য বিত্তশালী ব্যক্তি যাঁরা শহুরে হবার জন্য শহুরে লোকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুকার্য করতেন—তাঁদের প্রতিনিধি রাম-মাণিক্য। পাল্লা দেওয়া ছাড়া এই নির্বোধ জমিদার আর কিছু জানেন না। আত্ম-সম্ভ্রমবোধও তাঁর নেই। স্ত্রী এবং বেশ্যা যে এক নয়—এ বোধও তার মধ্যে দুর্লভ। তাই কাঞ্চনের সঙ্গে তার নিজের স্ত্রীর তুলনাক্রমে সে কাঞ্চনকে বলে,—

> "ঠাহাতো দিইচে, হাব্‌লি বানায়ে দিইচে, ওলোঙ্কার দিইচে, পরের বাগানে যাবার দেবে ক্যান? (নকুলের প্রতি) আমার বাগ্যদরী কি পরের লগে যায়, কওদি বা ইডি?" (৩।১)

বিভিন্ন মানসিকতার এই পুরুষ চরিত্রগুলি ছাড়া রয়েছে ঘটিরাম ডেপুটির আরদালি, প্রভুর যোগ্য দাস,—বৈদিক ব্রাহ্মণের চরিত্রে মধ্যে হিন্দু সমাজের কর্ণধারের টাইপ লক্ষ্য করা যায়। সার্জ্জন ও পাহারওলাদ্বয়ের চরিত্রে মধ্যে তাদের শ্রেণীচরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি দেখানো হয়নি।

এবার নারীচরিত্রগুলির বিশেষত্ব দেখা যেতে পারে—

কাঞ্চন : অভিজাত পতিতার মনোভঙ্গি লালসা, অর্থগৃধ্নতা ও নিম্নরুচির পরিচয় কাঞ্চন চরিত্রে আছে। কিন্তু কাঞ্চন চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে তার স্বাভাবিকতায় সে কখনও এ কথা বিস্মৃত হয় না যে সে বারবধূ। সবার প্রতিই তার সমান আকর্ষণ। সে জানে বড়লোকের ছেলেরা দু'দিনের জন্য তার কাছে আসে। সে বাড়ীর বধূ নয়—বারো জনের বধূ। সুতরাং ব্যবসা ঠিকঠাক চালাতে গেলে সবার সঙ্গেই তাকে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। আবেগের বশবর্তী হয়ে বাবু সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক অটল যখন তাকে ডেপুটির চেয়েও বেশি মাইনে মাসোহারা দিতে থাকে তখনও তাই সে সময় পেলেই নকুলবাবু, নিমচাঁদ, রামমাণিক্য প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। অটলের আবেগাতিরিক্ততায় সে যে বিব্রত এ কথা সে নকুলেশ্বর উকিল, নিমচাঁদকে জানিয়েছে। বিরক্তিক্ষুন্নস্বরে সে বলেছে,—

"মাইরি ভাই; আমি কেবল তোমার অনুরোধে এলেম, আদুরে ছেলে, আমায় ভাই ঘরের মাগ করে তুলেছে, কাঁরো কাছে যেতে দেয় না।...." (৩।১)

কিন্তু অতশত ব্যক্তিগত বাঁধনের মধ্যে নিজেকে বন্ধ রাখতে কাঞ্চন নারাজ।

কুমুদিনী : বাবু কালচারের পৃষ্ঠপোষক অটলের স্ত্রী কুমুদিনী, বঙ্গকুলবধূসুলভ ব্যবহার তার। সংসারের এক কোণে পড়ে থাকে সে এবং তার সৎ-অসৎ সম্পর্কে তার অসহায় মতামত। শাশুড়ীর প্রশ্রয়ে দিনের পর দিন তাঁর স্বামী অধঃপতনের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে অথচ তার প্রতিবাদের কোনও সামর্থ্যও নেই—মূল্যও নেই। তাই এই অসহায়া বঙ্গ বধূ এই নির্যাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে মৃত্যুকে বরণ করে নিতেও প্রস্তুত। সৌদামিনী অর্থাৎ তার ননদিনীর চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে তার হৃদয়ের দুঃখ বেদনার সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুটনের প্রয়াস করেছেন নাট্যকার। সৌদামিনীর স্বামীও শিক্ষিত—কিন্তু মদ্যপ নয়। কুমুদিনী তাই নিজ বৈধব্য কামনা করে। 'সধবার একাদশী' নষ্ট হয়ে যাওয়া চরিত্রে কার্যক্রম চিত্রিত করেছে। জীবনের স্বাভাবিকতা তাই এখানে অস্বাভাবিক। কুমুদিনীর সঙ্গে তাই দেখা হয়নি অটলের অন্তত শেষ দৃশ্যের পূর্ব পর্যন্ত, কিন্তু দৈবক্রমে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাতের মুহূর্তে স্বামীর আচরণের জন্য যে লজ্জা কুমুদিনীকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছে—সে লজ্জার কণামাত্র অটলকে স্পর্শ করেনি। স্বামীর দুষ্কর্মের জন্য স্বামীকে অনুযোগ করলে বরং তাকে শুনতে হয় রূঢ় কথা,—

"তোমার আর লেকচার দিতে হবে না, তুমি আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর যাও, উনি আবার আমার কাছে গিন্নীপনা কণ্ডে এলেন।" (৩।৩)

সৌদামিনী : অটলের বোন সৌদামিনী চরিত্রে বঙ্গকুলবধূর স্বাভাবিকতা, সৌদামিনীর মায়ের চরিত্রে অন্ধ মাতৃস্নেহ ফুটে উঠেছে। বারবিসাসিনীদ্বয় এবং হিঁজড়ের চরিত্রও যথাযথ চিত্রিত। এভাবে 'সধবার একাদশী' প্রহসনের অপ্রধান নবি চরিত্রগুলিও নাট্যকারের উদ্দেশ্যকে সার্থক করার ক্ষেত্রে একান্ত সহযোগিতা করেছে।

পাশ্চাত্য-অনুসরণ : 'সধবার একাদশী' প্রহসন আলোচনার উপসংহারে আর একটিকথা বলা দরকার। উনিশ শতকের মধ্যভাগে সাহিত্যিকবৃন্দ অনেকেই কালিদাস, সেক্সপীয়র, বায়রণ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। এই প্রভাবের প্রভূত পরিচয় ওই সময়কার সাহিত্যে রয়েছে। তাই এ সময় সমালোচকেরা সমকালীন সাহিত্যিকদের কাউকে বলতেন বাংলার সেক্সপীয়র, কাউকে বা বাংলার স্কটপ্রভৃতি। দীবনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রহসনের মধ্যে নিমচাঁদের সংলাপে নানান বিদেশি লেখকের উক্তি উদ্ধৃত এই উক্তিগুলি কখনও বক্তব্যের মতের পরিপোষকতা করেছে, কখনও বা তির্যক-ভাব উৎপাদন করেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। যেমন,—

প্রথম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্কে

(ক) Milton-এর Paradise lost-এর উদ্ধৃতি দেয় নিমচাঁদ নকুলেশ্বরবাবু রোগের ভয়ে যখন মদ্যপান ত্যাগ করার জন্য তাকে অনুরোধ জানান তখন সে বলে,—

"—to be weak is Miserable
Doing or suffering."

[**অনুবাদ** : দুর্বলতা পাপ, (রেখো মনে)
কর্মের সাধনে কিংবা দুঃখের সহনে]

দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(খ) নিমচাঁদ, ভোলা বারাঙ্গনা প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় মদ্যপান করছে। আর তখন নিমচাঁদ Byron এর Don Juan থেকে উদ্ধৃতি দেয়,—

"Man being reasonable
must get drunk
The best of life is but
in toxication."

[**অনুবাদ** :তখন মানুষ হয় পরিপূর্ণ খাঁটি
যখন সে মদ্য করে পান।
সে জীবন মহনীয়, শ্রেষ্ঠ সে জীবন
উত্তেজনা যেবা করে দান॥]

এই উদ্ধৃতিতে বক্তব্যের তির্যকতা লক্ষ্য করা যায়। বারাঙ্গনা মানুষকে সঙ্গ দেয়—তাই সে জীবন মহৎ। বারাঙ্গনা মাত্রই মাসী। অতএব নিমচাঁদ এই উদ্ধৃতির পর অনায়াসে বলে—'মাসীর হেল্‌তো পান করি। (মদ্যপান)'।

এই গর্ভাঙ্কেই অটল যখন নিমচাঁদকে গ্লাসে করে মদ্য পান না করে বোতল ধরে মদ খেতে বলে, তখন নিমচাঁদ আনন্দিত হয়ে সেক্সপীয়রের 'Merchant of venice' এ পোর্শিয়ার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত অভিসন্ধি চরিতার্থ হবার আনন্দে উদ্বেল সাইলকের উক্তি উদ্ধৃত করে,—

"A Daniel come to
Judgement! Yea, a Daniel!—
O wise young Judge, how do
I honor thee!

[**অনুবাদ** : অহ্‌। দানিয়েল এসেছেন বিচারক হয়ে।
ওহে সত্যই দানিয়েল
হে মহাজ্ঞানী বিচারক। কীভাবে
আমি আপনাকে সম্মান জানাব?]

নিমচাঁদের এই উক্তির তির্যকতা লক্ষণীয়। নিজ জীবনের দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে মদ্যপ নিমচাঁদ মাঝে মাঝে Milton-এর 'Paradise Lost', সেক্সপীয়রের 'King Lear', 'Macbeth' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে। যা এই চরিত্রটির ট্র্যাজিক গভীরতা বৃদ্ধি করেছে। ফলে প্রহসনটি নিছক প্রহসনের গণ্ডী থেকেও উত্তীর্ণ হয়েছে।

জামাই বারিক

প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয় : 'সধবার একাদশী'র প্রশংসা ও নিন্দা দীনবন্ধু মিত্রকে বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক বিতর্কিত নাট্যকার রূপে পরিচিত করিয়েছিল। ১৮৭২

খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ 'জামাই বারিক' প্রহসনটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে তাঁর খ্যাতির পাল্লা বেশ ভারী হয়ে উঠল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটার 'জামাই বারিকে' নাটিকাটি প্রথম মঞ্চস্থ করে। এই প্রহসনের দুই উল্লেখযোগ্য চরিত্র পদ্মলোচন এবং পাঁচীর ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এবং ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। 'জামাই বারিক' প্রহসনটি দেখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেখে,—

> "ন্যাশনাল থিয়েটারের নীলদর্পণের অভিনয় দেখিয়া আমরা যেমন ক্রন্দন করি, জামাই বারিক দেখিয়া তেমন হাসিয়াছিলাম।....দীনবন্ধুবাবুর গুণ ইতিপূর্বে অনেকে জানিয়েছেন বটে, তাঁহার অনেক নাটকও ইতিপূর্বে অভিনয় হইয়াছে, কিন্তু এবার তাঁহার গ্রন্থনিহিত রত্নগুলি যেরূপ জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতেছে, ইতিপূর্বে কোথাও সেরূপ হইয়াছে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি।"[১]

'জামাই বারিকে' পদ্মলোচনের ভূমিকাভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় কলা-নৈপুণ্য সম্পর্কে দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র পরবর্তীকালে লেখেন,—

> "জামাই বারিকে অর্দ্ধেন্দু 'কর্তা' সাজিতেন। জামাইরূপে রামায়ণের কথকতা শুনিলে মোহিত হইতে হইত এবং মাণিকপীরের গানে হাসির ফোয়ারা ছুটিত। গান গাহিবার পূর্বে তিনি মুসলমানদের মতো অঙ্গপ্রক্ষালনাদির যে ভঙ্গি দেখাইয়াছিলেন, তাহা বহুদিনের কথা হইলেও, আজও ভুলিতে পারি নাই।"[২]

'অমৃতবাজার পত্রিকা' 'জামাই বারিকে'র প্রশংসার সাথে সাথে এর নিন্দাও করেছে। কয়েকটি ত্রুটিও ধরিয়ে দিয়েছে। 'ন্যাশনাল পেপার' অভিনয়ের বিবরণের সাথে সাথে রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ তথ্য পরিবেশন করেছে। আসন, আলোর বন্দোবস্ত ও সুরসৃষ্টির জন্য বাজনার ব্যবস্থার বিশেষত্বের কথাও পত্রিকাটি উল্লেখ করেছে।[৩]

কাহিনী সংক্ষেপ : কেশবপুরের জমিদার বিজয়বল্লভ মেয়েদের বিয়ে দিয়ে পরের ঘরে পাঠাতে চান না। জামাইদের থাকার জন্য তিনি ব্যারাক নির্মাণ করিয়েছেন। সেখানে তাঁর জামাই ও তাদের আত্মীয়স্বজনের থাকার বন্দোবস্ত করেছেন। কন্যারা থাকে অন্তঃপুরে। বিজয়বল্লভের বাড়ীর জামাইরা পাস পেয়ে তবেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারে। ব্যারাকে পড়ে থাকা জামাইদের কোনও কাজ নেই। দিনরাত কেবল নেশা ভাঙ করে আর অন্তঃপুরে প্রবেশের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় থাকে। বিজয়বাবুর মেজো মেয়ে পিতার এই আচরণ সহ্য করতে পারে না। একদিন তার স্বামী তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলে দারোয়ান তাকে অপমান করে। লজ্জায় মেজো মেয়ে গলায় খুর লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। মেজো জামাইয়ের সুখের চাকরীর সমাপ্তি ঘটে। মূল কাহিনী ছোটো মেয়ে কামিনী ও ছোটো জামাই অভয়কে ঘিরে। বিজয়বাবুর অভয়ের প্রতি একটু দুর্বলতা থাকলেও কামিনী নিজের ঘরজামাই স্বামীর প্রতি রুষ্ট, কেননা তার মতে "ঘরজামায়ের গা, না গণ্ডরের গা, মারলে দাগ পড়ে না— তাদের মন লোহার গঠন, অপমানের হুল বেঁধে না, বরং ভোঁতা হয়ে যায়।"(১।২) তাই

১. অমৃতবাজার পত্রিকা/১৮৭২, ১৯ ডিসেম্বর
২. মানসী ও মর্মবাণী/১৩২৭, কার্ত্তিক/অর্দ্ধেন্দু কথা/ললিতচন্দ্র মিত্র
৩. ন্যাশনাল পেপার/(১৮৭২, ১৮ ডিসেম্বর

সেই অহংকারে কামিনী অন্তঃপুরে ডেকে এনে অভয়কে অপমান করে। রাগ করে ব্যারাক ত্যাগ করে চলে গেলেও স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতায় ও বন্ধু পদ্মলোচনের অনুরোধে অভয় আবার স্ত্রীর কাছে যায় ও পুনরায় অপমানিত হয়ে গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবন যাত্রা করে। সঙ্গী হয় তার বন্ধু পদ্মলোচন। দুই স্ত্রীর মধ্যে প্রতিনিয়ত ঝগড়া-বিবাদে গৃহের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠেছিল সেও। অভয় গৃহত্যাগ করার সাথে সাথেই কামিনীর মধ্যে অনুতাপ জাগে। অভয়ের বৃন্দাবন যাত্রার খবর পেয়ে সে নিজ মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দিয়ে ভবী ময়রানীকে নিয়ে ছদ্মবেশে অভয়ের ডেরার পাশেই আস্তানা করে। কামিনীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে পদ্মলোচনের পরামর্শক্রমে অভয় ছদ্মবেশী কামিনীকেই না জেনে বৈষ্ণবী করে নেয়। পরে প্রকাশ পায় আসল তথ্য। অভয় কামিনীর মিলন হয়। পদ্মলোচনের সমস্যারও সমাধান হয়েছে—সেও খবর পায় তার দুই স্ত্রীর সম্পর্ক বর্তমানে সুমধুর হয়েছে। স্বামীর মূল্য বুঝেছে তারা। বিজয়বল্লভবাবুও বৃন্দাবনে হাজির হলেন। সকলে মিলে ফিরে চললেন নিজ নিজ গৃহে।

নামকরণ : 'জামাই বারিক' প্রহসনের নামকরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঘরজামাইদের থাকার জন্য জমিদার বিজয়বল্লভ নির্মিত ব্যারাক-ই জামাই-ব্যারাক বা জামাই বারিক। কৌলিন্য প্রথার এক বীভৎসরূপ প্রতিফলিত হয়েছে বহুবিবাহ প্রথায়—আছে পুরুষের পৌরুষ দেখানোর নিষ্ঠুর প্রয়াস। কিন্তু যদি তার বিপরীত হয়, যদি অসমর্থ পুরুষ শ্বশুরের আশ্রিত এবং তারাই নির্দেশে সর্বক্ষেত্রে চালিত হয়, তহলে সেই পৌরুষহীন পুরুষের জীবনাচরণ কিরকম হতে পারে—তাই সরস ভঙ্গিতে উপস্থানে করা হয়েছে এই প্রহসনে। রাসবিহারী বসুকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করতে গিয়ে উৎসর্গ পত্রে নাট্যকার জানিয়েছেন,—

"বহুকালের পর তোমাকে একটি অপূর্ব্ব স্থানের ইতিবৃত্ত দিতে সক্ষম হইলাম, সে স্থানের নাম "জামাই বারিক"।

নাটিকাটির উৎসর্গপত্রে নাট্যকার একটি ইংরেজি কবিতা থেকে দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন,—

"Of all the blessings on earth the best is a good wife;
A bad one is the bitterest curse of human life"

সুধী সমালোচক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এই পংক্তি দুটি উদ্ধৃত করে বলেছেন,—

"উদ্ধৃত পদ দুইটির মধ্যে প্রথমটির অর্থাৎ 'good wife'-এর blessings এর কোনও বিবরণ এই প্রহসনের মধ্যে নহে, দ্বিতীয় পদটিরও আংশিক পরিচয় আছে, পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নাই।"[১]

কিন্তু ড. ভট্টাচার্য কোথায় যেন একটু ভুল করেছেন; নাটিকাটিতে যা দেখানো হয়েছে তা উৎসর্গপত্রে উদ্ধৃত। অভয় এবং পদ্মলোচনের জীবনে দেখানো হয়েছে খারাপ স্ত্রী পাওয়া কত মন্দ ভাগ্যের পরিচায়ক; কাজেই সেই বক্তব্যের জের হিসাবে আসে জীবনে সবচেয়ে বড়ো পাওয়া—ভালো স্ত্রী। 'জামাই বারিক' প্রহসনের সারমর্ম এটি, সারসংক্ষেপ নয়।

হাস্যরস : দীনবন্ধুর অন্যান্য প্রহসনের তুলনায় হাস্যরস উচ্ছলতায় চরিত্রের অসঙ্গ

১. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১ম)/ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য/পৃঃ ৩৯০

তিপূর্ণ কার্যকলাপে এবং পরিণামী ব্যঞ্জনায় এটি সার্থক হয়েছে। জামাই ব্যারাকে বসবাস-কারী ঘরজামাইদের কার্যকলাপ, তাদের গাঁজা টেপা, বেল্লিকের রামায়ণ পাঠ, পীরের গান অন্তঃপুরে যাওয়ার প্রত্যাশায় পাসের জন্য অপেক্ষা করা, পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী বগলা ও বিন্দুবাসিনীর কোন্দল, ব্যক্তিত্বহীন পদ্মলোচনের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা প্রভৃতি প্রসঙ্গে উচ্চকিত হাস্যরোলের সৃষ্টি করে। কিন্তু নাট্যকার হাসির এই উতরোল স্রোতকে প্রহসনের লঘুতায় পরিসমাপ্ত হতে দেন নি—কমেডির গভীরতা আনার চেষ্টা করেছেন নাটিকার শেষ দৃশ্যে। হাস্যরস সৃষ্টির চিরাচরিত এবং দীনবন্ধুর নাটকে বহু ব্যবহৃত রীতি কৌশল এখানে অবলম্বিত হয়েছে। রীতিগুলি নিম্নরূপ—

(i) চরিত্রের আচরণগত অসঙ্গতি

(ii) তির্যক বাক্যপ্রয়োগে হাস্যরস সৃষ্টি

(iii) দেশজ বা লৌকিক আদিরসাত্মক শব্দ প্রয়োগে গ্রাম্য-দোষ-দুষ্ট হাস্যরস সৃষ্টি।

জমিদার বিজয়বল্লভের জামাইদের আচরণ তীব্র হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। যদিও ঘরজামাই প্রথাকে ব্যঙ্গ করাই এর লক্ষ্য—তবু সে প্রথার বস্তুগত দিক এতে সামান্যই আছে। প্রহসনকার হাসির উতরোল তরঙ্গ সৃষ্টির প্রত্যাশায় জামাইদের জামাই ব্যারাকের 'জাম্বুবান' করে এঁকেছেন। 'নামের পাস' নিয়ে তারা একে একে ঢোকে নিজের স্ত্রীর কাছে। প্রথমে জামাই একমাস আগে বাড়ীর ভেতরে যাবার অনুমতি পেয়েছিল আর পায়নি। তৃতীয় জামাই জানায়,—

> 'তোমার তবু একটা অছিলা আছে, আমি আজ দশ দিন জামাই বারিকের বরেগা গুন্‌চি আর তিনি সুস্থ শরীরে খোসমেজাজে একা খাটে পড়ে আছেন। আমি পাঁচিকে রোজ বলি পাঁচি আমার নামের পাসখানা নিয়ে আয়, আমি আজ বাড়ীর ভিতর যাব, তা বলে তোমার নামের পাস দিতে চান না।"(৩।১)

পাস কোথায় থাকে সে সম্পর্কে দ্বিতীয় জামাই ও চতুর্থ জামাইয়ের কথোপকথনও যথেষ্ট হাসির খোরাক জোগায়,—

"দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) কদিন এখানে ছিলাম না এর মধ্যে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি যে—পাসগুলিন থাকে কোথা?

চতুর্থ জা। গিন্নির ঘরে। যারে যারে তিনি বোঝেন বাড়ীর ভিতর যাবার যোগ্য তার নামের পাঁচীর কাছে দেন, পাঁচি জল খাওয়ায় সময় দিয়ে যায়।" (৩।১)

পঞ্চম জামাই-এর রামায়ণ ব্যাখ্যা হাসির হর্‌রা ছোটায়। কিন্তু শুধু হাস্যরস নয়—এখানে যাগযজ্ঞের মাধ্যমে পুত্রলাভ ও অংশত হিন্দুধর্মের নিয়োগ প্রথার প্রতি তির্যক দৃষ্টি ক্ষেপিত হয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে না পেরে দ্বিতীয় জামাই-এর অনুরোধে পঞ্চম জামাই 'এক নিশ্বাসে সাত কান্ট রামায়ণ' বলা শুরু করে,—

পঞ্চম জা। ......রাজা যাগ যজ্ঞ হোম নৈবিদ্দি স্বাস্থ্যরক্ষা কুশাসন সাগর মন্থন গন্ধমাদন কত কল্যেন কিছুতেই রাণীদের গর্ভের সঞ্চার হল না। রাজা ভেবে ভেবে চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং। তখন কুক সাহেবের আগগড়া হয়নি, কি উপায়ে বংশ রক্ষা করেন।

তৃতীয় জা। জামাই বারিক ছিল না?

পঞ্চম জা। রাণীদের সঙ্গে জামাই বারিকের শাশুড়ি সম্পর্ক, থাক্‌লেই বা বা কি হতো — রাজা কিংকর্ত্তব্য অনূঢ়া হয়ে খুব গ্যাঁটাগোঁটা অকাল কুষ্মান্ড গোচ একজন ঋষিকে আনালেন, তার নাম রসশৃঙ্গ, ঋষিবর যোগ আরম্ভ করলেন। বাবা কার দ্বারা কি হয় বল্‌তে পারে, রসশৃঙ্গ তপোবনে ফিরে না যেতে যেতে মহারাজের চার কুমার উত্তমাশা অন্তরীপের ন্যায় বিহার কত্তে লাগ্‌লো।.....” (৩।৩)

হাস্যরস সৃষ্টির জন্য প্রহসনকার এখানে তির্যক বর্ণনাভঙ্গীর সহায়তা নিয়েছেন। আবার দীনবন্ধুর নাটকে বহু ব্যবহৃত দেশজ শব্দের প্রচুর ব্যবহার এখানেও লক্ষ করা যায়। স্থানে স্থানে সে কারণে প্রহসনটিকে কিছু অশ্লীল মনে হতে পারে। যেমন —লাঙ্গুল অবতার, রাঁড়, ভাতার, ফাঁৎ ফাঁৎ কচ্চে, বয়ারকাটা, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুম, চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাছিনী, হুম্‌রো চুম্‌রো ভাতার, আবাগী, ফচ্‌কে ছুঁড়ী এরকম অজস্র শব্দ।

রসের যোগান সম্পূর্ণ করার আকাঙক্ষায় দীনবন্ধু এই প্রহসনে আদিরসাত্মক অশ্লীল শব্দ বহুল কয়েকটি গানও সংযোজন করেছেন। কোথাও আবার সে কাজ নিষ্পন্ন করেছেন যদি রসাত্মক ছড়ায়। সাধারণ দর্শকদের বাহবা পাবার জন্য সম্ভবত দীনবন্ধু 'জামাই বারিকে' একটু বেশি মাত্রায় ছড়া ব্যবহার করেছেন। অবশ্য একথাও বলা যায়—বাঙালির ঘরে জামাই-ঠাট্টার আগাগোড়া আদিরসে মোড়া। 'জামাই বারিক' রচনা করতে গিয়ে দীনবন্ধু তাই আদিরসের ভিয়েন চড়িয়েছেন। নিচে কয়েকটি জনপ্রিয় আদিরসাত্মক ছড়া ও গান 'জামাই বারিক' থেকে তুলে দেওয়া গেল।—

(ক) তৎকালে জনপ্রিয় লোককাব্য তরজার ঢঙ ভবি ময়রাণী ও কামিনীর ছড়ায় রচিত সংলাপে লক্ষণীয়—

(i) “ভবি। কামিনী, নাতিনী, সতিনী আমার তুই,
তোর ঠাকুর্দ্দাদায় রেখে মাঝে তিন জনাতে
এক বিছানায় শুই—
কামি। মরণ আর কি, কত সাদি যায়।
ভবি। একবার দেখি, বুড়ো তোকে ন্যায়
কি আমায় ন্যায়।
কামি। মুড়্‌কিমুখী ময়রা দিদি নবীন বয়েস তোর,
ছোট্ট মাজা নিরেট বাঁজা
কড় কপাল জোর।
তোকে ছেড়ে কি আমায় নেবে? (১।২)

(ii) “কামি।.......
দোজ্‌বরে ভাতারের মাগ।
চতুর্দ্দশীর চৌদ্দ শাগ।
ভবি। তুইও ত দোজ্‌বরে
কামি। আদিরসের দোজ্‌বরে
চিরকাল্‌টা জ্বাল্‌য়ে মারে!
ভবি। তাইতে দিলি হাবার মারে। (১।২)

(খ) 'জামাই বারিকে' অনেকগুলি প্রবাদধর্মী ছড়া ব্যবহার করে কিছুটা হাসির খোরাক যোগানের চেষ্টা করা হয়েছে,

(i) কামি। ঘর জামায়ে ভাতার যার,
কাণের সোনা নিন্দে তার। (১।২)

(ii) বগলা। ছোটো মাগ পাটরাণী।
বড়ো মাগ ধানভানানী (২।১)

(iii) প্রথম বৈষ্ণবী। কুঞ্জবনে বাজ্‌লে বাঁশি
ঘরে রয় না মন,
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি
রাধা ভেবে উচাটন। (৪।২)

(iv) বগলা। সুয়ো মেগের ষোল আনা দুয়োর
নামে নাই,
একচখো ভাতারের মুখে
বাসি আকার ছাই। (২।৩)

(গ) অশ্লীল শব্দযুক্ত ছড়া ও গানও ব্যবহৃত হয়েছে,—

(i) বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী,
রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃন্ধ বেশ্যা তপস্বিনী
এইচি বৃন্দাবন। (২। ৩)

(ii) গাঁজা খেতে খেতে জামাইদের বাউল সুরে গান—
মার দম্ কসে দম্ গাঁজার কল্‌কে তুলে,
না খেয়ে রয়েছে আমার পেট্‌টা ফুলে,.........প্রভৃতি। (৩।১)

উদাহরণ বৃদ্ধি করে আর লাভ নেই। হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ সৃষ্টিতে দীনবন্ধু যে এখানে সফল হয়েছেন সে কথা স্বীকার করতেই হয়।

সমাজচিত্র : 'জামাই বারিক' প্রহসনের কাহিনীবস্তু অনুসরণ করলে দেখা যায় অনাবিল হাস্যরসের উপভোগ্য পরিবেশন এই নাটিকার মূল উদ্দেশ্য হলেও, দু'টি সামাজিক কুপ্রথা—বহুবিবাহ ও ঘরজামাই প্রথাক অর্থাৎ কৌলীন্য সমস্যার দ্বিবিধ রূপকে একই সঙ্গে আক্রমণ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে হাস্যরস এবং কৌতুককর উপস্থাপনভঙ্গি—এই উভয়কে একই সঙ্গে প্রয়োগ করে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর নাট্যকৃতির সাফল্যের চাবিকাঠি খুঁজতে গিয়ে দুটি বিশেষ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।—(ক) দীনবন্ধু অভিজ্ঞতার নাট্যকার (খ) নাট্যকারের ছিল সহানুভূতি প্রবণ মন। বস্তুতপক্ষে অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতির স্পর্শেই দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে। 'জামাই বারিকের' দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।"[১] রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে উনিশ শতকেও কৌলীন্য সমস্যার রুক্ষতা কীভাবে সাধারণ নর-নারী জীবনকে উষর করে

১. দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী.......সমালোচনা/বঙ্কিম রচনাবলী/সাহিত্য সংসদ/পৃঃ ৮২৭

তুলতো। তার পরিচয় গ্রন্থের প্রথম অংশে রয়েছে। এক্ষেত্রে তাই তা পুনরায় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক'-এ কৌলীন্য সমস্যাকে যে দৃষ্টিকোণে দেখা হয়েছে দীনবন্ধু এই বহু আলোচিত এবং বিতর্কিত প্রথার সমস্যার উপস্থাপনে সেই মাপা পথের বাইরে পা বাড়াননি। সমাজচিত্র বলেই 'জামাই বারিক'কে কখনও কখনও নক্সাধর্মী বলে মনে হয়। যদিও কাহিনীর ধারাবাহিক নষ্ট হয়নি এমনই সুকৌশলী এর বয়ন বিন্যাস।

স্ত্রী প্রধান প্রহসন কিনা : 'জামাই বারিক'কে স্ত্রী-প্রধান প্রহসনরূপে চিহ্নিত করা যায়। বাঙালীর গুহাভ্যন্তরে বঙ্গললনাবৃন্দ কীভাবে আধিপত্য করে থাকেন, তার এক বাস্তবানুগ পরিচয় বিবৃত করেছেন নাট্যকার এই প্রহসনে। অন্তঃপুরচারিণীদের রঙ্গরস, হাসিঠাট্টা স্বতঃকবিতা রচনা, ক্ষণে ছড়া কাটার দক্ষতা এবং প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার মতো প্রখর ভাষা—এমন বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্ণিত হয়েছে যা দীনবন্ধুর মত নাট্যকারের কলমেই সম্ভব। প্রহসনে বর্ণিত দুটি কাহিনীতেই নারী প্রাধান্য সূচিত হয়েছে। কিন্তু নারী প্রাধান্য দেখানোই নাট্যকারের অভিপ্রেত নয় তা আমরা প্রহসনের উপসংহারে বুঝতে পারি। নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন কলহপ্রিয়া, ব্যাপিকা স্ত্রী জীবনের পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ। 'জামাই বারিকে'র প্রথম অংশে সৎ ও অনুগত্য স্ত্রীর পরিচয় না পাওয়া গেলেও শেষ অংশে মুখরা স্ত্রীদ্বয় বগলা ও বিন্দুবাসিনী এবং পতিবিমুখ কামিনী সকলেই পরিণামে পতিসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। তাই স্ত্রী প্রাধান্য শেষ পর্যন্ত পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণে বিলীন হয়ে গেছে। সুতরাং প্রহসনটির পূর্বাপর নারী চরিত্রের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য রক্ষিত হয়নি। কামিনীর নত মুখরা বাতিকগ্রস্ত রমণীরও মধ্যে ভালোবাসার বীজ বপন করে তাকে পথে নামিয়ে এনেছে অভয়কুমার। কামিনীকে জব্দ করার পর তার পরিবর্তনের রূপরেখা আঁকতে মাত্র কয়েকটি সংলাপ ব্যয় করেছেন। নিচে সেটুকু উদ্বৃত হল,—

"কামি। আজ তোমারি একদিন কি আমারি একদিন, খাটে উঠ্‌বে আর ন দিদির মত করবো, নাতি মেরে নাব্‌য়ে দেব।

অভ। (দীর্ঘনিশ্বাস) বটে—এত দূর।

কামি। চ'ক রাঙ্গাচ্চো মারবে না কি?

অভ। গোঁয়ার হ'লে মাত্তেম—(দীর্ঘনিশ্বাস) কামিনী—আমি তোমার স্বামী—কামিনী, আমি জন্মের মত যাই, তোমাকে একটি কথা বলে যাই, তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়ে কখন জল পড়ে নি, আজ পড়্‌লো—

কামি। আমার মাথা খাও রাগ ক'রো না, খাটে এস।

অভ। এ শরীরে আর না। [প্রস্থান]

কামি। কত বার রাগ দেখিচি। (খট্টাঙ্গ উপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন এবং ক্ষণকাল পরে খট্টাঙ্গে উপবেশন—দীর্ঘনিশ্বাস।) ঘুম তো হয় না। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমি তো বিষম জ্বালায় পড়্‌লেম—'আজ পড়্‌লো'—আমিও তো আর রাগতে পারি নে — আমারও 'আজ পড়্‌লো'। (রোদন) 'তারা

জামাই বারিকের জাম্বুবান'—'গোঁয়ার হলে মাত্তেম'—'আজ পড়্লো'—ও মা, কি করি বুক যে ফেটে যায়।" (৩।২)

প্রহসন না কমেডি : আঙ্গিক গঠন-এর বিচারে 'জামাই বারিক' প্রহসনটিকে ঠিক সার্থক প্রহসন বলা যায় না। বস্তুতপক্ষে দীনবন্ধুর লেখা দুটি প্রহসনে প্রহসনের দীর্ঘত্ব সম্পর্কে নির্দেশ লঙ্ঘিত। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনটি দুটি অঙ্কের সীমায় আবদ্ধ হলেও 'সধবার একাদশী' তিন অঙ্কে এবং 'জামাই বারিক' চার অঙ্কে লেখা। শুধু বক্তব্যের গভীরতায় নয় আঙ্গিকের রীতি না মেনে চলায়—শেষোক্ত প্রহসন দুটি কমেডি নাটকের সমধর্মী হয়ে উঠেছে একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু হাল্কা চটুল রসের অবতারণায়, চরিত্রগুলির উপর অনবরত অসঙ্গতির রং ছিটোনোয়, অসম্ভবকে সম্ভব কল্পনায়—বিশেষত সৈন্য ব্যারাকের কায়দায় জামাই ব্যারাক কল্পনায় এবং সেখানে সৈন্য শাসনে জামাইদের প্রতিপালন করার ঘটনা বর্ণনায় 'জামাই বারিক' আদর্শ প্রহসনের সমধর্মী।

অপ্রধান প্রহসনকার (১৮৬১—১৮৭২)

বাংলা প্রহসনের জগতে মধুসূদন-দীনবন্ধুর বিস্ময়কর প্রতিভার পাশাপাশি সমকালে আরও অনেক প্রহসনকারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এঁদের অনেকেই বাংলা প্রহসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন মাত্র। কেউ কেউ আবার প্রহসন অর্থে নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থ-রচনা বুঝে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে শিক্ষামূলক নাটিকা রচনা করেছেন—এবং তাকেই প্রহসনরূপে উল্লেখ করেছেন। কেউ-বা আবার প্রহসন অর্থে হাল্‌কা চটুল ভাবের আদিরসের ভিয়েনে চড়ানো তরল মিলনান্তক কাহিনী বুঝেছেন—তাঁদের নাটিকাগুলিই এ কথার প্রমাণ। কিন্তু একথা বলতে বাধা নেই যে, সেই নাটিকাগুলি না হয়েছে নাটক না প্রহসন। কোথাও কোথাও উদ্দেশ্য মহৎ হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক কুরুচির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং পরিশেষে রুচিভ্রষ্ট মানুষের সাজার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে গ্রন্থ সমাপ্তির কারণে প্রহসন-শিল্প হিসেবে এগুলি সার্থক হতে পারে নি।

সমাজ সংস্কারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা **হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের** 'দলভঞ্জন' (১৮৬১)। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে মধুসূদন দেখিয়েছেন মদ্যপানের ভয়ঙ্কর পরিণতি।[১] 'দলভঞ্জন' নাটিকায় শুধু মদ নয়—গাঁজা, আপিম ইত্যাদি নেশার কুফলও প্রদর্শিত হয়েছে।

মধুসূদন একসময় নিজ কুলগর্বের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন,—'দত্ত কারও ভৃত্য নয়।' কায়স্থ কুলোদ্ভব **অম্বিকাচরণ বসু** রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল-সর্বস্বে'র আদলে মধুসূদন-উক্ত কায়স্থ-জাত্যাভিমানকে যেন প্রতিষ্ঠা দিয়ে রচনা করেছিলেন 'কুলীনকায়স্থ'। (১৮৬১)।

গ্রামাঞ্চলের মাতব্বরদের চারিত্রিক অধোগামিতার স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াসে মধুসূদন লিখেছিলেন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'। জয়কুমার রায় তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন, দেশাচারের নিদারুণতায় কীভাবে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন পর্যুদস্ত। **রামনাথ ঘোষের**, 'পাড়াগাঞ্জ্যে এ কি দায়' (১৮৬২) প্রহসনে—এ চিত্র পুনরুদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

মধুসূদন-সুহৃদ **গৌরমোহন বসাক** তাঁর ৫১ পৃষ্ঠার বড়ো মাপের প্রহসনে কিছুটা নীতিবাগীশের ভূমিকা নিয়েছেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'অশুভ পরিহারক'[২] নামের এই প্রহসনটি বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা। বাল্য বিধবাদের নিয়ে সমাজে যে ব্যভিচার এবং অবিচার বাংলার নারী সমাজের সবচেয়ে বড়ো দুঃখের কারণ ছিল, এই প্রহসনটিতে হাস্যরসের মাধ্যমে তাই বিন্যস্ত হয়েছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—মহেন্দ্র, মহিম আর উপেন্দ্র তিন শিক্ষিত যুবক রাজপথে চলতে চলতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকে—ধর্মধ্বজী সমাজপতিরা বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ করে চলেছে, কারণ বিধবা-বিবাহ চালু হয়ে গেলে 'অনেকের রাসলীলা সম্বরণ' হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত উঠেছে এক সমাজপতি শ্যামচাঁদের কথা। তার দশ বছরে বিধবা-হওয়া-কন্যা যুবতী হয়ে গর্ভবতী হয়েছে

১. ভূমিকা অংশে মদ্যাপন প্রসঙ্গ আলোচনা দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গত বলা যায়—এই ধরনের নক্সাধর্মী রচনাগুলি জনমানসের সচেতনতার প্রমাণ।

২. বিধবাবিহার প্রসঙ্গে ভূমিকা অংশের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বৈরাগী বাবাজীর দ্বারা। পাড়ার লোকেরা সব জানতে পেরে বৈরাগীর উপর চড়াও হয়। টাকা দিয়ে বৈরাগী সমস্যার সমাধান করে। এরপর দেখানো হয় এক ভদ্রলোকের বিধবা কন্যা বিশাখা মুসলমানের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে চলেছে। উপেন্দ্র জানিয়েছে, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে যেরূপ বিধি দর্শায়েছেন তদ্রূপ হলে কি ওর এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করতে হোত,....." এখানে এক বিদ্যাভূষণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যে, বিদ্যাশূন্য মানুষদের কাছে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে নিজ মত প্রকাশ করে নিজেকে পণ্ডিত বলে জাহির করে। বিধবাবিবাহের সমর্থক অথচ কাজের সময় উৎসাহহীন কিছু মানুষের বিরুদ্ধেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এবং পরিশেষে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, বিধবাবিবাহের বিরোধিতা রূপ অশুভ পরিহার করে বিধবাবিবাহ রূপ শুভকে গ্রহণ করার জন্য।

প্রহসনে হাস্যরসের যোগান দিয়েছে কিছু তির্যক অর্থ-বোধক ছড়া,—এগুলি অধিকাংশই সমাজে সাধু সেজে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের ছদ্মবেশের মুখোশ উন্মোচন প্রয়াসে উক্ত,—

সমাজপতি প্রসঙ্গে,— "লোকে বলে সাধু সাধুতা ত ভারি।
পাইলে পরের ধন ছলে লয় হরি।"

বৈরাগী প্রসঙ্গে,— "মুচির পুত্র শুচি হয় যদি কপ্নি ধরে।
বেশ্যারাও পূজ্যা হয় শেষ অবতারে।।"

'অশুভ পরিহারক' প্রহসনটির সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি অতিমাত্রায় যুক্তিপ্রবণতা এবং উদ্দেশ্যসর্বস্বতা।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত **কুঞ্জবিহারী দের** 'কলঙ্কভঞ্জন নাটক', **ভুবনমোহন চক্রবর্তীর** 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' (১৮৬২), **কুশদেব পালের** দুই খণ্ডে রচিত 'আইন সংযুক্ত কাদম্বরী নাটক' প্রহসনধর্মী পুস্তিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।

সামাজিক অনাচার ও ব্যভিচার ব্যথিত করেছে প্রহসনকারদের। **হরিশ্চন্দ্র বসাকের** 'শ্যামকিশোরী' (১৮৬২), **গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের** 'পুনর্বিবাহ' (১৮৬২), **নফরচন্দ্র পালের** 'কন্যা বিক্রয়' (১৮৬৩)—কন্যাপণ প্রথার বিরোধিতা করে লেখা, একই মানসিকতায় লেখা **ব্রজমাধব শীলের** 'পনের ধনে বরের বাপ'। বলা বাহুল্য, এ প্রহসনগুলি সমাজ-দর্পণ-এর ভূমিকা পালন করেছে—সাহিত্যের সার্থক প্রতিনিধি হতে পারে নি।

রাধামাধব হালদার চিরাচরিত প্রহসনের পথ ধরেছেন। মদ এবং বেশ্যা—এই উভয় নেশা কীভাবে হিন্দু সমাজের মূল ধরে নাড়া দিয়েছে, তারই পরিচয় রয়েছে মধুসূদন দত্তের প্রহসন দুটির অনুসরণে লেখা তাঁর—'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি' (১৮৬৩) এবং 'এই কলিকাল' (১৮৭৫) প্রহসন দুটিতে। 'এই কলিকাল' প্রহসনটিতে মদ্যপানের কুফল এবং নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ প্রভৃতি দেখানো হয়েছে পরম বৈষ্ণবের চরিত্রের ভ্রষ্টাচারের মাধ্যমে।

প্রহসনের তালিকা বৃদ্ধি বই আর কোনও কাজ করেনি এমন কিছু মোটা দাগের হাস্যরসাত্মক গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মুখরা স্ত্রীর জন্য সংসারের অশান্তি ব্যক্ত **রামকৃষ্ণ সেনের** 'হুড়কো বৌয়ের বিষম জ্বালা' (১৮৬৩) নাটিকায়। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আদলে লেখা **কালাচাঁদ শর্মা ও বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের** 'একেই কি বলে বাবুগিরি' (১৮৬৩), **মহেন্দ্রনাথ বসুর** 'স্ত্রীলোক-সাধ্য নাটক' (১৮৬৩), জনৈক

অজ্ঞাতনামা কর্তৃক রচিত 'কি মজার গুড ফ্রাইডে' (১৮৬৩)। গিরিশচন্দ্র ঘোষের পঞ্চরং জাতীয় রচনা 'বড়দিনের বখশিসে'র পূর্বসূরী-রূপেএ গ্রন্থটিকে চিহ্নিত করা যায়। **দ্বারকানাথ মিত্রের** 'মুষলং কুল নাশনং,' (১৮৬৪), **বিশ্বম্ভর দত্তের** 'চোর বিদ্যা বড়ো বিদ্যা' (১৮৬৪), স্মৃতি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। মদ্যপানের কুফল চিত্রিত হয়েছে **নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** রচিত 'বারুণী বিলাস' (১৮৬৭)-এর। **হরিমোহন কর্মকারের** সং-জাতীয় রচনা 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বে' (১৮৬৪), 'মাগ সর্বস্ব' (১৮৭০)। বিধবাবিবাহ বিষয় অবলম্বনে লেখা **গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তীর** 'অশুভস্য কালহরণং', (১৮৬৩)। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে **ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তীর** 'চক্ষুঃস্থির নাটক' এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে **যদুনাথ তর্করত্নের** 'দুর্ভিক্ষদমন নাটক' প্রকাশিত হয়। **যদুনাথ ঘোষের** 'হেমলতা' ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, প্রিয়মাধব বসুর) লেখা 'বুঝলে কিনা' (১৮৬৬) প্রহসনটি ঠাকুরবাড়ির জ্ঞাতি-কোন্দলকে প্রকাশ করে দিয়েছে। পূর্বেই আলোচনা করেছি ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনটি 'বুঝলে কিনা' প্রহসনের জবাব। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি 'বুঝলে কিনা' প্রহসনটি ন্যাশনাল থিয়েটারে শিশিরকুমার ঘোষের 'বাজারের লড়াই' প্রহসনের পূর্বে অভিনীত হয়। রক্ষণশীল সমাজপতি অটলের ভণ্ডামি অটলের মোসাহেব পুরোহিত বিদ্যালঙ্কারের নষ্টামি এবং পরিশেষে অটলের দাদা দর্পনারায়ণের হাতে কুকীর্তিরত অবস্থায় ধরা পড়ে সব হাঁক ডাকের অবসান ঘটে। অটল মদ্যপ, লম্পট, কুক্রিয়াসক্ত এমন কি দাদার স্ত্রী সৌদামিনীর প্রতিও তার আসক্তি প্রকাশিত। পরিশেষে মেথরানী সুখীকে শাড়ী দেবার লোভ দেখিয়ে অটল তাকে রাত্রিতে আস্তাবলে আনে। সেখানেই তার মুখোশ খসে পড়ে, অটলের রূপ সবার কাছে দেখিয়ে দর্পনারায়ণ বলেন—'ইনিই আমাদের দলপতি, বুঝলে কিনা।'

প্রহসন রচনার প্রথম যুগে দীনবন্ধু এবং মধুসূদনের প্রহসন বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল **অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে**। উনিশ শতকের মধ্যভাগে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমকালীন ঘটনা লোককে যেমন মোহিত করে, প্রাচীন ঘটনায় তেমন করে না। এই কারণে তিনি সমকালীন সমাজচিত্রের এক আভাস দিয়েছেন তার রচিত কল্প কাহিনীতে। জগদীশপুরের জমিদারভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে—শ্যামলাল ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—বিষয়কেন্দ্রিক সমস্যার উদ্ভব হয়। বিশ্বনাথের স্ত্রী দয়াময়ীর প্ররোচনায় হারাণে, রতা ও রাম সিংকে দিয়ে বিশ্বনাথ শ্যামলালের একমাত্র পুত্র বিপিনকে হত্যা করিয়ে নিষ্কণ্টকে বিষয় ভোগ করতে গিয়ে বিপদে পড়ে। প্রসঙ্গত দারোগার ঘুষখোর মানসিকতা এবং বৃদ্ধ বংশীর সত্য সাক্ষ্য দেবার জন্য দারোগার কাছে নির্যাতিত হওয়া এবং পরিণামে ধর্মের জয় ঘোষণাই এই প্রহসনের মূল কাহিনী। প্রহসনটির নাম 'ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতি' (১৮৬৮)। হাস্যরসের চেয়ে অন্তর্দাহের প্রকাশ এখানে বেশি। তবে সার্থক না হলেও প্রথম যুগের প্রহসন রচনাকার হিসেবে অঘোরনাথের ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য।

এই পর্বে আরও কয়েকজন প্রহসনকারের পরিচয় মেলে। সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ যাঁদের প্রহসনগুলির বিষয় হয়েছে। নিচে প্রহসনকারদের নামও তাঁদের লেখা প্রহসনগুলির নাম রচনাকাল অনুসারে সাজিযে দেওয়া গেলে—

নিমাইচাঁদ শীল ঃ 'এরাই আবার বড়ো লোক' (প্রকাশ—১২ নভেম্বর ১৮৬৭)।

তারকেশ্বরের মোহান্তকে নিয়ে লেখা ব্যঙ্গ নাটিকা 'তীর্থমহিমা' (১৮৭৩), **জনৈক অজ্ঞাতনামা :** হৈমন্তকুমারী (১৮৬৮), **গোপালচন্দ্র মজুমদার :** 'বিমাতা মনোরঞ্জন' (১৮৬৮), **কিশোরীমোহন মিত্র** রচিত 'বিপদই সম্পদের মূল' (১৮৬৮), **সেখ আজিমদ্দীর** লেখা 'কুড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' (১৮৬৮), **বনমালী চট্টোপাধ্যায় :** 'বরের কাশীযাত্রা' (১৮৬৮), **ক্ষেত্রমোহন ঘটক :** 'কামিনী নাটক' (১৮৬৮), **তরিণীচরণ দাস :** 'বেশ্যা বিবরণ' (১৮৬৯), **জনৈক অজ্ঞাতনামা :** 'বাহবা চৌদ্দ আইন' (১৮৬৯), **জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার :** 'সুধা না গরল' (১৮৭০), **বিপিনবিহারী দে :** 'একাদশীর পারণ' (১৮৭০), **মতিলাল মজুমদার :** 'উদ্ভট' (১৮৭০), **হীরালাল দত্ত ও অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ :** 'কলিকালের গুড়ুক ফোঁকা নাটক' (১৮৭০), **জীবনকৃষ্ণ সেন :** 'ফাল্‌তো ঝগড়া' (১৮৭০), **চন্দ্রকান্ত শিকদার :** 'কি মজার শনিবার' (১৮৭০), **কেদারনাথ ঘোষ :** 'জ্ঞানদায়িনী' (১৮৭০), **বঙ্কুবিহারী মিত্র :** 'আই ডোণ্ট কেয়ার' (১৮৭০), **দ্বারকানাথ দত্ত :** 'বাঙ্গালার ভাবি মঙ্গল' (১৮৭১) , **মহেশচন্দ্র দাস দে :** 'কুলপ্রদীপ নাটক' (১৮৭১), **অক্ষয়কুমার সাধু :** 'রতনেই রতন চেনে' (১৮৭১), **জনৈক অজ্ঞাতনামা :** গিরিবালা (১৮৭১), **প্রবোধচন্দ্র মজুমদার :** 'সাক্ষাৎ দর্পণ' (১৮৭১), এই প্রহসনটি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। **শ্রীমতি নিতম্বিনী :** 'অনূঢ়া যুবতী' (১৮৭২), **অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় :** 'সমাজ রহস্য' (১৮৭২), **হরিগোপাল মুখোপাধ্যায় :** 'দারোগা মশাই' (১৮৭২), **অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় :** 'টেক্ টেক্ না টেক্ না টেক একবার তো সি' (১৭৮২) এই প্রহসনটির নাম প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়ে গেছেল। তৎকালে চীনাবাজারে কথিত ইংরেজি ভাষাকে এখানে তুলে ধরে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। **প্রিয়লাল দত্ত ও ললিতমোহন শীল :** 'ভারত দর্পণ' (১৮৭২), এতে বাঙালি যুবকদের ভণ্ড স্বাদেশিকতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত উদ্ধার'-এর ঢঙে। **রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় :** 'এই এক রকম' (১৮৭২), **শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় :** 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু' (১৮৭২), **দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় :** 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী' (১৮৭২)[১]।

শিশিরকুমার ঘোষের লেখা 'নয়শো রূপেয়া' (১৮৭২) প্রহসনে হাস্যরস কারুণ্যে ভেসে গেছে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সমাজে তৎকালে কন্যা ক্রয় করে বিয়ে করতে হত। তাই অনেকের

---

১. উদ্ধৃত প্রহসনগুলির অনেকগুলিই হাতে আসেনি—সেই গ্রন্থগুলির নাম ও ব্যাখ্যাসূত্র :

(ক) বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান/শঙ্কর ভট্টাচার্য
(খ) The Story of the Calcutta Theatre. 1753-1980 / S. K. Mukherjee.
(গ) বাংলা নাটকের ইতিহাস/ড. অজিতকুমার ঘোষ।
(ঘ) বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১ম-২য়)/ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য
(ঙ) সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন/ড. জয়ন্ত গোস্বামী
(চ) সমকালীন নানা পত্রপত্রিকা
(ছ) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম-৪র্থ)/ড. সুকুমার সেন
(জ) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/(১-৫)/ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপ্যাধায়
(ঝ) বঙ্গভাষার লেখক (সন ১৩১১ সাল)/শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত
(ঞ) সাহিত্য সাধক চরিতমালা/বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
(ট) বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা/ড. অজিতকুমার ঘোষ

পক্ষেই বিয়ে করা সম্ভব হত না। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ রামধন মজুমদার নিজেদের ব্রহ্মোত্তর জমি বেচে বিয়ে করেছিলেন—কিন্তু ভাই সাতুলাল অবিবাহিত। রামধন ঠিক করে নিজের মেয়ে হলে তার বিয়ের টাকা নিয়ে সাতুলালের বিয়ে দেবে। রামধনের মেয়ে হয়। সে বড় হয়। রামধন বহু টাকা (হাজার টাকা) দর হাঁকে। তারপর অনেক জল ঘোলা হবার পর রামধনের মেয়ে সরলার সঙ্গে তার মনের মানুষ রঞ্জনের বিয়ে হয়। শিশিরকুমারের 'বাজারে লড়াই' প্রহসনটি ১৮৭৪ সালের ২৪ জানুয়ারি ও ১১ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। 'নয়শো রূপেয়া' ১৯৭৪ সালের ৭ জানুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়।[১]

বাংলা ভাষায় প্রহসন রচনার সর্বপ্রাচীন প্রমাণ মেলে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের প্রকাশিত 'হাস্যার্ণব' গ্রন্থে। তারপরে ইতঃস্তত দু'এক জন প্রহসনকার এক-আধটা প্রহসন রচনা করেছেন। কিন্তু রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদনের প্রহসন প্রকাশিত হবার পর সাধারণ প্রতিভা-সামর্থ্যের অধিকারী প্রহসনকারদের দ্বারা মধুসূদনের দুটি প্রহসনের বিষয়বস্তু নিয়ে এত বেশি সংখ্যক প্রহসন রচিত হয়েছে যে তার সঠিক পরিসংখ্যান দেওয়া মুশকিল। সাহিত্যমূল্যহীন কিংবা সামান্য সাহিত্যমূল্যসম্পন্ন এই হাস্যরসাত্মক নাটিকাগুলির কাহিনীবৃত্ত কয়েকটি পরিচিত এবং বহু আলোচিত বিষয়ের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে। সেগুলি হল—

(i) সমাজ-সমস্যা—বহুবিবাহ (পক্ষে-বিপক্ষে), বিধবা বিবাহ (পক্ষে-বিপক্ষে) বৃদ্ধবয়সে দারগ্রহণ। (ii) নৈতিক সঙ্কট—মদ্যপান প্রভৃতি নেশা, বাবুয়ানা, ব্যভিচার, গণপথা, (iii) সাংস্কৃতিক সঙ্কট—স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, (iv) ধর্মকেন্দ্রিক বাদ-বিসম্বাদ।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ (ন্যাশনাল থিয়েটার) প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকে বাংলা প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক থেকে জোয়ার আসে বলা যায়। কারণ ১৮৭৩ সালে আঠারটি বাংলা প্রহসন রচনার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রহসন রচনার এই সংখ্যাধিক্যের কারণ সম্ভবত,

(১) ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রহসন অভিনীত হওয়ায় ফলে প্রহসন রচনা সম্পর্কে নাট্যকারদের আগ্রহ বৃদ্ধি। বহু থিয়েটারে মঞ্চ স্থাপিত হওয়ার ফলে এবং তাতে প্রহসন অভিনীত হওয়ার ফলে সে আগ্রহের পরিপোষকতা।

(২) সমকালীন জীবন স্রোতে কয়েকটি ব্যাপারে এক তীব্র জাগরণী জোয়ার সঞ্চার। ঘটনাগুলি হল—হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা ও তার ফলে জাতীয়তাবোধের জাগরণ, অন্ধ-পাশ্চাত্যমোহের বিরোধিতা এবং পাশ্চাত্য অনুগামীদের নিন্দাপ্রবণতা, তারকেশ্বরে মোহান্তের কুকীর্তি।

বাংলা প্রহসনকে একই পথে আবর্তনের হাত থেকে রক্ষা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমৃতলাল বসু। এঁদের মতেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা প্রহসনের চরমোৎকর্ষ লাভ সম্ভব হয়েছিল।

১. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান/শঙ্কর ভট্টাচার্য/পৃঃ২৬

জ্যোতিরিন্দ্র-অমৃতলাল কালপর্ব

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২—১৯০২)

ভূমিকা : বাংলা গানের জগৎ থেকে নাটকের জগতে এসে নিজের অসাধারণ প্রতিভায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক ও নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে এক অবশ্য উচ্চারিত নাম হয়ে গিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐকান্তিক প্রয়াসে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথের ঠাকুরভবনের এক অংশে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা'। বাংলা নাটকের বিস্তার ঘটানোর উদ্দেশ্যে এ প্রস্তাব আসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকে। পরবর্তীকালে আমেদাবাদ থেকে গুণেন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে তিনি লেখেন,—

> ".....The origin of the Jorasanko Theatre is now hidden in the deep folds of rusty antiquity!!...It was Gople Ooriah's jatra that suggested us the idea of projecting a theatre. It was Gangooly [Sarada prasad], you and I that proposed it,...[১]

সুতরাং, নাট্যমঞ্চ স্থাপন থেকেই তাঁর নাট্যসেবার ইতিহাস শুরু। প্রহসনকাররূপে বাংলা নাটকের জগতে তাঁর আবির্ভাব। মধুসূদন-দীনবন্ধুসৃষ্ট বাংলা প্রহসনের নবীন বৃক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফুল ফোটাবার প্রয়াস করেছেন।

বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে বারবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম উচ্চারিত হয় কেন প্রসঙ্গত সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ঠাকুরবাড়ীর চার দেওয়ালের ভেতরে যেখানে সিরিয়াস শিল্প-সাহিত্যচর্চাই ছিল মুখ্য, সেখানে হাল্‌কা হাসির মৃদু সুড়সুড়িতে তাঁর বৃত্তের কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন তাঁদের ফিরে-দেখায় অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি। সমকালীন অন্যান্য প্রহসনকারের মত এ জন্য তিনি গল্প রসাস্বাদহীন উপদেশসর্বস্ব নক্সা নাট্যকে প্রহসন বলে চালাতে চেষ্টা করেননি। আগাগোড়া ঘনসন্নিবদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে কাহিনীর বা চরিত্রের উত্থান-পতনের মুহূর্তে কখনও Wit, কখনও humour-এর ছোঁয়ায় হাস্যরসাত্মক প্রহসন সৃষ্টির এক নূতন পথ নির্মাণ করেছেন। শুধু সাধারণ অন্যায়ের জন্য আঘাত করে নয়—তার চেয়েও গভীর সমাজ সমস্যাকে নিয়ে নয়—জ্যোতিরিন্দ্রের কৃতিত্ব 'অলীকবাবু'র মত চিরকাল সমভাবে গ্রাহ্য মানবজীবনের ওই দুর্বোধ্য অনুভবকে প্রহসনের আধারে ধরে দেওয়ায়।

কোনও কোনও সমালোচক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রাহসনিক সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে প্রহসন রচনা করার মতো সামাজিক অভিজ্ঞতা কিংবা শৈল্পিক ক্ষমতা কোনটাই তাঁর ছিল না। কিন্তু সমকালীন ইতিহাস এ ব্যাপারে ভিন্ন সাক্ষ্য দেয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলার সময় থেকে শুরু করে যেভাবে তাঁর জন মানসের সঙ্গে নৈকট্য এবং একাত্মতা ঘটেছে—তা তৎকালীন কোনও কোনও দেশনেতার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। তাই তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতা কম ছিল, এ কথা সর্বাংশে সত্য নয়। ব্রাহ্মসমাজের

১. গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই।

সম্পাদক থাকাকালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম প্রহসনও আমার মন্তব্যের সমর্থন করবে। তবে একথা বলতে দ্বিধা নেই, প্রচলিত প্রহসনবিধির গণ্ডীকে ছিঁড়ে ফরাসী নাট্যকার মলেয়ার এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, গভীর সামাজিক সমস্যাগুলিকে নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া না করে, মানবজীবনের সাধারণ কতকগুলি সমস্যার উপরিতলের পরিচয় দিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ফলে সিরিয়াস দর্শকের কাছে তেমন সাড়া না পেলেও তিনি সাধারণ দর্শকের হৃদয়ে অতি দ্রুত নিজ বক্তব্যকে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যও লক্ষ্য করেছেন,—

"জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন কয়খানিও সমাজের সুগভীর তলদেশের কোনও সন্ধান রাখে নাই, ইহারা উপরিভাগেই ক্ষুদ্রহাস্যের ফেনঃপুঞ্জ বিস্তার করে মাত্র।"

কিঞ্চিৎ জলযোগ

প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয় : আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তৎকালে রক্ষণশীল মানসিকতার অধিকারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের স্ত্রীস্বাধীনতার আত্যন্তিকতা এবং পর্দা-প্রথা উঠিয়ে দিয়ে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর এই বিরূপ মানসিকতার ফসল—তাঁর প্রকাশিত প্রথম প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২, ২০ সেপ্টেম্বর)। প্রথম সংস্কারণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না "প্রথম সংস্করণে এ পুস্তকে আমার নাম ছিল না, তবুও কি করিয়া যেন আমার নাম প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।" (জীবনস্মৃতি)। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল এটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ন্যাশান্যাল থিয়েটারে এদিন যে অনুষ্ঠানসূচী ছিল তা নিম্নরূপ,—

"২৬ এপ্রিল ঃ 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'একেই
কি বলে সভ্যতা?' (মাইকেল মধুসূদন দত্ত), ডিস্-
পেন্সারি, চ্যারিটেব্ল্ ডিস্পেন্সারি, ভারতসঙ্গীত"[১]

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রমুখের অভিনয় কলাকুশলতায় অভিনীত হয় 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', এবছর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'আনন্দকানন' অথবা 'মদনের দিগ্বিজয়' নাটকের সঙ্গে দ্বিতীয়বার 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' অভিনীত হয় ২১ নভেম্বর। রাধাকান্ত দেববাহাদুরের নাটমন্দিরেও এই নাটিকাটি অভিনীত হয়।

প্রহসনটির নিন্দা : 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনটি প্রকাশের সাথে সাথে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অদৃষ্টে জুটে-ছিল নিন্দা এবং প্রশংসা উভয়ই। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের দ্বারা লিখিত এই গ্রন্থটিতে যেভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল রমণীদের আঘাত করা হয়েছিল, তা মুখ বুজে মেনে নিতে পারেননি অনেক ব্রাহ্মই। ফলে স্ব-সমাজের আক্রমণে তিনি অসহায়তা অনুভব করেন অনেক বেশি। কেশব সেন পন্থী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অত্যন্ত তীব্রভাবে আক্রমণ এবং তিরস্কার করে,—

"আমরা শুনিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলাম 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামক একখানি নাটক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ভারতাশ্রম, ব্রহ্মমন্দির প্রচারকগণকে

১. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান/শঙ্কর ভট্টাচার্য/পৃঃ ২৫

বিলক্ষণ গালি দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মিকাগণকে ইহার মধ্যে আনিয়া গ্রন্থকর্তা যথোচিত আপনার নীচতা ও বিকৃত স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন।"[১]

ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার আক্রমণ এত তীব্র হয়ে উঠেছে কেন এই নিবন্ধের পরবর্তী অংশে তা স্পষ্ট হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের একজন কর্ণধার যদি সেই সমাজের বিরুদ্ধে কলম উঁচিয়ে ধরেন, স্বাভাবিকভাবেই বিরুদ্ধপক্ষীয়দের সমালোচন কার্যে তা আরও সহায়তা করবে; ফলে সমাজের উপর কলঙ্ক আরোপিত হবে। 'ধর্মতত্ত্ব' এ প্রসঙ্গে লেখে,—

"আমরা এ কথা শুনিয়া অবাক হইলাম যে, উক্ত গ্রন্থকর্তা কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্যের পুত্র। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।"[২]

প্রশংসা : কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম প্রহসনটির জন্য অকুন্ঠ প্রশংসাও পেয়েছিলেন উদারপন্থী মানুষজনের কাছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এই নাটিকার এক দীর্ঘ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করেন। রসজ্ঞ পাঠকের জ্ঞাতার্থে এর কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাক,—

"**কিঞ্চিৎ জলযোগ**। প্রহসন, কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র। একেই কি বলে সভ্যতার জন্মাবধি প্রহসনের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে। সেই সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুইখানি প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেষ রূপে বর্জিত **একেই কি বলে সভ্যতা** এবং **সধবার একাদশী**। সধবার একাদশী অশ্লীলতা দোষে দূষিত হইলেও, অন্যান্য গুণে ভারতবর্ষীয় ভাষায় এরূপ প্রহসন দুর্লভ। "**কিঞ্চিৎ জলযোগ**" ওই দুই প্রহসনের তুল্য নহে বটে কিন্তু ইহাকেও বর্জিত করিতে পারি না। ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন।"[৩]

হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা এই গ্রন্থের প্রশংসা করে লেকে,—'Its tendency is far from immoral'. সমকালীন বিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকা 'ক্রীশ্চান হেরাল্ড' 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্র-বান্ধব তারকনাথ পালিতও বইটির প্রশংসা করেন। কিন্তু এত প্রশংসা লাভ করা সত্ত্বেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেননি।

২য় সংস্করণ প্রকাশ না করার কারণ : 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ না হওয়ার কারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল হয়েছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন। এই নাটিকাটি লেখার সময় যদিও তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন—তবুও 'এ সময়ে আমি কিন্তু পুরাতনপন্থী ছিলাম, তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলাম।'[৪] কিন্তু কালক্রমে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন

১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ/বিশ্বভারতী/প্রসঙ্গ কথা/পৃঃ ৬৪৮
২. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটসংগ্রহ/বিশ্বভারতী/প্রসঙ্গ কথা/পৃঃ ৬৪৮
৩. বঙ্গদর্শন/চৈত্র; ১২৭৯/রিফ্রেক্ট। পৃঃ ৫০৮
৪. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি/পৃঃ ১৩৭

সাধিত হয়—বিলাত প্রত্যাগত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে তাঁর এ পরিবর্তন ঘটে এবং,—

> "তখন হইতে আর আমি অবরোধ-প্রথার বিরোধী নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। ইহারই কিছুদিন পূর্বে স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করিয়া আমি 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' লিখিয়াছিলাম বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। সেইজন্য 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র দ্বিতীয় সংস্করণ আর আমি ছাপাই নাই।"[১]

কাহিনী চিত্র : 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র কাহিনী নিম্নরূপ। বেকার পেরুরাম সংসারের চাহিদা মেটাতে দেনা করেছে প্রচুর। পাওনাদারদের দেনা শোধ করতে না পেরে সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু পাওনাদারদের শিকারী চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। তারা পেছু ধাওয়া করে তার। প্রাণের দায়ে দৌড়তে দৌড়তে সে একদিন হঠাৎ একটি পাল্কীর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং পাল্কীর দরজা বন্ধ করার সাথে সাথে বেহারারা পাল্কী নিয়ে রওনা দেয়। পাল্কীটি ছিল এক উচ্চশিক্ষিতা মহিলা বিধুমুখীর। বিধুমুখী মির্জাপুরের গীর্জার কাছে পাল্কী রেখে 'পরমগুরু, পরমপূজনীয়, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন পাপীর গতি শ্রীপতিতপাবন সেন'-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। পেরু পাল্কীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চাকরেরা কর্ত্রী এসে গেছে মনে করে তাকে নিয়ে ঘরে চলে আসে। এরপর বিধুমুখীর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে ব্রাহ্মমহিলাদের নানা হাস্যকর আচার আচরণ। স্বামী পূর্ণ বহু চেষ্টা করেও কোনদিন বিধুমুখীর মন রাখতে পারে না। হতাশ হয়ে সে বলে,—

> "তুমিই তো আমার সর্বস্ব ধন, তুমি যা বল, আমি তাই শুনি। বললে, সাঁইজির গির্জেয় যাব, ভালো বললে রক্সেনের ওখানে চা খাব , ভালো তাই খাও। বললে, মেয়েমানুষের স্বাধীনতা আছে, আমি যেখানে খুশী উড়ব—ভালো তাই ওড় গিয়ে। আমি কোন্ কথাটা শুনিনি বল দেখি ডিয়ার?" (১।১)

পূর্ণ বিধুমুখীর সব কথা শোনে কারণ সে নিয়মিত স্ত্রীকে লুকিয়ে শ্যামবাজারের কামিনীর কাছে যায়। বিধুমুখীও কামিনীর সঙ্গে তার স্বামীর পূর্ব-সম্পর্কের কথা জানে—'শ্যামবাজারের কামিনীর উপর তোমার যে আসক্তি ছিল, তা এমন কি আমাদের বিয়ে হবার আগে লোকে বলাবলি করত। যা হোক্, আমি গত বিষয়ের জন্য ভাবি নে....'(১।২) পূর্ণ মদ্যপ অথচ বিধুমখী মদ্যপান পছন্দ করে না। পূর্ণকে সে অনেকবার নিষেধ করেছে কিন্তু পূর্ণ মদ ছাড়তে পারেনি।

প্রথম দুটি দৃশ্য জুড়ে পেরুরাম পূর্ণের বাড়ীর গোলক ধাঁধায় ঘুরেছে। রাত্রিতে বিধুমুখীর ঘরে তার হাতে সে ধরা পড়েছে। বিধুমুখী পেরুরামকে ধর্মপ্রচারক প্রেমনাথবাবু রূপে চালাবার চেষ্টা করেছে, এবং তাকে আড়াই টাকা বেতনে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। পেরুরামের প্রেমনাথ ছদ্মবেশ শেষ পর্যন্ত খসে পড়েছে পূর্ণের কাছে। পেরুরামের প্রয়াসে পূর্ণ আর বিধুমুখীর মিলন হয়েছে।

প্রহসন কিনা : একটি মাত্র অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্কে সীমায়িত 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটিকাটিতে প্রহসনের সব লক্ষণ রয়েছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন,—

১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি/পৃঃ ১৩৮

"...ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। এ প্রহসনের একটি গুণ এই যে তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই। অনেকের প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক মাত্র; এ প্রহসন প্রহসন মাত্র কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাস্যের প্রাচুর্য্য না থাকুক, নিতান্ত অভাব নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। সেই ব্যঙ্গ যদি কোনও শ্রেণী বিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে তথাপি নিন্দনীয় নহে, কেননা ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না।"[১]

বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন 'Error ব্যঙ্গের যোগ্য নহে, Mistake ব্যঙ্গের যোগ্য,—এই নাটিকায় সে ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে পূর্ণ এবং বিধুমুখীর চরিত্রকে কেন্দ্র করে। বিশেষ করে বিধুমুখী। ব্রাহ্মসমাজের মহিলাদের কয়েকটি বিশেষ চারিত্রিক লক্ষণ হাস্যরসের আধারে—পরিবেশিত হয়েছে—

(i) বিধুমুখী জানিয়েছে পাপকর্ম করার পর পায়ে ধরে মাফ চাওয়ার কোনও কারণ নেই 'একবার অনুতাপ করো, তাহলেই পাপ ক্ষয় হবে।'[২] অনুতাপ করার পদ্ধতিও সে শিখিয়ে দেয় পূর্ণকে—অনুতাপ 'কেমন করে করবে? উর্দ্ধদিকে হস্তোত্তলন করে ক্রন্দন করতে করতে বলো, আর এমন কর্ম করব না।' (১।১)

(ii) বিধুমুখী দেশজ কথাবার্তাকে অশ্লীল বলে ভাবে। সে 'দিব্বি' করা একদম সহ্য করতে পারে না। মদ খাবে না বলে পূর্ণ দিব্বি করলে সে বলে—'আবার দিব্বি করা ভারি পাপ তা জান?' (১।১)

হাস্যরস : পেরুর অসংলগ্ন কথাবার্তা, ভোলার স্বগতোক্তি এই নাটিকার হাস্যরসের স্রোতকে অনাবৃত করেছে। দর্শক হৃদয় জয় করার উদ্দেশ্যে দুটি আদিরসের গান ও একটি ছড়া সন্নিবিষ্ট হয়েছে প্রাচীন ঢঙে। প্রথম গানটি ও শেষ ছড়াটি কিছুটা তাৎপর্য পূর্ণ। প্রথম গানটিতে পাওনাদারদের হাত থেকে পালাতে পালাতে পেরুরাম এসে গিয়েছে বিধুমুখীর বাড়ীতে—তার জীবনে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের পূর্বাভাস রয়েছে গানটিতে,—

"পদী রে! তবু আমি আছি তোর।
এত যে খারাবি করলি মোর।
মেগে পেতে কর্জ্জ করে, খাওয়ালাম পরালাম তোরে,
এখন কেবল বাকি আছে, হতে সিঁদেল চোর।।" (১।১)

১. বঙ্গদর্শন/চৈত্র সংখ্যা, ১২৭৯

২. '১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রামমোহনের মৃত্যু হয়; তাহার পরেই সমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহারই নেতৃত্বাধীনে সমাজের নিয়মাদি স্থিরীকৃত হয়। সমাজে প্রবেশের সময় সভ্যগণ পৌত্তলিকতা পরিহার করিবার জন্য, প্রকৃত ঈশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য, পবিত্র জীবন-যাপন করিবার জন্য, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন। অনুতাপই ক্ষমা ও মুক্তির একমাত্র উপায়; ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে সৎকার্য্য, দান, চিন্তা ও ভক্তি, ত্যাগের মধ্যে স্বার্থত্যাগ; এবং পবিত্র অন্তঃকরণই একমাত্র ধর্ম্মমন্দির। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের নেতৃরূপে আবির্ভাব। তিনি জাতিভেদ প্রথা রহিত করেন, রমণীদিগকে সমাজভুক্ত করেন, এবং বিবাহের সংস্কার করেন।' 'সাহিত্য' ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩০২ / পৃঃ ৩৮০

মিলনান্তক সমাপ্তিতে বিধুমুখী মিষ্টান্নের থালা হাতে নিয়ে যে ছড়াটি বলে তা নিম্নরূপ—

"মিটিল ঝগড়া-ঝাঁটি আর গোলযোগ।
মুখে করে পেরুরাম এবে জলযোগ!
তারি লাগি এতক্ষণ এই কর্মরোগ!
এখন দর্শকগণ খ্যাঁটে দেও যোগ!" (১।৩)

'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনের নামকরণের সার্থকতার ইঙ্গিতেও এখানে রয়েছে। ক্ষুধার্ত পেরুরামের জলযোগ করার প্রয়াস অবশ্য তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শুরু এবং সেখানেই শেষ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্ভবত কেশবচন্দ্র সেনের কথা মনে রেখে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক পতিত-পাবন সেন চরিত্রে সৃষ্টি করেছিলেন। এই অদৃশ্য ধর্মপ্রচারকের চরিত্রটিই বোধ হয় কেশব সেনের উষ্মাবৃদ্ধির কারণ। পরিশেষে বলা যায় বিধুমুখী চরিত্রের অনুসরণ পরবর্তীকালে অমৃতলাল বসুর বহু প্রহসনে ব্রাহ্ম রমণীর চিত্র অঙ্কনে সহায়তা করেছে। এ নাটকে মাঝে মধ্যে যে অশ্লীল শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে—তা লৌকিক বা দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বাক্-ব্যবহারে অতি-শুচিবায়ুগ্রস্ততার বৈপরীত্য দেখানোর জন্যই।

প্রসঙ্গত আর একটি কথাও বলা যায়, মলেয়ার ভক্ত ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাই তাঁর প্রথম প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র উপসংহার অংশে কোনও কোনও সমালোচক মলেয়ার-এর 'তার্ত্যুফ' প্রহসনের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। কারণ তাঁদের মতে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনের মতই পরিণতিতে দোষীর শাস্তিবিধান করে নীতি শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা আছে সেখানে। কিন্তু 'তার্ত্যুফ' নাটকের বিষয় আর 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র কাহিনী-বস্তু-দুয়ের মধ্যে রয়েছে দুস্তর দূরত্ব। ভণ্ড ধর্মধ্বজীর মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে 'তার্ত্যুফে'। কিন্তু 'কিঞ্চিৎ জলযোগে' বিধুমুখী দায়ে পড়ে পেরুকে নকল ধর্মপ্রচারক সাজিয়েছে। এখানে ধর্মের নাম করে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে যতটা না ধিক্কার আছে তার চেয়ে অনেক বেশি চিত্রিত প্রবৃত্তির তাড়না মেটাতে মানুষের (বিধুমুখীর) চিরকালীন ছলাকৌশল অবলম্বন।

অলীকবাবু [‘এমন কর্ম্ম আর ক’রব না’]

প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম প্রহসন স্বসমাজে নিন্দিত হয়েছিল শিক্ষিতা-নারীদের নিয়ে বিদ্রূপাত্মক মনোভাব পোষণের কারণে। কিন্তু হাল্কা রসের দ্বিতীয় নাটিকা ‘এমন কর্ম্ম আর ক’রব না’-তে সহজ সরল কৌতুককর এক কাহিনীকে গ্রহণ করায় সে ধরনের কোনও ব্যাপার ঘটেনি। ‘বিদ্বজ্জন সমাগমে’র ১৮৭৭ সালের অধিবেশনে নাটিকাটি প্রথম অভিনীত হয়। এবং ওই বৎসরই ৭ জুলাই এটি মুদ্রিত হয়। এই নাটিকার প্রধান নানা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—

সত্যসিন্ধু—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (জ্যাঠামশায়)
অলীকবাবুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবিকাকা)
গদাধর—সেজ পিসেমশায়

১. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান/শঙ্কর ভট্টাচার্য/পৃঃ ৩০০

জগদীশ—জগদীশ দাদা

হেমাঙ্গিনী—শরৎকুমারী চৌধুরাণী

পিস্‌নি—বর্ণপিসিমা।[১]

নিজ স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও এক সময় বলেছেন যে নাট্যমঞ্চে তাঁর প্রথম আবির্ভাব 'অলীকবাবু' রূপে,—

> "নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার 'এমন কর্ম্ম আর ক'রব না' প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়।'

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু' প্রহসন অভিনয়ের এক চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন,—

> "একবার ড্রামাটিক ক্লাবে 'অলীকবাবু' অভিনয় হয়। অলীকবাবু জ্যোতি কাকা মশায়ের লেখা, ফরাসী গল্প মোলেয়ারের একটা নাটক থেকে নেওয়া। সেই ফরাসী গল্প উনি বাংলায় রূপ দিলেন।"[২]

'এমন কর্ম্ম আর ক'রব না' প্রহসনটি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল 'অলীকবাবু' নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

নামপরিবর্তন ঃ 'এমন কর্ম্ম আর ক'রব না' প্রহসনের নাম পরিবর্তনের যৌক্তিকতা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে, কেননা এ পরিবর্তন ঘটেছে প্রহসনটির প্রথম প্রকাশের তেইশ বছর পরে। দৃশ্যবিভাগ কিংবা অঙ্ক বিভাগহীন এই নাটিকার শেষ অংশে সত্যসিন্ধুবাবু জগদীশ বাবুর কাছে অলীক প্রকাশের ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ে যায়। গদাধর নিজেই সবকিছু জানিয়ে দেয় বাধ্য হয়ে।

বাড়ির প্রকৃত মালিক পেয়াদা নিয়ে অলীকের কাছে ভাড়া চাইতে গেলে সে পেয়াদার হাতে মার খাবার পরে বলে ওঠে,—

(i) "একটু সবুর করো বাবা—পেয়াদা-সাহেব বড়ো ভালো লোক—শ্বশুরমশায় আমাকে এ যাত্রা উদ্ধার করুন—আমি এমন কর্ম আর করব না।"

(ii) সত্যসিন্ধুবাবু তাকে তিরস্কার করে টাকা দেবেন না বললে সে আবার কাতর কণ্ঠে বলে,—"এ যাত্রায় রক্ষা করুন—আর এমন কর্ম করব না—"

(iii) জগদীশবাবুর মধ্যস্থতাতেই অলীকের খালাস পাবার সম্ভাবনা জেনে সে জানিয়েছে যে সে ছাড়া পেলেই এ জায়গা ত্যাগ করবে। সে আর হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করতেও চায় না—কারণ যেভাবে সে ভোঁতা-বঁটি হাতে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল তাতে তার ভাবনা নিজের সম্পর্কে ধরিয়ে দিয়েছে। তার বিশ্বাস 'বিয়ে হলে আমারই গলায় কোন্‌দিন ছুরি বসিয়ে দেবে'। তাই সে বলে 'এমন কর্ম আর করব না।'

(iv) পেয়াদার হাত থেকে মুক্ত হবার পর সে বলেছে,—'মশায়, আমার ঘাট হয়েছে—আমি নাকে খৎ দিচ্ছি, এমন কর্ম আর কখনো করব না।'

১. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর স্মৃতিকথা (১৯৬২)/পৃঃ ২৯

২. ঘরোয়া/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/পৃঃ ১৩৬

অলীকপ্রকাশের এই বারবার আক্ষেপ ও আকুলভাবে মুক্তিলাভের প্রার্থনা এই নামকরণে গুরুত্ব পেয়েছিল। কারণ যে কাজ তার করা উচিত ছিল না—সে কাজই অলীক করেছে। নিজের মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বড়লোক মানুষের জামাই হয়ে সুখে থাকতে চেয়েছে। আবার সত্যসিন্ধুবাবুও একবার এই কথা উচ্চারণ করেছেন।

"এবার বিলক্ষণ শিক্ষা হয়েছে—এমন কর্ম আর করব না।" সত্যসিন্ধুর এই উক্তির পশ্চাতে রয়েছে তাঁর আক্ষেপ। তাঁর ধারণা মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে তিনি নিজেই তাকে স্বাধীনভাবে চলতে উৎসাহিত করেছেন বলে এ সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তাই তাঁরও প্রতিজ্ঞা এমন কাজ তিনি আর করবেন না। গদাধরও জগদীশবাবুর মুখ রক্ষা করে শেষে সত্য কথা স্বীকার করে জানায়, 'ধর্মাবতার, আমাকে মাপ করুন, এমন কর্ম আর কখনো করব না।'

'এমন কর্ম্ম আর ক'রব না' নামকরণে হাসির ব্যাপারটা থাকলেও তা ততখানি প্রবল হতে পারে নি যা হয়েছে নাম পরিবর্তনের ফলে। এ নাটকের প্রধান চরিত্রই তো অলীকবাবু। তার অদ্ভুত কথাবার্তা এবং সে সব সত্য হয়ে ওঠার, কথা দিয়েই এ নাটক। অলীকবাবু এক ধাপ্পাবাজ চরিত্র। শুধু কথা বাড়িয়ে বলা নয়, তার উদ্দেশ্য সত্যসিন্ধুবাবুর মেয়েকে বিয়ে করে, তাঁর টাকা বাগিয়ে নিয়ে মেয়েকে ডিভোর্স করার।

'অলীকবাবু' নাটকের শেষে জানানো হয়েছে এ নাম নাকি তার পিতৃদত্ত। তাই সবকিছু ছাড়তে পারলেও সে এ নামটুকু কোনমতেই ছাড়তে পারবে না। এমন কর্ম আর করব না স্বীকার করে তিন তিনটি চরিত্র। কিন্তু হাসির নাটকে এই প্রতিজ্ঞা তখনই হাসির কারণ হয়ে ওঠে যখন তারা সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙে। কিন্তু এখানে সে ধরনের কোন অবকাশ নেই। তাই যে চরিত্রকে কেন্দ্র করে এ নাটকের কাহিনী আবর্তিত সে চরিত্রের নামেই নামকরণ করেছেন নাট্যকার।

এখানেই শেষ নয়। হাস্যরস প্রধান প্রহসন জাতীয় নাটকে চরিত্র অথবা ঘটনা নাটকের মূল ভাবনাকে প্রকাশ করে, তাই নামকরণ এ দুয়ের মধ্যে কোন একটি গুরুত্ব পায়। অলীকবাবু চরিত্রটি সেদিক থেকে এগিয়ে। কেননা সে-ই প্রহসনের নায়ক চরিত্র। তার মিথ্যাবাদিতা যাতে ধরা না পড়ে সে চেষ্টা নায়িকা হেমাঙ্গিনীর কম নয়। প্রসন্নের সঙ্গে তার কথোপকথনে তার মানসিক ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে।

> "হেমার বাবা বলেছেন যদি তিনি একবার একটা মিথ্যা কথা ধরতে পারেন তা হলে তাঁর সঙ্গে আর আমার বিয়ে দেবেন না।
>
> প্রস। বলো কি দিদিঠাকরুন? বাবু মানুষ কাঁচা বয়েস, শহরে বাস, দু-চারটে মিথ্যে কথা না বললে কি চলে?
>
> হেমা। সে যাক, এখন অলীকবাবুকে আগে থাকতে কি করে সাবধান করে দি ভেবে পাচ্ছি নে।
>
> প্রস। রোসো, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি তিনি কখন এখানে আসেন। কর্তাবাবুর কাছে যাবার আগেই আমি তেনাকে সাবধান করে দেব।
>
> হেমা। চুপ কর্ তো। বাবার ঘরে কে যেন কথা কচ্ছে না? এ নিশ্চয় অলীকবাবুর গলা।
>
> প্রস। তবে বুঝি দিদিঠাকরুন, তিনি আর-এক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসেছেন।
>
> হেমা। তবেই তো দেখছি সর্বনাশ! যদি বাবার সঙ্গে কথা কবার সময় পেয়ে থাকেন তা হলেই তো দেখছি—

প্রস। তা দিদিঠাকরুন, কর্তাবাবু যাতে ওঁর বেফাঁস কথাগুলো না ধরতে পারেন তার একটা ফন্দি করতে হবে। আমার ঘটে বড়ো বুদ্ধি এসে না। তবে আমার সেই মিন্‌সেটিকে বলে দেখি, যদি তার কোনোরকম বুদ্ধি জোগায়, দিদিঠাকরুন, আমি জানি তার অনেকরকম ফন্দি এসে।"

গদাধর যুক্ত হয়ে পড়ায় অলীকবাবুর অলীক কথা সত্য হয়ে উঠেছে, তার বিযুক্তিতে হয়ে গেছে অলীক।

কাহিনী সংক্ষেপ : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন 'মোলেয়ারের নাটক অনুসরণে' 'অলীকবাবু' রচিত হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে এই নাটিকার কাহিনী অংশটুকু লক্ষ্য করা যাক। সত্যসিন্ধুবাবু কৃষ্ণনগরের এক সম্ভ্রান্ত এবং বিত্তবান ভদ্রলোক। তাঁর এক বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে হেমাঙ্গিনী। হেমাঙ্গিনীর পাত্র অনুসন্ধান করতে কৃপাসিন্ধুবাবু তাঁর কন্যা ও তার দাসীকে নিয়ে কোলকাতায় যার বাড়ীতে উঠেছেন—সে-ই হল ভণ্ড অলীকবাবু। অলীকবাবু যে বাড়ীতে সত্যসিন্ধুবাবুকে আশ্রয় দিয়েছে সেটা তার ভাড়া বাড়ী। অথচ সত্যসিন্ধুবাবুকে ঠকিয়ে তাঁর কন্যাকে বিয়ে করার আকাঙক্ষায় অলীকবাবু সে বাড়ীকে নিজের বাড়ী বলে বলেছে। অলীকবাবু বিয়ে করে অদৃষ্ট ফেরাতে চায়। অন্যদিকে অলীকবাবুর সাগরেদ গদাধর চায় হেমাঙ্গিনীর দাসী পিস্‌নি বা প্রসন্নকে বিয়ে করতে। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর বিয়ে না-হওয়া পর্যন্ত পিস্‌নির বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। আবার অলীকবাবুর সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বিয়ে হলে বিধবা দাসী প্রসন্ন বা পিস্‌নি বখশিস পাবে নগদ এক হাজার টাকা। সুতরাং তখন পিস্‌নি-গদাধর সুখে ঘর-সংসার পাততে পারবে। তাই তারা অলীকবাবু-হেমাঙ্গিনীর বিয়েতে আগ্রহী।

এদিকে অলীকবাবু নিজ কৃতিত্ব জাহির করতে সত্যসিন্ধুবাবুর কাছে যে সব উদ্ভট কথা বলতে থাকে—গোপনে সব খবর জানতে পেরে গদাধর অলীকবাবুর সমস্ত উদ্ভট কথাকে সত্যে পরিণত করতে কখনও হিন্দুস্তানী, কখনও চীনাম্যান, কখনও বাঙালি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সেজেছে। বারবার অজান্তে প্রতারিত সত্যসিন্ধুবাবুর যখন অলীকবাবুর প্রতি প্রীত হয়ে তাঁর কন্যার সঙ্গে অলীকবাবুর বিবাহ-কথা প্রায় পাকা করতে গেছেন, সে সময় গদাধর তার সমস্ত ছদ্মবেশ ধারণের কথা সবাইকে জানিয়ে দেয়। এ সময় ভাড়ার টাকা দিতে না পারার জন্য পুলিশ অলীকবাবুকে গ্রেপ্তার করে। অলীকবাবুর সমস্ত ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ে যায়।

বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ : 'অলীকবাবু' প্রহসনে সমকালীন একটি বহু আলোচ্য প্রসঙ্গ—বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। হেমাঙ্গিনীর দাসী পিস্‌নি বিধবা। গদাধরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তার মধ্যেও বিবাহের বাসনা জেগে উঠেছে। কিন্তু সেকথা সাহস করে কাউকে বলতে সে ভয় পেয়েছে। তাই ছল করে সে হেমাঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করে,—

"প্রস। ও মা কি ঘেন্নার কথা। মিন্‌সে বলে কি দিদিঠাকরুণ যে তুই আমাকে বে কর, পণ্ডিতরে নাকি বলেছে যে বিধবা বে তে দোষ নেই; একথা কি সত্যি দিদিঠাকরুণ?

হেমা। (হাস্যকরত) ওগো! তুই বিধবা বিয়ে করবি? ওমা আমি কোথায় যাব! তা তুই কর-না, তাতে কোনো দোষ নেই। সত্যি, পণ্ডিতরা বলেছে বিধবার বিয়ে হতে পারে।"

বিধবাবিবাহের সমর্থনসূচক এই সংলাপগুলি বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

প্রহসন রচনার উদ্দেশ্য : বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকলেও এই প্রহসন রচনার পশ্চাতে বিধবাবিবাহের পক্ষে বা বিপক্ষে মত প্রচার করা নাটকারের উদ্দেশ্য ছিল না—কোনও কুপ্রথা বা কু-রীতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করাও নাট্যকারের উদ্দেশ্য নয়—তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অনাবিল হাস্যরস পরিবেশন। 'এমন কর্ম আর করব না' নামে এই গ্রন্থটি প্রথমে প্রকাশিত হয়—পরে এর নাম পরিবর্তিত হয় 'অলীকবাবু'। জনৈক সমালোচক (প্রিয়নাথ সেন) বলেছেন,—

> "ইহার উদ্দেশ্য কেবল খাঁটি আমোদ। গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার ভিতর একটি সুস্থ, সবল, উজ্জ্বল, বালকসুলভ অট্টহাস্য শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল হাসি— নিছক বিশুদ্ধ হাসি।"[১]

হাস্যরস : 'অলীক বাবু' নাটকের আগাগোড়া রয়েছে এক সরল অথচ উদ্ভট কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট উজ্জ্বল হাস্যরসের স্রোতঃপ্রবাহ। এ নাটকে হাস্যরসের উৎসার ঘটেছে কয়েকটি বিষয় সূত্রে (i) ঘটনার উপস্থাপন সূত্রে (ii) চরিত্রের আচরণের সূত্রে এবং (iii) সংলাপের ভাষায় বিচ্যুতির সূত্রে।

ঘটনার উপস্থাপন সূত্রে এ নাটকে হাসির ফোয়ারা ছুটেছে বারবার। এ নাটকের মূল ঘটনার বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই ধাক্কা লাগে একটা ক্ষেত্রে তা হলো অলীকবাবু হঠাৎ কোলকাতায় এসে প্রাসাদোপম বাড়ি ভাড়া নিলেন কেন আর কিভাবেই সে বাড়িতে এসে সত্যসিন্ধুবাবু উঠলেন—সে সম্পর্কে প্রসন্নের উক্তিতে জানতে পারি,—

> "এর আবার দুই মহল। এক মহলে বরটি নিজে থাকে, আর এক মহলে আমাদের কর্তাকে থাকতে দিয়েছে। তিনি কৃষ্ণনগর থেকে সবে এই এসেছেন—কলকাতার তো কিছুই চেনেন না, তাই আপাতত এই বাড়িতে উঠেছেন।"

কিন্তু এ তথ্য সূত্র সংযোজনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। প্রসন্নের জন্য এ বাড়িতে গদাধরের আগমন থেকে কাহিনী এগিয়েছে টুকরো টুকরো ঘটনায়, যার সব ঘটনার উৎসস্থল এক—লোভ। গদাধরের লোভ প্রসন্নকে বিবাহ করে তার টাকা পাওয়া। অলীকের লোভ সত্যসিন্ধুবাবুর টাকার উপরে। এই লোভ ও আকাঙক্ষাকে সত্য করার জন্য তাদের ভূমিকা হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। সে হাসির প্লাবন নেমেছে বন্ধুর আবির্ভাব ও তার সঙ্গীতে, চীনাম্যানের আবির্ভাবে, নকল সত্যপ্রকাশ ও আসল সত্যপ্রকাশের আবির্ভাবে, হেমাঙ্গিনীর বঁটি হস্তে প্রবেশে।

'অলীকবাবু' নাটকের প্রতিটি চরিত্রই কমবেশি হাসির কারণ হয়ে উঠেছে। অলীক প্রকাশের গুলবাজির চেয়ে গদাধরের কেরামতি, উপন্যাসের নায়িকা হয়ে ওঠার চেষ্টায় চেষ্টিত হেমাঙ্গিনী অনেক বেশি হাসির কারণ হয়েছে। হেমাঙ্গিনীর ঝাঁটার বর্ণনা—এই নাটকের গতিতে কিছুটা ক্ষামতি ঘটলেও এই ঝাঁটায় বর্ণনার বঙ্কিমীমুদ্রা বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুগামী লেখকদের বর্ণনাকে ব্যঙ্গ করেছে। ঝাঁটার দর্শন

১. প্রিয় পুষ্পাঞ্জলী (১৩৪০)/প্রিয়নাথ সেন/পৃঃ ১৩৬

মিললো বংশীবদন ঘোষের কন্যার হাতে,—"দেখিলেন, বংশীবদন ঘোষের বাড়ির গৃহস্থেরা সকলেই নিদ্রিত। কেবল একটিমাত্র বালিকা সম্মার্জনীহস্তে, গৃহপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতেছিল। সুন্দরীর সুকুমার হস্তে ঝাঁটার যে কি শোভা তাহা কি পাঠকগণ দেখিয়াছেন? কেহ যদি না দেখিয়া থাকেন তো আমি দেখিয়াছি। ইহাতে প্রখরে মধুরে মিশে। বজ্র ও বিদ্যুতে প্রখরে মধুরে মিশে; নিদাঘ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ও বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় প্রখরে মধুরে মিশে; ব্রাণ্ডি ও বরফে প্রখরে মধুরে মিশে; চিলের চিহিঁরবে ও কোকিলের কুহুধ্বনিতে প্রখরে মধুরে মিশে; এবং বালিকার সুকুমার হস্তে ঝাঁটিকাও প্রখরে মধুরে মিশে। হে ঝাঁটে! হে শতমুখি!—হে ধূমকেতু প্রতিরূপিণি সম্মার্জনি! হে কুণ্ডলাকৃতিধূলি-রশি-সমুদগরিণি! হে শম্বক-কণ্টকী-নিন্দিত-তীক্ষ্ণকর-প্রসারিণি! হে নারিকেল-রাশি-নিবন্ধ-শিরোদেশ-সুশোভিনি! কি বা তোমার অতুলনা মহিমা! তুমি গৃহের শ্রীস্বরূপা, কারণ তুমি গৃহ-প্রাঙ্গণের মুখ উজ্জ্বল কর—তুমি পল্লীর বৈতালিক-স্বরূপা, কারণ তোমার মৃদু মধুর ঝরঝর নিনাদে গৃহস্থের নিদ্রা ভঙ্গ কর—তুমি দ্বিপত্নীক ভর্তার ভীতি-স্বরূপা, কারণ দিবারাত্রি তাহার উপর নিগ্রহ কর—তুমি বীরত্বের আদর্শ-স্বরূপা, তোমার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে কেহ অগ্রসর হয় না, কারণ তোমা কর্তৃক নিগৃহীত ভীরুদের পৃষ্ঠদেশেই ক্ষতচিহ্ন লক্ষিত হয়—তুমি অলঙ্কার শাস্ত্রোল্লিখিত মহাকাব্য-স্বরূপা—কারণ তোমাতে নব রসেরই আবির্ভাব। যখন আনতমুখী অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর সুকুমার হস্তে তুমি শোভমানা হও, তখন তুমি আদিরসের উত্তেজক—যখন প্রচণ্ড মূর্তিধারিণী, ঘূর্ণায়মানলোচনা, আলুলায়িতকেশা, বদ্ধ-পরিকরা বাপান্ত-বর্ষিণী প্রৌঢ়ার হস্তে বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া থাক তখন তুমি রৌদ্র বীর ও ভয়ানক রসের উত্তেজক এবং যখন তোমার সেই সুতীব্র ভীষণ বজ্র নিগৃহীত ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশ শতধা বিদীর্ণ করিয়া রক্তনদী প্রবাহিত করে, তখন তুমি করুণ-রসের উত্তেজক—যখন তুমি আঁস্তাকুঁড়ের আবর্জনারাশির মধ্যে ক্রীড়া করিতে থাক তখন তুমি বীভৎস রসের উত্তেজক—যখন তোমার কোমল স্পর্শে কুপিত নায়কের কোপ-শান্তি হয় তখন তুমি শান্তিরসের উত্তেজক। তোমার মহিমার অন্ত কোথায়? তোমাকে প্রণাম।

প্রস। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

হেমা। ও কি লো প্রণাম করিস কাকে?"

এই বর্ণনায় নাট্যকারের পরিহাস রসিকতার যেমন প্রমাণ মেলে তেমনি তার সম্পূর্ণতা ঘটেছে এ বর্ণনার অন্তে ভূমিষ্ঠ হয়ে ঝাঁটা প্রণামে। তার যুক্তি ঠাকুর-দেবতার নাম শুনলে প্রণাম করতে হয়। তাই এই প্রণাম।

অলকীবাবুর বন্ধুর সঙ্গীত আসলে রাগ অবলম্বী প্যারডি গান। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে পাঁচু ঠাকুর প্রমুখের প্রয়াসে এ ধরনের রচনার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ নাটকের গানে যে প্রভাতী মূর্ছনা সৃষ্টি করা হয়েছে ললিত রাগিনীতে তা যথেষ্ট হাস্যরসোদ্দীপক,—

"গা হোলো রে নিশি অবসান প্রাণ।
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে পুঁইশাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।"

উৎসাহিত সত্যসিন্ধুর অনুরোধে বন্ধু জানকীর প্রতি শ্রীরামের উক্তি বিষয়ক গান ধরে,—

"হুলো বেড়াল মিঁয়াও করে, নেংটে ইঁদুর খাচ্ছে ধরে
পেঁচা ভাবে আমার খাবার অন্যে কেন খান।

গুড়ুম গুড়ুম নটার তোপ, এখনো কি যায় নি কোপ,
একটুখানি দিয়ে হোপ রাখল আমার প্রাণ।
ভোঁদড়গুলো মারছে উঁকি, ঘুমিয়ে গেলো খোকাখুঁকি,
শ্রীরাম বলেন, হে জানকী, ভাঙবে কি তোর মান?'

পূরবী রাগিণীতে গাওয়া এ গানকে অলীকপ্রকাশ বলে বেহাগ রাগিণী। সে শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দেয়। 'বেহাগ' বাংলা গান হলেও এটার সংস্কৃত নাম 'শব্দকল্পদ্রুম'।

অলীকের সংস্কৃত গানের পরাকাষ্ঠা দর্শকদের মধ্যে তুমুল হাসির ঢেউ তোলে। তার ঘটোৎকচ রাগে গাওয়া গান এবং তার সমর্থনে তার বাক্‌বিন্যাস বিস্মিত করে। হাসির ফোয়ারা ছোটার এই মুহূর্তে দু'একটা প্রশ্ন যে মনে জাগে না তাও নয়—প্রশ্ন হলো অলীকপ্রকাশের সব কিছুই অদ্ভুত—সে ধাপ্পাবাজ, সে মিথ্যাকথার ভাণ্ডার, সে বানিয়ে বলায় ওস্তাদ, সে মহা মূর্খ, সংস্কৃত জ্ঞানে যেমন সে অজ্ঞান তেমনি ইংরেজি শাস্ত্রেও আকাট। তার সবকিছু প্রকাশের স্থূল মুখ—বাক্যরাজি। সে চিঠি লিখতে সাহসী নয়, কেননা তাতে তার সমস্ত পাণ্ডিত্য ধরা পড়ে যাবে। তাই প্রাচীন পণ্ডিৎদের উপদেশ মান্য করে সে না জেনেই। তার পথ 'শতংবদ না লিখ'র পথ।

নাটকের শেষ অংশে অলীকপ্রকাশের ধাপ্পা ধরা পড়ার মুহূর্তটি বড় বেশি প্রলম্বিত। জগদীশবাবুর আগমনের সাথে সাথে যদি নাট্যকাহিনীতে ছেদ পড়তো তবে তা অনেক বেশি গ্রহণীয় ও প্রাহসনীয় হতো, শেষ অংশের এই দীর্ঘতা যেন প্রাতিশোধিক মনোভাব সঞ্জাত বলে মনে হয়ে যায়। অলীকবাবু মিথ্যাবাদী—তার সেই মিথ্যাচারকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য যতটা বেশি সম্ভব সময় নিতে গিয়ে হাস্যরসকে একটু আঘাত করে বসেছেন নাট্যকার।

মিথ্যাবাদিতার অপরাধে অপরাধী হতে পারে অলীক, কিন্তু মিথ্যাচারে নয়। সে যে সব কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে গেছে তাকে সত্য করার জন্য গদাধরের ক্ষেপে ওঠা এবং তাকে ঠিক সেভাবে উপস্থাপিত করার দক্ষতায় সে তো অলীককেও স্থানে স্থানে ছাপিয়ে গেছে। জগদীশবাবুর ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মোসাহেব গদাধরের জগদীশবাবুকে নিয়েও মিথ্যাচার অলীকতার পর্যায়কে যেন চরমে নিয়ে গিয়েছে।

দু'এক জায়গায় এ ধরনের কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অলীকবাবু নাটকটির রস নিঃসন্দেহে দর্শককে দীর্ঘকাল হাসিয়েছে অলীকবাবুর কিছু সংলাপ যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছে। বিশেষ করে হেমাঙ্গিনীর চিঠি আসার পর তার স্বগতোক্তি এবং প্রসন্নকে তার উত্তর দান। উদ্ধৃতি কিছু দীর্ঘ হলেও এখানে তা উদ্ধার করার লোভ সংবরণ করা গেল না—

"—যেরকম লিখেছে, আমার চোদ্দপুরুষেও অমন লিখতে পারে না। মেয়েটা দেখছি আমার প্রেমে একেবারে মজে গেছে। তা আমাকে দেখতে তো নেহাৎ মন্দ নয়—মজবেই বা না কেন? লিখছে "দেখিলাম—দেখিয়া মজিলাম—মজিয়া জ্বলিলাম—জ্বলিয়া মরিলাম না কেন"—বালাই, মরবে কেন? লিখে জবাব দেওয়া তো আমার কর্ম নয়, মুখে জবাব দেওয়া যাক্—আমার পেটে যত রসিকতা আছে এইবার সব টেনেটুনে বের কত্তে হবে। আমার চেয়ে মেয়েটার বিদ্যে থাকতে পারে কিন্তু রসিকতায় আমার সঙ্গে আর পারতে হয় না—পেট থেকে পড়েই বিদ্যেসুন্দর পড়তে আরম্ভ করেছি। (প্রকাশ্যে প্রসন্নের প্রতি)

দেখো প্রসন্ন, তোমার দিদিঠাকরুনকে বোলো—যে অবধি আমি তাঁর সেই পদ্মপলাশলোচনবৎ চক্ষুযুগল, তাঁর সেই শুকচঞ্চুবৎ ঠোঁটযুগল, তাঁর সেই অজাতলম্বা হাতযুগল এবং তাঁর সেই গজেন্দ্রগমনবৎ শ্রীচরণকমলেষু দর্শন করেছি সেই অবধি আমিও মজেছি। মজেওছি বটে, মরেওছি বটে। দেখো প্রসন্ন, তোমার দিব্যি, সেই অবধি আমার আর আহার-নিদ্রে নেই। সদা-সর্বদা অষ্টপ্রহরই তোমার দিদিঠাকরুনের ধ্যানেতেই মগ্ন আছি। আবার তাতে এখন বসন্তকাল! বসন্তকালের যে কি বিরহযন্ত্রণা তা তো তুমি জানো প্রসন্ন। যখন কোকিল কুহু-কুহু করে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তখন গুম্ গুম্ শব্দে আমার প্রাণে যেন কে কিল মারতে থাকে—যখন চাঁদের জোচ্ছনা ফোটে, তখন এমনি গরম হয়ে ওঠে যে শরীরটা একেবারে শিক-কাবাব হয়ে যায়—গা-ময় মস্ত মস্ত সব ফোস্কা পড়ে—দেখো প্রসন্ন, এখনো তার দাগ মিলোয় নি (বসন্তের দাগ প্রদর্শন) আর যখন আমি বিছানায় শুই তখন সে শুষ্যি-কণ্টকটা উপস্থিত হয় তা আর কি বলব—একবার এ পাশ, একবার ও পাশ—ক্রমাগত ছট্‌ফট্ কত্তে হয়। কে বলে বিছানা বিছা না। অন্যের পক্ষে যাই হোক আমার পক্ষে, প্রসন্ন, সে বিছাই বটে। কট্‌কট্ করে ভয়ানক কামড়াতে থাকে। এই-সব যন্ত্রণার কথা তোমার দিদিঠাকরুনের কাছে সব নিবেদন কোরো প্রসন্ন। আর যদি কোনো রকমে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় তবে তো আর কথাই নেই। তোমার দিদিঠাকরুনকে বোলো আমি তাঁর জন্যে তৃষিত চাতকিনীর ন্যায় উপেক্ষা কচ্ছি।

প্রস। তা বলব।

[প্রসন্নের প্রস্থান"

প্রসন্ন হেমাঙ্গিনীর দাসী। নিরক্ষর সে। বিধবা এই রমণী প্রেমের ব্যাপারে অতশত গভীর কথা বোঝে নি। সামাজিক অনুশাসনকে ভয় পায় বলে বিধবা বিবাহে তার আগ্রহ ছিল না। সে সম্পর্কে আইন আছে শুনেই উল্লসিত হয়ে উঠেছে সে। হেমাঙ্গিনীর বিয়ে দেবার পশ্চাতে তার নিজের বিবাহ-আকাঙ্ক্ষাও রয়েছে যথেষ্টই। হেমাঙ্গিনী তার হাত দিয়ে চিঠি পাঠালে সে তা অলীকের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু প্রত্যুত্তরে অলীক তাকে যে কথা বলেছে—আর সে যেভাবে এসে সেকথা হেমাঙ্গিনীকে জানিয়েছে তাতে হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটেছে,

"হেমা। কি লো, সেই চিঠিটা কি তাঁকে দিয়েছিস?

প্রস। দিয়েছি বই-কি দিদিঠাকরুন।

হেমা। তিনি কি তার কোনো উত্তর দিয়েছেন?

প্রস। দিদিঠাকরুন, বরটি বেশ—নাহলে কি তোমার মনে ধরে—কেমন বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা—ভালোমান্‌ষের ছেলেটি বড়ো সুবোধ শান্ত—আমাকে একবারও তুই-তাকারি কল্লে না গা—আমাকে বাছা বলে, পেসন্ন বলে কত কথাই কইলে, একবারও আমাকে পিস্‌নি বলে ডাকে নি দিদিঠাকরুন।

হেমা। তিনি কি বললেন তাই বল্-না।

প্রস। আমি কি সে-সব বুঝতে পেরেছি দিদিঠাকরুন, তিনি কত ন্যাকাপড়ার কথা কইলেন—কোকিলের কথা কইলেন—চন্দর-সূর্য্যির কথা কইলেন—আর কত কি কথা কইলেন। কিন্তু একবারও আমাকে পিস্‌নি বলে ডাকেন নি।

হেমা। আ মর্—পিস্‌নি বলেন নি এই আহ্লাদে উনি গেলেন আর-কি—আমার কথা কি বললেন তা বলবে না—আপনার কথাই পাঁচ কাহন।

প্রস। দিদিঠাকরুন, তোমার কথাই তো কইলেন। আহা ভালো মান্‌ষের ছেলে কত দুক্ষু কত্তে নাগল গা—বললে গরমে তার গায়ে ফোস্কা পড়েছে—আবার বিছানার মধ্যে একটা বিছে ছিল, তেনাকে কট্ কট্ করে কামড়ে দিয়েছে—তার জন্যে তেনার রাত্তেরে ঘুম হয় নি—এইসব দুক্ষের কথা তোমার কাছে দিদিঠাকরুন জানাতে বললেন। আরো বললেন তোমাকে তেনার বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে।

হেমা। (আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া) কি বল্‌লি পিস্‌নি, আমাকে তাঁর দেখতে ইচ্ছে করে? আমার জন্যে তাঁর কষ্ট হয়? হা! (দীর্ঘনিশ্বাস)"

প্রতিটি চরিত্রের সংলাপেই রয়েছে হাস্যরসের অজস্র যোগান। মিথ্যাবাদী ভণ্ড অলীকপ্রকাশও বারবার নাজেহাল হয়েছে তার মুখের কথা খসতে না খসতে সেই সেই কাল্পনিক চরিত্রের উপস্থিত হওয়ায়,—

"অলীক। (স্বগত) এ বেটার মতন মিথ্যেবাদী তো আমি দুনিয়ায় দেখি নি।"

একসময় চীনাম্যানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং নাট্যকার। ইন্দিরা দেবী স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন,—

"·····জ্যোতিকাকার সেই চীনেম্যান সেজে চীনে ভাষায় কিচির মিচির কথা—কাকে ছেড়ে কার কথা বলব!"

হাস্যরসের উৎসমুখ খুলে দিয়েছে হেমাঙ্গিনী স্বয়ং। এই চরিত্রটি প্রায়শই উপন্যাসের নায়িকার ঢঙে কথা বলেছে। রোমান্সের স্রোতে ভেসেছে। ছল-চাতুরীতে সিদ্ধ ভণ্ড অলীকপ্রকাশ যখন ভাড়া দিতে না পারার জন্য পুলিশের হাতে বন্দী হয়েছে তখনও হেমাঙ্গিনী একটা ভোঁতা বঁটি হাতে স্টেজে এসেছে—এবং সকলের সামনে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস গ্রন্থের নায়িকার মতো

"হেমা। আমি পিতার সমক্ষে, সমস্ত জগতের সমক্ষে, মুক্ত কণ্ঠে বলছি এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর—আমার কণ্ঠরত্ন—ইনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করব না—যদি এর সঙ্গে আমার বিবাহ না হয় তাহলে এই দণ্ডেই প্রাণ বিসর্জন করব।"

বলা বাহুল্য এর সংলাপ বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স শ্রেণীর উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষার সংলাপকে স্মরণ করিয়ে দেয়। হেমাঙ্গিনীর এই উক্তি তৎকালে জনমনে কিরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা ইন্দিরা দেবীর দীর্ঘকাল পরে স্মৃতিচারণের আনন্দানুভবে বুঝতে পারি। তিনি বলেছেন,—"হেমাঙ্গিনী যে হাতে বঁটি ধরে 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর' এই রকম কী একটা খুব নাটকীয়ভাবে বলতেন, সেও একটা মনে রাখবার মতো জিনিস।" রিচার্ডস ব্রিন্‌সলে শেরিডান (Richard Brinsely Sheridan)-এর 'The Rivals' নাটকের নায়িকা লিডিয়া লাংগুইস (Lidea Langues)-এর সঙ্গে 'হেমাঙ্গিনী'র চরিত্রকে সমান্তরাল রেখায় অঙ্কন করা যায়। উভয়ের উদ্ভট রোমান্টিকতা যেমন পুরোপুরি বাস্তব পরিপন্থী নয়, তেমনি আবার, বাস্তব অনুমোদিতও নয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'অনুপমার প্রেম' গল্পের নায়িকা অনুপমায় সম্ভবত হেমাঙ্গিনীর উত্তরাধিকার বর্তেছে। 'অলীক

বাবু' প্রহসনে মলেয়ারের যে হাস্যরসাত্মক নাটকটির অনুসরণগত প্রভাব গল্পে, চরিত্রে ও সংলাপেও বর্তেছে—সেটি 'The Romantic Ladies'।

অলীকবাবু : অলীকপ্রকাশের নামেই প্রকাশ যে সে অলীক। অলীক শব্দের অর্থ ভ্রম, মায়া, স্বপ্ন, কল্পনা। বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই। সে যেন অলীককুসুম—আকাশকুসুম। কিন্তু এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অলীকপ্রকাশ বারবার কল্পফানুস ওড়ালেও দেখা গেছে সে ফানুস আশ্চর্যজনক ভাবে মিথ্যা নয় সত্য হয়ে উঠেছে। বিস্মিত হয়েছে স্বয়ং অলীকও। বলেছে—

"এ কি আশ্চর্য! আমি যেটি মনে কচ্ছি সেইটিই কাজে ঘটছে—"

বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে ধনী হয়ে ওঠার বাসনা তার। সে বাসনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য তার আয়োজনের অন্ত নেই। কিছুমাত্র সঙ্গতি না থাকা সত্ত্বেও সে কোলকাতায় বড় বাড়ি ভাড়া করেছে। সেই বাড়িতে কৃষ্ণনগর থেকে আসা সম্ভ্রান্ত ধনী সত্যসিন্ধুবাবু আর তার মেয়েকে থাকতে দিয়েছে। পরিকল্পনায় অলীকের অলীকত্ব নেই, বরং এই বাবুয়ানিতেই সে হয়ে উঠেছে অলীকবাবু।

আবির্ভাবের মুহূর্তেই অলীকের মিথ্যা কথার সূচনা। সে জানিয়েছে তার বংশ বড় উচ্চ, তার সঙ্গে কামাখ্যাদেবের রাজকন্যার বিবাহ সম্বন্ধ হয়েছিল। রাজা বিক্রমাদিত্যের বংশের সেই রাজকন্যা মনোরমা তাকে বিয়ে করার জন্য নাকি পাগল। কিন্তু অলীক এ বিয়েতে রাজি হয় নি। বিষ্ণুপুরের রাজার মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ হয়েছিল। রাজা নিজেও বিয়ের জন্য বহু সাধাসাধি করেছিলেন তাতে কিন্তু সে রাজি হয়নি। সত্যসিন্ধুবাবু মেয়ের বিবাহ দিতে আগ্রহী কেবল উপযুক্ত বরের হাতে—একথা শোনার সাথে সাথেই নিজেকে তার উপযুক্ত প্রমাণ করার জন্য সে উঠে পড়ে লাগে।

কন্যা শিক্ষিত তাই শিক্ষিত পাত্র ছাড়া যে তাকে বিয়ে করা অসম্ভব, তা অলীক বিলক্ষণ জানে। তার বিদ্যের দৌড় ইস্কুলের দুচারটে ক্লাস এড়ানো। সে স্বগতোক্তি করেছে,—

'এত করে ইস্কুল থেকে এড়িয়ে আবার বুড়ো বয়সে এগ্‌জ্যামিনের দায়ে পড়তে হল নাকি!'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেখেছেন তাঁর সমকালে দু'চার ছত্র ইংরেজি শিখতে না শিখতেই পাণ্ডিত্যের বাহবাস্ফোট। তাদের কথার ভুলটুকু বোঝার মতো সামর্থ্য এসব বক্তার নেই। শ্রোতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে অজ্ঞ হলে তো আর কথাই নেই। অলীকবাবু সেই সুযোগ নিয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের পুঁথি খুলে বসেছে—যাতে দেশি বিদেশি পণ্ডিতদের বক্তব্য সবার কাছে সহজ করে বলার প্রয়াস করেছেন,—তার গুরুগম্ভীর আলোচনা,—

(i) বিদ্যার ক্ষেত্রে নারীদের এগিয়ে দেবার ব্যাপারে তার বক্তব্য,—"শেক্সপিয়ার তাঁর ওয়েবস্টর ডিক্‌স্যানারি বলে একটা নভেলেতে তো পষ্টই লিখেছেন যে মেয়েদের লেখাপড়া না শেখালে তারা হয় একটা জন্তু।" আবার—
"আর, চেম্বর্স অ্যাট্‌লাসে বায়রন লিখেছে যে নথ যেমন স্ত্রীলোকের প্রধান অলংকার বিদ্যাও স্ত্রীলোকের পক্ষে তদ্রূপ।"

(ii) সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রেও তার ব্যুৎপত্তি দেখাতে সে বলে,—"আমাদের শাস্ত্র অগাধ জগদম্বা বিশেষ, উপযুক্ত ডুবুরি হলে সকল রত্নই পাওয়া যায়। তা কেন,

কালিদাসই তো মুগ্ধবোধে লিখে গেছেন যে 'বিদ্যাহীন না শোভন্তি শোভন্তি বৈশাখে নর বাঁদরী।''

অলীকের এই বক্তব্যে একসঙ্গে দুজন ধরাশায়ী হয়েছে, যে দুজনকে তার প্রতি আসক্ত করা ছিল অলীকের প্রধান লক্ষ্য। আড়াল থেকে শেক্সপীয়ারের নভেল শব্দটুকু শুনেই হেমাঙ্গিনী তার প্রতি প্রাণমন সঁপে দিয়েছে পুরোপুরি। কেননা তার অনুমান ছিল অলীক উপন্যাস পড়েছে, আর নভেল শব্দের দৃষ্টান্তেই সে ধরে নিয়েছে সে কথা। অন্যদিকে অলীকের উদ্ভট বক্তব্য শুনে তার পাণ্ডিত্য সম্পর্কে সত্যসিন্ধুর নিঃসংশয় হওয়া 'সংস্কৃত ও ইংরেজি শাস্ত্রে ছোগ্‌রাটির বিলক্ষণ দখল আছে দেখেছি।' শুধু হাসির নয় বিস্ময়েরও কারণ ঘটায়। বিশেষ করে কালিদাসের মুগ্ধবোধ গ্রন্থ আর শেক্সপীয়ারের নভেল। বিস্ময় জাগায় সত্যসিন্ধুর পাণ্ডিত্য বিষয়েও।

অলীকবাবুর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য তার কথার মাত্রাহীনতা। তার মতে খাটো খাটো করে কথা বলা শিক্ষিত ভদ্রলোকের উপযুক্ত নয়, 'ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলেই পাঁচরকম সাজিয়ে বলতে হয়—না হলে যে আমাকে অসভ্য বলবে।' মুখে সভ্য-অসভ্য যারই দোহাই দিক এই হলো তার প্রকৃতি। যদি তা না হতো তবে সে নিশ্চিতভাবে হেমাঙ্গিনীকে পেতে পারতো। কারণ তার প্রথমদিকের কয়েকটি মিথ্যাভাষ সাথে সাথেই সত্যে পরিণত হয়ে যাবার পর হেমাঙ্গিনীর বাবা সত্যসিন্ধুবাবু অলীকের প্রতি নরম হয়ে পড়েছিলেন। এমন কি জগদীশবাবুর কাছে তিনি বলেছেন,—'আপনার বন্ধু অখিল প্রকাশের পুত্র অলীকপ্রকাশের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহের কথা হচ্ছে—' তখন প্রকৃত ঠক হলে সে নিরস্ত হয়ে যেত। নানারকম ভান করে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করতো। কিন্তু তা সে করেনি, উল্টে প্রকৃত জগদীশের সঙ্গে অযথা বাক্‌দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে বিবাহের সম্ভাবনাকেও দিয়েছে কাঁচিয়ে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সৃষ্ট অলীকবাবুর চরিত্র বাঙালী সমাজে একেবারে অলীক নয়। এ ধরনের বাড়িয়ে বলা চরিত্র প্রায়শই চারপাশেই চোখে পড়ে। তবে এ অলীকের বাড়িয়ে বলা যেন সমস্ত বুদ্ধির সীমা গেছে ছাড়িয়ে।

গদাধর : অলীকবাবুর চরিত্রের বাড়িয়ে বলা স্বভাবকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে যে চরিত্রটি সেটি জগদীশবাবুর মোসাহেব গদাধর। সত্যসিন্ধুবাবুর কন্যার পরিচর্যার দায়িত্বে থাকা বিধবা পিস্‌নিকে বিয়ে করে কপাল ফেরাতে চায় সে। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত জেনে নিমরাজি পিস্‌নি। কিন্তু তার শর্ত একটাই তা হলো অলীকের সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বিয়ের পর সে তাকে বিবাহ করতে পারবে। এই পরিস্থিতিতে সে গদাধরকে এ কথাই জানিয়ে দিয়েছে অলীকবাবুর মিথ্যা কথাগুলো সে যদি সত্য করে সত্যসিন্ধুর মনে তার প্রতি আস্থা জাগাতে পারে এবং তাদের বিবাহ ঘটাতে পারে, তবেই সে গদাধরকে বিয়ে করবে।

গদাধর প্রসন্নকে বিয়ে করতে চায় শুধু ভালোবসে নয়, প্রগতিশীল জগদীশ মুখোপাধ্যায় তাকে কথা দিয়েছেন যে সে বিধবা বিয়ে করলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। এ পুরস্কারের লোভের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হেমাঙ্গিনীর বিয়ে হলে প্রসন্নর পুরস্কারের উপরি পাওয়া এক হাজার টাকার লোভ। সে বলেছে,—

"মরুক গে যাক, আমার তা জেনে লাভ কি? (স্বগত) এই টাকাটা গ্যাঁড়া দিতে

হবে (প্রকাশ্যে) তা, ওতে আমার কি লাভ? পীরিত যে জিনিস সে কি টাকার ধার ধারে?"

প্রসন্নর কথায় গদাধর নতুন পরিকল্পনা ছকে নেয়। সে প্রসন্নকে বলে,—

"দেখ পিস্‌নি, নীচে একটা ঘর-ভাড়া করে একজন বহরূপী আছে—তার সঙ্গে আমারও বেশ আলাপ আছে—তুই এখানে থাক্, আমি চললেম—যদি মিথ্যে কথাটা ধরে পড়বার মতন হয় তা হলে চট্ করে আমাকে খবর দিস—আমি লাটুভাই সেজে আসব।"

অলীকের কথাকে সত্য প্রতিপন্ন করাই এর পর গদাধরের একমাত্র কাজ হয়ে ওঠে। শেষে জগদীশবাবু সেজে প্রকৃত জগদীশ মুখোপাধ্যায়কে যখন বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দেয় সে তখন ধরা পড়ে সব কথা জানিয়ে দেয়। গদাধর নিজে কেন এ কাজ করেছে সে কথাও অকপটে জানিয়ে দেয়,—

(i) জগদীশবাবু তাঁকে বিধবা বিবাহের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দেবেন বলেছিলেন সেই লোভে সে 'এই বাড়ির চাকরাণীকে বিধবা বিয়েতে রাজি করেছিলো'।

(ii) দিদিঠাকরুনের বিবাহ না হলে প্রসন্ন বিয়ে করতে পারবে না জানার পর সে এ বিয়ে যাতে হয় তাই এই ধরনের কাজ করেছে।

(iii) সত্যসিন্ধুবাবুর সন্দেহ দূর করে অলীকবাবুর প্রতি তার আস্থা জাগানোর জন্য সে-ই লাটুভাই চীনাম্যান সেজেছে। সামাল দিয়েছে পরিস্থিতির। কিন্তু জগদীশবাবু সেজে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে সব গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে। গদাধর জগদীশকে জানিয়েছে 'আপনি যে এখানে নিজে উপস্থিত হবেন তা আমি স্বপ্নেও মনে করি নি।'

গদাধর জানিয়েছে যে সে অলীকের সহায়ক ছিল বলে তার মিথ্যা কথাগুলো এতক্ষণ ধরা পড়েনি। এবার সে পাঁচ মিনিট ওকে কথা কইয়েই মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে পারবে। বেলিফের পেয়াদাকে নিয়ে বাড়ির প্রকৃত মালিকের লোক ঠিক সেই মুহূর্তে এসে পড়ায় অলীকের মিথ্যা ধরা পড়ে যায়।

হেমাঙ্গিনী ঃ অলীকবাবু নাটকের প্রধান নারী চরিত্র হেমাঙ্গিনী। নারী প্রগতির কথা বললেও ঠাকুর পরিবারে নারী প্রগতির নামে নারীর যথেচ্ছারের প্রতি বিন্দুমাত্র সমর্থন ছিল না। হেমাঙ্গিনী চরিত্রটি এখানে শিক্ষিত নারীর প্রতীক নয়, সামাজিক ন্যায়বোধ হারিয়ে ফেলা এক বাক্‌সর্বস্ব নারী।

পিতার সঙ্গে কৃষ্ণনগর থেকে হেমাঙ্গিনী কোলকাতায় এসেছে তার বিবাহাকাঙ্ক্ষী অলীকবাবুর বাড়িতে। নাটকের সূচনাতেই আছে উপন্যাসের নায়িকার ঢঙে তার কথাবার্তা বলা। নভেলপ্রিয় এই রমণী দাসীর সঙ্গেও নভেলের ভাষায় কথা বলেছে। সে পিস্‌নিকে বলেছে,—

"যার সঙ্গে যার ভালোবাসা হয়, তাদের বিয়ে দিতে আমার বড়ো ইচ্ছে করে। যখন নভেলে পড়ি যে দুজনের ভালোবাসা হয়ে বিয়ে হল না তখন আমার বড়ো কষ্ট হয়।"

শুধু তাই নয় বিয়ে করতে এমনই উৎসুক হয়ে উঠেছে সে যে প্রসন্নকে বলেছে তার বিয়ে হয়ে গেলে সে বিধবা প্রসন্নের বিয়ে দেবে, এ জন্য যত টাকা খরচ হয় তার সবই সে দেবে।

অলীকবাবুকে দেখামাত্র ভালো লেগেছে হেমাঙ্গিনীর। সে সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারে। তার এই কথাগুলোকে লোকে মিথ্যা ভাবে বলে সে দুঃখ পায়। তার উপর সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত লোকগুলোর উপরই হেমের রাগ হয়। সে প্রসন্নকে জানায়—'আমার বোধ হয় তিনি অনেক নভেল পড়েছেন।'

অতঃপর অশিক্ষিত প্রসন্নকে সে নভেল সম্পর্কে যে জ্ঞান দিয়েছে—তাতে তারও এ সম্পর্কে ধারণা নিয়ে সংশয় জাগে—সে জানায় নভেল বলে—এক ধরনের নতুন বই বেরিয়েছে যাতে 'যেমন জ্ঞানের কথা থাকে—এমন আর কিছুতে না'। তার জ্ঞানের প্রসারতা বোঝাতে সে বলেছে,—রামায়ণ মহাভারতের চেয়েও আকর্ষণীয়,—

> 'আমার ইচ্ছে করে তোকে লেখাপড়া শেখাই, তা হলে নভেল পড়বার সুখটা তুই জানতে পারিস।"

প্রসন্নের মনে উপন্যাস প্রীতি জাগানোর জন্য যে ঝাঁটা বন্দনা সে তাকে শোনায় তা শুনে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে প্রসন্ন গড় হয়ে প্রণাম করে।

হেমাঙ্গিনী প্রসন্নকে জানিয়েছে অলীকবাবুর কথা তার ভালো লাগে, কিন্তু তার বাবা ঐ বরে বিয়ে দেবেন না বলেছেন যদি তিনি ওর একটা মিথ্যা ধরতে পারেন। উপন্যাসের নায়িকার মতো সেও মনে করে একই গৃহে এখন থাকলেও 'যার সঙ্গে ভালোবাসা হয় তাকে ভালোবাসার চিঠি গোপনে পাঠাতে হয়।' অতঃপর সে অলীকবাবুকে স্বামিন্ সম্বোধন করে পত্র পাঠিয়েছে। এ পত্রের ছত্রে ছত্রে যে ধরনের আবেগ প্রকাশিত তা হাস্যরসের উৎসমুখ খুলে দিয়েছে।

নারীর সাজসজ্জা সম্পর্কে হেমাঙ্গিনীর ধারণা carefully careless থাকা। প্রসন্ন সেকালে সাজগোজ করে পুরুষের মন ভুলাতো শুনে হেম বলেছে,—'আশ্চয্যি! ওরকম সাজগোজে আবার তখনকার পুরুষগুলো ভুলত!" একালের পুরুষের পছন্দও যেন তার জানা। সে দুইকালের পছন্দের তুলনা করে বলে—"তোদের কালে পিস্‌নি লোকগুলো রূপে ভুলত—এখনকার কালে তারা ভাবে ভোলে।" হেমাঙ্গিনীর মতে সেকালের লোকেরা প্রেমও জানতো না।

আড়াল থেকে সত্যসিন্ধুর সঙ্গে অলীকের কথাবার্তা শোনে হেমাঙ্গিনী। সে সময় শেক্সপীয়ারের নভেল এর দৃষ্টান্ত শুনেই বিগলিত হয়েছে সে। সে নভেলের নাম 'ওয়েবস্টর ডিক্‌স্যানারি'। শেক্সপীয়রের আমলের প্রায় দেড়শ বছর পর বিশ্বসাহিত্যে নভেলের আবির্ভাব। তাই অলীকের ধাপ্পা যে কোন পর্যায়ের এবং তার বোদ্ধা শ্রোতাদের জ্ঞানের সীমা যে কতদূর বিস্তৃত তা এখানে সহজেই অনুমেয়।

নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বিবাহ স্থির হবার পূর্বমুহূর্তে হেমাঙ্গিনীর আকাঙক্ষা তরী কূলে এসে ডুবতে বসলে সে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকা আয়েষার মতো লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে ছুটে আসে পিতার কাছে।

সত্যসিন্ধুবাবু, জগদীশবাবু, প্রসন্নর চরিত্রও এ নাটকে যথাযথভাবে অঙ্কিত হয়েছে। হাস্যরসাত্মক নাটকের রস আস্বাদন করতে বসে যুক্তি, তত্ত্ব, তথ্যকে প্রাধান্য দিলে হাস্যের পরিবর্তে রয়ে যায় শুষ্ককাশি। তাই 'অলীকবাবু' দেখতে বসে সে বিচার ত্যাগ করাই ভালো।

উদ্ভট ভাবনা এবং অস্বাভাবিকতা নিষ্ণাত 'অলীকবাবু'র হাস্যরসসুধা আজও হাস্যরসপ্রিয় দর্শক সম্প্রদায়কে সমানভাবে আকর্ষণ করে। কেননা এ প্রহসনটির আবেদন তাদের কাছে চিরন্তন।

হিতে বিপরীত

ফরমায়েসী রচনা : অনেকদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্য রচনায় ছেদ পড়েছিল। হিন্দুমেলার তাগিদে—সঞ্জীবনী সভার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপে চাপা পড়েছিল প্রহসন রচনার গরজও। তাঁর মেজ-বৌঠাকুরাণী একদিন তাঁকে পাকড়ালেন। 'একখানা নাটক এইখানে লিখে ফেল।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পড়লেন ফ্যাসাদে। নাছোড়বান্দা মেজ-বৌঠাকুরাণী তাঁকে জোর করে একটি ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তারকনাথ পালিতের কন্যা লীলাকে দরজা পাহারায় নিযুক্ত করে দিলেন। শর্ত এই, "যতক্ষণ নাটক না লেখা হইবে, ততক্ষণ আর আমার (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের) মুক্তি নাই। দায়ে পড়িয়া এইরূপে 'হিতে বিপরীত' রচিত হইল।" এবং "দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের কন্যা নলিনী দেবীর সঙ্গে ডাক্তার সুহৃদনাথ চৌধুরীর বিবাহ উপলক্ষে নাতনীকে এই নাটকটি উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হয়েছিল। উৎসর্গ লিপি নিচে উদ্‌ধৃত হল—

নাতিনীর শুভ বিবাহে উপহার
নলিনি জুটিল তোর সুহৃদ্ ভ্রমর
বিধি মিলাইয়া দিল মনোমত বর।
কি দিয়া তুষিব তোরে, কি আছে রতন,
সম্বলের মধ্যে মোর একটু যতন।
যতনে গাঁথিনু তাই বাক্যময় হার,
কৌতুক-যৌতুক এই লহ উপহার। —নূতন দাদা"[১]

১৪ই বৈশাখ
১৩০৩ সাল

প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয় : 'হিতে বিপরীত' হাস্যরসাত্মক নাটিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৩ সালের ১৪ বৈশাখ—ইংরেজি ৭ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই প্রহসনটি সম্ভবত ওই বৎসরই ঠাকুরবাড়ীর রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানিয়েছেন 'এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানি পরে আমাদের বাড়ীতে ও সঙ্গীত সমাজে বহুবার অভিনীত হয়।'[২]

কাহিনী সংক্ষেপ : 'হিতে বিপরীত' তাৎক্ষণিক রচনা। স্বাভাবিক কারণেই এর কাহিনীতে মৌলিক ভাবনার ছোঁয়া নেই বললেই চলে। বৃদ্ধের বিবাহ বাতিক এবং তার পরিণতি চিত্রণই এই নাটিকার মূল কাহিনী। বৃদ্ধ ভজহরি ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত কৃপণ। কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে তিনি কিছুটা দরাজ-হস্ত। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী গত হবার পর তাঁর চতুর্থ পক্ষে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। কারণ রামধন ভৃত্য তাঁর সমস্ত অর্থ নানাভাবে

১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ/প্রসঙ্গ কথা/বিশ্বভারতী/পৃঃ ৬৭৭
২. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

আত্মস্যাৎ করছে—বাজারের পয়সা চুরি করছে, এই বিশ্বাস তাঁর প্রবল হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। তাই তাঁর স্বগতোক্তি,—

"এতগুলো পয়সা নিলে আর দেখো-না ঠোঙা করে কি একরতি নিয়ে আসবে এখন। ওর সঙ্গে আর পারা যায় না। আবার বিবাহ না করলে আর চলছে না। ঘরে গিন্নি না থাকলেই যত দুর্দশা...." (প্রথম দৃশ্য)

কিন্তু ভৃত্যের কাছে সরাসরি সে চুরি করছে বলা যায় না বলেই ভজহরি বিয়ে করতে চান। তিনি বলেন,—

"তোমার কষ্টের যাতে লাঘব হয়, তার উপায় আমি একটা ঠাওরেছি। আমি আবার একটি চতুর্থ পক্ষ করতে চাই, বুঝলে রাম" (প্রথম দৃশ্য)

ভজহরির নাতি কুঞ্জবিহারী একটি এ্যামেচার থিয়েটার দলের সঙ্গে যুক্ত। কুঞ্জ তার দলবলকে একদিন 'খ্যাঁট' দিতে চায়। তাই দাদুর কাছে সে টাকা চায়। কৃপণ দাদুর কাছ থেকে পয়সা বের করতে পারে না। সে রামধনের কাছে জানতে পারে দাদুর বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগের কথা। থিয়েটারের দলপতির সঙ্গে সে পরামর্শ করে নেয়, ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে কি ভাবে দাদুর পয়সা হাতাবে। পরের দৃশ্যে রামধন ভজহরিকে জানায় বিয়ের সব ব্যাপার প্রস্তুত। কুঞ্জ উৎসাহের সঙ্গে রসুন চৌকি করে আনে। ভজহরি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন,—

"ভজ। এই দেখো পাগলামি আবার রসুন চৌকি ডাকতে কে বললে? তোমার যত অনাসিষ্টি—রসুনচৌকি দূর করে দেও—ওদের আমি এক পয়সাও দেব না।

কুঞ্জ। দাদামশাই, তোমার পয়সা দিতে হবে না—আমার থিয়েটারের দলের লোক—ওরাই বিনি পয়সায় বাজাবে।

ভজ। তাই বলো—তা শুভকার্যে একটু বাজনা-বাদ্যি হলে কিছু ক্ষতি নাই। দেখো, ভালো ভালো রাগ বাজাতে বলো—এখন রাত্তির—এখন ভৈরবী বাজাতে বলো—যখন কার যে রাগ—কি বলেন মশায়।" (তৃতীয় দৃশ্য)

এরপর পরিকল্পনামত কুঞ্জের বন্ধুবর্গ ভজহরির কনে, শ্যালী সেজে ভজহরিকে যথেষ্ট নাকাল করে। পরিশেষে বৃদ্ধের নিদ্রাকর্ষণ হলে ভজহরির বাক্স থেকে টাকার থলে নিয়ে সকলে চলে যায়। রামধন সেই টাকা থেকে তার ছ'মাসের বাকি মাইনে পায়। কুঞ্জের বন্ধুরা পায় কেক, বুটি, কাটলেট খাবার পয়সা।

হাস্যরস : প্রহসন কিনা : 'হিতে বিপরীত' প্রহসনটিতে হাস্যরসের উজ্জ্বলতা রয়েছে, কিন্তু হাস্যরস সৃষ্টির নিজস্বতা নেই। যে চিন্তার ফসল মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হিতে বিপরীত' সেই চিন্তারই ফসল।[১৫] কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থ হিসেবে 'হিতে বিপরীত' প্রহসনে প্রহসনকারের চিন্তার এবং প্রহসন পরিকল্পনায় যে সমুন্নতি প্রত্যাশিত ছিল—নাটিকাটি তার ধার কাছ দিয়েও যায়নি। চারটি দৃশ্যে রচিত এই প্রহসনটিতে প্রহসনের দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত নির্দেশ প্রতিপালিত হয়েছে। তা ছাড়া 'হিতে বিপরীতে'র কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দর্শকহৃদয় জয়েও সমর্থ হয়েছে—

(i) বৃদ্ধ ভজহরির কৃপণতার পরিচয়বাহী তাঁর সংলাপগুলি। অন্তত একটি সংলাপ

উল্লেখের দাবি রাখে,—সংসার যাত্রা নির্বাহ করার ক্ষেত্রে ভজহরি ভীষণ কঞ্জুষ। তাঁর নূতন স্ত্রী যে আরও কৃপণ একথা প্রমাণ করতে গিয়ে যখন স্ত্রী ভজহরিকে বাসরঘরে বলে—গামছাগুলো ফেলে না দিয়ে ধুতি করা যায়,—

'স্ত্রী। আমি সেলাই করি জুড়ে ধুতি করে দেব—বেশ হবে। তা জানো না?

গামছাকে গামছা
গামছা দুগুণে কাছা
দুইকাছায় পণে ধুতি
চার কাছায় ধুতি।

ভজ। কি বলব যাদু, তুমি একটি রত্নবিশেষ। এই বয়সে কত গিন্নিই দেখলুম। কিন্তু তোমার মতো গিন্নি আমি তো চক্ষে দেখি নি।...'' (চতুর্থ দৃশ্য)

(ii) কোনও কোনও সংলাপ তির্যক বাচনভঙ্গীর জন্য হাস্যরসোদ্দীপক।

(iii) হাস্যরসের কয়েকটি গান এই নাটকে হাসির উজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে চতুর্থ দৃশ্যে শালীর কণ্ঠে গীত 'বলো বলো প্রিয় বলো, আলুর আজ ভাও কি,' এবং 'বাকস-ভরা লাকশো টাকা দেখতে কি বাহার' গান দুটি। বেশ কিছু সংখ্যক ছড়াও এ প্রহসনে রয়েছে। যেগুলি হাসির মাত্রা আরও ছড়িয়েছে।

'হিতে বিপরীত' সার্থক হয়ে উঠেছে এই কারণে যে নাটিকার শেষ অংশে কোনও নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়নি। বৃদ্ধ ভজহরিকে ঠকাতে পারার আনন্দ নিয়েই প্রহসনের উপসংহার। বৃদ্ধকে যা কিছু নাজেহাল করা হয়েছে—তা তার অজান্তে। নাটকের শেষের দিকে তিনি পুলিশ ডাকতে ছুটেছেন। তাই ভজহরির চরিত্রের কোনও পরিবর্তন এখানে দেখানো হয়নি।

হঠাৎ নবাব

ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের 'লা বুর্জোয়া জাঁতিয়ম্ ('L bourgeois gentilhomme) নাটক হাস্যরসাত্মক নাটকটির কোথাও আক্ষরিত অনুবাদ, কোথাও-বা ভাবানুবাদ করে বাংলা ভাষাকে একটি চমৎকার প্রহসন—'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪) উপহার দিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি নিজে গ্রন্থটিকে 'নামান্তরিত স্বাধীন অনুবাদ' বলেছেন। প্রহসন হবার পক্ষে এটির প্রথম যে বাধা—তা এর দৈর্ঘ্য। 'হঠাৎ নবাব' প্রহসনটি পাঁচটি অঙ্কে এবং পঞ্চাশটি দৃশ্যে বিভক্ত (১/২, ২/৬, ৩/২১, ৪/১১, ৫/৬)। এক দোকানদার জুর্দন খাঁর হঠাৎ পয়সা হয়ে যাওয়ায় নবাবী চাল-চলন শিখে নবাব হবার ইচ্ছা হয়। নিজের সমাজকে পরিত্যাগ করে বড়লোকের সমাজে মিশবার জন্য সে নিজের কন্যা রোষণীর সঙ্গে তার পূর্ব প্রণয়ী খেলাতের বিয়ে দিতে নারাজ হয়। খেলাৎ খাঁ তখন তার ভৃত্যের পরামর্শে পারস্য সম্রাটের ছদ্মবেশে এসে রোষণীকে বিয়ে করে। বড় মানুষ হবার জন্য জুর্দনের ঘরে নানা ধরনের শিক্ষা দেবার জন্য নানা বিষয়ক শিক্ষকদের আনাগোনার চিত্র হাস্যকর। এতে সঙ্গীতের অনুবাদ করতে গিয়ে অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভাবানুবাদ করেছেন।

দায়ে পড়ে দারগ্রহ

১৩০৯ বঙ্গাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মলেয়ারের 'মারিয়াজ ফোর্সে' নামক হাস্যরসাত্মক নাটক অবলম্বনে লেখেন 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ'। প্রহসনটি তিনটি অঙ্কে এবং ছয়টি দৃশ্যে (১।১, ২।৪, ১।১) বিভক্ত। এর দৈর্ঘ্য প্রহসনের উপযুক্ত। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—ষাট-অতিক্রান্ত বৃদ্ধ জগমোহন বিয়ে করার জন্য খেপে ওঠেন। বন্ধুরা নিষেধ করে, তিনি শোনেন না। তিনি ১০ বৎসর বয়সী কমলমণিকে (রামকান্তের কন্যা) পাত্রী ঠিক করেন। ইতিমধ্যে একদিন তিনি স্বপ্ন দেখেন ঘোড়া ব্রেক করার এক গাড়ীতে জুড়ে দিয়ে একটি মেয়ে তাকে চাবুক হাতে তাড়াচ্ছে। তিনি একে একে সমস্ত পণ্ডিতের কাছে এর রহস্য জানতে চাইলেন। শেষে এক বেদেনী তাঁকে উন্মাদ ভেবে নর্দমায় ফেলে দিল। সেই অবস্থায় তিনি রামকান্তবাবুর বাড়ী গিয়ে তাঁর বিবাহে অনিচ্ছার কথা জানালেন। কিন্তু কন্যাদায় গ্রস্ত রামকান্তবাবু তাঁর স্বপ্নে দেখা গাড়ী দেখিয়ে জগমোহনকে বললেন, হয় বিবাহ করতে হবে—নতুবা এই গাড়ীতে জোড়া হবে। বাধ্য হয়ে জগমোহন বিবাহ করলেন। দায়ে পড়ে বিবাহ করতে হয়েছে বলেই গ্রন্থটির নাম 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ'। গ্রন্থটি এদেশী ছাঁচে ঢালা, যদিও পদার্থ বা মালমশলা বিদেশি।

পরিশেষে বলতে হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলা প্রহসনের নব সম্ভাবনার বীজ বপন করেছিলেন তাঁর 'অলীকবাবু' প্রহসনে। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। জ্যোতিরিন্দ্রনাথে যার অঙ্কুর, রসরাজ অমৃতলালের হাতে তাই পল্লবিত হয়ে ওঠে অব্যহিত কাল পরেই।

মনোমোহন বসু (১৮৩১—১৯১২)

রাজনারায়ণ বসুর জাতীয় গৌরব সঞ্চারিণী মতবাদকে সাহিত্যের মাধ্যমে যে ক'জন সাহিত্যিক সাহিত্যে উপস্থাপিত করতে যত্নবান হয়েছিলেন—মনোমোহন বসু তাঁদের অন্যতম। খ্রীষ্টান ধর্মের আগ্রাসী মনোভাব এবং অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মসমাজের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মনোমোহন বসুর অসাধারণ জনপ্রিয় নাটক 'সতী' (১৮৭৩)-র মধ্যে তাঁর ভক্তিপ্রবণ মনের যথার্থ পরিচয় মেলে। অবশ্য ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—

"সত্য কথা বলতে গেলে মনোমোহনকে নাট্যকে না বলে যাত্রাওয়ালা বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। তাঁর অধিকাংশ নাটক যাত্রা ধাঁচে লেখা....."[১]

নাগাশ্রমের অভিনয়

প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয় : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাবশিষ্য মনোমোহন বসুর একটি মাত্র প্রহসন মেলে—'নাগাশ্রমের অভিনয়'। কেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র ছদ্মনামে ১২৮১ বঙ্গাব্দে আষাঢ় সংখ্যার 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় মনোমোহনের এই প্রহসনটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরে "বহু নূতন সংযোগ, পরিবর্তন ও সংশোধন পূর্বক মহর্ষি-খগেন্দ্র-ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু শিখীন্দ্রচন্দ্র নাগান্তক মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে শ্রী কেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত" হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি।

কাহিনী সংক্ষেপ : 'নাগাশ্রমের অভিনয়' প্রহসনের কাহিনী নিম্নরূপ ঃ—রসাতলে বাসুকী নাগের রাজ্যপাট। ভ্রাতা অনন্তনাগ, মন্ত্রীতক্ষকনাগ এবং পূর্ববঙ্গজ ভক্ত পুঁয়ে বোড়া আরও অজস্র নাগ পরিবৃত থাকেন নাগরাজ বাসুকী। নানা সময়ে তাঁদের আলোচনা চলে—কি ভাবে তাঁরা বংশ ও বিষবৃদ্ধি করবেন। এবিষয়ে উৎসাহ দানের জন্য এক সভা ডাকা হয়েছে। নাগেরা পরস্পরকে ভ্রাতা-ভগ্নী সম্বোধন করেন। পুরুষ ও স্ত্রী নাগেরা জড়ো হয়েছেন সভায়।

---

১. রাজা নবকৃষ্ণের এক ইয়ার শিবচন্দ্র ঠাকুর, কারও মতে অন্য এক শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পক্ষী দলের আদিপুরুষ। হুতোম বলেছেন 'তিনি বাগবাজারেদের উড়তে শেখান'। এদের আড্ডা ছিল বাগবাজার পাবলিক আটচালা। "পাখিদের যেমন দুটি ডানা, এদেরও তেমনি। এক ডানায় গাঁজা, আরেক ডানায় কবিত্ব। নেশার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে—গাঁজা, গুলি মদ ও চন্ডুর মহিমা বিবৃতি করে—সেকালে যে-সব অঞ্চলকে ছড়ায় গাঁথা হয়েছিল, তার ভেতর বাগবাজার পেয়েছিল গাঁজার গৌরব,—

"বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা,
গুলীর কোন্নগরে,
বটতলায় মদের আড্ডা
চন্ডুর বৌবাজারে।"

পাখির রাজা হতে হলে দুরূহ পরীক্ষা দিতে হত। একাসনে বসে যারা একশ' আট ছিলিম গাঁজা খেত তারা একখানা করে ইঁট পেত। এইভাবে স্বোপার্জিত ইঁটে বাসভবন নির্মাণ করতে পারলে পক্ষী পদবী পাওয়া যেত। কোলকাতায় মোট দেড়জন পক্ষী হয়েছিলেন—পটল ডাঙায় রূপচাঁদ পক্ষী আর বাগবাজারে নিতাই হাফ্ পক্ষী। "হাফ্ পক্ষীর অর্থ এই যে বাড়ির চার দেওয়াল গড়বার পরে হঠাৎ সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করে নিতাই। তাই লোকে হাফ্ পক্ষী বলত। বস্তুত রূপচাঁদই একমাত্র পক্ষী।" বাকি সব ছাতারে, কাঠ-ঠোক্‌রা প্রভৃতি।

বাবু গৌরবের কলকাতা/বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়/পৃঃ ২৬—৩১

এঁরা সবাই বাসুকীকে অবতার বলে মনে করেন। বাসুকী দেরী করে সভায় আসেন কদর বা ওজন বৃদ্ধির জন্য। সভায় নানা ধরনের আলোচনা হয়—হিন্দুধর্মের ভক্তিমার্গকে ব্যঙ্গ করা হয়। তবে বাসুকী অর্থাৎ অবতার স্বয়ং, যে সমস্ত কথাবার্তা বলেন তা তাঁর নিজেরই সব সময় বলতে ভালো লাগে না অথচ বলতে হয়। তাই তাঁর স্বগতোক্তি, "....পাপময় হিন্দুর শাস্ত্রে যা বলে, তার সবই কি মিছে?...তবে কি জান,....কলির অনুরোধে আমরা উল্‌টাতে পাল্‌টাতেই অবতীর্ণ হয়েছি।" সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া যে পক্ষীকের[১] মত তাদেরও গুণানুসারে নানা উপাধি দেওয়া হবে। এই উপাধি পাবার যোগ্যতার মাপকাঠি সভাপতি অবতার বাসুকীর মতে,—

> ".....পুং স্বাধীনতা আর স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে যে যেমন আগ্রহ, উৎসাহ, অনুরাগ, যত্ন আর কৃতকার্য্যতা দেখাতে পার্ব্বে, তার তেম্নি উপাধি দেওয়া যাবে।"

এই নিয়মে একটি স্কুলের মালিক ও তার প্রধান শিক্ষক বরনাথ বসু এবং তাঁর স্ত্রী সিধুমুখী বসুনীকে গোধা (স্বর্ণ গোধা) ও গোধানি উপাধি দেওয়া হল। এক প্রেস মালিক—যে ব্রাহ্মসমাজের বাণী প্রচার করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে তাকে ঢোঁড়া উপাধি দেওয়া হল। তারপর কাউকে বোড়া-বোড়ানী, কাউকে গিরগিটি, কাকেও বা বেত-আছড়া প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হয়। নাগ সমাজের বাক্‌সর্বস্বতা দেখানোর জন্য নকুল চরিত্রটি মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়েছে ব্রাহ্মদের বিধবা বিবাহ সম্পর্কে উৎসাহ প্রদানকে জাতিভেদ দূরীকরণ সম্পর্কে মন্তব্যকে।

প্রহসনের শেষ অংশে দেখানো হয়েছে নাগ সমাজের এক ভণ্ডামি 'সওয়াল' বা 'ধ্যান'—'সওয়ালের' মাধ্যমে নাকি ব্রাহ্মেরা পরম পিতার আদেশ পেতেন। সওয়ালের ভণ্ডামির একটা উদারহরণ দেওয়া যাক। সওয়ালের জ্বালায় অস্থির নাগ (ব্রাহ্ম) দের বাড়ীর গৃহিণী বলে,—

> "বোড়ানী।—সেদিন আমি তোলাপাড়া কচ্ছিলেম, আজ মুগের ডাল্ কি অড়র ডাল রাঁধি? প্রাণকান্ত বোড়া তা শুন্তে পেয়ে খপ্ করে ধ্যানে বসে গেলেন; খানিক পরেই লাফিয়ে উঠে বল্লেন,—"পেয়েছি পেয়েছি, সন্দেহ পোড়াবার আগুন পেয়েছি—প্রিয়ে! বিশেষ আদেশ হল, আজ তুমি মুসুর ডাল আর পুঁই চিংড়ি রাঁধো।"

নাগেরা কৌশলে স্বর্ণগোধার স্কুলটি হস্তগত করে তাঁদের তাড়িয়ে দেয়। উপসংহারে গোধানি তাই আক্ষেপ করেন—"হিঁদুর আলো আঁধারে ঘর বরং লক্ষ গুণে ভালো—এ আলেয়ার আলো যে এককালে কুপথে নিয়ে গে ঘাড় মুচ্‌ড়ে দেয়!"

উদ্দেশ্যসর্বস্বতা : নামকরণ : 'নাগাশ্রমের অভিনয়' নামকরণের মাধ্যমেই প্রহসনকার তাঁর প্রহসন রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। ড. সুকুমার সেন বলেছেন,—'ইহাতে পূর্ববঙ্গ স্থিত কোনও ব্রাহ্ম-আশ্রমের প্রতি কটাক্ষ আছে।"[২] সন্দেহ নেই মনোমোহন যোগ্য গুরুর (ঈশ্বর গুপ্ত) যোগ্য শিষ্য। তাই কটাক্ষ বড়ো তীব্র হয়েছে। যা রক্তচক্ষুর তীব্র দৃষ্টির সমতুল্য।

---

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য়)/ড. সুকুমার সেন/পৃঃ ৯৮

২. মধ্যস্থ/১২৮১ বঙ্গাব্দ, আষাঢ় সংখ্যা

ফলে নাটকটির নামকরণ সার্থক হলেও প্রহসন হিসেবে এটি সার্থক হতে পারেনি। যদিও এ সময় ব্রাহ্মসমাজ, বিশেষ করে কেশব-অনুগামী ব্রাহ্মসমাজের আচার আচরণ বড়ো দৃষ্টিকটু হয়ে পড়ছিল; তৎসত্ত্বেও কেশবচন্দ্রের আকর্ষণী বক্তৃতায় বহু শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়ে পড়ছিলেন—শিল্পীর শিল্পকার্যে তুলির টান মোটা হলে যেমন শিল্পের চারুত্ব নষ্ট হয় তেমনি সাহিত্য সৃষ্টি উদ্দেশ্যসর্বস্ব হয়ে গেলে তার সাহিত্য গুণও নষ্ট হয়। 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় এক সময় মনোমোহন বসু ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন,—তিনি বলেছিলেন যে তাঁরা হিন্দু, মুসলমান, সাহেব, বাঙালি কিছুই নন,—

> "তাঁহারা অহর্নিশি বিদ্বেষ বিষে মাতৃভূমি ও পিতৃবংশকে জরজর করিবার নিমিত্ত শাপভ্রংশে নাগ অংশে হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই কলিযুগে তাঁহারা বড়ো জাগ্রত! বিশেষত ছেলেপুলের জন্য বড়ো ভয়।....অবোধ শিশুরা চিনিতে না পারিয়া খেলার বস্তুবোধে যেমন ধরিতে কি কোল দিতে যায় অমনি হায় নির্ঘাত দংশন।"[৪]

নামে প্রহসন হলেও 'নাগাশ্রমের অভিনয়' সার্থক প্রহসন হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ অতিরিক্ত যুক্তিসর্বস্বতা এর স্বাভাবিকত্বকে গ্রাস করেছে ও হাস্যরসকে ব্যাহত করেছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বার বার নামোল্লেখ প্রহসনের সহজতাকে নষ্ট করে বক্তৃতা এবং প্রমাণ-সর্বস্ব এক নাটিকায় পরিণত করেছে। তাই 'নাগাশ্রমের অভিনয়' অভিনয়-সার্থক প্রহসনও নয়।

অপ্রধান প্রহসনকার (১৮৭৩—১৮৭৬)

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ :

উনবিংশ শতকের আটের দশকে তারকেশ্বরের মোহান্তের কুকীর্তির ঘটনাকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে প্রচুর সংখ্যায় হাস্যরসাত্মক নাটিকা, নক্সা ও প্রহসন রচিত হয়েছে। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মর্তব্য শুধু এই ঘটনা অবলম্বনে অনেকগুলি প্রহসন রচনার জন্য। প্রহসনগুলি তৎকালীন নাট্যমঞ্চের চাহিদা পূরণে যে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিল তা বলা বাহুল্য।

যোগেন্দ্রনাথের রচিত হাস্যরসাত্মক নাটিকাগুলি হল—১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ আগষ্ট প্রকশিত 'মোহান্তের এই কি কাজ!' এই বৎসরই প্রকাশিত হয় 'মোহান্তের এই কি দশা!!' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ অক্টোবর প্রকাশিত হয় 'উঃ মোহান্তের এই কাজ' প্রভৃতি। তবে মোহান্তের কাহিনী অবলম্বনে যে প্রহসনগুলি বাংলায় রচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যেও সবচেয়ে মঞ্চসফল লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের প্রহসনগুলি।

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের আর একটি হাস্যরসাত্মক প্রহসন 'কেরাণি দর্পণ'—কেরাণি জীবিকা গ্রহণকারী মানুষের জীবন যন্ত্রণা ও তার হাস্যকর দিক সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে এখানে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারে এটি অভিনীত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর বেঙ্গল থিয়েটারে নাটিকাটি পুনরায় অভিনীত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রহসনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ড. সুকুমার সেন বলেছেন—"ইহাতে কেরাণি-জীবনের বাস্তব দৃশ্য আছে। কেরাণির গৃহজীবন, তাহার আপিসের পরিবেশ, খাস-বিলাতি বড়ো-সাহেব এবং ফিরিঙ্গ ছোটো-সাহেব, ছোটো বড়ো কেরাণিবাবু—সব যেন মূর্তিমান হইয়াছে।"[১]

লক্ষ্মীনারায়ণ দাস :

তারকেশ্বরের মোহান্তের কুকীর্তিকে প্রহসনের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে যে কজন প্রহসনকার বিখ্যাত হয়েছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ দাস তাঁদের অন্যতম। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁর প্রহসন দুটি এককালে দর্শককে এমন গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে যে বেশ কয়েকটি মঞ্চে তাঁর প্রহসন দুটি অনেকবার অভিনীত হয়েছে। কী ন্যাশনাল থিয়েটার, কী হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার (লিণ্ডসে স্ট্রিট অপেরা হাউস), কী বেঙ্গল থিয়েটার সর্বত্র ১৮৭৩ এবং ১৮৭৪ সালে বিখ্যাত সব অভিনেতাদের দ্বারা প্রহসন দুটি অভিনীত হয়েছিল।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর বেঙ্গল থিয়েটার লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের 'মহান্তের এই কি কাজ!!' প্রথম অভিনীত হয়। অমৃতলাল বসু এই প্রহসনের মঞ্চসাফল্য সম্পর্কে লেখেন,—

> "কে একজন বাঙ্গালী (কৃশ্চান বোধ হয়) 'মহান্তের এই কি কাজ' বলে নাটক লিখলেন, সেই নাটকের অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের নাম সারা বেঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল...মাইকেলের পরামর্শে নারী এক্‌ট্রেস নিয়েও যে বেঙ্গল থিয়েটার খালি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য়)/ড. সুকুমার সেন/পৃঃ ৩২৩

বেঞ্চির সামনে প্লে কচ্ছিল, মহান্ত মাহাত্ম্য কীর্তনে সেই বেঙ্গলের দরজা থেকে শত শত লোক ফিরে যেতে লাগল।"[১]

ড. সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—

"This was 'Mohanter ki Eei Kaj', an insignificant play by Lakshminarayan Das on the affair of the religious head of a temple with another man's young and beautiful wife and the murder of the wife by the enraged husband. With Biharilal Chatterjee as Mahanto this play began its triumphant march on 6 september 1873 drawing a large crowd to Bengal Theatre. Bengal Theatre rose into prominence with a third-rate play on a trite theme by an unknown writer."[২]

বেঙ্গল থিয়েটারে মোহান্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় জেলারের ভূমিকায় বটুবাবু। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর বেঙ্গল থিয়েটারে এই নাটিকার দ্বিতীয় অভিনয় হয়। ঐদিনই চুঁচুড়ায় বারিকের হলে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারও 'মহান্তের এই কি কাজ' অভিনয় করেন। এতে বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,—"নবীন—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এলোকেশী-ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, এলোকেশীর বাবা—অমৃতলাল বসু।"[৩]

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল বেঙ্গল থিয়েটারে 'মহান্তের এই কি কাজ।' অভিনীত হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি নাটিকাটি ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দেই 'মোহন্তের এই কি কাজ' (১ম ও ২য়) দুটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

সুতরাং প্রহসনকে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে দিয়ে নাটক মহত্ত্ব নিয়েছে বলে যাঁরা মনে করেন—তাঁদের সে ধারণা এক্ষেত্রে তুচ্ছ হয়ে গেছে। কারণ রঙ্গমঞ্চের দর্শক আকর্ষণ করার কাজে প্রহসনই এরপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধব গিরি নবীনচন্দ্রের তরুণী স্ত্রী এলোকেশীকে ধর্ষণ করে। পরে নবীন একথা জানতে পেরে স্ত্রীকে খুন করে এবং পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করে। এর ভিত্তিতে নবীন ও মাধব গিরি উভয়ের সাজা হয়। সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তারকেশ্বরের মোহান্তের এই কলঙ্কের কাহিনী নিয়ে চারটি প্রহসন রচনা করেছিলেন—'তারকেশ্বর নাটক' (১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩), 'যমালয়ে এলোকেশীর বিচার' (২০ ডিসেম্বর, ১৮৭৩), 'মোহন্তের কারাবাস' (১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪), 'মোহান্তের দফারফা' (১৮৭৪)। এই নাটিকাগুলিতে হাস্যরস যতটা না ক্ষরিত হয়েছে তার চেয়ে অশ্লীল প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে বটতলার পুস্তিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রবণতা বেশী চোখে পড়েছে। সুরেন্দ্রচন্দ্র শিশিরকুমার

১. মাসিক বসুমতী/১৩৩৪, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা/ভুবনমোহন নিয়োগী

২. The story of the Calcutta Theatres. 1753—1980/Sushil kr. Mukherjee /p—55

৩. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান/শঙ্কর ভট্টাচার্য/পৃঃ ২৭

ঘোষের সদ্য প্রকাশিত 'বাজারের লড়াই' এর অনুসরণে 'বড় বাজারের লড়াই' (৫জুন, ১৮৭৪) রচনা করেন। এটিও প্রহসন হিসেবে সার্থক নয়।

তারকেশ্বর প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত **তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের** 'মোহান্তের কি দুর্দশা' (২৩ ডিসেম্বর, ১৮৭৩), **দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের** 'ভণ্ড তপস্বী' (১৮৭৩?) প্রভৃতিও প্রসঙ্গগত উল্লেখযোগ্য।

বহুবিবাহ সমস্যার রূপ উদ্ঘাটন করে **নিত্যানন্দ শীল** লেখেন 'আর যেন কেহ না করে' (শ্রীরামপুর, ১৮৭৩), **দয়ালকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়** লেখেন 'সুশীলা সরলা সুন্দরী নাটক' (১৮৭৩), **ফেলুনারায়ণ শীল** লেখেন 'সাধের বিয়ে' (১৯ অক্টোবর, ১৮৭৩), **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'বারণাবতের লুকোচুরি' (৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩)।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং বাজারে কেলেঙ্কারী নিয়ে লেখা **শ্রীনাথ কুণ্ডুর** 'গত সেকাল ও হাল বন্দোবস্ত' (১৮৭৩), **দুর্গাদাস ধর** রচিত 'আজকের বাজার ভাও' (১২ নভেম্বর, ১৮৭৩)।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঃ

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রঙ্গমঞ্চের জগতে এক পরিচিত নাম। তাঁর বহু অভিনীত প্রহসন 'মা এয়েচেন' (১৮৭৩)। বেশ্যার ধর্ম একই সঙ্গে অনেক পুরুষকে সঙ্গ দেওয়া। কানাই নামে এক নির্বোধ লোককে এই বোধ দেবার জন্যই এই প্রহসন। কানাই তাঁর সতীসাধ্বী স্ত্রীকে অবহেলা করে বেশ্যার সঙ্গে মজেছেন। বেশ্যা মোহিনী কানাইবাবুর কাছে যথাসর্বস্ব পেয়েও গোপনে গিরিশচন্দ্র বোসের সঙ্গে কেলি করে। একদিন সব ফাঁস হয়ে যায়। কানাইবাবু মোহিনীকে দূর করে দেন। স্ত্রীর গুরুত্ব বুঝতে পারেন। পরিশেষে তাই তিনি বলেন—·····"যাঁরা এ পথে অসেননি। তাঁরা যেন লোভে পড়ে রাক্ষসীদের টোপে না যান্। আর যাঁরা যাঁরা মজেছেন, আমার এই দসা মনে করে আজ অবধি তাঁরা যেন নাকে কানে খত দেন।···অ্যাঁ বেটী স্বচ্ছন্দে বোল্লে কিনা, মা এয়েচেন!!!" বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মার্চ এই প্রহসনটি অভিনীত হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় ভুবনচন্দ্রের 'পাঁচ পাগলের ঘর' প্রহসন। পরিবারে সবার মতকেই যদি সমান প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে সংসারের কিঁ দুর্দশা ঘটে তারই এক বিশ্বাসযোগ্য তথ্যচিত্র এটি। মনে রাখা দরকার—এ সময় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জাগরণে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পড়ছিল। 'পাঁচ পাগলের ঘর' প্রহসনের মূল ভিত্তিতে রয়েছে এই বক্তব্য।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ অক্টোবর প্রকাশিত হয় তাঁর আর একটি প্রহসন 'ঠাকুরপো'। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ প্রহসনে ব্যক্তিগত আক্রমণের উর্দ্ধে উঠে একে সার্থক নাটক-রূপে পরিচিত করতে পারেননি। জগৎমোহন ঠাকুরের কীর্তিকলাপই এখানে মুখ্য। সে হল সখীদিদির ঠাকুরপো। প্রহসনটির শেষে একটি ছড়া দেওয়া হয়েছে,—

"জন্ম গেল, কম্ম গেল
গুরো ডাকে কড়োর কোঁ।
আছি আমি সখীদিদির
জগৎমোহন ঠাকুরপো!"

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত হয় **শ্রীনাথ চৌধুরী** রচিত প্রহসন 'আমি তো উন্মাদিনী'। প্রহসনটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।

সঙ্জাতীয় একটি অনুষ্ঠান ন্যাশনাল থিয়েটারে খুব জনপ্রিয় ছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মার্চ তামাসার জন্য 'বিলাতী বাবু' অভিনীত হয়, ৫ এপ্রিল হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারে সেটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় :

বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ে তালিকা থেকে জানা যায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। ১৮৭৪ এর ২০ জানুয়ারি গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ বছর ২৪ জানুয়ারি এই প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয়—অতঃপর ৩১ জানুয়ারি দ্বিতীয়, ৭ ফেব্রুয়ারি তৃতীয়, ২৮ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ অভিনয় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গাধর 'বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য' ছদ্মনামে এই প্রহসনটি রচনা করেছিলেন। নাটিকার শেষে উদ্দীপনাময় একটি গান আছে। এটি সমকালে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তারকেশ্বরের মোহান্তের কেচ্ছায় ভাটা পড়তে না পড়তেই ঘটল আর এক ঘটনা। কোনও এক লম্পট জমিদারের সাকরেদ একজন কুলীন কন্যাকে ভুলিয়ে আনতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং হাওড়ার কোর্টে তার যথোচিত সাড়া হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী এই কাহিনী নিয়ে রচনা করেন 'কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী' (১৮৭৪) নামক একটি হাস্যরসাত্মক নাটিকা। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই কাহিনী অবলম্বনে আরও কিছু প্রহসন রচিত হয়েছিল। জনৈক অজ্ঞাতনামাকৃত 'নাপিতেশ্বর নাটক' সেগুলির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য। 'কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী' প্রহসনটি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে অভিনীত হয়।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় :

উনিশ শতকের মধ্যভাগে শিক্ষিত সমাজের মদ্যাসক্তি ও ইউরোপীয় হবার ঐকান্তিক প্রয়াসে নানান উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণকে ব্যঙ্গ করে লেখা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রহসন 'বিধবার দাঁতে মিশি' (১৮৭৪)। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বাংলার সাহিত্যাকাশে আস্তে আস্তে মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো ভাস্বর হয়ে উঠেছেন। তাই গোপালচন্দ্র 'বিধবার দাঁতে মিশি' প্রহসনে উডুম্বর চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উপহাস করেছেন। উডুম্বর নামকরণের ইতিহাস হল ''মদ খেয়ে কোর্টের বেঞ্চ থেকে উড়তে গিছলেন বলে, নাম হয়েছে উডুম্বর অনেক বই লেখে—বাংলার স্কট নামেও পরিচিত। 'সধবার একাদশী'র অনুসরণে এ প্রহসনের নামকরণ করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। কাহিনী সংক্ষেপে এই—শিবপুরের জমিদার কমলাকান্তের বড়ো ছেলে শারদা বিবাহের পর নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। ছোটো ছেলে বরদা কতকগুলো মাতাল বন্ধু ও জামাই গোরাচাঁদের পাল্লায় পড়ে মদ ধরেছে। গোরাচাঁদের উদ্দেশ্য কমলাকান্তের সব সম্পত্তি গ্রাস করা, শারদার স্ত্রী সৌদামিনীকে ভোগ করা। এদের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে কমলাকান্ত কাশীবাসী হন। মদের প্রকোপে বরদা মারা যায়। তার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী উন্মাদ হয়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ আত্মহত্যা করে। সৌদামিনী গোরাচাঁদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কাশীর দিকে যেতে থাকে—গোরাচাঁদ তার পেছু ধাওয়া করে। শারদা মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে কাশীতে ছিল—জনৈক সন্ন্যাসী তাঁকে সারিয়ে তোলেন। গোরাচাঁদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে সৌদামিনী সেখানে হাজির হয়। সৌদামিনী শারদা

মিলন হয়। গভীর দুঃখে জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে কমলাকান্ত ভাতে বিষ মেখে খাবার ঘরে রেখে শেষ বারের মতো গঙ্গাস্নান করতে যান। ইতিমধ্যে সে খাবার খেয়ে গোরাচাঁদ মারা যায়। সৌদামিনী এতদিন বিধবার পোষাক পরেছিল—আজ স্বামীকে পেয়ে সে সধবার সজ্জা করে। আয়নায় নিজের মুখ দেখে হেসে মন্তব্য করে বিধবার দাঁতে মিশি! প্রহসন হিসেবে এটি অত্যন্ত দুর্বল।

তারকেশ্বরের মোহান্ত-কেলেঙ্কারী নিয়ে লেখা প্রহসন সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় লেখা হয়েছে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দেই। সব নাটকের বক্তব্য প্রায় একই। নক্সা জাতীয় এই নাটিকা গুলিতে হাস্যরসের আবেগ সৃষ্টি করা হয়েছে বাক্ভঙ্গির তির্যকতায়। এবং প্রায় সব পুস্তিকাগুলিই বটতলা জাতীয় পুস্তিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। যেমন, **চন্দ্রকুমার দাস** রচিত 'মোহান্তের কি সাজা' (১৮৭৪), **রাজেন্দ্রলাল দাস** রচিত 'এলোকেশী, নবীন, মোহন্ত (২ আগস্ট, ১৮৭৪) , **নারায়ণ চন্দ্র** রচিত 'মোহন্তের যেসা কি তেসা' (৩ মে, ১৮৭৪), **হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়** রচিত 'মহান্ত পক্ষে ভূতো নন্দী' (১ ফেব্রুয়ারি, (১৮৭৪), **রাজেন্দ্রলাল ঘোষ** রচিত 'নবীনের খেদ' (১৮৭৪) ও 'নবীন মহন্ত (১৮৭৪), **দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়** রচিত 'ভণ্ড তপস্বী' (১৮৭৪), **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'মোহন্তের শেষ কান্না' (১৮৭৪) প্রভৃতি।

বাঙালি সমাজের এক বিশেষ সমস্যা কন্যার বিবাহ সমস্যা। কুলীন পিতা নিজের কুল রক্ষার জন্য নিজের অল্পবয়স্কা কন্যাকে বুড়ো বরের হাতে তুলে দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ক প্রতিবাদে বৃদ্ধ বয়সে পাণিগ্রহণের বিরোধিতা করা হয়েছে। বিরোধিতা করেছেন কুলীন বংশোদ্ভূত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়-ও। **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' (১৮৭৪) প্রহসনে সে সমস্যা তুলে ধরেছেন। **হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** রচিত 'বিবাহ ভঙ্গ', **রামচন্দ্র দত্তের** 'মাতালের জননী বিলাপ' (১৮৭৪), **জনৈক ভুক্তভোগী** রচিত 'হাসিও আসে কান্নাও পায়' (১৮৭৪) এবং 'মেলেরিয়া জ্বর সংক্রান্ত প্রহসন (১৮৭৪) স্মৃতি বিভিন্ন স্বাদের প্রহসন। 'মেলেরিয়া জ্বর সংক্রান্ত প্রহসন'টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য এর বিষয়বস্তুগত নূতনত্বের কারণে। **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'ধূর্ত্তপ্রহসন' (১৮৭৪), **হরিমোহন ভট্টাচার্য** রচিত 'দেশের গতিক' (১৮৭৪) এবং জনৈক **অজ্ঞাত-নামাকৃত** 'মেয়ে মনস্টার মিটিং, প্রহসন' (১৮৭৪)। শেষোক্ত প্রহসন দুটি নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রহসনকারের ব্যঙ্গের উদ্‌গার।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় 'উচিত ফল' প্রহসনটি। এটি কার রচিত জানা যায় না। গ্রন্থটিও আমাদের হাতে আসেনি।[১]

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দেও তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধব গিরির কুকীর্তি অবলম্বী প্রহসন লেখা হয়েছে। তবে সংখ্যায় অনেক কম। **মহেশচন্দ্র দাসদে** রচিত 'মোহন্ত এলোকেশী' (১৮৭৫), **নন্দলাল** রায়ের 'মোহন্ত এলোকেশী' (১৮৭৫) প্রভৃতি।

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঃ

বাঙালির সামাজিক ও ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে কয়েকজন প্রহসনকার কয়েকটি প্রহসন রচনা করেছিলেন। গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'বাঙালির মুখে ছাই' (১৪জুন, ১৮৭৫) এ ধরনেরই একটি প্রহসন। এর কাহিনী—যাদববাবু উন্মত্তের মতো বিলাতী মদে মত্ত হয়ে

১. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান/শঙ্কর ভট্টাচার্য/পৃঃ১৩৪

উঠেছেন। ইংরেজদের কাছে রায়বাহাদুর বা রাজাবাহাদুর হবার দুরাশায় তিনি নিজের ধন, সংসার সব বির্সজন দিয়েছেন। পরিশেষে তাঁর ভাগ্যে খেতাব জুটে নি। পুত্র ক্ষেত্রনাথও আত্মহত্যা করে। যাদববাবু হাহাকারে ভেঙে পড়েন। পরাণ ধিক্কার দেয়—"চিরকাল বাঙালিরা অর্থলোভ দাসত্ব করে কিন্তু এ সকল মহাপুরুষেরা অর্থ দিয়ে দাসত্ব করে। এবং বাঙালিরা গলায় দড়ি, ধিক এমন বাঙ্গালিদিগকে, এমন বাঙ্গালির মুখে ছাই।" হাস্যরসের তুলনায় বিদ্ধংধ ব্যঙ্গের মাত্রা বড়ো বেশি। এ প্রহসনটি তৎকালীন বিত্তবান ক্ষমতালোভী বাঙালির মানসিকতাটুকু বুঝতে সাহায্য করে।

গঙ্গাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'প্রণয় প্রকাশ' (৩ এপ্রিল, ১৮৭৫) এবং 'তুমি কার' (১৬ জুলাই, ১৮৭৫) প্রহসন দুটি নরনারীর জৈব সমস্যা নিয়ে লেখা।

ভুবনচন্দ্র সরকার :

স্ব-বৃত্তির অসাধুতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন ডাক্তার ভুবনচন্দ্র সরকার। জনৈক ডাক্তার ছদ্মনামে নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি লেখেন 'ডাক্তারবাবু (১৮৭৫) প্রহসন। কোলকাতার কোনও কোনও ডাক্তার যেভাবে অসাধু উপায়ে তেজি ওষুধ দেবার নামে ব্রান্ডি দিয়ে, মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়ে, অর্থ উপার্জন করতেন এই প্রহসনে প্রহসনকার তার পরিচয় দিয়েছেন। ভুবনচন্দ্র গ্রন্থটির ভূমিকায় গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, "যদি আমার এই 'ডাক্তারবাবু নাটক' পড়িয়া সমাজের কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা হইলেই আমি আমার যত্ন, পরিশ্রমও সম্প্রদায় বিশেষের আশঙ্কিত অপ্রিয়ভাজনতা সার্থক বলিয়া জ্ঞান করিব।"

অজ্ঞাতনামা রচিত 'গ্রন্থকার প্রহসন' (১৮৭৫), 'সমালোচক' (১৮৭৫) 'বলদ-মহিমা নাটক' (১৮৭৫) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। **রমানাথ সান্যাল** রচিত 'নব্য উকীল' (১৮৭৫) ওকালতি ব্যবসায়ের অন্ধকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে অভিনীত হয়েছে **জনৈক ব্যক্তি** রচিত 'অপেরা' নামক প্রহসন। **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'বিধবা বঙ্গবালা' (২৪ সেপ্টেম্বর, (১৮৭৫), **শ্যামলাল চক্রবর্তী** রচিত 'কি মজার কর্ত্তা (২০ জানুয়ারি, ১৮৭৫), **রাজরত্নের** 'জয় মা কালী', 'কালীঘাটে এ কি চুরি'! (২৫ আগস্ট, ১৮৭৫) **যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের** 'হিত সাধন' (১৮৭৫) **ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর** 'হীরক অঙ্গুরীয়ক' (১৮ জানুয়ারি, ১৮৭৫), **শ্রীপতি ভট্টাচার্যের** 'কি লাঞ্ছনা' (১৮৭৫), **বিরাজমোহন চৌধুরীর** 'সরস্বতী পূজা' (১৮৭৫), **বাদলবিহারী চট্টোপাধ্যায়** রচিত 'মাছে পোকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হরিহর নন্দী :

গ্রন্থের সংখ্যাধিক্য যদি গ্রন্থকারের উৎকর্ষতার নিদর্শন হয় তাহলে নিঃসন্দেহে হরিহর নন্দীকে আমরা উৎকৃষ্ট প্রহসনকার বলে চালাতে পারি। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ হরিহর নন্দীর হাস্যরসাত্মক এই নাট্যপুস্তিকাগুলি বটতলার সাহিত্য। কারও মতে অনেক প্রহসনকারকে দিয়ে গ্রন্থ লিখিয়ে হরিহর নন্দীর নামে সেগুলি প্রকাশ করা হয়েছে। সব প্রহসনগুলি একজনের লেখা নয়। সে যা হোক, হরিহর নন্দীর নামে যে প্রহসনগুলি মেলে সেগুলির অধিকাংশেই সমাজ-সংসার, ঘর-গেরস্থালীর দৈনন্দিন ঘটনা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করা

হয়েছে। হরিহরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই—এগুলির গ্রন্থনামই এই নাটিকাগুলির বিষয়বস্তুর পরিচয়সূচক।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল হরিহরের ১৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকা-নাট্য 'কলির বৌ হাড় জ্বালানি' প্রকাশিত হয়। এরপর প্রকাশিত হয়, তাঁর ১৯ পৃষ্ঠার নাটিকা 'ছাল নাই কুকুরের বাঘা নামে' (৯ এপ্রিল ১৮৭৭), ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হঠাৎ বাবু', ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় 'ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি', এরপর 'ননদ ভাই বো'র ঝগড়া' (১মার্চ, ১৮৮০ ;), 'কলির কুলাঙ্গার' (৪ জুলাই, ১৮৮০), তারপর দীর্ঘ চার বৎসরের নিস্তব্ধতা। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগস্ট প্রকাশিত হয় আট পৃষ্ঠার পুস্তিকা 'কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানি', ওই বৎসরই ৫ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল 'অসৎকর্মের বিপরীত ফল'। এছাড়া 'এমন কর্ম আর করবো না' (১০ এপ্রিল, ১৮৮৬), 'নাতিন জামাই' (৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬), 'শিখ্‌ছ কোথা? ঠেকেছি যথা' (২০ ডিসেম্বর, ১৮৮৮) ওই দিনই প্রকাশিত হয় 'আর কি বলদ গাছে ধরে' 'শাশুড়ি বউয়ের ঝগড়া', 'ঘোড়ার ডিম' (১২ নভেম্বর, ১৮৮৯); 'দুই সতীনের ঝগড়া' (১২৯৩ বঙ্গাব্দের পূর্বে প্রকাশিত)।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর জনৈক অজ্ঞাতনামা রচিত 'মাখাল ফল' প্রহসনটি বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর এটি পুনরায় অভিনীত হয়। এ বৎসর ২৮ আগস্ট বেঙ্গল থিয়েটারে অজ্ঞাতনামা রচিত 'অর্থাগমের নূতন উপায় বা মেয়েমানুষে কি না হয়।' নামে হাস্যরসাত্মক নাটিকা অভিনীত হয়।[১]

উপেন্দ্রনাথ দাস (দুর্গাদাস দাস)

বাংলা নাটকের জগতে উপেন্দ্রনাথ দাস একটি বহু আলোচিত নাম। দীনবন্ধুর পর তিনিই প্রথম ইংরেজদের অত্যাচারের বাস্তব বিবরণকে তুলে ধরেছিলেন নাটকের পৃষ্ঠায় স্বাভাবিক জীবনযাপনের ব্যত্যয় সামাজিক রীতিনিয়মের লঙ্ঘন যেখানে ঘটেছে সেখানেই তিন খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছে। সত্য কথা স্পষ্ট করে বলার জন্য তাঁর বিতর্কিত প্রহসনকে কেন্দ্র করে প্রথম নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হয়। সেই বিতর্কিত প্রহসনটি হল 'গজানন্দ ও যুবরাজ'।

গজানন্দ ও যুবরাজ

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভিক্টোরিয়া-সুত যুবরাজ ওয়েলস্ (প্রিন্স-অব-ওয়েলস) ভারতে আসেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মী উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় উপাধি লাভের প্রত্যাশায় অতিরিক্ত প্রগতিশীলতা দেখাবার জন্য ওয়েলসকে তাঁর অন্দরমহলে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি। এবং নিজের অন্দরমহলের রমণীদের দিয়ে তাঁকে বরণ করান। জগদানন্দের এই কার্যকলাপকে সেদিন বহু পত্র-পত্রিকা ধিক্কার জানিয়েছে। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা লেখে,—

> "যে মূল্যে ইনি রাজ সম্মান জয় করিলেন তাহাতে সমস্ত জাতির মান সম্ভ্রম আজ পদদলিত হইল।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বন্ধুকে বিদ্রূপ করে লিখেন 'বাজিমাৎ' কবিতা,—

১. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান/শঙ্কর ভট্টাচার্য/পৃঃ১৫

"সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়;
দেখালে অদ্ভুত কীর্ত্তি বকুলতলায়।।
পুণ্য দিনে বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে।
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে।।"

উপেন্দ্রনাথ দাসের লেখা 'গজানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনটি[১] ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সরোজিনী' নাটকের পর অভিনীত হয়। ওই দিন 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়,—

"GREAT NATIONAL THEATRE
THIS DAY
Saturday, 19th February 1876
FOR THE FOURTH AND LAST TIME
SAROJINI
To Conclude with the New Farce
GAJANANDA AND THE PRINCE!!
Come, yemen of the long robe!!
Play Commences at 8 P.M."[২]

২৩ ফেব্রুয়ারি এই প্রহসনটি 'গজদানন্দ' নামে অভিনীত হয়। দ্বিতীয় অভিনয়ের পর রাজাজ্ঞায় 'গজদানন্দে'র অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ এ প্রহসনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এতে একজন রাজভক্ত প্রজাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তৃতীয়বার এই নাটকটিকে 'হনুমান চরিত্র' নাম নিয়ে অভিনীত হয় ১৮৭৬ এর ২৬ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু এই নাটিকার অভিনয়ও বন্ধ করে দেওয়া হয়। লর্ড নর্থব্রুক (Lord Northbrook) ১ মার্চ এর অভিনয়ের পূর্বদিন অর্থাৎ ২৯ ফেব্রুয়ারি এক অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এ সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' লেখে,—

"we need hardly say that the ordinance is issued consequent on the performance of that scandalous farce, entitled "Gajanund" on the stage of a disreputable Native Theatre in Calcutta. All honour to Lord Northbrook for the prompt action taken by him to uphold the cause of public morality and decency."[৩]

১৯ ফেব্রুয়ারির 'গজানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসন অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নিয়েছিলেন প্রথিতযশা অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ। যুবরাজ হয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গজানন্দের ভূমিকায় মহেন্দ্রলাল বসু এবং গজানন্দের পিসির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ক্ষেত্রমণি। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আইন সচিব হব্‌-হাউস এক নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া

১. গিরিশজীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন 'গজানন্দও যুবরাজ' উপেন্দ্রনাথ দাসের লেখা।
২. অমৃতবাজার পত্রিকা/১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬
৩. Indian Mirror/1st March, 1876.

(Dramatic Performances Control Bill) তৈরি করেন। এ বছরের শেষ দিকে তা আইনে পরিণত হওয়ায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে গভীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী (বিদ্রূপাত্মক) প্রহসন রচনা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এ সময় থেকে প্রহসন আর এক নূতন দিকে মোড় নেয়। ১৮৭৭ সাল নাগাদ রসরাজ অমৃতলাল বসুও পুলিশের চাকরি নিয়ে পোর্টব্লেয়ার চলে যান। ফলে প্রহসন রচনায় এক মন্দা শুরু হয় ১৮৭৬ এর শেষ থেকেই।

দাদা ও আমি :

'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' খ্যাত উপেন্দ্রনাথ দাসের তৃতীয় নাটক এবং সম্ভবত দ্বিতীয় প্রহসন 'দাদা ও আমি'। উপেন্দ্রনাথ দুর্গাদাস ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে উপেন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে আসেন। 'দাদা ও আমি' লেখা। প্রহসনটি একটি ইংরেজি প্রহসন 'ব্রাদার জিল্ অ্যাণ্ড আই' অবলম্বনে বিলাতে বসে লেখা। এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী—এক পরিবারে দুই ভাইয়ের (ধীরেন্দ্রকুমার ও অনন্তকুমার) মধ্যে ভীষণ ভাব। পারস্পরিক এই মধুর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে কেউই বিয়ে করতে চায় না। শেষ পর্যন্ত বড় ভাই ধীরেন্দ্রকুমার অনেক কৌশলে ছোটো ভাই অনন্তকুমারের বিবাহ দেয়। কিন্তু অনতিকালের মধ্যে ভ্রাতৃবধূর এক ঘনিষ্ঠ সখীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার পরিণামও হয় বিবাহে।

'দাদা ও আমি' প্রহসনটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৫ বঙ্গাব্দে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর এটি বীণা রঙ্গমঞ্চে নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক তৃতীয়বার অভিনীত হয়। সংকলক শঙ্কর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন,—

> "১৫ ডিসেম্বর ঃ দাদা ও আমি (My Elder Brother and Myself) উপেন্দ্রনাথ দাসের রচিত। তৃতীয় অভিনয়। অনন্তকুমার—উপেন্দ্রনাথ দাস। প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়-রজনীর বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়েনি। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভুলক্রমে লিখেছেন যে, এই নাটকে উপেন্দ্রনাথ দাস দাদা (ধীরেন্দ্রকুমার) সেজেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, উপেন্দ্রনাথ ভাই (অনন্তকুমার সেজেছিলেন।"[১]

'দাদা ও আমি' প্রহসনের তৃতীয় অভিনয় রজনীর বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ—

THE NEW NATIONAL THEATRE
38 MACHUABAZAR ROAD,
THANTHANIA
Saturday, the 15th December, at 9 P. M.
THIRD PERFORMANCE OF THAT NEW DRAMA
"DADA O AMI"
(My Elder Brother and Myself)·····

একই রঙ্গমঞ্চে 'দাদা ও আমি' আরও বহুবার অভিনীত হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর, ২৯ ডিসেম্বর, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারি, ১৩ জানুয়ারি, ২০ জানুয়ারি।

১. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান/শঙ্কর ভট্টাচার্য/পৃঃ ৩০০

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ আগষ্ট প্রকাশিত হয় **কৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার** রচিত প্রহসন 'রামের বিয়ে প্রহসন', **কাশীনাথ বর্মা** রচিত হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'ছেলের কি এই গুণ, স্ত্রীর জন্যে মাকে খুন'। **গিরি গোবর্ধন** ছদ্মনামে **গোপালচন্দ্র রায়ের** লেখা নাটিকা 'একেই বলে বাঙ্গালী সাহেব' (২৮ এপ্রিল, ১৮৭৬) প্রকাশিত হয়।

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় :

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'বাঙ্গালী বাবু' (১৮৭৬) প্রহসনটি এক বাঙালি বাবুর চরিত্রভ্রষ্টতার এবং তা শুধরানোর কাহিনী নিয়ে লেখা। শিক্ষিত এক বাবু স্ত্রীকে ঘরে রেখে এক অন্য নারীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। বাবুর বিধবা বোন আবার ওই মেয়েটির ভায়ের প্রতি আসক্ত ছিল। বাবুর জলের মতো অর্থ নষ্ট হতে থাকে। বাবুর বোন একসময় ওই লোকটির সঙ্গে পালিয়ে যায়। স্ত্রীলোকটি বাবুর বিরুদ্ধে দশ হাজার টাকার নালিশ করে। বাবুর মা টাকা শোধ করে বাবুকে ধনেপ্রাণে রক্ষা করেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রহসনের অভিনয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রচারও করা হয়েছে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন। কিন্তু ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৬ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে প্রহসনের অগ্রগতির রথযাত্রা কিছুটা বুন্ধ হয়ে গেল ১৮৭৬-এর মাঝামাঝি Dramatic Performances Act জারী করার ফলে। এই সময় এই নিষেধাজ্ঞার ফলে প্রহসনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত আক্রমণকে কিছুটা বন্ধ করা গিয়েছিল। একটি পত্রিকায় দেখি,—

"A GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY was issused last evening Containing an ordinance to empower the Government of Bengal to prohibit certain dramatic Performances, which are scandalous defamatory, seditious, obscene or otherwise prejudicial to public interest".[১] এরপর নিষেধাজ্ঞা আইন জারী হয়। সেই থেকে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতলালের দেশে ফেরার পূর্ব পর্যন্ত প্রহসন রচনা এবং পরিবেশনায় মন্দা ভাব দেখা দেয়। প্রহসনের স্থান তখন কিছু পরিমাণে দখল করে নেয় গীতিনাট্য। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে ইতোমধ্যে নগেন্দ্রনাথের 'সতী কি কলঙ্কিণী' গীতিনাট্য জনচিত্ত জয়ে সমর্থ হয়েছিল।

১৮৭৬ পর্যন্ত প্রহসনের গুরুত্ব বিচার করলে বলা যায়—

১। প্রহসন এ সময় স্বমহিমায় ভাস্বর। কারণ রঙ্গমঞ্চে প্রহসনের অভিনয় এখন আর জলসায় স্থানীয় শিল্পীকে গাইতে দেবার মতো সুপারিশ-নির্ভর নয়। দর্শকেরা প্রহসন দেখতেই অনেক সময় মঞ্চে এসেছেন।

২। প্রহসন সমাজ সমস্যার মূলগুলি ধরে নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছিল। এবং মঞ্চে অভিনয়ের দ্বারা দ্রুত প্রহসনগুলির বক্তব্য সাধারণের মধ্যে প্রভাব ফেলছিল।

(৩) হাস্যরসাত্মক এই ক্ষুদ্র নাটিকাগুলির পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এ সময় অজস্র প্রহসন রচিত হয়েছে। তবে সেগুলির মধ্যে বেশ কিছু অ-সাহিত্যও রচিত হয়েছে একথাও বলতে হয়।

১. Indian Mirror/1st March, 1876.

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩—১৯২৯)

পশ্চাৎপট ঃ স্বাতন্ত্র্য ঃ বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে অমৃতলাল বসু একটি স্বয়ং-স্বতন্ত্র যুগ। ঐশ্বর্য-যুগের সমস্ত প্রাহসনিক ঐশ্বর্য তাঁর অসংখ্য প্রহসনের লুক্কায়িত রয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রহসন রচনার ক্ষমতার উত্তরাধিকার বর্তেছে অমৃতলালের মধ্যে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল সংযুক্তভাবে উচ্চারিত নাম হলেও দুজনের প্রতিভার পার্থক্যটুকুও অনুধাবনযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব হাস্যরসাত্মক নাট্যরচনায় নয়—ভক্তিভাব-নির্ভর পৌরাণিক নাটকগুলিতে আর অমৃতলালের শ্রেষ্ঠত্ব হিউমার স্যাটায়ারের যুগলবন্দী-সমৃদ্ধ তাঁর অজস্র প্রহসনগুলিতে। মধুসূদন এবং দীনবন্ধুর পর বাংলা প্রহসন যখন যোগ্য উত্তরসূরীর অভাবে ক্লেদাক্ত ভাঁড়ামি আর নক্কারজনক ইতরামিতে পর্যবসতি—তখন সেই কুটিল পঙ্কাবর্ত থেকে বাংলা প্রহসনকে কিছুটা মুক্তির পথ দেখালেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। অমৃতলাল বসু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য। কিন্তু তা বলে রসের পথে হাঁটতে গিয়ে অমৃতলাল একমাত্র পূর্বসূরীর অনুসরণকেই সর্বস্ব জ্ঞান করেন নি। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের পূর্বসূরীর রচনারও প্রভাব পড়েছে। একদিকে তাঁর রচনায় সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হাস্যরসাত্মক রচনার রসসাগর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা পাঁচু ঠাকুর, প্রভাব লক্ষিত হয়—অন্যদিকে বাংলা প্রহসনের জগতে দিকপালত্রয়ী মধুসূদন-দীনবন্ধু-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা যায় সেক্সপীয়র, জন ড্রাইডেন, মলেয়ার প্রমুখ বিদেশি নাট্যকারদের অনুপ্রেরণাও তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। এতৎসত্ত্বেও তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্র এক পথেরপলিক।

অমৃতলালের প্রহসের শ্রেণী বিভাগঃ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতলালের প্রথম প্রহসন 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রকাশিত হলেও সেই থেকেই নিরবছিন্নভাবে অমৃতলাল খ্যাতির অধিকারী হতে পারেন নি। ৭৬ এর নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন যখন নাটকের কণ্ঠরোধ করল—তখন জাতীয় রঙ্গালয়ের আকাশের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটি—নট অমৃতলাল—পুলিসের চাকরি নিয়ে আন্দামান (পোর্টব্লেয়ার) চলে যান। ১৮৮১ সালে কোলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় তাঁর বিজয়-রথের অপ্রতিহত যাত্রা। বাংলা রঙ্গমঞ্চগুলির অভিনয় তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ সময় অমৃতলাল কি পরিমাণে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। হাস্যরসাত্মক নাটক রচনার জন্য—হাস্যরসের অভিনয়ে অত্যন্ত পারদর্শিতার জন্য তাঁকে রসরাজ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। বাংলা প্রহসনের জগতে অমৃতলালের কৃতিত্ব বিচারে পূর্বে তাঁর প্রহসন রচনার বিশেষ ভাবনাটুকু বিচার করতে পারি। প্রহসনকারের রচনায় সমকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির অসঙ্গত এবং অন্ধকার দিকে ইঙ্গিত কাম্য—এজন্য প্রহসন রচয়িতাকে হতে হয় খুবই অনুভূতি-সচেতন। এক্ষেত্রে রোমাণ্টিক কবির অনুভবের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তবে পার্থক্য এখানে যে রোমাণ্টিক কবি আবেগের ক্ষেত্রে সিরিয়াস আর প্রহসনে আবেগের মূলে রয়েছে পরিহাস। কিন্তু এই পরিহাসই অনায়াসে সমাজ-সংশোধনরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে থাকে—এখানে রোমাণ্টিক কবিতার তুলনায় তার বাস্তাব উপযোগিতা স্বীকৃত। শ্রীরামদাস সে বলেছেন,—

"নাটকের অভিনয় দর্শন বিশুদ্ধ আমোদ। ইহাতে প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনা মনোমধ্যে উত্তমরূপে অঙ্কিত হয় এবং সমাজের কুরীতি সংশোধন প্রহসন দ্বারা যেমত হইয়া থাকে, এমত কিছুতেই হয় না।"[১]

অমৃতলালের প্রহসনগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের কার্য—এক্ষেত্রে আমরা কেবল তাঁক কয়েকটি বিখ্যাত প্রহসন ছাড়া বাকি সব প্রহসনগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেব মাত্র। আলোচনার সুবিধার্থে অমৃতলালের প্রহসনগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়—

১। **বিশুদ্ধ প্রহসন :** প্রহসনের শৈল্পিক আদর্শ যা, তা এই প্রহসনগুলিতে রক্ষিত। প্রহসনের হাস্যরস Humour-ধর্মী হওয়াই বিধিসম্মত। এই শ্রেণীর প্রহসনগুলিতে রয়েছে সেই সরল হাসির অনাবিল প্রকাশ।

২। **শিক্ষাত্মক প্রহসন :** যুগোচিত গ্রন্থ রচনার তাগিদে এগুলির লেখা। এই প্রহসনগুলিতে প্রহসনকারের ভূমিকা নীতিবেত্তা শিক্ষকের। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর প্রহসনে অমৃতলালের পূর্বানুসৃতি এবং সমকালীন নাট্যকারদের কাছে যতটা প্রকটিত হয়েছে—ততটা মৌলিকতার প্রকাশ ঘটেনি।

৩। **বিদ্রূপাত্মক প্রহসন :** প্রহসনের হাস্যরসের মধ্যে Satireকে যাঁরা অপাংক্তেয় মনে করেন—অমৃতলালের এই প্রহসনগুলি তাঁদের সে মতকে পরিবর্তন করাতে যথেষ্ট। কখনও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে, কখনও উচ্চকিত বিদ্রূপে আসল অমৃতলালকে এই শ্রেণীর প্রহসনগুলিতেই খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রহসনের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অমৃতলাল ছুঁৎমার্গ বিসর্জন দিয়েছিলেন। কী ধর্মীয়, কী সামাজিক, কী রাজনীতিক, কী লোকপ্রচলিত কাহিনী—সব কিছুকেই গ্রহণ করেছেন। তবে অমৃতলালের মানসিকতা ছিল গোঁড়া হিন্দুর। এদিক থেকে কখনো কখনো তাঁকে মনে হয় যেন পঞ্চাশ বৎসর পশ্চাতে ফেলে আসা ধর্মসভার (১৮৩০) এক সদস্য। তাই স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর ভীষণ গোঁড়ামি সেই সভার সদস্যদের এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

বিশুদ্ধ প্রহসন

আঙ্গিক এবং রস পরিবেশনে প্রাহসনিক নীতি নিয়ম মেনে অমৃতলালের এই প্রহসনগুলি রচিত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসরণে এখানে অমৃতলাল বেশ কয়েকটি প্রহসন রচনা করেছেন—আবার ফরাসী নাট্যকার মলেয়ার-এর প্রভাবেও কয়েকটি প্রহসনও রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায়—এই যুগে অধিকাংশ বিখ্যাত প্রহসনকার ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি।

বিশুদ্ধ প্রহসনের আদর্শ রক্ষিত হয়েছে 'চোরের উপর বাটপাড়ি', 'ডিস্‌মিস্', 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে', 'তাজ্জব-ব্যাপার', 'কৃপণের ধন' প্রভৃতি প্রহসনে। ড. সুকুমার সেন এই বিভাগে আরও কয়েকটি প্রহসনের নাম করেছেন 'তিলতর্পণ', 'রাজাবাহাদুর', প্রভৃতি। কিন্তু

১. বঙ্গদর্শন/শ্রাবণ, ১২৮০/হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়/শ্রীরামদাস সেন।

'অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য' রচয়িতা ড. অরুণকুমার মিত্র এই দুটি প্রহসনকে বিদ্রুপাত্মক প্রহসন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। যুক্তির দিক থেকে এক্ষেত্রে ড. মিত্রের মতকেই সমর্থন করা যায়। কারণ 'তিলতর্পণ' এবং 'রাজা বাহাদুরে'র হাস্যরস সর্বত্র Humour এর মত নিরামিষ হয়ে থাকে নি।

চোরের উপর বাটপাড়ি

অমৃতলাল বসুর প্রথম প্রহসন 'চোরের উপর বাটপাড়ি' ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে এটি অভিনীত হয়। এই প্রহসনটি স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর। উল্লেখযোগ্য এই যে, এই প্রহসনে গিন্নীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নটসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী। প্রহসনটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অমৃতলালের প্রাহসনিক দক্ষতা সম্পর্কে দর্শককূল সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম প্রহসনেই তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিলেন। প্ল্যাকার্ডের বেহারা পর্যন্ত রঙ্গালয়ে দর্শক সংখ্যা হ্রাস দেখলে অমৃতলালকে বলত "মহারাজ আদর্শ সরস্বতী[১] আর চোরের উপর বাটপাড়ি লাগাইয়ে।' এ কথা স্বয়ং গিরিশচন্দ্র আমাদের জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রেট ন্যাশনালে এটি বার বার অভিনীত হয়েছে (১৮৭৭-এর ১৪, ১৭ মার্চ, ৪ এপ্রিল)। ড. সুকুমার সেন এই গ্রন্থের মূলে দেখেছেন বোকাৎসিয়োর গল্পের প্রভাব, ড. অজিতকুমার ঘোষ দেখেছেন মলেয়ারের 'স্কুল ফর ওয়াইভস্' এর কাহিনী সাদৃশ্য। সমকালীন কোন সমস্যা এই নাটকের মূল কাহিনী নয়। অঘোর নামে এক দুশ্চরিত্র বিষয়ী ভদ্রলোক পাড়ার বখাটে যুবক নারায়ণকে দিয়ে পাড়ার এক ভদ্রমহিলাকে ফুসলাতে গিয়ে ধরা পড়ে কীভাবে নাজেহাল হয়—এবং নারায়ণ এদিকে কোন কিছু না জেনেও অঘোরের স্ত্রীকে আয়ত্ত করে কীভাবে চোরের উপর বাটপাড়ি করে—এ নাটিকার কাহিনী এই। সমসাময়িক কোনও জটিল সমস্যা এর কাহিনী মূলে না থাকলেও তারকেশ্বরের মোহান্তের লাম্পট্য, স্ত্রীশিক্ষার ও স্ত্রীস্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার কথা—কখনও সংলাপে, কখনও-বা গানে উপ্ত। অমৃতলালের সমাজচিন্তার রূপটি তাঁর এই সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও কৌতুকপ্রদ প্রহসনটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

ডিস্‌মিস্

অমৃতলালের তৃতীয় প্রহসন 'ডিস্‌মিস্' (১৮৮৩) চারটি দৃশ্যে এক অঙ্কে রচিত। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর বেঙ্গল থিয়েটারে এটি প্রথম অভিনীত হয়। এদিন পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় তা নিম্নরূপ,—

BENGAL THEATRE
POSITIVELY LAST NIGHT BUT ONE
Saturday, The 14th October, 1882 at. 9 P. M.
That enchanted and most appreciated opera
HARISH CHUNDRA
To be concluded with A NEW FARCE
DISMISS or 'Husband vs. wife'[২]

১. অতুলচন্দ্র রচিত 'আদর্শ সতী' উচ্চারণে 'আদর্শ সরস্বতী' হয়ে গিয়েছিল।

২. The Statesman/14 October, 1882

এই প্রহসনে কৃষ্ণনাথের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন প্রহসনকার স্বয়ং। ড. সুকুমার সেন বলেছেন 'ডিস্‌মিস্‌ কাহিনীর মূলও বিদেশি।' দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রমদার প্রতি স্বামী কৃষ্ণনাথের অহেতুক সন্দেহ, সেই সন্দেহের বিস্তারে কৃষ্ণনাথের স্ত্রীর প্রতি অনুযোগ—সেজেগুজে সে কেন পাড়া বেড়াতে যায়। সে তাই বলে, 'ওই রীতিগুলো ছেড়ে দাও, নইলে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না।' কিন্তু পরিশেষে জানা যায় প্রমদা পাড়ায় যায় দরিদ্রের সেবা করার জন্য—ব্যভিচারিণী নয় সে, তখন কৃষ্ণনাথ তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়। এর হাস্যরসে নাট্যকারের সুরুচির পরিচয় মুদ্রিত।

চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে

জে. এম্‌. মর্টনের 'Cox and Box' (১৮৪৭) নামক একটি প্রহসনের কাহিনীর সঙ্গে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ও ২৬ এপ্রিল স্টার থিয়েটারে অভিনীত অমৃতলালের 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে'র কাহিনীর সাদৃশ্য রয়েছে।[১] খুদিরাম বাঁড়ুজ্যে ও পুঁটিরাম চাটুজ্যে একই বাড়ীতে ভাড়া থাকে। কলা পাঁউরুটির রহস্য নিয়ে দু'জনের মধ্যে এক অদ্ভুত বিবাদ উপস্থিত হল। চাটুজ্যে কাজ করে রাধাবাজারে সাহেব মেমদের কাছে কাপড় বিক্রির, অতএব তাকে বাঁড়ুজ্যে গালি দেয় 'কমিন্‌স মিস্‌ ইওর ফাদার্স সপ; হেঙ্কারচিপ, বনেট, মসলিন' এবং বাঁড়ুজ্যে কাজ করে ছাপাখানায় অতএব চাটুজ্যে তাকে গালি দেয় 'দূর বেটা। কমা, সেমিকোলন, ক-এর জায়গায় ফ, হয়ের জায়গায় ঢ়।'' শেষ পর্যন্ত বাড়ীর ঝি ভবতারিণীর উপর সব দোষ দিয়ে তারা নিরস্ত হয় এবং বাড়ীওলার নির্দেশে একই ঘরে বসবাস করতে থাকে।

প্রথম পরিচয়ের এই পর্বের পর জানা যায় কমলাকান্ত গাঙ্গুলির মেয়ে দিগম্বরীকে বিয়ে করতে চলেছে চাটুজ্যে, যাকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বাঁড়ুজ্যে। এই নিয়ে দু'জনের মনোমালিন্য হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাদম্বরীর নামে কুৎসা শুনে উভয়ে উভয়ের ঘাড়ে কাদম্বরীকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টায় যখন আবার উত্তেজিত, তখন দেখা গেল কাদম্বরীর অন্যত্র বিবাহ হয়ে গেছে। চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যের বিবাদ ঘুচে গেল। সমকালীন

---

১. 'Indian Daily News' পত্রিকার ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল সংখ্যায় স্টার থিয়েটারের ২৬ এপ্রিলের অভিনয় সম্পর্কে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ—

GRAND TRIPLE PROGRAMME/STAR THEATRE/SATURDAY, 26TH APRIL, AT 9P.M./Babu G.C, Ghosh's two new pieces/wonderful Spectacular paly/BRISHSAKATU/ Most wonderful Decapitation/By PROFESSOR JAHARLAL DHAR/ Never beore performed in India/Followed by a Fairy Romance/THE DIAMOND FLOWER/And a New Farce/Adopted from the Celebrated English Farce.

COX AND BOX

Next day, Sunday evening performance/SITAHARAN/ G. C. GHOSH, Manager.

চাটুজ্যে-বাঁড়ুয্যে পালার চাটুয্যের ভূমিকা অমৃতলাল বসু এবং বাঁড়ুয্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নীলমাধব চক্রবর্তী।

এরপর এই প্রহসনটি অভিনীত হয়েছিল মে মাসের ৩, ৭, ১০, ১৪, ২৮ তারিখে, জুন মাসের ১১ তারিখে, জুলাই মাসের ৯ তারিখে এছাড়া আরও অনেকদিন এটি অভিনীত হয়।

কোনও গভীর সামাজিক সমস্যা এই প্রহসনের বিষয় নয়—নিতান্ত সাদামাটা, চিরকালীন হাল্কা বন্ধুত্বের ব্যাপার এতে অবলম্বিত। অনেকটা ক্ষণে যুদ্ধ, ক্ষণে শান্তির মতো—ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে বন্ধুত্ব।

তাজ্জব ব্যাপার

স্ত্রীস্বাধীনতার নামে যথেচ্ছচারের মূলে পুরুষদের মতিভ্রমের কথা জানাতেই হাস্যরসাত্মক 'তাজ্জব ব্যাপার' (১৮৯০) 'গীতিরঙ্গো'র উপস্থাপনা। এটি গ্রন্থকারে প্রকাশের পূর্বেই ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।[১] অমৃতলালের অনেক প্রহসনে সমসাময়িক নানান সমস্যার উপর জোরালো সার্চলাইট ফেলা হয়েছে নক্সাধর্মী দৃষ্টিতে। রক্ষণশীল নাট্যকার জানিয়েছেন স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হলে তাঁর এই কল্প-প্রহসনের মতো বাস্তবেও নারী পুরুষের কার্যক্ষেত্রের অদলবদল হয়ে যাবে। প্রহসনটির প্রস্তাবনায় বঙ্গনারীদের গানে এ কথা জানানো হয়েছে,—

"ফাটকে আটক রব না।
আপন করে যতন করে খুলে দেছ ডানা।।"

নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলির পরিচয় দান 'তাজ্জব ব্যাপারে' যথেষ্ট হাস্যরসের উদ্বোদ ঘটিয়েছে। মুক্তকেশী বক্সী হুগলী জজকোর্টের সেরেস্তাদার, মুক্তকেশীর মেয়ে সরসী ভঞ্জ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ে। সে অন্তঃসত্ত্বা, সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা। কিন্তু তার বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই সে পরীক্ষা দেবেই—কেননা "আমার বিয়েন ভালো, এন্‌ট্রেন্স যখন দিই, তখন আমার ভরা দশমাস, শেষ এক্‌জামিনের দিনেই ব্যথা হল।" কোনও মহিলা আবার হাইকোর্টের উকিল। হাবড়া পুলিশের হেড কনস্টেবল কনে। বিবাহ সভায় পুরুষের সমস্ত কাজ করে নারীরা। নাপ্তেনী বরকে পরমার্শ দেয় কীভাবে ঘর করতে হবে "ভালোমন্দ লোক থাক তো সরে যাও, গোঁপ পেকে যাবে, মাগের দুয়ো হবে।" এদিকে মহিলাদের সভায় মহিলারা সিদ্ধান্ত নেয় যতদিন না পুরুষদের গর্ভাধানের সুবন্দোবস্ত করা যায়—ততদিন নারীই এক কাজটা করবে কিন্তু আপাতত পুরুষদের কাছা খোলা এবং চুড়ি পরানোর ব্যাপারে সবাই অন্তঃপুরে ব্যবস্থা নেবে। নাটকের শেষে তাই স্ত্রীবেশী পুরুষদের আক্ষেপে নাট্যকার যেন স্ত্রীস্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে নিজ মত পোষণ করেছেন,—

"খেলেম কানমলা নাকমলা, ফিরে কোন্ শালা
স্ত্রী স্বাধীনতার কথা নিয়ে করবে লাফালাফ।
মেয়েদের দণ্ডবৎ, দিলাম এই নাকে খৎ
যেমনি পাপ করেছিলাম, তেমনি পেলে তাপ।"

১. Indian Daily News পত্রিকার ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর সংখ্যায় স্টার থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে রয়েছে 'নলদময়ন্তীর' সঙ্গে 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসনের অভিনয়ের খবর—".... **Tuesday, 24th December, at 9 P. M. NALA DAMAYANTI/Followed by Superbly mounted Pantomime / TAZZAB BYAPAR....**" এটিও স্টারে বেশ কয়েকবার অভিনীত হয়েছিল।

'তাজ্জব ব্যাপার' এ যুগে আর তাজ্জব নয়। কেননা নারী শিক্ষা, নারী প্রগতির সেই সূচনার যুগে এ বিষয়ে রক্ষণশীলদের বাধা যাই থাক না কেন আজ আর উকিল, পুলিশ, ইঞ্জিনিয়ার নারীর অভাব নেই। নারী জাগৃতির মন্ত্র এখন উচ্চারিত নয় সত্যরূপে প্রতিভাত।

কৃপণের ধন

দুই অঙ্কে (৪+৪) বা ৮টি দৃশ্যের 'প্রমোদ প্রহসন' (A farcical comedy) 'কৃপণের ধন' (১৯০০) নাটিকায় ড. সুকুমার সেন মলেয়ারের 'ল্ আভার'-এর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। কৃপণ হলধর হালদার অবস্থাপন্ন হলেও অক্ষয় তৃতীয়ার দিন স্ত্রীর ব্রতোপলক্ষ্যে সামান্য খরচ করতে কুণ্ঠিত। এদিকে সে ভাগ্নীর বিবাহের জন্য সঞ্চিত দশ হাজারটাকা কৌশলে আত্মস্যাৎ করতে চায়। অর্থপ্রাপ্তির আকাঙক্ষায় এক ছদ্ম সন্ন্যাসীকে দশ হাজার টাকা দিয়ে কীভাবে সে সব অর্থ হারাল এবং এক বিধবা রমণীর প্রতি আসক্তির মাশুল কীভাবে গুণল—এই প্রহসনের কাহিনী তাই নিয়ে গড়া। ছদ্ম-সন্ন্যাসীকে অর্থদানের প্রসঙ্গ টি বাংলাদেশে অতিলোভের শাস্তি বিষয়ক নীতিকতাধর্মী গল্প এ ধরনের গল্প সুদূর অতীত থেকে প্রচলিত। অর্থ নিয়ে সন্ন্যাসীর উধাও হবার গল্পটি তাই সম্ভবত অমৃতলাল লোক প্রচলিত কাহিনী বা সঙ্যাত্রা থেকে সংগ্রহ করেছেন। এই নাটকটির ইংরেজি নাম দেওয়া হয়েছিল "The Miser's Misery."

শিক্ষাত্মক প্রহসন

এই শ্রেণীর প্রহসনগুলিতে অমৃতলাল বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে নিজস্ব চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন—বলা বাহুল্য, সে চিন্তা রক্ষণশীল। প্রকৃত শিক্ষার প্রতি অমৃতলালের কোনও বিবাদ নেই, সে প্রাচ্য শিক্ষাই হোক আর পাশ্চাত্য শিক্ষাই হোক—বিরূপতা তাঁর স্বল্পশিক্ষিত যুবকদের অন্ধ পাশ্চাত্য মোহের প্রতি। বিরূপতা তাঁর সেই সব মানুষের প্রতি স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসারের নামে নারীকে যারা স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছে। শিক্ষাত্মক প্রহসনে তাঁর দৃষ্টি অনেকটাই কৌতুক স্নিগ্ধ। laughing mirror এর মধ্য দিয়ে তিনি দ্রষ্টব্য বস্তুর বিচ্যুতিকে ফুটিয়ে তুলতে যত্নবান হয়েছেন। তবে অমৃতলালের প্রাহসনিক প্রতিভার মূলে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ wit ও satire। তাই বিদ্রূপের স্বল্প ছোঁয়া এই শ্রেণীর নাটকগুলিতেও বিরল নয়। শিক্ষাত্মক প্রহসন শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য নাটিকাগুলি হল—'বিবাহ বিভ্রাট', 'সম্মতি সঙ্কট', 'কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা', 'একাকার', 'গ্রাম্য-বিভ্রাট' প্রভৃতি।

বিবাহ বিভ্রাট

অমৃতলালের ব্যাপক জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে তাঁর 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪) প্রহসনটি। কৃপণ গোপীনাথ সরকার পুত্র নন্দলালকে ফ্রি চার্চ ইন্স্টিটিউসনে পড়াচ্ছেন। কারণ পুত্রের বিয়ে দিয়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে চান। কেননা 'এখন কুলীন মর্য্যাদা কলেজের পাশ, মুখ্যী কনিষ্ঠ উঠে গিয়ে এখন এম্. এ., বি. এ. হয়েছে।' সোনার বেনের জাতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গোপীনাথ পুত্রের লেখাপড়া শিক্ষায় ব্যয় করা অর্থের চতুর্গুণ অর্থ তুলে নেবার আশায় হোগলকুঁড়ের মন্মথ মিত্রের বারো বছরের মেয়ের সঙ্গে বিবাহের ঠিক করে। সোনা না নিয়ে সোনার দাম আর গয়নার বানি হিসেব করে নিতে চেয়ে

গোপীনাথ চুক্তি দেখায় 'টাকাটা স্যাক্‌রাকে না খাইয়ে জামায়ের ঘরে গেলে মিত্রিরজা মশায়ের লাভ না লোকসান?' কিন্তু শঠ অর্থপিশাচ গোপীনাথের সব গুড়ে বালি দিয়ে নন্দলাল সমস্ত টাকা আত্মস্যাৎ করে পালিয়ে যায়। পরিশেষে গোপীনাথের এ শিক্ষা হয় '....পাঁঠা ব্যাচা টাকা থাকে না—পাঁঠীর পোষাণীর টাকাও থাকে না।' এই প্রহসনে নন্দ, গোপীনাথ এবং তার স্ত্রী—কারও চরিত্র ভালো নয়—প্রত্যেকেই অর্থপিশাচ। নাটকের শেষে গিন্নির টাকার সিন্দুক খুলে বসে থাকা দেশীয় সঙযাত্রার অনুরূপ। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২ নভেম্বর স্টার থিয়েটারে 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রথম অভিনীত হয়।

প্রথম দিন 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ' (১৮৮৪, ২২ নভেম্বর)-এর বিজ্ঞাপনে 'বিবাহ বিভ্রাট' নামটি ছিল না। ২৯ নভেম্বরের বিজ্ঞাপনে দেখি 'প্রহ্‌ললাদ চরিত্রে'র সঙ্গে বিবাহ বিভ্রাটের একত্র বিজ্ঞাপন,—

Followed by a New and Highly Humorous
Society play.
BEBAHA BEVRAT
G. C. GHOSH, Manager.[১]

প্রথম অভিনয়ে মিঃ সিং—অমৃতলাল বসু, কর্তা—নীলমাধব চক্রবর্তী, নন্দ—অঘোরনাথ পাঠক, বেয়ারা-কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিলাসিনী কারফরমা—বিনোদিনী, ঝি—ক্ষেত্রমণি প্রমুখ বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৮৮৪-র নভেম্বর মাসে—২২, ২৩, ২৯, ৩০ তারিখে; ডিসেম্বর মাসে ৬, ৭, ১৩, ১৪, ১৭, ২৮, ৩১ তারিখে, ১৮৮৫, '৮৬ সালেও এ প্রহসনটি বহুবার অভিনীত হয়।

বাঞ্ছারাম

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর অমৃতলালের রচিত একটি ক্ষুদ্র হাস্যরসাত্মক নাটিকা স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। প্রহসনটির নাম 'বাঞ্ছারাম'। এই প্রহসনটিতে বাঞ্ছারামের ভূমিকায় অভিনয় করেন বিখ্যাত নট শ্রীনীলমাধব চক্রবর্তী। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর Indian Daily News পত্রিকায় এই অভিনয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। 'বাঞ্ছারামের', অভিনয় দেখে অনুসন্ধান পত্রিকা লেখে—"...লোকজন চাই, প্রকৃত নাটক—প্রহসন চাই! নহিলে ভুয়া আড়ম্বরে কয়দিন টিকিবে?..." (স্টার থিয়েটারের ভয়ানক দুর্নাম। অনুসন্ধান পত্রিকা / ১৮৯০, ৩০ সেপ্টেম্বর)

সম্মতি সঙ্কট

একটি পরস্পরবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন এক নব আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতলালের 'সম্মতি সঙ্কট' রচিত হয়। প্রহসনটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি, অমৃত গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগে মুদ্রিত হয়েছে।[২] দুই অঙ্কের প্রহসনটিতে টকলাস-শিখরাসীন দেবাদিদেব মহাদেব, দুর্গা ও নারদের কথোপকথনে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষদের সমূহ বিপদ নিবারণের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে। মর্তে এই বিল

১. Indian Daily News/29 Nov., 1884
২. অমৃতলাল বসুর জীবনীও সাহিত্য/ড. অরুণ মিত্র/পৃঃ ২৪৯

নিয়ে ভট্টাচার্যদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। রামলাল তার এগারো বছরের কন্যা কনকের জন্য একটি ভালো ছেলে পেয়েছিল। বাড়ী বাঁধা দিয়ে হাজার চারেক টাকাও সংগ্রহ করেছিল কিন্তু এখন বরের বাপ পিছিয়ে পড়েছে আইনের ভয়ে। এই প্রহসনে একদিকে পণ্ডিতদের অর্থলালসাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করা হয়েছে, অন্যদিকে দেশহিতের নামে অহিতকারীদের একহাত নেওয়া হয়েছে। একটি গানে তাই দ্ব্যর্থক ভাষায় অমৃতলাল বলেছেন,—

"গা'লো লেক্‌চারের জয়, গা'লো এডিটারের জয়;
কি ভয় কি ভয় হলো হিন্দুয়ানী ক্ষয়;
গা'লো গা মকর গঙ্গাজল।"

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২১ মার্চ 'সম্মতি সঙ্কট' প্রহসনটি স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। Indian Daily News পত্রিকায় এদিন 'সম্মতি সঙ্কট' প্রহসনের প্রথম অভিনয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়,—

"......The 21st MARCH. At 9 P. M./A New Dramatic
Sketch / THE CONSENT DILEMMA....."[৮]

'সম্মতি সঙ্কট' প্রহসনটি স্টার থিয়েটারে বহুবার অভিনীত হয়।

কালাপানি বা হিন্দু মতে সমুদ্র যাত্রা

১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা' প্রহসনটি। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর এই প্রহসনটি 'নরমেধ যজ্ঞ' নাটকের পর অভিনীত হয়। ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ পত্রিকায় বড়দিনের নাট্যোৎসবের নিম্নোধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়, তাতে দেখি,—

"....
X-MAS DAY AT 6-30 P. M./NARAMEDH YAJNA Followed by
Amritalal Bose's New/X'Mas Pantomime
KALAPANI/OR THE/
Great Sea-Voyage Movement ! / Songs, Dances Jokes,
Humours—Hits ! AMRITALAL BOSE, Manager."

স্টার থিয়েটারে 'কালাপানি' প্রহসনটি বহুবার অভিনীত হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে বিলেতফেরৎদের সমাজে একঘরে করে রাখা হত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো লোকও একঘরে হয়েছিলেন এই কারণে। 'কালাপানি' নামকরণে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ থাকলেও 'হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা'র মধ্যে ব্যঙ্গ সুস্পষ্ট। হিন্দুয়ানীর ঠাট বজায় রেখে 'সাহেব' সাজার মূঢ় প্রয়াস ধিক্কৃত হয়েছে অমৃতলালের এই নাটিকায়। কেননা একে তিনি মনে করতেন 'নামাবলীর পেণ্টুলেন' পরে সাহেব সাজার মতো। হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রহসনকারের মতামত বোঝা যায় নিচের গানটিতে,—

'ধর্ম্মের বেড়েছে মাত্রা সমুদ্রে হবে যাত্রা!
বাপের হয় না গঙ্গাযাত্রা, গৃহে মরণং।।
আস্‌ছে সব বিধি নিতে, অমনি বিধি হবে দিতে,
দেখেন নি যা বিধির পিতে, চৌদ্দ ভুবনং।।"

৮. India Daily News/21 March, March, 1891

বিলেত যাওয়ার উদ্দেশ্য রয়েছে দুলালচাঁদের মনে। কেননা বিলেত থেকে ফিরলেই রাতারাতি বিখ্যাত হওয়া যাবে। কিন্তু বাধ সাধলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তর্কচূড়ামণি, অথচ তর্কচূড়ামণি তার প্রজা। পরিশেষে দুলালচাঁদের বিলেত যাত্রার সপক্ষে পণ্ডিতদের বিধান মেনে সারা দেশের কাগজে, সর্বত্র এনিয়ে আলোচনা হতে থাকে। এই অবস্থায় দুলাল বলে "এ্যাজিটেসন করবার জিনিষ ছিল না, তাই ওই subject নেওয়া গেছল; বিশেষ আমাদের কাজ হাসিল হয়ে গেছে, হুজুগ জমে গেছে, নাম বেজে গেছে, এখন বিলেত গেলেও চলে, না গেলেও চলে,..." দুলালচাঁদ আর বিলেত গেল না।

একাকার

অমৃতলালের আর একটি বিখ্যাত প্রহসন 'একাকার' 'দেশের আর্থনীতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিভেদ সংরক্ষণের আবশ্যকতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে' রচিত। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সহায়তায় নক্সাধর্মী এই প্রহসনটির সার কথা বলা হয়েছে। রাধানাথ কর্মকারের উক্তিতে দেখি "এই গ্রামার ছেড়ে হ্যামার ধরে ভাই আমার সাম্যভাব গিয়ে গ্রাম্যভাব এসেছে, দেশোদ্ধার ছেড়ে কার্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়েছি।' দাসত্ব ত্যাগ করে জাতিগত বৃত্তি গ্রহণের মাধ্যমেই যে আমরা মুক্তিপথের পথিক হতে পারি এই প্রহসনে সেকথাই জানিয়েছেন নাট্যকার। 'একাকার' প্রহসনটি দুই অঙ্কে রচিত। প্রথম অঙ্কে চারটি ও দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি গর্ভাঙ্ক আছে। গান আছে মোট দশটি। বৈষ্ণবীদের গানের বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়েছে ভবিষ্যতের জাতপাত একাকারের দৃশ্য—

"বামুন যদি গড়ে জুতো
কেনা মুচি পরবে সুতো,
ধোপা সে তো বাপের ঠাকুর
ভাটপাড়াতে খুলবে টোল
(এখন) নেড়ানেড়ী বাড়াবাড়ী
হরি হরি হরি বোল।"

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর 'একাকার' পঞ্চরংটি স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয়ের পূর্বদিন Indian Daily News পত্রিকায় নিম্নরূপ বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল,—

"...

X'MAS DAY, AT CANDLE LIGHT/Grand X'Mas Feast/ New Pantomime/AKAKAR/SOCIAL CHAOS !/To be preceded by Operatic Sauce / Annanda Mongal/..."

গ্রাম্য-বিভ্রাট

অমৃতলাল বসু রচিত 'গ্রাম্য-বিভ্রাট' প্রহসনটি সম্ভবত 'একাকারে'র সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা। 'গ্রাম্য-বিভ্রাট' অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর Indian Daily News এ সম্পর্কে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়,—

"...

Saturday, 1st january candle light, 6 p. m./Amritalal Bose's. New Society—Satire/"The Rural Sketches"/Village youths ! Royal Beauties !/comic song ! Pastoral Song !..."

মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে গ্রামাঞ্চলে দলাদলি সৃষ্টি হয়ে যেভাবে শান্তি বিনষ্ট হয়েছে, তারই এক কৌতুককর চিত্র রয়েছে 'গ্রাম্য-বিভ্রাট' সামাজিক নক্সায় (১৩০৪)। দুই অঙ্কে মোট এগারটি (৭+৪) দৃশ্য রয়েছে এতে। গানের সংখ্যা পনেরো। কমিশনার ইলেকশন নিয়ে রমানাথ স্মৃতিরত্নের উক্তিতে এ সম্পর্কে অমৃতলালের বিশেষ মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে। "আমাদের এ গ্রামটির ভিতর ঈশ্বরেচ্ছায় আজ পর্যন্ত পরস্পরে বেশ মিল-জুল আছে, সখ করে ঝগড়া বিসম্বাদের বীজ এনে কেন গ্রামখানিকে ছারে খারে দেবে!"

বিদ্রূপাত্মক প্রহসন

প্রহসনকার হিসেবে অমৃতলালের খ্যাতি বা অখ্যাতির মূলে তাঁর বিদ্রূপাত্মক, অসাধারণ প্রহসনগুলি। এতে নাট্যকারের সমাজবোধ, নিজ বিশ্বাসের গভীরতা, সহজ পরিহাসরসিকতা এবং মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কশাঘাতে বিরুদ্ধতাকে শাসন করার এক উদ্ধত চিত্র অঙ্কিত। অমৃতলালের সমাজ-সংস্কারকামী সত্তাটিকে এখানে আবিষ্কার করা যায়, এখানে প্রাচ্যপন্থী অমৃতলালের সমাজ-অনুভাবন প্রতিভা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত। এই শ্রেণীর প্রহসনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'তিলতর্পণ', 'রাজাবাহাদুর', 'বাবু', 'বৌমা', 'সাবাস আটাশ', 'বাহবা বাতিক', 'সাবাস বাঙ্গালী', 'খাসদখল', 'ব্যাপিকা বিদায়', 'দ্বন্দ্বে মাতনম্' প্রভৃতি।

তিলতর্পণ

বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের তিলতর্পণ করেছেন অমৃতলাল 'তিলতর্পণে' (১৮৮১)। এই প্রহসনে বিদ্রূপ এবং ব্যঙ্গের খোঁচায় জর্জরিত হয়েছে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মানুষেরা।—ঐতিহাসিক, রোমান্টিক নাটকও ব্যঙ্গবিদ্ধ হয়েছে। ব্যবধানে আক্রান্ত হয়েছেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্রও। গিরিশচন্দ্র ঘোষ কৃত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপকে ব্যঙ্গ করে অমৃতলাল এনাটকে লিখেছেন "ওই যে শৈলেশ্বর ঘোষ ভারি বই লেখেন, কৈ দুর্গেশনন্দিনীতে কি কল্লেন? যে ভুল সে ভুল। ওরা বঙ্কিমবাবুর ভুল কেটে, আয়েষাকে মেরে ফেলে দিলেন, বঙ্কিমবাবুও মলেন।" ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি 'তিলতর্পণ' ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।[১]

১. 'তিলতর্পণ' প্রহসনটিতে বাপ্পারাও-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অমৃতলাল বসু। ৫ জানুয়ারি The Statesman পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দেখি,—

"NATIONAL THEATRE
6, BEADON STREET।
WEDNESDAY 5TH JANUARY, 1881
CLASSIC REPRESENTATION OF RUSHLILA
New & gorgeous–Unique of its Kind, And
TILTARPON
A DRAMATIC SATIRE.
Box office now open, where plan of the house can be seen and seats secured, from 10 A. M. to 5 P.M. daily Doors open at 8 P.M. Overtures at 8-30 P.M. Sharp
G.C. GHOSE.
Manager.

তিলতর্পণ নাটিকাটি ন্যাশনাল থিয়েটারে বহুবার অভিনীত হয়।

রাজাবাহাদুর

পূর্বে আলোচিত 'সম্মতি সঙ্কট', 'কালাপানি' প্রহসন দুটিকে ড. সুকুমার সেন বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর একটি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন 'রাজা বাহাদুর' (১২৯৮)-এ মূর্খ উপাধিলোলুপ ক্ষুদ্র জমিদারের চিত্র আঁকা হয়েছে। তৎকালে রায়বাহাদুর রাজাবাহাদুর খেতাব লাভের প্রত্যাশায় অনেকেই ইংরেজদের তোষণ করে গেছে। জগদানন্দ উকিল নিজের অন্দরমহলে নিয়ে গেছে সাহেবকে। ড. সেনের মতে এই প্রহসনে সেক্সপীয়রের 'টেমিং অব দি শ্রু' নাটকের সাদৃশ্য রয়েছে। এই প্রহসনটিকে অমৃতলাল বলেছেন 'সং-রং'; এবং পাত্রপাত্রীদের পরিচয় দিতে গিয়ে দিয়েছেন 'সঙের তালিকা'। এই প্রহসনের কাহিনী হল—এক মূর্খ, লম্পট বাঙাল জমিদার 'রাজা' খেতাব পেতে চেয়ে এক ধূর্তের খপ্পরে পড়ে। ধূর্ত জমিদারের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আত্মস্যাৎ করে। এক দরিদ্র মদ্যপ সাহেবকে দিয়ে জমিদারকে রাজা খেতাব দেবার আয়োজন করতে গিয়ে ধরা পড়ে। জমিদারের স্ত্রীর হাতে জমিদার লাঞ্ছিত হয়। 'রাজাবাহাদুর' প্রহসনটির প্রথম অভিনয় হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে। ২৩ ডিসেম্বর 'Indian Daily News' পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে জানানো হয়েছে,—

"......

THURSDAY, DECEMBER 24TH, AT 9 P.M.
THE sparkling operetta MALINA-BIKASH
AND/THE Spectacular One Act Piece—/BRISHA
KETU/WONDERFUL DECAPITATION/AND THE
CHRISTMAS PANTOMIME/RAJAH BAHADOOR/
COMIC SONGS—DANCE—SOCIETY HITS & etc·····"

পরের দিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বরও অভিনীত হয়েছিল 'রাজাবাহাদুর'। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি, ১০ জানুয়ারি, ১৭ জানুয়ারি, ২৪ জানুয়ারি, ৩১ জানুয়ারি এবং আরও অনেকবার স্টার থিয়েটারে এর অভিনয় হয়েছিল। প্রথম রজনীর অভিনয়ে মিঃ ফিশ্‌ এর ভূমিকায় পার্ট করেছেন অমৃতলাল বসু।

বাবু

প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয় : ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন রচনায় অমৃতলাল বসুর অসামান্য জনপ্রিয়তা ও সাফল্য 'বাবু' (১৩০০) তে অর্জিত হয়েছে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি 'মলিনা বিকাশ' নাটকের পর 'বাবু' অভিনীত হয়—'Indian Daily News'-এর বিজ্ঞাপন থেকে আমরা সে কথা জানতে পারি। বিজ্ঞাপনটি ছিল এরকম,—

"NEW YEAR'S DAY, 1894 !!!
STAR THEATRE
Monday, 1st January, at candle-light
The delightful Operatta
MALINA BIKASH-
Followed by Amritalal Bose's New Society
Sketch "BABU"

AMRITALAL BOSE,
Manager."[১]

এরপর স্টার থিয়েটারে 'বাবু' প্রহসনটি বহুবার অভিনীত হয়। ১৮৯৪-এর জানুয়ারি মাসের ৭, ১৪, ২১, ২৭। ফেব্রুয়ারি মাসের ৪, ১০, ১৭, ২৫। মার্চ মাসের ৩, ১০ প্রভৃতি তারিখে।

নামকরণ ঃ বাবুদের বিচিত্র জীবনাচরণের[২] সম্পর্কে কৌতূহল এবং ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী উনিশ শতকের শেষদিককার অধিকাংশ সাহিত্যিককে বেশ নাড়া দিয়েছিল। পুর্বেই উল্লেখ করেছি কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বাবু' নামে একটি প্রহসন জাতীয় নাটিকা রচনা করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলালে' গোঁড়া হিন্দু উচ্চবিত্ত পরিবারের আলাল বাবুর পরিচয় মুদ্রিত করেছিলেন। তিনি বাবুয়ানির পরিণাম চিত্রিত করতেও ভুল করেন নি। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'তেও কলকাতাই বাবুদের জীবনাচরণ চিত্রিত করেছেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদেরও বহুপূর্বে বাবুদের জীবনকথা ও এঁদের সম্পর্কিত কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলী বিবৃত করেছেন 'নববাবুবিলাসে'। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বাবুদের দশাবতারের রূপ এঁকেছেন। অমৃতলালের 'বাবু' প্রহসনটিকে বাবুদের জীবন সম্পর্কে নানা সাহিত্যিকের এই ক্রম-চিন্তনের একটি ফল রূপে চিহ্নিত করা যায়। সুতরাং চিন্তার ধারাবাহিকতায়, ঔৎসুক্যের ক্রমে 'বাবু' প্রহসনটি নেহাৎ হঠাৎসৃষ্ট, একক, কোন নব-চিন্তনের ফসল নয়। বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শে নব্য-শিক্ষিত উৎকেন্দ্রিক যুব সমাজের আচারভ্রষ্টতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার এক জীবন্ত চিত্ররূপ অঙ্কিত হয়েছে 'বাবু' প্রহসনে। এ প্রহসনের সমাজচিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'অনুসন্ধান পত্রিকা' স্টার থিয়েটারের অভিনয় দেখে নট-দের অভিনয়ের দুর্বলতা এবং ততোধিক দুর্বল নাট্যরচনার তীব্র সমালোচনা করেছিল। 'অনুসন্ধান' লিখেছে,—

> "থিয়েটারের বাজারে 'স্টার থিয়েটারের' প্রতিই আমরা অনেক আশা ভরসা করিয়াছিলাম; উহাদের দ্বারাই নট-নাট্যেরও অনেকটা সংস্কার হইবে, ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এতদিনে, এখন বুঝিতেছি, আমাদের সে আশা শুধু বাড়িটার বাহারে আসে যায় কি! লোকজন চাই—প্রকৃত নাটক—প্রহসন চাই! নহিলে ভুয়া আড়ম্বরে কয়দিন টিকিবে?"[৩]

'অনুসন্ধানে'র এই খোঁচাতে জন্ম হয়েছে 'রাজাবাহাদুর', 'কালাপানি' এবং 'বাবু'। 'বাবু'ই এই তিনটি প্রহসনের মধ্যে তুলনায় উৎকৃষ্ট সন্দেহ নেই। এই প্রহসনে দুটি অঙ্ক রয়েছে। প্রথম অঙ্কে চারটি এবং দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক রয়েছে। সুতরাং প্রাহসনিক বিধি—আয়তনে সংক্ষিপ্ততা এতে রক্ষিত হয়েছে।

১. India Daily Nesw/23 December, 1892

২.

৩. অনুসন্ধান পত্রিকা/১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ, ৩০ সেপ্টেম্বর।

'বাবু' সামাজিক নক্সার আগাগোড়া কোনও ধারাবাহিক কাহিনী নেই। বিধবা বিবাহ, ভারত উদ্ধার, সংবাদপত্র করা, দুর্ভিক্ষে সাহায্য, ব্রাহ্মসমাজের আচরণ ধর্মকে কেন্দ্র করে নানান ফক্কিক-ফাঁকি, মদ্যপান প্রভৃতি প্রহসনকারের সমকালীন বহু আলোচ্য বিষয়ের হাস্যকর দিক এই প্রহসনে উদ্ঘাটিত। নক্সাধর্মী এই রচনায় একটা নীতি শিক্ষাও রয়েছে এবং সে শিক্ষা বাবু ষষ্ঠীচরণ বটব্যালের উপরই বর্তেছে—অন্যরা ফলভোগী মাত্র। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সুবিধাবাদী, ঠক, প্রবঞ্চক, ইংরেজিনবিশ, পত্রিকা সম্পাদক ষষ্ঠীচরণের অর্থগৃধ্নুতা দেখানো হয়েছে। সে বিলাতি কেতায় অভ্যস্ত হবার জন্য শ্বশুরবাড়ীতে শালার সঙ্গে দেখা করতে যায় কার্ড পাঠিয়ে। মুখে দরিদ্রের ত্রাণের কথা বললেও কাজে সে তা করে না। বর্দ্ধমানের কাঙ্গালডাঙার ভজহরি, তাদের গ্রামে খরা-জনিত দুর্ভিক্ষের কথা ষষ্ঠীচরণকে তার কাগজে লিখতে বললে সে বলে যদি তারা চাঁদা তুলে তার পত্রিকার গ্রাহক হয়—তবে সে লিখতে পারে। তারপর যখন শোনে যে কাঙ্গালডাঙার জমিদার সীতানাথ সিঙ্গি, যিনি আগে তার পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন, চাঁদাও দিতেন ভালো। এখন ঠিক চাঁদা দিচ্ছেন না—তখন ষষ্ঠীচরণ জানায় সে যাবে তাদের গ্রামে এবং কলমের জোরে প্রজাদের চোখে নিরীহ ভালোমানুষ জমিদারকে প্রজাপীড়ক বানিয়ে ছাড়বে। ষষ্ঠীচরণের আন্দোলন আফিম উঠানোর পক্ষে এবং মদ্যপান প্রচলনের পক্ষে—অবশ্য সেটা সাহেব তোষণের জন্য। অতঃপর স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা ওঠে ফটিকচাঁদের সঙ্গে কথোপকথনের সময়। ফটিকচাঁদ ষষ্ঠীকে নিরস্ত করতে চায় তার বোন নীরদাকে নিয়ে স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ থেকে—কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। ষষ্ঠীচরণ স্ত্রীকে স্বাধীনা করবেই, এই পণ তার।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কোনও সংলাপ নেই। কন্দর্পের বাড়ীর রাস্তায় স্বাধীন মহিলাগণ বিধবাবিবাহের সমর্থনে একটি গান গেয়েছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রয়েছে ব্রাহ্মদের বিচিত্র ক্রিয়াবর্ণন। সজনীকান্ত ব্রাহ্ম নেতা, অশনিপ্রকাশ বৈজ্ঞানিক। তবে অশনিপ্রকাশের বক্তব্যের মধ্যে কখনও যুক্তিসঙ্গত, কখনও অযৌক্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রাধান্য লাভ করেছে। অশনি জানিয়েছে পরমেশ্বরকে ব্রাহ্মরা সৃষ্টিকর্তা বলে ভুল করছে "আমি যদি half an ounce protoplasm পাই, তাহলে আমিও এখনি একটা সৃষ্টি করতে পারি।' এমন সময় দামোদর সজনীকান্তকে সংবাদ দেয় নাড়াজোলে সাঁওতালগণ দলে দলে প্রেমধর্ম গ্রহণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব। দামোদর সেখানে পারছে না, কারণ দ্বিতীয়বার বিধবা হয়ে অনঙ্গমোহিনী কর্মকার তার আশ্রয়ে উঠেছে। অশনি অনঙ্গের বৈধব্য যন্ত্রণা দূর করতে চেয়েছে ইলেকট্রিসিটি দ্বারা। সজনী এবং দামোদর একথায় হেসে উঠেই শঙ্কিত হয়ে পড়ে কারণ ব্রাহ্মদের সমাজে হাসা নিষেধ। মহাপাতকের কাজ। কাঁদাই হল আসল কাজ। পৃথিবীটা কাঁদবার জায়গা। দামোদর মুখে প্রেমধর্মের কথা বলে, এদিকে ব্রাহ্ম নয় বলে সহোদর হিন্দু ভ্রাতাকে বাস্তুচ্যুত করার জন্য হাইকোর্টে মোকদ্দমা রুজু করেছে। সজনী দামোদরকে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় দামোদর নাড়াজোল রওনা হয়। ব্রাহ্মদের স্বার্থপরতার আরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই গর্ভাঙ্কে। তিনকড়ি মামার সঙ্গে আসে গুরুচরণ। তার মা মারা গেছে। রাস্তা দিয়ে গেলে মড়া নিয়ে অনেক দূর দিয়ে ঘুরে যেতে হবে, কিন্তু সজনীকান্তের পোড়ো ভিটে দিয়ে বের হলে সময় কম লাগবে।

সজনীকান্ত সরাসরি না না-বলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় জন্য সবার সঙ্গে মিটিং করে; সেক্রেটারী প্রেসিডেন্ট প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্তের কথা জানায়। বিরক্ত হয়ে গুরুচরণ চলে যায়। সজনীকান্তের পরিচয় দেওয়া হয়েছে অতঃপর। বয়স্কা কন্যাসহ বিধবা বিবাহ করেছে সে। কন্যাটির মাথার উপর কুঁড়েঘর ভেঙে পড়েছিল বলে সজনী তার নাম দিয়েছে সৌধকিরীটিনী। সজনীর ভগিনী-স্ত্রীর ইচ্ছা সৌধকে অবিবাহিতা রাখা। সে এখন জিমনাস্টিক শিখছে। সজনী সৌধের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার পর আসে ভাই বাঞ্ছারাম। সে বীরভূমে সেবা করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ ঘরের বয়স্কা বিধবা মহিলা ক্ষমাকে নিয়ে এসেছে। বয়স্কা কন্যা, চাকুরিরত ছেলে রয়েছে ক্ষমার। মায়ের দুষ্কর্মে ক্ষমার ছেলে লজ্জায় ঘেন্নায় চাকরি ছেড়েছে। এদিকে কথার শুদ্ধতা রক্ষার জন্য সদাব্যস্ত বাঞ্ছা সমস্ত দেশজ শব্দকেই সে অশ্লীল বলে। এমন সময় ক্ষমা আসে। ভ্রাতা বাঞ্ছা ও ভগিনী ক্ষমার কোন্দলের সম্ভাবনার আভাস পেয়ে সজনী মুহূর্তের জন্য এসে তক্ষুনি প্রস্থান করে। তিনকড়ি ও অশনি পূর্বেই প্রস্থান করেছে। বাঞ্ছারাম ক্ষমার ভরণপোষণে অক্ষম বলে তাঁকে এনে তুলেছে শেওড়া কুটিরে। এখানে অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবার একসাথে থাকে। ক্ষমার হাতে নির্যাতিত হয় বাঞ্ছারাম।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কের বিষয় কন্দর্পকান্ত বাঙ্গাল। তার আজিমা কন্দর্পের উন্নতির জন্য মাস ছয়েক তাকে কোলকাতায় নিয়ে এসে ইংরেজি শিক্ষা দিয়েছে। পরিণামে কন্দর্প গোঁড়া ব্রাহ্ম হয়েছে। ভারত উদ্ধার কার্য করার জন্য সে এখন বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধা আজিমার (দিদিমা) বিবাহ দিতে চায়। আজিমা ভাবেন, কন্দর্পের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি তাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা ভাবেন। ভৃত্য নদেরচাঁদ কন্দর্পের বাইরে বের হবার সাজ এনে দেয়। কন্দর্প চোখ বেঁধে বাইরে বের হয়, কারণ ''কত গুরা, বোলদ, গাদা, কুত্তা, বিলেই, সব উলঙ্গ অইয়ে সরকে যাতায়াত করচে, তাগোর পানে তাকাইব ক্যাম্নে! মনে কুভাব আসবো না!'' নদেরচাঁদ চোখে ফ্যাটা বাঁধা কন্দর্পকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে আসে সভ্য মহিলাবৃন্দ। তারা বৃদ্ধা বিধবা আজিমার দুঃখ দূর করার জন্য তাঁকে বিধবা বিবাহের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে বলে। আজিমা তাঁদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের কাহিনীস্থল ষষ্ঠীবাবুর বসবার ঘর। ষষ্ঠী ভারত-মাতার উদ্ধার কার্যে রত, তাই নিজের গর্ভধারিণীর কথা ভাববার সময় তার নেই। বিধবা মা মাসে দু'দিন একাদশী করে বলে সে দিন-প্রতি ছ'পয়সা হিসেবে মোট বার পয়সা, মায়ের মাসোহারা তিন টাকা থেকে কেটে রেখেছে। মায়ের অনুনয় বিনয়েও সে টলে না। সে জানায় নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে মাত্র। মায়ের কাছে কিছু পাবার আশা তার নেই। কিন্তু ''আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, মায়া, এনার্জী, য়্যাজিটেশন, চাঁদা রোজগার এখন সবই তাঁর জন্য। ভারতমাতা বই আর আমার মা নাই, এখন আমি ভারত-সন্তান।''

মা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলে ষষ্ঠী ভাবে পৃথিবীতে মাগুলোই সবচেয়ে অসভ্য। এরপর ষষ্ঠী নীরদাকে নিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতে চায়। প্রথমটা নীরদা আপত্তি করেছে— কিছুটা লজ্জায়, কিছুটা পড়শীর কাছে দুর্নামের ভয়ে। পরে অবশ্য রাজী হয়েছে। ফটিক এসেছে বোনের কাছে। সে ষষ্ঠীকে নিষেধ করেছে। ষষ্ঠী হেসে উড়িয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা।

ভারতচন্দ্রের অনুসরণে নারীদের পতিনিন্দার পর্বও এক প্রস্থ দেখানো হয়েছে এরপর। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে স্কুলের ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ স্বরূপ গোবিন্দবাবু জানিয়েছেন ষষ্ঠী পয়সা রোজগারের ধান্দায় যে স্কুল খুলেছে তাতে পড়াশোনা হয় না কেবল ছুটি। (প্রসঙ্গত সেকালের মুক্তমনা এবং সহজ শিক্ষার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী শিক্ষা পদ্ধতির কথা স্মরণে আসে।) বাপ-জেঠাকে মানে না আধুনিক কালের যুবকেরা। পাশ্চাত্য অনুকরণের ফল এটা।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ব্রাহ্মসমাজের রথী মহারথীরা জোড়ায় জোড়ায় ভ্রাতা-ভগিনী উদ্যানে পরিভ্রমণ রত। এমন সময় কন্দর্প এসে জানায় আজিমাকে পবিত্র প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে সে ব্যর্থ হয়েছে। ষষ্ঠীকৃষ্ণ আসে নীরদাকে নিয়ে সজনী নীরদাকে বলে দৌড় শিখতে হবে, কারণ 'দৌড় ভিন্ন ভারতের স্বাধীনতার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।' তিতুমীর ঠাকুর এসে হাজির হয়। ষষ্ঠীকৃষ্ণকে সে সাবধান করে যায়—যাতে সে তামাক, আফিমের বিরুদ্ধে না লেখালেখি করে। কেননা মদ খেয়ে তাহলে দেশ উৎসন্নে যাবে। তিতুমীরের এই সাবধান বাণীর পর নাটকে এই রেশ ধরে রাখে ক্ষমার উক্তি 'মদ খেয়ে হুটোপাটী করবার চেয়ে একটু একটু আফিম খাওয়া ভালো নয়?'' ঠিক এই সময় এক মত্ত সাহেব এসে হাজির। নারীদের ফেলে রেখে তখন সবাই পালাতে শুরু করে। সাহেব নীরদাকে ধরে ফেলে। ষষ্ঠী অগত্যা সাহেবের কাছে নীরদাকে রেখে স্ত্রী উদ্ধারের জন্য চাঁদা আদায় থেকে শুরু করে মিটিং, য়্যাজিটেশন—মায় বিলেত পর্যন্ত যাবার কথা চিন্তা করে। অথচ সে নিজে এগিয়ে গিয়ে সাহেবের হাত থেকে বৌকে রক্ষা করার কথা ভাবে না। এমন সময় উদ্ধার-কর্তার ভূমিকায় আসেন বৃদ্ধহিন্দু তিনকড়ি মামা। তিনি লাঠি উঁচিয়ে ধরতেই সাহেব তার প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে দেয়। সাহেব আর কেউ নয় ফটিক। এরপর এক প্রস্থ শিক্ষা দান। নিজের স্ত্রীকে যারা রক্ষা করতে জানে না, তারা করবে ভারত উদ্ধার?

সমাজচিত্র ঃ 'বাবু' প্রহসনের সমাজচিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শুরুতেই বলা যায় অমৃতলাল নিজেই Indian Daily পত্রিকার বিজ্ঞাপনে 'বাবু' নাটকের মধ্যে উক্ত নানান লক্ষ্যস্থলকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন নানান ধরনের বাবুর কথা বলে। বিজ্ঞাপন বলা হয়েছে,—

"....Amritalal Bose's New Society Sketch

'BABU'

THE BABU—Political
THE BABU—Ultra Religious
THE BABU—Reformer
THE BABU—Scientific
THE BABU—Ultra Moralist
THE BABU—Tamed. ....''[১]

হুজুগপ্রিয়, স্বার্থান্ধ মানুষেরাই বাবুরূপে 'বাবু' প্রহসনে আক্রমণের লক্ষস্থল। অমৃতলালের মধ্যে এখানে ঈশ্বরগুপ্তের উত্তরাধিকার বর্তেছে। বর্তেছে 'ধর্মসভা'র রক্ষণশীল মানসিকতা।

১. Indian Daily News/1st January, 1894

তাঁর অন্য প্রহসনগুলিতেও তাই কোনও কোন্ও স্থানে গোঁড়া ব্রাহ্মণের কর্তব্য হাস্যকরতার দিকে এক-এক বার দৃষ্টি দেবার চেষ্টা থাকলেও মূলত তিনি আঘাত করতে চেয়েছেন বিলাতপ্রিয়, স্বদেশবিদ্বেষী, স্বার্থপর মানুষদের। এই নাটকে বিদ্রূপের সিংহভাগ নিক্ষিপ্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি। বস্তুতপক্ষে ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে অমৃতলালের ঘনিষ্ঠতা থাকলেও, কোনও কোনও ব্রাহ্মের প্রতি নাট্যকারের শ্রদ্ধাবোধ থাকলেও, এই প্রহসনে ব্রাহ্মদের আচার-আচরণে ছুঁৎমার্গ ও অতিরিক্ততাকে ভণ্ডামিরূপে চিত্রিত করেছেন প্রহসনকার। ব্রাহ্মগণ ছাড়াও এখানে শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দু শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বৈপরীত্যে সব সমস্যা বিজ্ঞান দিয়ে সমাধান করতে চান যাঁরা—তিনি তাঁদেরও ব্যঙ্গ করেছেন। তুলে ধরেছেন শিক্ষা ব্যবস্থার অপূর্ণতার কথাও। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রতি বয়ঃকনিষ্ঠদের অশালীন ব্যবহারের মূল কোথায় তাও দেখাতে চেষ্টা করেছেন অগ্রগতির ধারক ও বাহকরূপে কৃতিত্ব দাবী করে যে ব্রাহ্মরা—তাদের আচার-আচরণগত হাস্যকরতা, কথা ও কাজের বৈপরীত্য দেখিয়ে প্রহসনকার বিংশ শতাব্দীর প্রথম লগ্নে নষ্টভ্রষ্ট ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যেভাবে বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন সেগুলির দিকে এখন দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে,—

১। ব্রাহ্মসমাজের রীতি অনুসারে ব্রাহ্ম পুরুষেরা প্রত্যেকেই ভ্রাতা অভিধায় অভিহিত হয়ে থাকে। সে ভ্রাতৃ সম্মান সমাজ ভ্রাতৃত্ববোধ-জাত। ব্রাহ্ম বাঞ্ছারাম নিজেকে ভ্রাতা বলে পরিচয় দেয়। তিনকড়ির প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় "ভ্রাতার আবার নাম কি? তবে ভ্রাতায় ভ্রাতায় গোল না বাধে, তাই লোকে একটা ব'লে ডাকে।' (১।৩) প্রতিটি নারীই ভগিনীরূপে চিহ্নিত। এ সমাজে স্ত্রীও ভগিনী। অমৃতলালের ব্যঙ্গের খোঁচা কতদূর বিস্তৃত—তা বোঝা যায় বাঞ্ছারামকে তিনকড়ি যখন তার পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন তখন সে বলে "আমাদের সম্প্রদায় নূতন, সকলেই 'ভ্রাতা' আছেন, এখনও কেহই 'পিতা' হন নাই। পরিবারিক কুটীর স্থাপন হয়েছে, ভ্রাতা ভগিনী হয়েছে, বিশেষ উন্নতিশীলগণ শীঘ্রই 'পিতা' হবেন বোধ হয়।" (১।৩)

২। ব্রাহ্মগণ পিতৃপরিচয় কিংবা মাতৃপরিচয় দেওয়াকে অশ্লীলতা বলেছে। কারণ সাকার পিতার কথা শোনাও তাদের মহাপাপ। তাদের পিতা নিরাকার।

"তিনকড়ি। কি, পরাণ—তুমি পরাণে কলুর ছেলে?

বাঞ্ছা। (সরোদনে) ওঃ! ওঃ! আজ আমায় অশ্লীল কথা শুনতে হ'ল, সাকার পিতার কথা শুন্‌তে হ'ল, কি অত্যাচার!..."(১।৩)

৩। কেশব সেন পন্থী ব্রাহ্মসমাজ নিজেদের হিন্দুধর্ম থেকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেই বিরোধীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। জনৈক কবি নব্য-ব্রাহ্ম সমাজের (ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ) এই আচরণকে ব্যঙ্গ করে লেখেন,—

"চাপ দাড়ি রাখা চোখে চস্‌মা ঢাকা,
ভয়ানক ঢং লেগেছে বাংলাতে।
এ পথের পথিক নম্বরে অধিক
যায় কেবল ইয়ংবেঙ্গলেতে।"[১]

১. বিশ্ব সঙ্গীত, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ/পৃঃ ৪৬০

রসিকতা করে আর এক কবি লিখলেন,—

"দেশ জুড়ে উঠেছে দাড়ি রাখা ঢেউ,
বাড়ী বাড়ী দাড়ি বাকি নাইকো কেউ।"[১]

'বাবু' প্রহসনে কন্দর্পের চরিত্রে ব্রাহ্মসমাজের এই দিকটা দেখানো হয়েছে হাস্যকর ভঙ্গিমায়। কন্দর্পের দাড়ি গজায়নি বলে সে নকল দাড়ি লাগিয়েছে। আজিমাকে সে বলেছে "আমি করছি কি, আপন হইতে দারী গজাইল না। দারী লাগাইছি, দারী না থাক্‌লে সৈভ্য অইব ক্যামনে;" কন্দর্প 'টৌপি চস্‌মা'ও পরেছে। ইন্দ্রিয়শুচিতা রক্ষার জন্য আবার চোখে ফ্যাটা বেঁধেছে।

৪। অনেক ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানতে চাইতেন না। এঁরা ছিলেন বিজ্ঞানের ভক্ত। এঁদের যুক্তিবাদ অনেকক্ষেত্রে নিতান্তই নিজেদের বানিয়ে তোলা অর্থহীন জিনিস। কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১—১৯৪২) তাই একটি কবিতায় এই শ্রেণীর মানুষদের ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন,—

"গ্যাস থেকে জল হয় বলে যখন কেমিষ্ট্রি
পরিষ্কার বোঝা গেল সৃষ্টির যত মিষ্ট্রি
বোঝা গেল পরমেশ্বর নিতান্তই ফক্‌কা,
ধর্মকর্ম একেবারে পাবেই পাবে অক্‌কা।"[২]

বিজ্ঞানের অভিনব ব্যাখ্যা ঃ 'বাবু' প্রহসনে অশনিপ্রকাশের চরিত্রে বিজ্ঞান-পাগল ব্রাহ্মদের চরিত্রের এই দিকটা দেখানো হয়েছে। বিজ্ঞানের আশ্চর্য উন্নতি বিষয়ে সে বলেছে— বিজ্ঞান প্রয়োগ করে সব কিছুই করা সম্ভব। তার বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য অংশগুলি হল,—

(i) "মাইক্রস-স্কোপের দিন দিন যেরূপ উন্নতি হচ্ছে, তাতে বেশ আশা করা যায়, শীঘ্রই এমন একটা যন্ত্র তৈয়ার হবে যে, ঈশ্বর যদি থাকেন—তাঁকে সকলেই এ যন্ত্রে সাহায্যে অনায়াসে দেখতে পাবে।..." (১।৩)

(ii) "সৃষ্টি যে কেউ করছে, আমি তা মানিনে, ফিজিক্যাল চেঞ্জে সবই আপনা আপনি হচ্ছে...আমি যদি half an once protopalsm পাই, তা হলে আমিও এখনি একটা সৃষ্টি করতে পারি।" (১।৩)

(iii) "....আমি এমন একটা গ্যাল্‌ভানিক ব্যাটারি তৈয়ার কর্‌তে পারি, যা দুহাতে ধরে থাকলে বৈধব্য-যন্ত্রণা একেবারে অসাড় হয়ে যাবে।" (১।৩)

(iv) "আমরা যদি কখনও স্বাধীন হই, তা নিশ্চয় জানবেন, সে সায়েন্সের সাহায্যেই হবে। কলাগেছের কাছে গঙ্গার ভিতর তার দিয়ে এমন একটা ইলেকট্রিক কারেণ্ট চালাতে হবে যে ইংরেজের জাহাজ ওখানে পৌঁছিলেই ভুস্‌ করে ডুবে যাবে।" (১।৩)

(v) "আমি যদি বেঁচে থাকি—আর তা থাকব, কেন না, আমি রোজ দুবেলা খানিকটা ক'রে ইলেকট্রিসিটী খাই,—..." (১।৩)

১. ওই/পৃষ্ঠা ৪৬০

২. নব্যভারত পত্রিকা/ফাল্গুন, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ/'মাভৈঃ মাভৈঃ' কবিতা

(vi) "....এই ইলিকট্রিসিটী দ্বারাই জাতিভেদ উঠিয়ে দেব,..." (১।৩)

(vii) "আপনি নাড়াজোলে আগুন লাগিয়ে দেখুন, গ্রাম সব জ্বলে গেলে নিশ্চয় বৃষ্টি হবে, আর দুর্ভিক্ষ দমন হবে।" (১।৩)

(viii) "আমার ম্যাগনেটিক তেল এক শিশি কিনে নে গে মাখিয়ে দাও, পাঁচ বৎসর মড়া তুলে রাখ, কিছু হবে না;..." (১।৩)

(ix) "একটা ক'রে নেগেটিভ আংটী হাতে রাখ্‌লে আর চুল সাদা হবার যো নেই।" (১।৩)

(x) "দেহ হচ্ছে একটা ব্যাটারী, মাথা হ'ল তার প্রধান সেল।"

(xi) "বাঞ্ছা। কি বেরিয়ে গেলে মানুষ ম'রে যায়?
অশনি। ইলেকট্রিসিটী।" (১।৩)

(xii) "...এ রকম হঠাৎ ভয় পেলে নারভস সিষ্টেমের ইলেকট্রিসিটী একেবারে খারাপ হয়ে যায়!" (২।৩)

সুতরাং অশনিপ্রকাশের বিজ্ঞান ইলেকট্রিক-নির্ভর। সে সব কিছুর মধ্যেই বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার প্রকাশ লক্ষ্য করেছে। সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার এই যে সে বৈধব্য যন্ত্রণাকেও ব্যাটারী আবিষ্কার করে সারিয়ে দেবার কথা ভেবেছে।

(৫) ব্রাহ্মগণ সর্বজীবে দয়া করার কথা বলেছে বার বার। কিন্তু তাঁরা কী রকম গোষ্ঠীকেন্দ্রিক স্বার্থপর ছিলেন সে চিত্র দেখিয়েছেন প্রহসনকার অত্যন্ত রুক্ষ ভঙ্গিতে। সজনীকান্ত ব্রাহ্মসমাজের নেতা। অ-ব্রাহ্ম দরিদ্র মানুষ আর কোনো উপকার তার কাছে যায় নি, চেয়েছে তার জমির উপর দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যেতে। কেননা রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেলে অনেক ঘোর-পথ হয়। সজনীকান্ত তাকে সরাসরি না না-বলে সভা সমিতির সঙ্গে আলোচনার কথা বলেছে। পনেরো কুড়ি দিন অপেক্ষার থাকতে বলেছে। তারপর তিনকড়িকে সজনী যখন জিজ্ঞাসা করে যে সাধারণ সভাগৃহে এখন তিনি আসেন না কেন—তখন তিনকড়ি যে উত্তর দেন তা প্রকৃতপক্ষে নাট্যকারের উত্তর। তিনি এখানে না আসার কারণ স্বরূপ বলেন—"কি জান—ক্রমে তোমাদের মতন দয়াল হয়ে দাঁড়াব, আমার ব্যাতিকের ধাত্ এত করুণা সহ্য হবে কেন?" (১।৩) ব্রাহ্মদের করুণার দ্বিতীয় উদাহরণও ইতোপূর্বে দিয়েছেন অমৃতলাল। সজনীকান্ত ভাই-দামোদরকে জানিয়েছে পৌত্তলিক ভ্রাতাকে তার গৃহ থেকে উচ্ছেদ করানোর কার্যে সে সহায়তা করবেই, কারণ ওই পাপাত্মা ভাই দামোদরের স্ত্রীকে 'ভগিনী' হতে দেয় নি। তাই মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে হলেও সজনী দামোদরের ভাইকে মোকদ্দমায় হারিয়ে 'তারপর না হয় দু'দিন বেশী করে অনুতাপ' করবে।

(৬) ব্রাহ্মসমার্জের শব্দগত শুচিতার উপর খুব জোর দেওয়া হত। অমৃতলাল 'বাবু' প্রহসনে দেখিয়েছেন খারাপ কাজ করায় দক্ষ মানুষের প্রতি কোনও কোনও ব্রাহ্ম কেমন নির্বিকার। অথচ শব্দ-শুচিতার প্রতি কী গভীর নিষ্ঠা তাদের! স্বামীকে 'ওগো' বলাও তাদের কাছে অশুচিতা। হাসাটাও তাদের কাছে অশ্লীলতা।

(৭) ব্রাহ্মসমাজে সভার মতামত নিয়ে কার্য করার বিলিতি কায়দা প্রচলিত ছিল। 'ভাবু' প্রহসনে অমৃতলাল এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরএকব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। মৃতদেহকে কোনো

স্থানের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা—এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও তাদের সাধারণ সভার প্রয়োজন, একথা তারা জানিয়েছে। স্ত্রী সাহেব কর্তৃক অপহৃতা হলেও ছদ্ম-দেশহিতব্রতী ষষ্ঠীচরণ তাকে উদ্ধার করার জন্য না এগিয়ে গিয়ে চীৎকার করতে থাকে 'এ অত্যাচার আমি কখনও সহ্য করবো না, কখনই নয়; আমি য়্যাজিটেসন করবো, টাউন হলে মনষ্টার মিটিং কন্‌ভিন্ করবো, সমস্ত কাগজে করেসপণ্ডেস লিখব, শেষ পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত যাব—দেখি, আমার স্ত্রী আদায় হয় কি না।" (২।৩) বাহবাস্ফোট-সর্বস্ব এই সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা এখানে বন রূঢ়ভাবে এঁকেছেন অমৃতলাল।

(৮) কেশব সেন পন্থী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের কেউ কেউ স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ভারত উদ্ধারের জন্য, ভারতবর্ষের পরাধীনতা ঘোচাবার জন্য, যাঁরা নানান চিন্তা ভাবনা করতেন। রক্ষণশীল প্রহসনকার অমৃতলাল ভারত উদ্ধার কর্মে চিন্তিত ব্রাহ্মদের চিত্রকে 'লাফিং মিররে' প্রতিবিম্বিত করে দেখিয়েছেন। যে তাঁরা যেকোন বিচিত্র কর্তব্য করাকেই বলেন ভারত উদ্ধার। এই ভারত উদ্ধার বা সমাজসেবার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে কয়েকটি চিত্রের মাধ্যমে। এই চিত্রসৃজনকারী চরিত্রগুলির এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য অর্থ সংগ্রহ করা।

প্রথমে ধরা যাক দলের পাণ্ডা ষষ্ঠীকৃষ্ণকে। একটি ইংরেজি কাগজের সম্পাদক সে। ইংরেজ মহলে তার সংবাদপত্রের যথেষ্ট খাতির রয়েছে বলে সাধারণ মানুষ মনে করে। দেশসেবার জন্য সে কি না করেছে! ষষ্ঠীকৃষ্ণের অতীত জীবন দারিদ্র্য-পূর্ণ ছিল। সাধারণ মানুষ তিতুমীরের দয়ার থাকার জায়গা পেয়েছে, খেতে পেয়েছে তারপর আপন দুর্বুদ্ধি কৌশলে অর্থ সঞ্চয় করার জন্য নব্য বঙ্গ সমাজের পাণ্ডা হয়েছে। সে কাগজে দরিদ্রদের ত্রাণের জন্য লিখে বটে কিন্তু সেজন্য সে এলাকার মানুষদের তার পত্রিকার গ্রাহক হতে হয়। পত্রিকা ফাণ্ডে চাঁদা দিতে হয়। ইংরেজি পড়ুয়া ছাড়া কারও জন্যে সে লেখে না। সবার কাছ থেকে সে নানান ছুতোয় চাঁদা চায়। সে চাঁদা দিতে অস্বীকার করে, তার বিরুদ্ধে সে অপপ্রচার চালায়—জমিদার সিঙ্গির কাহিনীতে সে কথা জানানো হয়েছে। সমাজসেবার অর্থ তার কাছে অর্থকরী হওয়া চাই। ইংরেজদের পক্ষে সদা তার লেখনী উদ্যত। তাই আফিমের বিপক্ষে মদের পক্ষে তার আন্দোলন। পরিণামে মদ্যপের ছদ্মবেশে ফটিক তাকে শিক্ষা দেয়।

ভারত উদ্ধারের ব্যাপারে সজনীকান্তের মতটা বড় খোলামেলা। তার স্পষ্ট কথা "ভারত উদ্ধার যদি আমাদের দ্বারা হয় ত হবে, না হয় ভারত উৎসন্ন যাক।" ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গকাব্য 'ভারত উদ্ধারে'র সঙ্গে এখানে ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

আর এক ব্রাহ্ম বাঞ্ছারাম ভারত উদ্ধার বা দুর্ভিক্ষে সেবাকে লাভজনক কাজ মনে করে। সে স্ত্রী ক্ষমাকে আশ্বস্ত করে 'এ বৎসরও নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ হবে' "...দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি দেশের কোনও অমঙ্গল হলেই আমার অন্ন-কষ্ট থাকে না বরং কিছু সঞ্চয় হয়;"

(৯) ভারত উদ্ধারের জন্যই ব্রাহ্মোরা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী বলে 'বাবু' প্রহসনে জানানো হয়েছে। স্ত্রীস্বাধীনতার ব্যাপার বোঝাতে কয়েকটি ছক বাঁধা কথা প্রহসনকার বলেছেন, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উচ্চারিত হতে হতে যা বহু ব্যবহারে জীর্ণ। সেগুলি হল,—

(i) শাশুড়ীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন শিক্ষিতা স্ত্রীর প্রধান লক্ষণ। নীরদার মুখ দিয়ে প্রহসনকার স্বাধীনা মহিলাদের, বিশেষ করে কুল-বধূদের এই অতি-আধুনিকা হবার বাড়াবাড়ির কথা জানিয়েছেন। অতি-আধুনিকা হবার জন্য মনঃকষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সে কি কি করেছে স্বামীকে সেকথা জানিয়েছে—"কেন, ঘোমটা তুলে দিয়েছি, সময় সময় জুতো-মোজাও পরি, শাশুড়ীকে লজ্জা করিনি ধম্‌কে কথা কই, তোমার ইয়ারদের সাম্‌নে বেরুই, আর কি করতে হবে?" (২।১)

(ii) কুমারী মেয়ের বিবাহ হোক বা না হোক বিধবা বুড়ীর বিবাহ দেওয়া চাই, ব্রাহ্মদের বিধবা বিবাহ সমর্থনকে এইভাবে ব্যঙ্গ করেছেন অসহিষ্ণু অমৃতলাল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিটি কর্ণধারকেই তিনি খারাপ, চরিত্রভ্রষ্ট করে এঁকেছেন এবং তারা বিধবা বিবাহ করেছে সবাই। প্রতিটি নারীরই প্রায় পুত্র কন্যা উপযুক্ত। বাঞ্ছারাম দেশ উদ্ধারের নাম করে গিয়ে ব্রাহ্মণ রমণীকে বের করে এনেছে, উপযুক্ত পুত্র কন্যা তার। দামোদর দ্বিতীয়বার বিধবা হওয়া রমণীর তৃতীয় স্বামী হতে চায়। কন্দর্প তার বৃদ্ধা বাহাত্তর বছরের আজিমার বিবাহ দিতে চায়। সে বলে, যদি সে আজিমার বিবাহ দিতে পারে তবে "...সকল সৈভ্য লোক কইবেন যে কন্দর্পকান্ত এট্টা বারত-সন্তান বটে, আপন আজিমার বিধবা বিবাহ দিল—দ্যাশ উদ্ধার করল;" (১।৪)

(১০) নব্য ব্রাহ্মসমাজের অন্ধ পাশ্চাত্য প্রীতির কথা সর্বজনবিদিত। অনেকেই তাঁরা সভ্য হবার জন্য পিতৃবংশের উপাধি ও নামকে পরিবর্তিত করে নিতেন। 'বাবু' প্রহসনে দেখি ষষ্ঠীকৃষ্ণ শ্যালক ফটিকচাঁদ—"তবু যদি সাহেবরা মনে করে—বাবু কোন ইত্‌রু পিড়ুরুর দৌহিত্র।" বিলাতি কায়দায় কার্ড পাঠিয়ে সে সর্বত্র যায়। শ্বশুরবাড়ীতে ঢুকতে গিয়েও সে কার্ড পাঠিয়েছে। শ্যালকের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে গিয়ে নাস্তানুবাদ হয়েছে শেষে বাংলা ভাষায় কথা বলেছে। তিতুমীরের কাছে বটব্যাল হয়েছে ব্যাটাম্বল। সজনীকান্ত চাকি যে বিধবা রমণীকে বিয়ে করেছে তার মেয়ের নাম ছিল ভূতি, পূর্ব পিতার উপাধি ছিল গড়গড়ি। সজনী তার মেয়ের নব নামকরণ করেছে সৌধকিরীটিনী গড়গড়ি চাকি। তিনকড়ি ঠাট্টা করেছেন ম্যাচলা-ট্যাচলার সঙ্গে বিয়ে দিও "একেবারে গড়গড়ি-চাকি-ম্যাচলা হয়ে দাঁড়াবে,—রাজযোটক হবে।" অমৃতলাল 'বাবু' প্রহসনে ব্রাহ্মদের যে চিত্র এঁকেছেন তা অনেকটা একদেশদর্শী। কারণ উনিশ শতকের বাংলায় সামাজিক সংস্কার কর্মে ও জাতীয় চেতনার জাগরণে ব্রাহ্মদের ভূমিকা খুব একটা ম্লান ছিল না। কৃত্রিমতা ও আতিশয্য হয়তো অনেক সময় ব্রাহ্মসমাজকে অন্যদের কাছে কিছুটা হাস্যকর করে তুলেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটাই তাদের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। 'ধর্মসভা'র পৃষ্ঠপোষক রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সার্থক উত্তরসূরী অমৃতলাল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে দেখেছেন ব্রাহ্মসমাজের ক্রিয়াকলাপ। একথা সত্য, সন্তানসহ প্রথম বিধবা বিবাহ করেছিলেন একজন ব্রাহ্ম। কিন্তু অমৃতলাল একে ভালো মনে গ্রহণ না করে সমস্ত ব্রাহ্মকেই সেই দৃষ্টিতে দেখেছেন ও এঁকেছেন।

হাস্যরস ঃ অমৃতলালের 'বাবু' প্রহসনটির মূল রস হাস্যরস। এই হাস্যরসের উৎসারে প্রহসনকার ঘটনা সংস্থাপন ও চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির উপরে যেমন জোর দিয়েছেন, তেমনি সংলাপ ও সঙ্গীতকেও প্রয়োগ করেছেন নিপুণভাবে। নক্সাধর্মী এই নাটিকায় একটি প্রচ্ছন্ন

কাহিনী রয়েছে। ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যালের বাহবাস্ফোট এবং তার যথোপযুক্ত শিক্ষা হল সেই কাহিনী। ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ গৃহে তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না ঘটলেও সজনীকান্ত তার কথা উচ্চারণ করেছে। তার ঈর্ষা জানিয়েছে ষষ্ঠীকৃষ্ণের প্রতি। ষষ্ঠীকৃষ্ণও প্রগতিতে সবাইকে টেক্কা দেবার জন্য অন্যদের তুলনায় সব কাজে অতি উৎসাহ দেখিয়েছে।

সংলাপ ঃ ঘটনা সংস্থাপন, হাস্যরসের উৎসার এবং চরিত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতির বা নানা অসঙ্গতির সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করেছি। এবার এই প্রহসনে নাট্যকারের সংলাপ রচনায় দক্ষতার কথা বলতে হয়। বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে অমৃতলালের জনপ্রিয়তা কিংবদন্তী-প্রায়। এই জনমন জয়ের পশ্চাতে রয়েছে তাঁর প্রহসন পরিবেশনের অসাধারণ দক্ষতা। কখনও সহানুভূতি, কখনও জলবিছুটি লাগাতে তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার। 'বাবু' বিদ্রূপাত্মক প্রহসন। যে Satire-এর হাস্যরসের মূলে, সেই Satire-এর উদ্ভব ঘটেছে সুতীক্ষ্ণ আক্রমণাত্মক সংলাপে। সংলাপ যথাযথ হবার প্রথম শর্ত চরিত্রানুযায়ী সংলাপ। অমৃতলালের জয়জয়কার সেখানেই। হাস্যরস সৃষ্টি করার জন্য এমন দুটি ভাষাকে ব্যবহার করেছেন যা তৎকালে নাটকে হাস্যরস সৃষ্টিতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত। একটি ভাষা হল উড়িয়া ভাষা, অন্যটি পূর্ববঙ্গীয় ভাষা। উড়িয়া ভাষায় কথা বলেছে ভাগবত। ষষ্ঠীকৃষ্ণ এসেছে শ্বশুরবাড়ী, ভাগবতকে কার্ড দিয়ে ফটিকের কাছে পাঠালে ভাগবত ফটিককে বলে—"মু ত কহি দিলা আপনি জমাই মনুষ্য আছ, ঘরের মানুষ ধাকিড়িকিড়ি উপর চড়ি যউ, ত মতে ইংরাজী কিচিমিচি কড়িকড়ি কহিলা, মুত বুঝল না, কহিল তু ভসাখণ্ড দিউ, নই তো আঁটিকাঁটি হব না—না কঁড় কহিলা" (১।১)

বাঙাল ভাষায় কথা বলেছে আজিমা, নদেরচাঁদ ভৃত্য ও কন্দর্প। প্রথম অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কে হাস্যরসের উচ্ছল প্রকাশ প্রথম সংলাপ থেকেই। আজিমার বিবাহ দেবার জন্য পাগল কন্দর্প বলেছে ষষ্ঠীবাবুর ছাপাখানার পঁচিশ বছরের যুবকের সঙ্গে বাহাত্তর বৎসরের বিধবা আজিমার বিবাহ দেবে এবং আজিমাকে "আবার শাঁখা সিন্দুর পরাইমু, অঙ্গে চিকণ শারী দিমু, বাশীর প্রায় নাসায় নলক দোলাইমু, পা দুটিতে পাইজর পরাইমু, জুমুর জুমুর ক'রে তুমি ব্যারাইবে, আমার ছাতিখানা গোরের মাঠের মতন অইব,…" (১।৪) কন্দর্পের অভিনব পোষাক দেখে আজিমা বলেছে,—"আরে সৈত্য সৈত্য বুত বানাইছে—বুত বানাইছে, দ্যাহ দ্যাহ মুয়ে গুয়ার ল্যাজ পইরে বুত সাজছে;" (১।৪)

ভাষাগত তির্যকতার মাধ্যমেও হাসরস সৃষ্টি করেছেন অমৃতলাল। সজনীকান্ত ও তিনকড়ির সংলাপ লক্ষণীয়—

"সজনী। তিনকড়ি বাবু, আমাদের এখানে আর আসেন না কেন?

তিনি। কি জান—ক্রমে তোমাদের মতন দয়াল হয়ে দাঁড়াব, আমার বাতিকের ধাত, অত করুণা সহ্য হবে কেন?" (১।৩)

অথবা

"বাঞ্ছা। কি সৌভাগ্য! কি শুভদিন! ক্রন্দন করুন, ক্রন্দন করুন—

তিনকড়ি। চিম্‌টি কাট্, চিম্‌টি কাট্, তা না হ'লে প্রথম প্রথম রপ্ত হবে না!…" (১।৩)

অন্যত্র

"তিনকড়ি। ….তোমাদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ দাড়ী, তাই মেয়েদের হয় না; এই বুঝি ধর্ম মহিমা? আমি কত বিবির দাড়ী দেখেছি—খৃষ্টানীর জোর বেশী।

বাঞ্ছা। আপনার স্মরণ রাখা উচিত্, নবীন ধর্মের এখনও শৈশবাবস্থা।" (১।৩)

এই প্রসঙ্গের জের টেনে অশনিপ্রকাশ ঔষধ দিয়ে মেয়েদের দাড়ী গজানোর উপায় ঠিক করলে বাঞ্ছারাম বলে,—

> "পৌত্তলিক ঔষধে আমাদের প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই কোন মহাত্মা আবির্ভূত হয়ে প্রার্থনা, অনুতাপ ও বক্তৃতার দ্বারা দুঃখিনী ভগনীদের এই অভাব মোচন করতে পারবেন।" (১।৩)

স্ত্রী নীরদাকে অপহৃতা হতে দেখে—ষষ্ঠীকৃষ্ণের পূর্বে উদ্ধৃত উক্তিতে লক্ষ্য করি—সে বক্তৃতা মাধ্যমে করে চাঁদা আদায় করে পত্নী উদ্ধার করতে চায়। নাট্যকারের শ্লেষাত্মক মনোভাব এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ক্ষমাসুন্দরী, তিনকড়ি ও ফটিক এই তিনটি চরিত্রের স্পষ্ট কথাবার্তা ব্রাহ্মসমাজের আচার-আচরণের হাস্যকর দিকগুলিকে প্রকট করে তুলেছে। যারা ক্ষমতালোভী, যশপ্রিয়, আপন পত্নীকে রক্ষা করতে পারে না অথচ পত্নীকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে নিজেকে সভ্য বলে দাবী করে, প্রতিকথায় চাঁদা আদায় করে অর্থ আত্মস্যাতের ধান্দায় থাকে, মানুষের সর্বনাশ করার জন্য যাদের চেষ্টার অন্ত নেই, পারিবারিক জীবনে পত্নী, ভগিনী, মা ও ভাই-এর প্রতি চরম দুর্ব্যবহার করতে যাদের বাধে না, 'বাবু' প্রহসনের বিভিন্ন স্থানে নানাভাবে তাদের উপর ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন প্রহসনকার।

সঙ্গীত ঃ শুধু সংলাপ নয়, হাস্যরস সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সঙ্গীতও ব্যবহৃত হয়েছে। 'বাবু' নাটকে ব্যবহৃত তেরটি গানের অধিকাংশই কাহিনীর অগ্রগতি ও চরিত্র বিশ্লেষণ এবং নাট্যকারের বিশেষ মানসিকতা প্রকাশে সহায়ক হয়েছে। অসাধারণ অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী বলেছেন,—

> "অমৃতলালের নাট্য-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁর নাট্যক সার্থক ও সুরচিত গীতাবলির যথাযথ সমাবেশ, যার ফলে নাটকে গতি হয়েছে বেগবান এবং অন্তরের ভাব বিশ্লেষণ হয়েছে অনেকাংশে সহজ এবং যথোপযুক্ত।"[১]

বৈষ্ণবীদের কণ্ঠে একটি গানে 'বাবু' প্রহসনের নান্দীমুখ করা হয়েছে, এই গানে 'বাবু' প্রহসনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। উনিশ শতকে শেষভাগে নানা ধরনের বাবুর বিচিত্র কর্মধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই গানটিতে। কিন্তু নাটকে শেষ পর্যন্ত যে 'বাবু'-বৃন্দ প্রধান হয়ে উঠেছেন—তাঁরা ব্রাহ্মসমাজের এবং নব্যবঙ্গের প্রতিনিধি। নান্দীর গানে বাবুদের চেহারার যে বর্ণনা করা হয়েছে তাঁরা নিঃসন্দেহে ব্রাহ্ম,—

"কাঁচে আঁখি ঢাকা, শিরে সীঁথি বাঁকা,
কথা বাঁকা বাঁকা,
বাঁকা মুখে রাখা, কিবা দাঁড়ি আবরণ।
অঙ্গে পরা কোট, বাক্যে ভরা ঠোঁট,
মুখে যত চোট,
কাজেতে চম্পট, তুলিতে পটোল সতত যতন।।

১. বাঙ্গালীর নাট্যচর্চা/অহীন্দ্র চৌধুরী/পৃঃ ২২০

কখন বা বাবু কখন মিষ্টার,
পিতা হন ভ্রাতা, বনিতা সিস্‌টার,
সম্বোধন নাহি সম্বন্ধ বিচার,...''

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কন্দর্পের বাড়ীর রাস্তায় স্বাধীনা মহিলাগণ যে গান গেয়েছেন তা চতুর্থ দৃশ্যের প্রাক্-কথন মাত্র। আজিমার সঙ্গে কন্দর্পের বিধবাবিবাহ বিষয়ক কথার পূর্বাভাস। মহিলাগণ গেয়েছে,—

"পতি মলে হাতের বালা খুল্‌ব না লো খুল্‌ব না।
বিচ্ছেদ-আগুন প্রাণে আর ত
জ্বাল্‌ব না লো জ্বাল্‌ব না।।" (১।২)

তৃতীয় সঙ্গীতটি হেমচন্দ্রের বহুখ্যাত 'হতাশের আক্ষেপ' কবিতার অনুকরণে রচিত ব্যঙ্গাত্মক সঙ্গীত। 'বঙ্গের বিধবা বালা ব'সে বুঝি অইরে' এই সঙ্গীতে ব্যঙ্গ তীব্র হয়ে উঠেছে নিম্নোক্ত অংশে,—

"বঙ্গের বিধবা বালা ব'সে বুঝি অইরে!
স্বাধীনা ভগিনী মোরা, প্রেমরসে প্রাণ পোরা,
আঁ'ব যেন বর্ণচোরা, বীরদাপে আয় তোরা,
উদ্ধারিব ওরে রে।
ছুঁড়ী বুড়ী বঙ্গে আর রাঁড়ী নাহি রবে রে।
উড়াব উন্নতি ধ্বজা কত মজা পাব রে;" (১।৪)

এই দৃশ্যে সভ্য মহিলাবৃন্দ আর একটি সঙ্গীত গেয়েছে এতে আক্রমণের চেয়ে রঙ্গ রসের উৎসার বেশী,—

"ঠান্‌দি তোমায় সাজাব লো ক'নে।"

পঞ্চম সঙ্গীতটি নীরদার। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি থেকে স্বামীকে সে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে। তাকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নীরদার মনে সংস্কারগত দ্বন্দ্বটিও এখানে অভিব্যক্ত। সে গেয়েছে,—

"ছি ছি ছি ছি ছি
তুমি পাগল হলে কি?" (২।১)

সঙ্গীতটিই যেন সংলাপের কাজ করেছে, ষষ্ঠীকৃষ্ণ নীরদার গানের উত্তর দিয়ে বলেছে 'নীরদা, আমি পাগল হবার ছেলে নই।' বিশেষ উদ্দেশ্যে তার এই মৎলব।

ষষ্ঠ সঙ্গীতটি গয়েছে নীরদার প্রতিবেশী শীলদা। ভারতচন্দ্রের রচনার ঢঙে এটি রচতি। শীলদা পতিনিন্দাও করেছে। হাস্যরসের উদ্বোধনে গানটি সামান্যই সহায়ক হয়েছে। এই গানটিকে প্রহসনে অতিরিক্ত প্রয়োগ বলে মনে হয়েছে। গানটি 'কে জানে ভাই নীরদা কেমন তোমার মন।' (২।১) এটি ঠিক সঙ্গীত নয়। কেননা সুর নির্দেশ নেই বা গীত বলে লেখাও নেই, অন্যত্র যেখানে সে নির্দেশ আছে।

সপ্তম সঙ্গীতটি প্রতিবাসিনীগণের কণ্ঠে,—

"কথা শুনে মনে লাজ পাই।
দে দে ঘোম্‌টা টেনে ম্যানে কমনে যাই।।" (২।১)

এই গানেও স্ত্রীকে অতিরিক্ত পরিমাণে বিবি করে তোলার বিরোধিতা করা হয়েছে।

এই দৃশ্যে স্বাধীনা মহিলাদের কণ্ঠে রয়েছে (সুরে পাঠ) আর একটি সঙ্গীত,—ব্যঙ্গ এই গানটির প্রতিটি শব্দেই রয়েছে। ব্রাহ্মরা মনে করতেন স্ত্রীকে বাড়ীর বাইরে বের করে আনাই হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় মঙ্গল। এই প্রবণতাকে তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করা হয়েছে গানটিতে,—

"আমরা এসেছি নিতে, তোমারে দেশের হিতে,
দেশের ছি-তে চিতে করো না মরম।
সবে ভাঙ্গিব জানানা, তুমি তা কি গো জান না।
মেন না মেন না সখি বকেয়া ধরম।।" (২।১)

এই গানের রেশ ধরে এই দৃশ্যে স্বাধীনা মহিলাদের কণ্ঠে আর একটি গান যোজনা করা হয়েছে,—

"পতি পাগল সাধিছে পায়ে ধ'রে।
লজ্জা কেন লো চল না সজ্জা ক'রে।।"

অতিরিক্ত গান প্রয়োগ করে এই দৃশ্যে প্রহসনকার প্রহসনের তীক্ষ্ণতাকে কিছু পরিমাণে নষ্ট করে দিয়েছেন বলে মনে হয়। একই ভাব-ভাবনা-নির্ভর এতগুলি সঙ্গীত প্রয়োগের কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। সম্ভবত নাট্যকার সঙ্গীতপ্রিয় বাঙ্গালী দর্শকদের মনোরঞ্জন এবং নাট্য-দৈর্ঘ্যের একটা কাঙিক্ষত বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে এতগুলি গান সংযোজন করেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে স্কুলের ছাত্রদের কণ্ঠে যে গানটি সংযোজিত হয়েছে—শিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি সেই গানটি নাট্যকারের অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে,—

"হাঃ হাঃ হাঃ কেয়া মজা পাই, কেয়া মজা পাই
স্ফূর্তি ক'রে স্কুলেতে ভর্ত্তি হতে যাই।।"

একাদশ সংখ্যক গানটিও ছাত্রদের কণ্ঠে গীত। বক্তব্যপ্রধান ব্যঙ্গ্যাত্মক গান এটি। অল্পবয়স্ক ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতা, গুরুজনদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি এই গানে উক্ত,—

"বেয়াদপ বাপ দাদারে করিনাক কেয়ার।
(আমরা) সার্ট পরেছি ব্যাট ধ'রেছি
পার্ট ক'রেছি হেয়ার।।"

শেষ দৃশ্যে স্বাধীনা মহিলাদের কণ্ঠে যে প্রথম গানটি দেওয়া হয়েছে তাতে শিক্ষিতা রমণীদের বিবিয়ানা, লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে পতির সঙ্গে বেড়ানো প্রভৃতি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে,—

"আমাদের প্রেম ধরে না
....
শিখেছি প্রেম ব'য়ে পড়ে,
বেড়াই পতির মাথায় চ'ড়ে
প্রেম বিলুতে এ ভারতে আসা
মোদের রসমই।।" (২।৩)

চরম শিক্ষাপ্রাপ্ত সংস্কারকদের নারীরাও বুঝে গেছে তাদের পুরুষদের ক্ষমতা, বুঝে গেছে এই চকমকে বিলাতি সভ্যতার অনুকরণ তাদের সাজে না। তাই তারা সমবেত কণ্ঠে গেয়েছে,—

"ছি ছি ছি হব না আর ঘরেরবার।
কুলবালা কুলে রব মুখে আগুন সভ্যতার
প্রাণনাথ করি মানা, সাজাও না আর বিবিয়ানা,
ঘরের লক্ষ্মী বাইরে এনে,
দেশ দিও না ছারেখার।"

প্রসঙ্গত স্মরণীয় হারাণচন্দ্র রাহার ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'অবকাশরঞ্জন' (২য় সং কাব্যে 'আমি ত হব না বিবি এ প্রাণ থাকিতে' কবিতায় একই ধরনের চিন্তা অভিব্যক্ত হয়েছে,—

"আমি ত হব না বিবি যাবৎ জীবন,
কেমনে ঘোমটা খুলে,
লাজলজ্জা সব ভুলে
করিব পরের সনে বাক্য আলাপন?
শরমে যে মরে যাই ভাবিতে এখন।"

প্রহসন কিনা : 'বাবু' প্রহসনটির উদ্দেশ্য এর শেষ সঙ্গীতটিকে অভিব্যক্ত। সমাজ, সংসার, পরিবেশ-পরিজনের শত নিষেধকে অগ্রাহ্য করে কেবল আত্মপ্রীতির মোহে নূতন কিছু করতে গেলে তার পরিণাম কখনও ভালো হয় না—'বাবু'র মর্মকথা এই। 'বাবু' সামাজিক প্রহসনটি যেন সমগ্র উনিশ শতকের সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াদির দর্পণ। কোন্ সমস্যার কথা এখানে উল্লেখিত হয় নি? পারিবারিক সমস্যার কথা ব্যক্ত হয়েছে। একান্নবর্তী পরিবারের বাঁধন যে ক্রমাগত আলগা হয়ে পড়ছে ষষ্ঠীকৃষ্ণের সংসার, দামোদরের সংসারে ভ্রাতার সঙ্গে তার সম্পর্কে ব্যক্ত হয়েছে। ভাই, বোন, মা, বাবাকে নিয়ে গড়া যে বাঙালি পরিবার—বিদেশি অনুকরণের মোহে, উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্তী হয়ে, শিক্ষিত অতি-সভ্য সমাজের যুবকেরা সবার আগে আঘাত করে বসেছে তাকেই। প্রথমত, বাবা, মা ও অন্যান্য গুরুজনদের তারা কেয়ার করতে চায় নি। শুধু ব্রাহ্ম নয়, নব্য শিক্ষিত সকলের মধ্যেই এই ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। স্কুলের ছেলের মধ্যেও শুরু হয়েছে এই জঘন্য বৃত্তির অনুপ্রবেশ। ব্রাহ্মেরা সাকার পিতামাতার পরিচয় দেওয়াকে মহাপাতক ভেবেছে। দ্বিতীয়ত, ভারতমাতার চিন্তায় ব্যস্ত যারা, তারা নিজের গর্ভধারিণী মায়ের প্রতি উদাসীন। ষষ্ঠীকৃষ্ণের চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। তৃতীয়ত, সমাজে সব পুরুষকে যারা 'ভ্রাতা' বলে সম্বোধন করে, সমস্ত নারীকে এমনকি স্ত্রীকেও বলে 'ভগিনী', তাদের একজন দামোদর নিজের ভ্রাতার বিরুদ্ধে অযথা মিথ্যা মোকদ্দমা করে তাকে গৃহচ্যুত করতে আগ্রহী। চতুর্থত, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কও স্বাভাবিক নয়। স্ত্রীকে বিবি করতে গিয়ে সাংসারিক শান্তিকে নষ্ট করে বসছে নব্য শিক্ষিত সংস্কারকামী মানুষেরা। সমাপ্তি সঙ্গীতে তাই মহিলারা মিনতি করেছে "ঘরের লক্ষ্মী বাইরে এনে/দেশ দিও না ছারেখার।" পারিবারিক সমস্যার মূল প্রোথিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমস্যায়। 'বাবু' প্রহসনে সেদিকেও আলোকপাত করা হয়েছে।

ধর্মীয় সমস্যার রূপটি উনিশ শতকের ধর্ম আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নানাজনের সংস্কার প্রবণতার কথাগুলি ব্যক্ত করেছে। একদিকে খ্রীষ্টান ধর্মের আগ্রাসী সম্প্রসারণ, অন্যদিকে

ব্রাহ্মসাজের সৃষ্টি, বিস্তার-কেশবসেন-দেবেন্দ্রনাথের মধেও মনোমালিন্য ও ব্রাহ্মসমাজ বিভাজন। হিন্দুধর্মের নানা সম্প্রদায়ের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের কথাও উল্লেখিত হয়েছে ফটিকের উক্তিতে,—"আচ্ছা, কি হ্ওয়া যায় বল্ দেখি? দেশহিতৈষী হই, না বেহ্মজ্ঞানী হই, না আজকাল যে ওই হয়েছে গেরুয়া কামিজ টামিজ প'রে হিঁদুয়ানি—তাই হওয়া যায়?"

কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই—ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি প্রহসনকারের বিদ্রূপটা একটু বেশী। রাজনৈতিক ব্যাপার কখনই অবহেলিত থাকে না, সমাজ সমস্যামূলক প্রহসনে। 'বাবু' প্রহসনেও থাকে নি। ব্রাহ্ম কিংবা নব্য শিক্ষিতদের অতিরিক্ত মাত্রায় সভ্য হবার প্রচেষ্টার পশ্চাতে, পাশ্চাত্য অনুকারিতার মূলে রয়েছে ইংরেজ শাসকের অনুকম্পা লাভ। ষষ্ঠীকৃষ্ণ ইংরেজী সংবাদপত্রে কখনও ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে নি। বৃটিশদের ওপিয়ম কমিশনের বক্তব্যেও তাই ষষ্ঠীকৃষ্ণ সমর্থন জানিয়েছে (১।১)। কারণ সে বৃটিশের অনুগ্রহ প্রত্যাশী। হাস্যরস এর রসানে চড়িয়ে নানা সমস্যা অবলম্বন করে নানান বাবুর রূপচিত্র এঁকে প্রহসনকার অমৃতলাল যে সার্থক প্রহসনটি রচনা করেছেন—তার নাম 'বাবু'।

বৌ-মা

প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয়ঃ অমৃতলাল বসু সমাজিক নক্সাজাতীয় নাটিকা 'বৌ-মা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে এটি অভিনীত হয়।[১] 'বৌ-মা' প্রহসনটিও জনপ্রিয় হয়েছিল। ফলে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি বার বার স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান' গ্রন্থে শঙ্কর ভট্টাচার্য এ ব্যাপারে স্পষ্ট আলোকপাত করেছেন।

উদ্দেশ্যমূলকতাঃ গোঁড়া হিন্দু সমাজের প্রতি অনুগত অমৃতলাল ব্রাহ্মসমাজের আচার-আচরণ চলন-বলনকে সহ্য করতে পারেন নি কোনসময়েই। ফলে বার বার তাঁর প্রহসনগুলিতে ঘুরে ফিরে এসেছে দৈনন্দিন জীবনাচরণে ব্রাহ্মদের হাস্যকরতার প্রসঙ্গ। 'বৌ-মা' প্রহসনটিতে দুটি অঙ্কের দশটি দৃশ্যে (৬+৪) প্রগতিশীল নব্যযুবক

১. Indian daily News পত্রিকার ২৩ ডিসেম্বর সংখ্যার বিজ্ঞাপনে জানানো হয়,—

'XMAS DAY, 25 TH DEC,
AT CANDLE-LIGHT
THE SPARKLING OPERATTA
RISHYA SRINGA
Followed by Amrita Lal Bose's New X'mas Sketch
'THE WIFE'
Funny Frobic-For the Sweet Children
Merry mirth-For the Gay young.
Serious Study-for the thinking Nature...

বাবুরামের ভ্রষ্টাচার এবং পরিণামে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এই শ্রেণীর মানুষদের আচার-আচরণের হাস্যকরতা দেখিয়ে, তাদের সংশোধন করা ছিল অমৃতলালের মূল উদ্দেশ্য।

কাহিনী সংক্ষেপ ঃ 'বৌ-মা' প্রহসনের সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি নিম্নরূপ—বামাদাস একজন প্রসিদ্ধ প্রগতিশীল ব্রাহ্মনেতা। তাঁর স্ত্রী হিড়িম্বা। বামাদাস ও হিড়িম্বা দম্পতি জীবনাচরণে, কথোপকথনে সদা শুদ্ধাচারের পক্ষপাতী। বাবুরাম আর তার তরুণী ভার্যা কিশোরী বামাদাস ও হিড়িম্বার দাম্পত্য জীবনের অনুসরেণ সংসারেও কাব্যিক ভাষায় বাক্‌বিনিময় রীতিকে শ্রেয় বিবেচনায় গ্রহণ করেছে। বাবুরামের বৃদ্ধা মাতা সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব পালন করেন অথচ বাড়ীর বৌ কিশোরী সংসারের কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে উপন্যাসের ভাষায় কথাবর্তা বলে সময় কাটায়। তার এই ধরনের আচরণের কারণ—সে বিশ্বাস করে, 'আমি যে নায়িকা—হিরোইন্'। কেউ তাকে হেঁসেল যেতে বললে সে তীব্র প্রতিবাদ করে জানায়, নায়িকারা অমন কাজ করতে পারে না। বাবুরামের মামা মতিলাল বার বার চেষ্টা করেও তাদের শুধরাতে পারেননি। শেষে বাবুরাম ওষুধ জাল করার অপরাধে ধরা পড়ে। এসময় বামাদাসের অত্যধিক ভগিনীপ্রীতি উথলে ওঠে। কিশোরীর সঙ্গে তার আচরণ সকলেরই এমন কি বাবুরামেরও দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে। মাতুল মতিলালের চেষ্টায় বাবুরাম শাস্তির হাত থেকে রেহাই পায়। সঙ্গে সঙ্গে তার পুরানো রোগও কেটে যায়।

প্রহসন কিনা ঃ 'বৌ-মা' নাটিকাটিকে 'সামাজিক নক্সা' রূপে চিহ্নিত করা হলেও এটি ঠিক নক্সাজাতীয় রচনা নয়। কারণ নাটিকাটির বক্তব্যে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে—যা নক্সাজাতীয় রচনার নয় বরং প্রহসনের আঙ্গিকের আনুকূল্য করে। 'বৌ-মা' নাটিকাটি দুই অঙ্কে দশটি দৃশ্যে রচিত। তাছাড়া এটির অঙ্গীরস হাস্য। সুতরাং 'বৌ-মা' নাটিকাটিকে প্রহসন বলা যেতে পারে।

হাস্যরস ঃ 'বৌ-মা' প্রহসনটি হাস্যরসের আধারেই পরিবেশিত। হাস্যরসের আশ্রয় এখানে সর্বত্র Humour নয়, বরং অনেকক্ষেত্রেই Satire। স্ত্রীশিক্ষা প্রসার এবং তার বাড়াবাড়ি, স্ত্রৈণ্যস্বভাব স্বামী, ভণ্ড সমাজ সংস্কারক প্রভৃতির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে। ভণ্ড সমাজ সংস্কারক বামাদাসবাবুর আচরণের স্থূলতা অতিরিক্ত-প্রগতি-অভিমানিনী কিশোরীর দৃষ্টিও এড়ায় না। সে বলে,—

"বামাদাসবাবু দেখলেই বলেন, ও পুঁটি
তোকে করবই সভ্য,—
ভগ্নী ভগ্নী তোর চোখ দুটি।"

নারী মাত্রকেই ভগিনী সম্বোধন করা—এবং ভগিনীর সঙ্গেই প্রেমালাপ—প্রভৃতি প্রসঙ্গকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনে আঘাত করেছিলেন। অমৃতলাল 'বৌ-মা' প্রহসনে ব্রাহ্মদের চরিত্রের এই আতিশয্যকে তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করেছেন। 'বৌ-মা' প্রহসনে ব্রাহ্মদের জীবনাচরণের নানা প্রসঙ্গ এবং চরিত্রের যে সমস্ত ত্রুটি দেখিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাসির খোরাক যোগাতে পেরেছে কিশোরীর

উপন্যাসের ভাষায় কথোপকথন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীক-বাবু' প্রহসনে নায়িকাও উপন্যাসের ভাষায় কথা বলেছে। গুরুজনেরা, শাশুড়ী ও মামাশ্বশুর কিশোরীকে হেঁসেল যেতে বললে সে বলে,—

> "আলমারী খুলে সমস্ত বই আপনার সামনে ফেলে দিচ্ছি, দেখে বলুন যে তার মধ্যে যত নায়িকা আছে, তারা কি হেঁসেলে গিয়েছিল।"

হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ততা থাকা সত্ত্বেও 'বৌ-মা' প্রহসনটি অমৃতলালের 'বাবু' 'তাজ্জব ব্যাপার', 'কালাপানি'র মতো জনপ্রিয় হতে পারেনি এর কাহিনীগত গতানুগতিকতা এবং মৌলিক-কল্পনাশক্তির দীনতার জন্য।

অবতার

প্রহসন সৃষ্টির মূলে রয়েছে উদ্দিষ্ট চরিত্রকে উপহাস্যসম্পদ করে চিহ্নিত করা—এসত্য প্রহসনকারদের রচনায় বার বার প্রমাণিত। রসরাজ অমৃতলাল বসুর লেখনীও 'ব্যঙ্গে র জন্য ব্যঙ্গ' পথকে সব সময় পরিহার করতে পারেন নি—এই দুর্বলতার কারণেই। তাই তাঁর রচিত দুটি অঙ্কে গঠিত 'অবতার' (১৩০৮) প্রহসনেও লক্ষ্য করা যায় ব্যঙ্গে র ছোঁয়া। তবে 'নির্মল হাস্যের স্বতোৎসার'-ও এ নাটিকার স্থানে স্থানে লক্ষিত হয়। সমকালীন এক বৈষ্ণবভক্ত সাংবাদিককে (সম্ভবত শিশিরকুমার ঘোষ) ব্যঙ্গ করে 'অবতার' প্রহসনটি রচিত। এ নাটিকায় নায়ক দর্পনারায়ণ মদ-মাংস খেয়ে খেয়ে শারীরিক অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলেছে, এই সময়ই সে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছে। সে তাই বলেছে,—

> "এই ঠিক সময় হয়েছে—পেটের অসুখ বেড়েছে, ডাক্তার মাংস খেতে নিষেধ করেছে, কাঁকড়া পর্যন্ত হজম হচ্ছে না, বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বনের এই ঠিক সময়।"

বিদ্রূপের তীব্রতা আছে, কিন্তু জ্বালা নেই; আঘাতের রক্তিমতা আছে, তবে সে আঘাত পিচকিরি নিক্ষিপ্ত রঙীন গুলালের। এবং এখানেই ব্যক্তিকে আক্রমণ করার প্রয়াস—

ব্যক্তি-বিশেষকে ছাড়িয়ে গেছে। স্টার থিয়েটারে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'অবতার' নাটিকাটি প্রথম অভিনীত হয়।[১]

সাবাস আঠাশ : 'সাবাস আটাশ' (১৩০৬), 'নবজীবন' (১৩০৮) এবং 'সাবাস বাঙ্গালী' (১৩১২) দেশাত্মবোধক বিদ্রূপ নক্সা। লর্ড কার্জনের আমলে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্তিত হয়, তার প্রতিবাদে নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রমুখ আঠাশ জন কমিশনার পদত্যাগ করেন, একজন কমিশনার পদত্যাগ করেন নি—এই আঠাশ জনকে বাহবা দিয়ে রচিত হয় 'সাবাস আটাশ'। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর এটি স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। দুই অঙ্কের এই প্রহসনে দৃশ্যসংখ্যা মোট

১. The Story of the Calcutta Theatres/S.K.Mukherjee/P. 762

বারোটি (৫+৭)। এছাড়া সূচনা ও পরিশেষে 'পট পরিবর্তন' অংশ আছে। এগারোটি গান আছে এতে।

সাবাস বাঙালী ঃ সমসাময়িক বিষয় অবলম্বনে রচিত এই নাটিকাটির মধেও চিরন্তনত্বের দাবী বড় অল্প। অমৃতলাল 'সাবাস বাঙ্গালী' কে সামাজিক নক্‌সা বলে উল্লেখ করলেও এটি প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যমূলক রচনা। সম-সাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটি রচিত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সরকারী আদেশ কার্যকরী হলে দেশের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশি বর্জনের কর্মযজ্ঞ শুরু হয় পুরোদমে। অমৃতলাল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আহুত এই আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর এই নাটিকাটি প্রথম স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

খাসদখল

ভূমিকা ঃ অমৃতলাল বসুর অসাধারণ প্রাহসনিক প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত রয়েছে খাসদখল' নাটিকায় 'বাবু' 'কালাপানি' প্রভৃতি অসাধারণ প্রহসনগুলি সৃষ্টি করে 'নিতুই নব রঙ্গনাট্যের কলহাস্যে বাঙ্গলার একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মুখরিত প্রতিধ্বনিত"[১] করে হঠাৎ তিনি গোপনীয়তার আবডালে নিজেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন। প্রায় ছ'বৎসরের অন্তরাল-বাস ঘুচিয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অনুরোধে বাঙালি দর্শকের কাঙ্ক্ষিত রূপে দেখা দিলেন অমৃতলাল অমৃতের ভান্ড হাতে করে। সে অমৃত 'খাসদখল'। জনৈক সমালোচক বলেছেন "বাঙ্গালী যদি 'খাস-দখলের সমাদর না করে, তাহা হইলে বলিব, বাঙ্গালা দেশে রসিকতা ও রসের কথার কাল গিয়েছে।"[২]

প্রকাশ প্রকাশ ও প্রথম অভিনয় ঃ খাসদখল' নাটিকাটি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ এপ্রিল (১৩১৯ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাস) প্রকাশিত হয় কিন্তু এটি প্রথম অভিনীত হয় স্টার থিয়েটার ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মার্চ। ঐদিন সকালে তৎকালীন জনপ্রিয় সংবাদপত্র 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এই নাটিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন স্টার থিয়েটারের লেসী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ—

"First–Nighters Look-up please !
Babu Amrita Lal Bose's New Play at the
STAR THEATRE
Hony, Dramatic Director–Babu Amritalal Bose
Saturday the 30th March, 1912, at 8-30 P.M.
The Sparking Society-Comedy "KHAS-DAKHAL"
The Re-Entree."[৩]

১. নাট্যমন্দির/১৩১৮ বঙ্গাব্দ, চৈত্রসংখ্যা
২. নাট্যমন্দির/চৈত্রসংখ্যা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ
৩ Amrita Bazar Patrika/1912, 30th March

‘খাসদখল’ গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত হয়েছে ‘পরম ভাগবত স্বধামপ্রাপ্ত প্রভুপাদ বলাইচাঁদ গোস্বামী’র নামে। বলাবাহুল্য গ্রন্থটি খুবই জনসমাদর লাভ করেছিল। কেননা এর প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গ। মোহিতের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, নিতাই—অমৃতলাল বসু, ঠাকুরদা—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, মোক্ষদা—বসন্তকুমারী, গিরিবালার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সুশীলাবালা।

কাহিনী-সংক্ষেপ ঃ ‘খাসদখলে’র কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ। লোকেন একজন নামজাদা উকিল। নিতাই আর রমেশ তার দুই করিৎকর্মা সহযোগী। এরা সকলেই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। ব্রাহ্মসমাজের রীতিনীতি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গে ঠিক মেলে না। ব্রাহ্মেরা বাল্যবিবাহের বিরোধী, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। কিন্তু ব্রাহ্মদের অন্যান্য সমাজ-সংস্কার বিষয়ক চিন্তাধারা এ নাটিকায় কখনও কখনও এসে পড়লেও, মুখ্য অংশ দখল করেছে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ। নাটিকার শুরুতেই (পূর্বরঙ্গে) কলি, রতি, মুচিরাম ও তপস্বীরামের কথাবার্তা ও গীতে মোটামুটিভাবে এই নাটিকার কাহিনীর আভাস মেলে। লোকেন বিধবা বিবাহের সমর্থক। সে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় অনুরাগী। তাই পর্দানশীন নিজ স্ত্রী মোক্ষদার তুলসীতলার প্রতি শ্রদ্ধা ঘুচিয়েছে, ঘুচিয়েছে হিন্দু সংস্কার। কথাবার্তায় চোস্ত মক্ষিরাণী মোক্ষদা এখন ঘরের মানুষের চেয়ে বাইরই বেশি পছন্দ করে। তার পাশাপাশি যে ভ্রমরগুলি ভন্ ভন্ করে তাদের একটি হল মোহিত। মোহিতের পূর্ব পরিচয় রহস্যাবৃত। তার নিজের জবানবন্দী অনুসারে সে বাল্যবিবাহ করেছে পিতামাতার বাধ্য হতে গিয়ে বাসর রাত্রিতেই স্ত্রীর সঙ্গে শেষ দেখা। মোহিত কবি। ‘কোকিলার স্বয়ম্বর’ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। মোক্ষদাকে প্রথম দর্শনেই সে ভালোবেসে ফেলেছে। কবি মোহিত কেবলমাত্র একজনকে ভালোবেসে সন্তুষ্ট নয়। মোক্ষদার পার্শ্বচরী গিরিবালাকেও ভালোবেসেছে। ইতোমধ্যে লোকেনের অসুখ হয়েছে। ডাক্তার বদ্যি হাকিম বাদ বায় নি কেউই। সারা কোলকাতার ডাক্তার সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করে লোকেন সুস্থ হল। মোক্ষদা লোকেনের অসুস্থতার সংবাদে উপন্যাসের নায়িকার মত ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদল। লোকেনের সেবার কাজে সবাইকে তটস্থ করে দিয়ে নিজে আপশোষ করতে লাগল এই সময় সখী সম্মেলন করতে না পরার জন্য। লোকেন সুস্থ হতেই সমাজের নিয়ম অনুযায়ী তাকে আরও সুস্থ করার জন্য পাঠানো হল হাওয়াবদল করতে। মোহিত কিছু পরিমাণে হতাশ্বাস। কেননা সে ভেবেছিল লোকেন আর শয্যা ত্যাগ করে দাঁড়াতে পারবে না। অতএব তার বিষয়-আশায় সহ মক্ষিরাণী মোক্ষদা তারই হবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়ল তার। লোকেন সুস্থ হয়ে উঠে বায়ু পরিবর্তনে গেল পশ্চিমে। মোহিত ভীষণ মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, মোক্ষদারও নজর এড়ায় নিতা। সেদিন যখন মোক্ষদা তার বান্ধবীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে এমন সময় মোহিত সেখানে হাজির হল। কিছু পরেই আহ্লাদী নিয়ে এল মর্মান্তিক সংবাদ লোকেনকে বাঘে খেয়েছে। খবর শুনে চিরকাল রোগীসাজা মোক্ষদা থিয়েটারী ঢঙে মূর্ছা গেল—চেতনা ফেরার পর কবিতা আবৃত্তি করল মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। বান্ধবীরা গিরিবালাকে কাঁদতে নিষেধ করল। বলল সমাজ-সম্মতভাবে কালো শাড়ী পরে শোক পালন করতে। এ সংবাদে মোহিত এত উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে ‘যথাধর্ম স্তথা জয়’ বলে চীৎকার করে উঠেছিল। ঠাকুরদা লোকেনকে বার বার নিষেধ করেছিলেন স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার ও

বিধবাবিবাহ সমর্থন কাজে না যাওয়ার জন্য, কিন্তু লোকেন সে কথা মানে নি। চেতনা পেয়ে মোক্ষদা খুঁজছে মোহিতকে। অতঃপর আয়োজন হয়েছে মোক্ষদা-মোহিতের বিবাহের। রাশি রাশি টেলিগ্রাম শুভেচ্ছা এসেছে, অনেকে ব্যক্তিগতভাবে এসে মোহিত-মোক্ষদাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেছে। কিন্তু এই বিধবা বিবাহকে যারা সমর্থন করতে পারে নি, তাদের দলে আছে বাংলা সংবাদ পত্র, গিরিবালা ও নিতাই। ইতোমধ্যে উপস্থিতে হল সুরেশ। গিরিবালার মাসতুতো দেবর। এখানে জানা গেল গিরিবালার আসল নাম রাধা। বিবাহের পর তার স্বামী নন্দ তাকে পরিত্যাগ করে যায়। সুরেশই তার সতীত্ব রক্ষার জন্য ও জীবন কাটানোর জন্য তাকে মোক্ষদার কাছে রেখে গেছল। সুরেশ অনেক অনুসন্ধানে জেনেছে মোহিতই সেই নন্দ। রাধা ওরফে গিরিবালার বর সে। এদিকে বিয়ের আয়োজন চলছে জোর কদমে। বিবাহ বাসরে হঠাৎ আবির্ভাব ঘটল সন্ন্যাসীর বেশধারী লোকেনের। সবাই তাকে প্রথমে ভূত ভেবে ভয় পেয়ে যায়। কুসংস্কার ও ভূত প্রেতে বিশ্বাস করে না ব্রাহ্মরা; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কর্ণসমাজের কর্ণধারকে পর্যন্ত দেখা গেল ভূতের ভয়ে রাম নাম জপ করছেন। নিতাই প্রথম লোকেনকে মানুষ বলে স্বীকার করল। মোহিতের মহা সর্বনাশ হল। বিধবা বিবাহ করার একান্ত সাধ তার অপূর্ণ রইল। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো হাজির হল সুরেশ। সে মোহিতের প্রকৃত পরিচয় সবার কাছে জানাতে সবাই তাকে ধিক্কার দেয়। সুরেশ মোহিতের স্ত্রীকে নিয়ে আসে ঘোমটা ঢেকে। সবাই চায় মোহিতকে পুলিশে দিতে। কিন্তু তার স্ত্রীর অনুনয়ে সবাই নিরস্ত হয়। ঘোমটা খুলতে সবাই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল সে-ই নারী আর কেউ নয়—গিরিবালা। অতঃপর গিরিবালা-মোহিতের মিলন ও লোকেন-মোক্ষদার মিলনে কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

নামকরণ ঃ 'খাসদখল' নাটিকার নামকরণের পশ্চাতে রয়েছে এক স্থূল ইঙ্গিত। বেওয়ারিশ জমিকে বলে খাস জমি। সেই খাসজমির দখল নেয় দখলিদার। বিধবার উপর স্ত্রীর স্বত্ব আরোপকেও অমৃতলাল খাস জমির উপর দখলী স্বত্ব আরোপ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন নি। এই নাটকের নায়িকা মোক্ষদা স্বামী লোকেনের অনুপ্রেরণায় আজ মক্ষিরাণী। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী, স্ত্রীস্বাধীনতায় সোচ্চার, কাব্যপ্রেমী, বিধবা বিবাহের সমর্থক ও কে। বাল্যবান্ধবীর কাছে যখন সে শুনল তার বিধবা বিবাহের ঔৎসুক্যের কথা, সেও তখন এবিষয়ে আগ্রহী হল। কিন্তু বিধবা হলে তবে তো তার বিবাহ। লোকেন অসুস্থ হল গুরুতর, কিন্তু মোহিত ও কিছুটা পরিমাণে মোক্ষদাকে নিরাশ করে গিয়ে সুস্থও হয়ে উঠল। লোকেন গেল বায়ু পরিবর্তনে—সেখানে তাকে বাঘে খাবার খবর এসে পৌঁছাল সবার কাছে। সুতরাং মোক্ষদা বিধবা হল অর্থাৎ খাস হল। মোক্ষদার সম্মতিক্রমে কবি মোহিত এল তার দখল নিতে। কিন্তু খাস জমি দখলের জন্য যেমন চাই সরকারি ফরমান, বিধবা নারীকে জন্য তেমনি দরকার তার বৈধব্যের সার্টিফিকেট। বিধবাবিবাহের আয়োজন যখন সারা, তখন হঠাৎ লোকেন সশরীরে হাজির হয়ে বিধবা বিবাহে বাধ সাধল। মোহিতের দ্বারা মোক্ষদা দখল সম্ভব হল না। এই খাসদখলের প্রক্রিয়া সহজে নিষ্পন্ন হয় নি। সহস্র বিবুদ্ধ জটিলতা, উৎকণ্ঠা এবং উচ্ছ্বলিত হাস্যরসের আধারে দেখানো হয়েছে খাস দখল করতে চাওয়ার নির্মম পরিণতি। প্রধান দুটি পুরুষ চরিত্র লোকেন ও মোহিত—এই নাট্যের পরিণতিতে প্রথম জন প্রায় হারাতে-বসা স্ত্রীকে এবং দ্বিতীয় জন

ত্যাগ করা স্ত্রীকে ফিরে পেলে কমেডির মধ্যে নাটিকাটির উপসংহার ঘটেছে। সুতরাং এর নামকরণ সার্থক হয়েছে।

Satire-ধর্মিতা ঃ 'খাসদখল' প্রহসন শ্রেণীর রচনা। কিন্তু প্রথাসিদ্ধ প্রহসনের পথে এসে দাঁড়ায়নি এটি। প্রহসনের প্রথম এবং প্রধান লক্ষণগুলিতে 'খাসদখলে'র সঙ্গে অমৃতলালের অন্যান্য প্রহসনের বিশেষ কোনো অমিল নেই। বৈসাদৃশ্যের প্রথম স্তর এর রস প্রয়োগে। প্রহসনের হাস্যরস সাধারণত Humour-ধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অমৃতলালের মতো নাট্যকার কেবলমাত্র সামাজিক ত্রুটির চিত্রাঙ্কনেই আপন দায়িত্ব সমাধা করবেন—এ হতে পারে না। কেননা তাঁর প্রহসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজশোধন—তাঁর পূর্ববর্তী প্রহসনে। 'তরুবালা' প্রহসন অভিনীত হলে তৎকালীন অনেক বিপথগামী যুবক কিছু পরিমাণে সঠিক পথের দিগ্‌দর্শন পেয়েছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের মতো তিনি তাই ব্যঙ্গের চাবুক হাতে তুলে নিয়েছিলেন সমাজশোধনের উদ্দেশ্যে John Dryden এক জায়গায় satire-জাতীয়-রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন,—

Satire has always shown among the rest,
And is the boldest way, if not the best.
To tell men freely of their foulest fault.
To laugh at their vain deeds ad vainer thought.

সেদিক থেকে অমৃতলাল 'খাসদখলে' যথার্থ Satirst-এর স্বাক্ষর রেখেছেন। কারণ এই রচনার বিদ্রুপাত্মক বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি মানুষের ভান, ভন্ডামি, কথা ও কর্মের অসঙ্গতিকে প্রকাশ করে ভন্ডের শাস্তি বিধান ও উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছেন।

উদ্দেশ্যমূলকতা ঃ 'খাসদখল' উদ্দেশ্যমূলক নাটিকা। উদ্দেশ্যমূলকথা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রহসনকে নষ্ট করে দেয়। কিন্তু 'খাসদখল' উদ্দেশ্যমূলক রচনা এটি এর শৈল্পিক কাঠামোর জন্য, সরস উপস্থাপন ভঙ্গীতে এবং Satire-এর তীক্ষ্নতায় সার্থক প্রহসন হয়ে উঠেছে। 'খাসদখল' নাটক রচনার রসরাজ অমৃতলালের কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য লক্ষিত হয়, প্রসঙ্গক্রমে সেগুলি উল্লেখ করা যায়—(১) ব্রাহ্ম-সমাজ ও নব্যহিন্দু সমাজের সমাজ সংস্কার বিষয়ে ছদ্ম-উৎসাহের মুখোস উন্মোচন (২) অল্পশিক্ষিত বখাটে যুবকদের অতিরিক্ত কাব্যপ্রীতি। 'খাসদখলে'র সমগ্র কাহিনী বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি আমরা এই দুটির সঙ্গে সম্পৃক্ত অসংখ্য প্রশাখা উদ্দেশ্য লক্ষ্য করব।

সমাজ সংস্কার ঃ প্রথমে সমাজ সংস্কারের কথাই ধরা যাক। 'খাসদখলে' সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে যে ক'টি দিকে laughing mirror এর ছায়া ফেলা হয়েছে সেগুলি সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে—(১) স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার ফল ফ্রি-লাভ (free love)। বাঙালি গৃহবধূ মোক্ষদার ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ ঘরানায় অভ্যস্ত হয়ে মক্ষিরাণী হয়ে ওঠা— স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতার অপ-দৃষ্টান্ত। অশিক্ষিত বলে এই নাটিকায় কবি মোহিত বিবাহের রাত্রিতে তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করছে। স্ত্রীস্বাধীনতার পরম পরাকাষ্ঠা ফ্রি-লাভে। এ কথার প্রমাণ দেবার জন্যই মহালক্ষ্মী, লাবণ্য প্রভৃতি চরিত্রের আমদানী। (২) কাব্যবিলাস—কাব্যপ্রীতির দিকটা নারী এবং পুরুষ উভয় দিক থেকে মোক্ষদা এবং মোহিতের চরিত্রে দেখানো হয়েছে হাস্যকরভঙ্গিতে। (৩) দেশোদ্ধার—ভারত মাতার দুঃখমোচনের নাম করে যারা দু'পয়সা

কামাই করতে উৎসুক অমৃতলালের ব্যঙ্গের চাবুক পড়েছে তাদের পিঠে। (৪) বিধবাবিবাহ—বিধবাবিবাহ আন্দোলনের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিজের বাড়িতে কারও বিধবাবিবাহ আন্দোলনের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে কারও বিধবাবিবাহ দিতে নারাজ। এ বক্তব্যকে পরিস্ফুটের জন্য নাট্যকের অঙ্কন করেছেন রামকমলবাবুর চরিত্র, যিনি নিজ বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে চান না—অথচ বিধবাবিবাহের সমর্থক ও প্রচারক। আবার উকিল লোকেন বিধবাবিবাহের সমর্থন করে কিন্তু তার মৃত্যু সংবাদ রটে গেলে তার স্ত্রী যখন বিধবাবিবাহ করতে চায় তখন সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। (৫) হিন্দু দেবদেবী প্রসঙ্গ—ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নরনারীই এ নাটিকার প্রধান চরিত্রগুলি। সুতরাং মুখে কুসংস্কারজয়ী, পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাসী এসব কথা ঘোষণা করলেও তারা যে কতখানি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কতখানি পৌত্তলিক রয়ে গেছে অমৃতলাল তাই সুকৌশলে দেখিয়েছেন। 'is the' খ্যাত নিতাই চরিত্র ছদ্ম দেববিদ্বেষী। সে অন্যের সামনে শীতলা মাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে 'মা ইজ দি। ঠাকুর?—পুতুল?" কিন্তু পথিক চলে যাবার পর তার ভীত সন্ত্রস্ত রূপটি বেরিয়ে পড়ে "তোমাকে ইজ দি আমি ভয়ঙ্কর ভয় করি।" ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বিবাহ দৃশ্যে, ভুতের ভয় ব্রাহ্মদের করতে নেই। কিন্তু যে লোকেনের মৃত্যুর কথা সবাই জানে, তাকে বিবাহ সভায় সন্ন্যাসীর বেশে দেখে সবাই তাকে ভুত বলেই ধরে নেয়, এমন কি রাজর্ষি মনোমোহন মাইতি-ও। যে রাম নাম ব্রাহ্মসমাজে অচ্ছ্যুজাত, সেই রাম নাম করে ভুতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেষ্টা করে ব্রাহ্মরা। মনোমোহন অনুরোধ করে তাকে সবাই যেন ঘিরে রাখে। কথায় এবং কাজে, বিশ্বাসে এবং আচার-আচরণে বাক্ সর্বস্ব নেতাদের যে অসঙ্গতি—তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মাধ্যমে সে কথাই ফুটিয়ে তুলেছেন অমৃতলাল।

কল্প ব্যাধি ও শোষক ডাক্তার ঃ ব্রাহ্মসমাজ ও ছদ্ম-প্রগতিশীল হিন্দুসমাজের কার্যধারার এবং বাগ্‌বিন্যাগের তফাত দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন অমৃতলাল। এই সমাজের মধ্যে রয়েছে ডাক্তার। 'খাসদখলে'র মূল কাহিনী ধারার মধ্যে এই ডাক্তারদের ভূমিকা গৌণ নয়। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ডাক্তারদের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার অমৃতলাল এক ঢিলে দু'পাখি মেরেছেন। একদিকে তিনি দেখিয়েছে ডাক্তার সমাজের অমানবিক শোষণস্পৃহা ও অপদার্থতা, অন্যদিকে দেখিয়েছেন বিত্তশালী লোকেদের বাড়ির পুরুষ ও নারীর রোগ বাতিকগ্রস্ততা। ফরাসি নাট্যকার মলেয়ারের 'L Amur Medecin or 'Love is the best doctor' এ রয়েছে চার-পাঁচজন ডাক্তারের কথোপকথন। এই আলোচনায় রোগ এবং রোগিনীদের সম্পর্কে তাঁদের উৎকণ্ঠার চেয়ে নিজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক চিন্তাই প্রাধান্য পেয়েছে। মলেয়ারের আর একটি কৌতুকনাট্য 'The Emaginary invalied–এও রয়েছে কাল্পনিক ব্যাধির কথা। নাটিকার মধ্যে রয়েছে দুটি পূর্বরঙ্গ বা prologue। মূল নাটক আরম্ভ হবার আগেই দেখা যায় ডাক্তারদের উদ্দেশ্য করে বিদ্রূপাত্মক উক্তি,—

"Vain and foolish doctors you
Have no balm can cure my ills."

'খাসদখল' নাটকের মধ্যেও রয়েছে এই কাল্পনিক ব্যাধির কথা। এই প্রহসনের নায়িকা

মোক্ষদার অসুখ কল্প-অসুখ। সামান্য সর্দিজ্বরে সে কাহিল হয়ে পড়ে, সাধারণ মাথাব্যথায় সে শয্যাশায়ী হয়ে থাকে। গ্রামীণ সংস্কারবশত গিরিবালা মোক্ষদার সামান্য মাথাব্যথায় উৎকণ্ঠিত হতে পারে না বলে মোক্ষদা ক্ষুণ্ণ হয়। তাই মোক্ষদার সামান্য কিছু হলেই গিরিবালাকে বলতে হয় 'তোমার বড্ড শক্ত ব্যারাম, ওগো কি হবে?'' মোক্ষদা স্বামীর কাছে প্রশ্রয় পাবার আশায় যখন জানায় তার মৃত্যুকাল আসন্ন তখন স্বামী লোকেন বলে 'সামান্য সর্দ্দিতে কি অত ভাবতে আছে?'' কিন্তু সর্দ্দিকে সামান্য বলে উড়িয়ে দিতে মোক্ষদা নারাজ। সে জানায় থাইসিসের প্রথম পদপাত সর্দ্দি। কারণ 'সর্দ্দি থেকেই তো ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস থেকেই তো নিউমোনিয়া, নিউমোনিয়া থেকেই তো থাইসিস।'' অতঃপর সে 'থাইসিস' রোগ নিয়ে মারা যাবার জন্য সে আনন্দ প্রকাশ করে। দেশীয় ডাক্তারদের প্রতি মোক্ষদার রয়েছে দারুণ অবজ্ঞা। কিন্তু যদি বিলাত ফেরত হয়—চলতে পারে। বিলাত ফেরত ডাক্তার মিত্তির মোক্ষদাকে দেখে তার অসুখকে সামান্য বলায় মোক্ষদা ক্ষুণ্ণ হয়। বিলাত ফেরত ডাক্তার বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং স্টকিং পরে রোগী দেখতে আসে না—এই অজুহাতে সে ডাক্তারের ষোল টাকা ভিজিট থেকে দু'টাকা কমিয়ে দেবার জন্য স্বামীকে পরামর্শ দেয়। মোক্ষদার চরিত্রের মাধ্যমে রোগ বাতিকের চূড়ান্ত ব্যাপার দেখানো হয়েছে—যখন দেখি, থার্মোমিটারে জ্বরের তাপ বেশি না ওঠায় তাকে সে আভিজাত্যহীনতা বলে মনে করেছে। আভিজাত্যাভিমানেই লোকেনের অসুস্থতার সময় কোলকাতার সব রকমের নামী দামী ডাক্তারকে ডাকা হয়েছে। লোকেনের বৈঠকখানায় বসে তিন জন ডাক্তার ডা. ব্যানার্জী, ড. পাকড়াশী, ড. গুণধর ঘোষ এবং বিখ্যাত কবিরাজ আনন্দ কবিরাজ পরস্পরের চিকিৎসা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা বলেন। শোষণস্পৃহা এদের কারও কম নেই। ব্যানার্জী নতুন গাড়ি কিনেছেন নিজের ফি বাড়াবার জন্যে। কোলকাতার মানুষদের ভ্রান্ত মানসিকতা এবং ডাক্তারদের শোষণকারী মনোভাবের চিত্রায়ন সুসম্পূর্ণ হয়েছে, যখন ডাক্তার ব্যানার্জী বলেন যে সাধারণ মানুষ এখন ডাক্তারের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে তার ফিতে। তিনি যখন চার টাকা ভিজিট নিতেন তখন তাঁর যা রোগী ছিল ষোল টাকা ভিজিট করায় এখন তাঁর রোগী দু'গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ঘটনার অন্তরালে রয়েছে। সাধারণ মানুষের বড়োলোকী মানসিকতা—''এখন দু'টাকা চার টাকার ডাক্তার দেখলে বাবুরা বলেন যে ব্যাটার কিছু হয় না তাই কমে আসে।'' কারণ আর একজনের মতে ''কল্‌কাতায় আর গেরস্ত নেই, সবাই ল্যাংচাচ্চে; পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরাণীরও আশা যে বাইরের চাল-চলনে রাজা মহারাজাদের সঙ্গে টক্কর দেয়।'' ডাক্তারেরা জানায় বড়োলোকদের কয়েকটি বিশেষ বাতিকের কথা—(১) বড়লোকদের যে কোন রোগকেই ভয়ঙ্কর রোগ বলতে হবে। (২) ভিজিটের অঙ্ক ক্রমাগত বাড়াতে হবে। (৩) রোগ নিরাময় হয়ে গেলেও তা সেরে গেছে বলা চলবে না। কারণ কারও ওষুধে যদি দ্রুত কোন্ বড়লোক সুস্থ হয়ে যায় তবে সে ডাক্তার পরের বার কাল্ পাবে না। ডা. মিত্তিরের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে।

তিন ডাক্তার এবং আনন্দ কবিরাজের কথোপকথনে ডাক্তার বিভ্রাটের চিত্রটিও সুপরিস্ফুট। অশিক্ষিত ডাক্তারদের চিকিৎসা করার বিচিত্র কথাও এখানে সুকৌশলে জানানো হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারদের শোষণস্পৃহা, তাদের অমানবিকতা ও প্রাচুর্যের পাশাপাশি সনাতন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে চলেছেন যে কবিরাজ সম্প্রদায় তাদের দুঃস্থতা ও অসহায়তার কথাও

চিত্রিত। হাস্যরসের তুমুল উতরোল, satire-এর তীব্র চাবুকের পরই হঠাৎ যখন কবিরাজ বলে ওঠেন—

> "আবার এহান হ'তে আমায় একবার মাথা ঘষার গলিতে যাইতে হইব, কতকগুলো তৈলের মশলা আবশ্যিক, দুর্গন্ধ ব'লে মহামাষাদি তৈল আর কেহ ব্যবহার করতে চান না, কাজেই সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করি। হায় হায় আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন কল্লাম—শেষ তৈলকার হইলাম। কি করি, বহু পরিবার, ছাত্র ও অনেকগুলি বাসায় আহার করে।"

তখন যেন এক অপঠিত পৃষ্ঠায় পাতা উল্টানো হয়ে যায় অজন্তেই। বেদনার তীব্রতায় বোবা হয়ে যায় হৃদয়। হাস্যোচ্ছ্বল পরিবেশকে মুহূর্তের জন্য যেন বিষাদের বোবা মূর্তি আড়াল করে দাঁড়ায়।

তরুবালা ও খাসদখলের সাদৃশ্য ঃ অমৃতলাল রচিত 'তরুবালা' (১৮৯০) নাটকের সঙ্গে 'খাসদখল' নাটকের কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। সাদৃশ্য লক্ষিত 'বৌ-মা' (১৮৯৬) প্রহসনের বৌমা চরিত্রের সঙ্গেও। 'তরুবালা' নাটকে রয়েছে অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ রোমান্স-প্রিয় যুবক অখিলের কথা। কল্পনাবিলাসী কাব্য-প্রিয় বাস্তববোধহীন অখিল তার পতিব্রতা স্ত্রী তরুবালাকে উপেক্ষা করে 'পবিত্র প্রণয়'-এর ঐকান্তিক অভীপ্সায় পারুল নামে এক পতিতার সান্নিধ্য চেয়েছিল। নাটকের শেষ পর্বে নাট্যকার অখিলের যথোচিত দাওয়াই-এর ব্যবস্থা করে তাকে সুস্থ করে তুলেছেন। 'খাসদখলে'র মোহিত চরিত্রটি অখিল-এর আদলেই গঠিত। মোহিত তার বিবাহিত পত্নীকে অশিক্ষার অজুহাতে পরিত্যাগ করে যায় বিবাহের রাত্রেই। মোক্ষদার চমক চটক এবং কাব্যপ্রাণতা তার অন্তরকে নাকি গভীরভাবে নাড়া দেয়। মোক্ষদাকে বিবাহ করার আকাঙ্ক্ষা তার তীব্র হয়। লোকেনের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে মোক্ষদাকে বিধবাবিবাহ করতে উৎসুক মোহিত আবার গিরিবালার প্রতিও তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। গিরিবালার প্রকৃত পরিচয় না জেনে, তার প্রতি দুর্বলতাবশত তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর প্রতি রূঢ় ও পরুষ বাক্য প্রয়োগ করে। পরিশেষে বিধবাবিবাহের দিন উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে মোহিত তার স্ত্রীর প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

'তরুবালা' নাটিকাতে অমৃতলাল প্রসঙ্গক্রমে বেণী ও শান্তের উপকাহিনীর মারফতে বিধবাবিবাহের কথা ব্যক্ত করে এর অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন। 'খাসদখলেও দেখা যাচ্ছে বিধবাবিবাহ ব্যাপারটা একটা হাস্যকর পর্যায়ে পর্যবসিত। প্রথমত, বিধবাবিবাহের সমর্থক বা প্রচারকেরা তাদের সমর্থন জানিয়েছেন কেবল অন্যের ক্ষেত্রে, নিজের ঘরে সে সমর্থন তাদের থাকে না। এটা যেন তাদের 'কাছারীর পোষাক।' দ্বিতীয়ত, বিধবাবিবাহের পশ্চাতে থাকে কিছু প্রাপ্তিযোগ, নিতাই-এর উক্তিতে তা অভিব্যক্ত "Not is the বিধবা-বিয়ে, বট্ বিয়ে is the iron chest লোহর সিন্দুক। কোম্পানির কাগজের সঙ্গে ইজ দি বিয়ে, গাড়ি ঘোড়া ফেটিংয়ের সঙ্গে ইজ দি বিয়ে!' তৃতীয়ত, বিধবাবিবাহ প্রচলনের হাস্যকর দিক। রাজর্ষি মাইতি লোকেনকে সশরীরে বিবাহ সভায় উপস্থিত দেখে জানায় তার মরাই উচিত ছিল, তাহলে অন্তত বিবাহ কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হত। এই যে ভেকসর্বস্ব প্রথা রক্ষার দায় ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত—বিধবাবিবাহের নগ্নরূপকে তা প্রকাশিত করেছে। সর্বোপরি

বিধবাবিবাহ করতে গিয়ে রাতারাতি বিখ্যাত ও সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে উঠেছে মোহিত, কিন্তু বিবাহসভায় লোকেনের উপস্থিতি, সুরেশ মোহিতের প্রকৃত পরিচয় ফাঁস করে দেওয়ায় তার যে লাঞ্ছনা এবং যে স্ত্রীকে একদিন সে অশিক্ষিত বলে ত্যাগ করেছিল তার জন্যেই পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া প্রভৃতি ঘটনায় নাট্যকার 'তরুবালা'র চেয়ে এই প্রহসনের বক্তব্যে অনেকটা এগিয়ে এসেছেন।

বৌ-মা ও খাসদখল : মলেয়ারের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন অমৃতলাল বসু। এই ফরাসী নাট্যকারের 'The Romantic Ladies' প্রহসনে তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে কাব্যপ্রাণ, বাস্তববিমুখ মহিলাদের। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত অমৃতলালের 'বৌ-মা' প্রহসনে নভেল-পাগল গৃহবধূ কিশোরী নিজেকে কাব্য-উপন্যাসের নায়িকা ভেবে এক স্বকপোলকল্পিত জগতে বাস করেছে। 'খাসদখলে'র মোক্ষদা চরিত্রের মূল সম্ভবত এই চরিত্রটিতেই রয়েছে। মোক্ষদা কল্পনাপ্রবণ, কবিতাপ্রিয়, ভাবাবেগসর্বস্ব গৃহবধূ। স্বামীর অসুস্থতার সময় সে কবিতা বলে, স্বামীর মৃত্যুর সংবাদে সে বিরহিণী নায়িকার মতো গান করে, কবিতা বলে। মোক্ষদার এই অবাস্তব স্বপ্নবিলাসকে বাস্তবের তীব্র ধাক্কায় খান্ খান করে দিয়ে নাট্যকার প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর চরিত্রদের সাবধান করতে চেয়েছেন। মোক্ষদা চরিত্র অঙ্কনে ঠাকুরবাড়ীর মহিয়সী মহিলাদের প্রচ্ছন্ন ছাপ দুর্লক্ষ্য নয়। পত্রিকা সম্পাদকের কাছে কবিতা পাঠানো নিয়ে মোক্ষদার কথাবার্তায় স্বর্ণকুমারী দেবীর এবং সখীমেলা বিষয়ক কথাবার্তায় সরলা দেবী চৌধুরাণীর কার্যধারার ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

গঠনকৌশল : পূর্বরঙ্গ : 'খাসদখল' প্রহসনটির গঠনকৌশলে নাট্যকার অমৃতলালের কৃতিত্বের স্বাক্ষর মুদ্রিত। 'পূর্বরঙ্গ' দিয়ে নাটিকার সূত্রপাত। প্রকৃতপক্ষে এটি নাটকের প্রস্তাবনা অংশ। এই অংশের কাহিনীতে রয়েছে কিছু চমৎকারিত্ব এবং সমগ্র নাটিকার মূল সুরের সংযোজন—এটা এমনভাবে করা হয়েছে এরপর যাতে নাট্যকারকে নাটক শুরু করার জন্য কোনো অসুবিধায় পড়তে না হয়। পূর্বরঙ্গে নাট্যকার 'কলির প্রধান স্থান কলিকাতায়' শিক্ষিত সমাজের অধোগামিতা, রুচিহীনতা ও নষ্টামির এক স্পষ্ট চিত্র এঁকেছেন। নাটকের সঙ্গে সম্পর্কহীন পূর্বরঙ্গের চরিত্রগুলির বক্তব্য কিন্তু সমাজসমস্যা বিষয়ক প্রহসন 'খাসদখলে'র মূল বক্তব্যের পরিপোষক। এ অংশে কলি যুগের অবক্ষয়কে ফুটিয়ে তুলেছে কলি-কামিনীদের গান। অতঃপর কলির প্রবেশ এবং কোলকাতার বিখ্যাত স্থানসমূহের পরিচয় প্রদান। পূর্বরঙ্গের এই অংশ যোজনায় অমৃতলাল সম্ভবত দীনবন্ধুর 'সুরধুনী' কাব্যের 'কলিকাতা বর্ণনা'র দ্বারা প্রভাবিত। তবে মলেয়ার-ভক্ত অমৃতলালের রচনায় এই পূর্বরঙ্গের উপস্থাপনায় মলেয়ারের প্রহসনের prologue অংশের প্রজন্মের কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরের সময়কাল 'খাসদখল' নাটিকায় বিধৃত। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাঙালির মেরুদন্ডকে আঘাত করে গিয়েছিল। ফলে দেশপ্রেমিক বাঙালিরা জেগে উঠেছিল। কিন্তু এর সাথে যুক্ত হয়েছিল বাঙালির হুজুগপ্রিয়তা। বাস্তববাদী নাট্যকার এই হুজুগকে আক্রমণ করেছেন স্পষ্ট ভাষায়। পূর্বরঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন মুচিরাম আর তপস্বীরাম নামে দুই হুজুগপ্রিয় বাঙালি যুবককে। এরা বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় দুঃখ পেয়েছে। তপস্বীরামের কণ্ঠে এই দুঃখী পাবার কারণ জেনে এই ভন্ড দেশপ্রেমিকদের প্রতি আমাদের মন ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তপস্বীরাম বলে—

"বলি মুচিরাম পার্টিশান তো গেল এখন এজিটেশান করব কি নিয়ে? নাম কেনার ধুমধাম তো চুলায় যাক্ আহার চলবে কি করে?"

শুধু অমৃতলালেরই এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়নি—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ সাহিত্যিকেরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কবি নজরুলও অনুভব করেছেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ফাঁক ও ফাঁকিকে। এই দুই ভন্ডযুবকের ভন্ডামি আরও প্রকট হয় যখন মুচিরাম হতাশভাবে জানায় সে ভলেন্টিয়ার হয়ে ত্রিপলীতে চলে যাবে এই হতভাগ্য দেশ ছেড়ে তপস্বীরাম কাশীবাস করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে বিলেতে গিয়ে। এই সময়ে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছেন কলিরাজ। তিনি এই যুবকদের জানালেন—এইরকম

"আর গুটি চার পাঁচ লোক আমার চাই। আমি তোমাদের এক একটি দেহের মধ্যে সশরীরে প্রবেশ সশরীরে প্রবেশ করে কার্য করব। কোন দেহে ধর্মসংস্কার, কোন দেহে সমাজ-সংস্কার, কোনো দেহে দেশোদ্ধার, বিদ্যাবিস্তার, গ্রন্থপ্রচার, ঔষধ আবিষ্কার এই রকম এক এক দেহে এক একটি লীলা করব।"

এরপর দুই যুবক অন্তর্হিত হল, এলেন, মদন-বিলাসিনী রতি। তিনি কলিরাজকে সহায়তা করতে চাইলেন। কেননা তাঁর বিশ্বাস তাঁর স্বামীকে পার্বতীনাথ অনঙ্গ করলেও তাঁর প্রভাব যে মানুষের মনে এখন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, তা তিনি এখন দেখাতে চান। এই অংশে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 'মদন ভস্মের পরে' কবিতার কাহিনী অনুসরণ ঘটেছে। (পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছে একি সন্ন্যাসী/বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে'।)

পূর্বরঙ্গ পরিকল্পনার পশ্চাতে কয়েকটি বিশেষ কারণ নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, পূর্বোল্লিখিত মলেয়ারের প্রভাব। দ্বিতীয়ত, তৎকালীন যুগে সংস্কৃত নাটক ও এদেশী যাত্রার অনুসরণে নাটক শুরুর আগে নাটকের সারকথা পূর্বরঙ্গ বা মূকাভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক সাধারণকে জানিয়ে দেবার বিশেষ রীতি প্রচলিত ছিল। তৃতীয়ত, দর্শকের রুচি ও চাহিদার যথার্থ খোঁজটি রাখতেন সেকালের অসাধারণ নট, নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক অমৃতলাল। তিনি জানতেন ঠাকুর-দেবতা প্রভৃতিকে নিয়ে রঙ্গরস করার যে পথ কবিবর ভারতচন্দ্র প্রশস্ত করে গিয়েছেন (শিবের গায়ে ধুলো দিয়ে) সেই পথে চললে দর্শক ও পাঠক বড়ো আনন্দিত হবে। আর একথাও জানতেন দর্শকের আনন্দেই নাট্য-সফলতা। তাই সামাজিক নাটক দেখতে এসে নাট্যপট উন্মোচনের পর দর্শকেরা যখন ধড়াচূড়া পরিহিত জাঁকজমক পোষাকে কলিযুগের রাজা কলিরাজকে দেখতে পান, তখন স্বভাবতই তাঁরা যথেষ্ট কৌতূহলী হয়ে ওঠেন মূল নাটকের প্রতি। চতুর্থত, কলিরাজ, রতি ও মুচিরাম তপস্বীরামের গান ও কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এই নাটকের মূলকথার উপস্থাপন ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

অঙ্ক গঠনশৈলী : কয়েকটি সংক্ষিপ্ততম দৃশ্য নিয়ে 'খাসদখল' নাটকের তিন অঙ্কে মোট তেরটি দৃশ্য রয়েছে। প্রথম অঙ্কে চারটি, দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি, তৃতীয় চারটি—নাটকে দৃশ্যসজ্জ্য এইরূপ। এই দৃশ্যগুলিতে কোলকাতার শিক্ষিত ও ব্রাহ্মসমাজের বিচিত্র চালচলন, কথা কাজের ফারাক দেখানোর চেষ্টা করেছেন সমাজসচেতন নাট্যকার অমৃতলাল। নাটকে অন্যান্য প্রসঙ্গ থাকলেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল—যারা বিধবাহিবাহের বিরোধিতা দেখলে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে তারা নিজের বাড়িতে কিন্তু এই বিবাহে সমর্থন করতে পারে না। তিন অঙ্কের তেরটি দৃশ্যে মোহিত-লোকেনের কথা-কর্মে স্ববিরোধিতা, লোকেনের

বিধবাবিবাহকে সমর্থন, তার মৃত্যু সংবাদে যখন স্বামীর অভীপ্সা চরিতার্থ করার ইচ্ছায় মোক্ষদা বিধবাবিবাহে রাজী হয়, তখন পুনরায় প্রত্যাগত লোকেন বিস্ময়ের সঙ্গে বলে—

> "সে বলে—সে কি! মোক্ষদা কি আবার বিবাহ কত্তে যাচ্ছিল নাকি! আমার বাড়িতে আজ কি বিবাহ সভা? আমার স্ত্রীর বিবাহ?"

বিদ্যাসাগরের দ্বারা প্রচলিত বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকদের সমর্থনের অন্তঃসারশূন্যতা শেষ পর্যন্ত এই প্রথাকে কতখানি হাস্যকর করে তুলেছিল তারই এক চিত্র এঁকেছেন নাট্যকার অমৃতলাল। পূর্বরঙ্গে কলির উক্তিতে নাট্যকার তাই কলেজ স্কোয়ার-এর পাশে দন্ডায়মান বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচু দেখে মন্তব্য করেছেন—

> "ও বিদ্যাসাগর ঠাকুর, তুমি এখানে? কি কর্তা, আমার কেরামতি দেখে একেবারে পাথর বনে গেছে দেখছি যে....নাও, মানুষ হয়ে দান করেছিলে; এখন পাষাণ হয়ে কাকের বিশ্রাম স্থান হয়েছে।"

মোহিতকে চরম আঘাত দেবার জন্য টেলিগ্রাম ও অভিনন্দনবার্তা প্রভৃতি পাঠিয়ে এক রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোহিত ঃ মোহিত চরিত্রটি 'খাসদখলে'র একটি প্রধান চরিত্র। কবি ও প্রেমিক এই চরিত্রটির পূর্বসূত্র আমরা পেতে পারি 'তরুবালা' নাটিকায় অখিল চরিত্রে। নিজ পত্নীর সঙ্গে 'যথার্থ প্রণয়' সম্ভব নয় ভেবে অখিল তার পত্নী তরুবালাকে অবহেলা করে বেশ্যার সঙ্গে প্রণয় করতে গিয়েছিল। 'খাসদখলে'র মোহিত ও অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে কুসংস্কারপূর্ণ মেয়ে তার নব বিবাহিত বধূকে পরিত্যাগ, করে শহুরে কাব্যপ্রাণা বিবাহিতা রমণী মোক্ষদার সঙ্গে 'কবি প্রণয়' করতে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'ললিত গীত কলিত কল্লোলে' ভাবকে মোটেই সমর্থন জানাতে পারতেন না অমৃতলাল। ক্লাসিক স্বভাব অমৃতলাল ভাববিলাস, দেহতীত প্রেমসাধনা, অপার কাব্যপ্রণয় প্রভৃতি রাবীন্দ্রিক ভাবসমূহকে তাই আক্রমণ করেছেন মোহিতের কাব্যচর্চার মাধ্যমে। মোহিত এক ধরনের টাইপ, চরিত্র, বিধবাবিবাহের নাম করে যে তা ভাগ্য ফেরাতে চায়। কিন্তু কাব্যপ্রিয় ধনবান লোকেনের পত্নী মোক্ষদার আকর্ষণে তার পাশে এসে সে দেখে তাদের বাড়িতে আশ্রিতা গিরিবালাকে। গিরিবালার প্রতি মোহিতের এই আকর্ষণ জানিয়ে অমৃতলাল জন্মান্তরীণ সংস্কারকেই বড়ো করে দেখাতে চেয়েছেন। যেন পূর্ব থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন মোক্ষদার প্রতি মোহিতের আকর্ষণ যতই থাক গিরিবালাকেই সে নিজের করে পাবে। কারণ গিরিবালাকে দেখে তার মনে হয়েছে সে 'রূপবতী বটে, চোখে মুখে একটু কবিতাও আছে।' সে মনে মনে তুলনা করেছে মোক্ষদা ও গিরিবালার সৌন্দর্যের,—

> "মোক্ষদা দেবীর সৌন্দর্য্য অতি বিচিত্র, বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বলতে গেলে আমি তাঁকে দু'বার একরকম দেখলুম না। গিরিবালা লক্ষ্মণ পোদ্দারের দোকানের গিণিসোনার চিক আর মোক্ষদা দেবী হ্যামিলটনের বাড়ীর নেকলেস্ —সোনা মরা হলেও কারিকুরির বানি সোনার দামের চেয়েও বেশি।"

কিন্তু সেই মোহিত অনিবার্যভাবে মোক্ষদার প্রতি আকর্ষিত হয়েছে। লোকেন অসুস্থ হলে সে কায়মনোবাক্যে তার মৃত্যু চেয়েছে। লোকেন সুস্থ হয়ে ওঠায় তাই সে খুশি হতে পারে নি। চেঞ্জ গিয়ে লোকেনকে বাঘে খাওয়ার সংবাদ মোহিতকে তাই আনন্দে

উন্মাদ করে তুলেছে। তার সেই উন্মত্ততায় তার বন্ধুবান্ধব বিস্মিত হয়েছে। অতঃপর মোক্ষদার সঙ্গে তার বিবাহের সব প্রস্তুতি শেষ।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে মোহিত মোক্ষদাকেই চেয়েছ তা রূপ, বিদ্যা, কবিত্ব ও ঐশ্বর্যের জন্য। ঠিক সেই মুহূর্তে গিরিবালার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সে ভেবেছে "আমার এই কাঙাল মনকে রাজা কত্তে পারে একমাত্র সেই কাঙালিনী গিরিবালা।" বিধবাবিবাহ করতে গিয়েই যে কবি মোহিত রাতারাতি বিখ্যাতি অর্জন করেছে, সে কথা সে নিজে ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে। টেলিগ্রাম ও অভিনন্দন বার্তা পেয়ে মোহিত খুশি। কিন্তু গিরিবালার বিষয়ে তার আগ্রহ বিন্দুমাত্র কমে নি। কেননা নিত্য নূতন নারীসঙ্গের বাসনায় লুব্ধ কবি মোহিতের চরিত্রের এক দুর্বল দিক এ ঘটনায় ব্যক্ত। তাই মোক্ষদা যখন জানায় সুরেশ শীঘ্রই গিরিবালাকে তার বাড়ী থেকে নিয়ে চলে যাবে তখন মোহিতের বিস্ময় লক্ষ্য করার মতো। লুব্ধ একা-খাওয়ার পক্ষপাতী বালকের মতো তার আচরণ।

অতঃপর লোকেনের আবির্ভাব এবং লোকেন মোক্ষদার পুনর্মিলন। এই সময় আবির্ভূত হল সুরেশ। সে মোহিতকে পত্নীত্যাগী নিরুদ্দিষ্ট নন্দলাল বলে অভিযুক্ত করে তাকে বিভ্রান্ত ও হতচকিত করে তুলল। সুরেশ বিমূঢ় দর্শককুলের কাছে নিন্দিত মোহিতের অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রী রাধাকে উপস্থিত করল অতঃপর। রমেশ যখন মোহিতকে পুলিশের হাতে দেবার উপক্রম করল তখন অনুতপ্ত মোহিতকে রক্ষা করল তার অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রী রাধা ওরফে গিরিবালা। রাধাকে গিরিবালারূপে পেয়ে হতাশ প্রণয়ী মোহিত অভিভূত হয়ে পড়ল। মোহিতের ব্যাকুলতা, কাতরতা এবং অনুতাপ পর্ব তাকে সমুন্নত করেছে, নবজীবনের যোগ্য করে তুলেছে।

লোকেন : লোকেন বৃত্তিতে উকিল। মানসিকতার দিক থেকে নীচতা নেই তার। অর্থলিপ্সায় কাতর নয় সে। তার চরিত্রের সে দিকটিতে আলোকপাত করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল সেটি হল—তার কথা এবং কাজের পার্থক্য। আসলে হজরৎ মহম্মদের মতো নিজে করে তবে অপরকে করতে বলার কোনো মানসিকতা তার মধ্যে ছিল না। নিজেকেও সে হঠাৎ নিজের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়াতে হতে পারে এমন কোনো আশঙ্কা সে কোনকালে অন্তরে পোষণ করে নি।

লোকেন চরিত্রটির অনেকাংশই তার নিজের আচার-আচরণ বা সংলাপের দ্বারা পরিস্ফুট নয়—দাদাঠাকুর এবং মোহিত লোকেনের সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্য বিবৃতির ঢঙে জানিয়ে তার চরিত্রকে চরিত্রের সম্পূর্তা দিয়েছে মাত্র।

প্রথম কথা, দাদাঠাকুর লোকেনকে নিষেধ করেছেন পাশ্চাত্য শিক্ষার আবেগে সমাজসংস্কারের মোহে বিধবাবিবাহের সমর্থন করা তার উচিত নয়। তিনি লোকেনকে বার বার বোঝাতে চেয়েছেন এই যে তার সমাজ সংস্কারের নেশা এ তাঁর কাছারীর পোষাক বই আর কিছু নয়। বাইরের ঘরে এ পোষাক খুলে ঘরে ঢুকতে হবে তাকে। কিন্তু লোকেন শোনে নি সে কথা। চরম মুহূর্তে নিজেই উপলব্ধি করেছে 'মুখে বলা করা নয়, কাজে করা করা।'

দ্বিতীয় কথা, লোকেন চরিত্রের সম্পূর্ণতা এসেছে মোহিতের আচরণ দ্বারা। লোকেনের বক্তৃতা শুনে মোক্ষদা মুগ্ধ মোহিত তাই স্বগতোক্তি করেছে যে তাকেও বক্তৃতা করাটা অভ্যাস

করতে হবে মোহিতের ঈর্ষার বস্তু যে তার বক্তৃতার ক্ষমতা, এটা লোকেনের চরিত্রের এক বিশেষ গুণ। এই গুণ কার্যক্ষেত্রে তাকে দুঃখে মজিয়েছে।

তৃতীয় কথা, নাটকের শেষে আমরা জানতে পারি সহজ সরল স্বভাবের মোক্ষদাকে আধুনিকা করে গড়ে তুলেছে লোকেন স্বয়ং। পরিশেষে তাই নিজ কর্মের জন্য তার আপশোষ নাটকে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।

নিতাই ঃ অমৃতলালের সবচেয়ে আকর্ষণীয় সৃষ্টি 'খাসদখলে'র নিতাই চরিত্রটি। অদ্ভুত এক বৈপরীতা সত্তা রয়েছে চরিত্রটির। সেই বৈপরীত্যের দোলায় দোলায়িত হয়েছে সে। ভালো এবং মন্দ, ধর্ম এবং অধর্ম সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট—কিন্তু জীবনধারণের ক্ষেত্রে বাস্তবতার চাহিদা যে অত্যন্ত বেশি, একথা আর কেউ জানুক না জানুক নিতাই জানে। নিতাই 'সুরঙ্গিনী' পত্রিকার সাব-এডিটর। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রহসনের ভোলা চরিত্রের ছাঁদে চরিত্রটি নির্মাণ করা হয়েছে—অন্তত মিশ্র সংলাপরীতির ক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরীদের কাছে ঋণী। নিতাই চরিত্র সৃষ্টি করে অমৃতলাল তৎকালীন স্বল্পশিক্ষিত, স্বল্পবুদ্ধি অথচ হামবাগ মানুষের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন। তাঁর প্রথম বিদ্রূপ সেই সব মানুষের প্রতি—দু'এক পৃষ্ঠা ইংরেজি পড়ে যারা ইংরেজিতে কথা বলার হাস্যকর প্রচেষ্টা করে। ইংরেজি প্রীতিমুগ্ধ এই সব মানুষেরা পড়তে চায় না, কারণ তাতে নাকি ভুল হয়। তাই লোকেনের বন্ধু রমেশ যখন নিতাইকে বলে,—

"রমেশ। তা তামাসা নয়, নিতাইবাবু যে রকম ইন্‌টেলিজেন্ট উনি যদি দিনকতক একটু ইংরাজিটা ভাল করে পড়েন, তা হলে বোধ হয় একটু আধটু লিখতে পারেন।

নিতাই। ইউ আর ইজ দি ভুল রমেশবাবু, ইউ আর ইজ দি ভুল—পড়লেই সব ইজ দি মাটী! ভুল হল বলে মনে ইজ দি খুঁৎ খুঁৎ এন্ড কলম ইজ দি নট এক পা এগোয়।"

নিতাই চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকারের দ্বিতীয় আক্রমণস্থল হিন্দু দেবদেবী। তার এই কার্যধারার পশ্চাতে এক করুণ ইতিহাস রয়েছে। নিতাই আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতই হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী। অথচ সে বিশ্বাসকে ঢাকা দিতে হয়, দেবদেবীকে অবজ্ঞা করে—কারণ সে 'সুরঙ্গিনী' পত্রিকার সাব-এডিটরের চাকরি পেয়েছে সে দেবদেবী মানে না বলেই ; যে চাকুরি তার সংসারের রুজি রোজগারের প্রধান অবলম্বন। নিতাই চরিত্রের মাধ্যমে অমৃতলাল আরও একটা দিকেও খোঁচা দিয়েছেন। কিছু কিছু পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবক বন্ধুদের কাছে নিজ কৃতিত্ব জাহির করার জন্য দেবদেবীর প্রতি, ইচ্ছ করেই, অবজ্ঞা প্রদর্শন করত। নিতাইও তাই করেছে। রাস্তার ধারে গাছতলায় শীতলা মায়ের মন্দিরের কথা সে জানে। অথচ দেবদেবীকে অবজ্ঞা করে, সে নিজ কৃতিত্ব জাহির করার জন্য বলে,—

"নিতাই। হ্যাঁ হে বাপ, তোমার যে ওই ঘরটার কাছে সব প্রণাম ক'রে যাচ্ছে ওখানে হু ইজ দি? কে এয়েছে, কোনো বড়লোক ইজ দি কি?

পথিক। আজ্ঞে না, আপনি জানেন না? ওখানে যে মা আছেন।

নিতাই। মা ইজ দি। ঠাকুর?—পুতুল?"

কিন্তু পথিক চলে যাবার পর ভীত-সন্ত্রস্ত-স্বভাব দুর্বলচিত্ত নিতাই অস্থির হয়ে পড়ে। অন্যাকে লুকিয়ে সে মন্দিরে দেবীর উদ্দেশ্যে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করে। সে দেবীকে বলে,—

> "তোমাকে ইজ দি আমি ভয়ঙ্কর ভয় করি। 'সুরঙ্গিনী' আপিস থেকে ইজ দি মাইনে পেলে লুকিয়ে তোমায় ইজ দি একটা মস্ত পাঁটা দিয়ে যাব; আবাগের ব্যাটারা যে মা ঠাকুর দেবতা ইজ দি মানি বল্লে চাকরি দিত না, তাই ইজ দি তো ঝক্‌মারি।"

নিতাই-এর উক্তিতে একদিকে হাস্যরসের স্বতোৎসার এবং অন্যদিকে বাস্তব সংসারের এক গভীর কথাকে ধরে দিয়েছে। ধনী শাসক ও মহাজনদের কাছে সাধারণ মানুষের দেবভক্তি পর্যন্ত কত ঠুনকো সামগ্রী এই বোধকেও উস্কে দিয়েছে। দাদা ঠাকুর এখানে নিতাই-এর মধ্যে যথার্থ মানুষকে আবিষ্কার করে আনন্দিত হয়েছে। এই নিতাই-এর মনুষ্যত্বের প্রকাশ, অবশ্যই কিছুটা বাড়াবাড়ি, ঘটেছে নাটিকার শেষ অংশে। নিতাই ব্রাহ্মসমাজের একজন, লোকেনের মতো সেও তাই বিধবাবিবাহের সমর্থক। কিন্তু লোকেনের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ পৌছানোর পর মোক্ষদা যখন মোহিতকে বিয়ে করে স্বামীর ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে মনস্থ করল তখন নিতাই সহ্য করতে পারে নি সেই বিবাহকে। কারণ স্বরূপ সে বলে,—

> "Can I is the see mother Marriage ? ছিঃ ইজ দি! ছিঃ ইজ দি! মা'র বিয়ে—ছিঃ ইজ দি!"

বিধবাবিবাহের মতো সমাজ সংস্কারের অভ্যন্তরে যে ঘৃণ্য লুব্ধতা লুকিয়ে থাকে তা এই মুহূর্তে নিতাই-এর দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিধবাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী হয় লোভী যুবকেরা তখনই যখন সেই বিবাহে অর্থপ্রাপ্তির পাল্লাটা বেশ ভারী হয়। সে তাই বলেছে—যে এই বিয়ে,—

> "Not is the বিধবা-বিয়ে, বট্ বিয়ে is the iron chest লোহার সিন্দুক! কোম্পানির কাগজের সঙ্গে ইজ দি বিয়ে, গাড়ি ঘোড়া ফেটিংয়ের সঙ্গে ইজ দি বিয়ে!"[১]

নিতাই ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মদের মতো বিধবাবিবাহের সমর্থক, পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাসী ইত্যাদি কারণের জন্যই 'সুরঙ্গিনী' (সম্ভবত ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার কথা ভেবেই একই ধ্বনিঝঙ্কারে সৃষ্ট এ নাম।) পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ চাকরিটি পেয়েছিল। কিন্তু বাস্তব ও বিবেকের নিত্যদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত নিতাই সম্মান বিকিয়ে অশান্তির রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে সসম্মানে শান্তিতে দু'মুঠো ডাল ভাল খাওয়ার দিকটাই বরণ করে নিয়েছে। তাই সে 'সুরঙ্গিনী'র চাকরী ছেড়ে ট্রামওয়ের কন্ডাক্টরির চাকরি নিয়েছে। অতঃপর সে মোহিতকে রীতিমত অপদস্থ করেছে। সুরেশ ও রমেশের সহায়তার সে এই সুযোগটা ভালোই পেয়েছে। আবার মোহিতের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে, গিরিবালার প্রকৃত পরিচয় জানার পর—মোহিত ওরফে নন্দবাবু এবং গিরিবালা ওরফে রাধার পুনর্মিলনে আনন্দিত হয়েছে নিতাই। কেননা পূর্বেই মোক্ষদা লোকেনের মিলন হয়েছে। এখন গিরিবালা মোহিতের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে

---

১. বিধবা বিবাহ, বাংলা কবিতা/ড: অশোককুমার মিশ্র।

নিতাই তাই যে কথা বলেছে সেখানেও করুণরস ও হাস্যরস একাকার হয়ে গেছে। নিতাই বলেছে—

'Beg your pardon is the, মোহিতের সঙ্গে ইজ্‌দি আমার ঝগড়া ছিল, নন্দবাবুর সঙ্গে ইজ দি নয়। You are is the গিরিবালা-মা'র বর, Your is the beg your pardon !'

ইজ্ দি' মুদ্রাদোষের বাহুল্য নিতাই চরিত্রকে 'খাসদখল' প্রহসনে কৌতুক সৃষ্টির উপকণ করে তুলেছে।

দাদাঠাকুর ঃ 'খাসদখল' নাটকের দাদাঠাকুর চরিত্রটি প্রত্যক্ষ ঘটনা সৃষ্টি করে নি, কিন্তু নাটিকার ঘটনা বিশ্লেষণে ও সঠিক পথে চরিত্রগুলিকে পরিচালনায় যাত্রার দলের বিবেকের মতো কাজ করেছে। লোকেন, মোহিত, মোক্ষদা ও নিতাই চরিত্রের পূর্ণ-রূপটি, রামলোচনবাবুর সমাজসেবী মনোভাবের যথার্থ বিশ্লেষণ—দাদাঠাকুরের মোহমুক্ত দৃষ্টিতেই বিশ্লেষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে ঠাকুরদা চরিত্র দেখা যায়, গ্রামীণ সঙ্‌যাত্রায় ব্রাহ্মণ চরিত্র দা'ঠাকুরের সন্ধান মেলে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে এবং গ্রামীণ সঙ্‌যাত্রার স্মৃতি অমৃতলালকে দাদাঠাকুর চরিত্র নির্মাণে অনুপ্রাণিত করেছে।

মোক্ষদা ঃ 'খাসদখল' প্রহসনের কাহিনী ধারা অনুসরণ করলে বোঝা যাবে চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে, অন্তত মোক্ষদা চরিত্রের প্রতি নাট্যকারের বিশেষ ঝোঁক ছিল। পূর্বেই আলোচনা করেছি তৎকালীন এক শ্রেণীর শিক্ষিতা স্ত্রীর সার্থক প্রতিনিধিত্ব করেছে মোক্ষদা এর চরিত্রের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে ও পূর্বে আলোচনা করেছি। মোক্ষদা চরিত্রের এক গ্রামীণ ভিত্তি ছিল। সাধারণ বঙ্গনারী ছিল সে। তুলসীতলায় যে দিত সন্ধ্যা প্রদীপ, স্বামীর মঙ্গলের জন্য যাতায়াত করত দেবস্থানে। নিজের হাতে সরিয়ে দিত সংসারের যাবতীয় অমঙ্গল। কিন্তু আধুনিকতার শিক্ষার হাতে খড়ি দিয়ে তার অবস্থা ক্রমে ক্রমে এমন বিসদৃশ হয়ে উঠেছে যে তা কর্তব্য নয়। আধুনিক শিক্ষিতা গৃহকর্ত্রীদের চারিত্রিক ত্রুটিগুলি প্রসঙ্গ ক্রমে নাট্যকার তার মধ্যে একে একে তুলে ধরেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই ধরনের আবেগপ্রবণ, কল্পনাবিলাসী, সংসারের প্রতি মমতাহীন, স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারে নিপ্ত নারীদের লিপ্ত নারীদের সন্ধান মেলে।

স্বামী লোকেনের মতো মোক্ষদাও বিধবাবিবাহ সমর্থন করে। নাটকের শুরুতেই তার এক বান্ধবীর কাছে তার বিধবাবিবাহে আগ্রহের কথা শুনে মোক্ষদা ম্রিয়মান হয়েছে। কারণ বিধবা হলে তবে তো বিবাহ—তার সে সম্ভাবনা নেই।

ওই সময়কার শিক্ষিতা রমণীদের আর এক বাতিক ছিল নিজ রোগ নিয়ে মোক্ষদাও সব সময় নানা কল্প-অসুখের চিন্তায় মগ্ন থাকত। নিজের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অসুখের কথা ভাবা ছিল তার রোমান্টিক কল্পনা-বিলাস মাত্র। আবার অসুস্থতা উপলক্ষ্যে বড়ো বড়ো ডাক্তারদের বাড়িতে ডাকাও ছিল এক সামাজিক ফ্যাসান। সামান্য সর্দি বা মাথা ধরায় তাই সে স্মরণ করে বিলেত ফেরত ডাক্তারকে। আবার ডাক্তার যদি জানায় এ অসুখ তার তেমন কিছু নয়—তবে সে ডাক্তার আর 'কল' পাবে না।

মোক্ষদা কাব্যবিলাসীও। মোহিতের সঙ্গে কাব্যচর্চায় তার অপার আনন্দ হয়। কবিজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গীতে সামাজিক স্ট্যাটাসের (status) কথা ভেবে স্বামী লোকেন অসুস্থ হয়ে পড়লে সে কিছুটা বিলিতি কায়দায় তার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করতে গিয়ে প্রথমে

নিজেই মূর্ছা যায়। খানিকটা তার ভয়েই ডাক্তারেরা লোকেনের রোগকে মারাত্মক ব্যাধি অভিধা দিয়েছে এবং সুস্থ হবার পরই বায়ু পরিবর্তনের জন্য 'চেঞ্জে' যাবার উপদেশ দিয়েছে। কারণ সুস্থ হওয়ার পর চেঞ্জে যাওয়া এসময়কার ফ্যাসন ছিল।

মোক্ষদাকে মোহিতের বিশেষ ভালো লাগে, কারণ মোক্ষদা দেবীকে সে (মোহিত) কখনও 'দু'বার একরকম' দেখে নি। সুস্থ হবার জন্য লোকেন 'চেঞ্জে' গিয়েছিল মোক্ষদা। তার সাথে যায় নি। আবার লোকেনকে বাঘে খাবার খবর এসে পৌঁছাতে সাহিত্যিক রচনার ঢঙে সে বিধিমত শোক প্রকাশ করেছে। আর্তনাদ করেছে, বুক চাপড়িয়েছে তবে অল্প—সর্বোপরি কবিতাও বলেছে,—

"দুখিনী জীবন দীপ নিভাবার তবে
দ্বীপী কি সৃজিলে বিধি ভারত ভিতরে।। প্রভৃতি"

অতঃপর 'মহান্ গরীয়ান্ স্বর্গীয়ান্ কবিপ্রণয়ে'র বশবর্তী হয়ে সদ্যবিধবা মোক্ষদা মোহিতকে নূতন পতিরূপে গ্রহণ করতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুত হয়েছে। বিবাহ সভায় লাবণ্যকে যে যে কথা বলেছে তাতে তার আচরণের হাস্যকরতা আরও উদ্ভট রূপে প্রকাশিত হয়েছে। সে বলেছে 'এ বিবাহ আমি প্রণয়ের জন্য করছি না, কোন লাভালাভ দেখেও করছি না' হাস্যরসের এই সরস উপস্থাপন আরও কৌতুকে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে যখন বিবাহ-অনুষ্ঠান শুরু হবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে মোক্ষদা স্মরণ করেছে তার ভূতপূর্ব স্বামী লোকেনকে,—

"O my Loken ! Dear–dear darling husband that was ! .... হে প্রিয়তম ভূতপূর্ব্ব স্বামী! তোমার মুখ রক্ষা কর্ব্বার জন্যই আমি আবার পতি পরিগ্রহ কর্ত্তে যাচ্ছি!....."

শুধু সে গদ্যেই সম্মতি চায় নি ভূতপূর্ব স্বামীর। কৌতুকরসকে আরও জমিয়ে তুলে লোকেনের আবিভাবে এক বৈপরীত্য সৃষ্টির ইচ্ছায় নাট্যকার মোক্ষদার মুখে একটি সম্মতি প্রার্থনাকারী 'গীত' সংযোজন করেছেন,—

"দেহ অনুমতি, দেহ অনুমতি
ওহে পরলোক গত মম প্রিয়তম পতি।।"

ব্রাহ্মসমাজভুক্ত প্রগতিশীল নারী বলে মোক্ষদা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না। অথচ বিবাহসভায় সাধুবেশি লোকেনকে লোকেনের ভূত ভেবে সে অন্যদের মতো মূর্ছা গেছে। অন্যত্রও মোক্ষদার পৌত্তলিকতা-বিরোধী মনোভাবকে নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করা হয়েছে। এক সময় অসুস্থ মোক্ষদার কাতরতায় দুঃখিত চিত্তে তার অসুস্থতা প্রশমনের জন্য গিরিবালা যখন মা মঙ্গলচন্ডীকে স্মরণ করে, তখন শুচিবায়ুগ্রস্তের মতো মোক্ষদা সেই অবস্থাতেও কুপিত হয়ে উঠেছে কারণ হিন্দুদের দেবীর নাম উচ্চারণ তার কাছে অসহনীয় বলে মনে হয়েছে—কেননা ওই সমস্ত দেবদেবী পৌত্তলিক। শিহরিত হয়ে মোক্ষদা বলে ওঠে—'ও কি নাম গিরি; ছিঃ প্রভুকে ডাক না।"

শুধু দেবদেবীদের নামের ব্যাপারে নয় শব্দপ্রয়োগের শুচিবায়ুগ্রস্ততা তাকে কোন্ পর্যায়ে নিয়ে গেছে তা বোঝা যায় লোকেনের সঙ্গে তা কথোপকথনে। আপন অসুস্থতার ভয়ঙ্করতা-প্রত্যাশী মোক্ষদা যখন সর্দ্দি থেকে থাইসিস হয়ে মারা যাবার কথা ভাবে এবং লোকেনকে জানায়—"থাইসিস, আহা থাইসিসে মারা যাব,

How interesting meeting away."

—তখন প্রাচীন্ মানুষদের মতো লোকেনের অসচেতন কণ্ঠ উচ্চারণ করেছে 'বালাই' শব্দটি। মোক্ষদা এই ধরনের শব্দপ্রয়োগ একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না। সে তিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে "দেহ তো গেল, বাকী থাকে কেন আর শেষ ওই অশ্লীল কথাগুলো বলে আত্মারও দুর্গতি হলো।' মোক্ষদা চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকারের অসাধারণ সফেন জীবনরস রসিকতা এবং রসিকতা সৃষ্টিতে পারস্পর্য রক্ষার মাত্রাও সমভাবে রক্ষিত।

গিরিবালা ঃ অমৃতলালের প্রাচীনপন্থী মনোভাবের সবটুকু সহানুভূতি নিয়ে গড়ে উঠেছে রাধা ওরফে গিরিবালা চরিত্র। গ্রাম্য স্বামীবঞ্চিতা গিরিবালা শহুরে পরিবেশে এসে মতিভ্রান্ত হয় নি। বহু মানুষের সঙ্গ করার মতো সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে আপন অবস্থানকে নিরাপদ দূরত্বে চিহ্নিত রেখেছিল। মোহিতকে প্রথম দর্শনের পর তার মধ্যে যে চঞ্চলতা তা অবশ্য তার চরিত্রের শুচিতার পক্ষে পূর্ণ সংখ্যা প্রাপ্তিতে সহায়তা করে না। কারণ যখন সে মোহিতকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তখন সে জানে না যে সেই তার স্বামী। শেষ পর্যন্ত হিন্দুর জন্মান্তরীণ সংস্কারের উপর ভয় দিয়ে আচমকা মোহিতকে গিরিবালার স্বামীরূপে দেখিয়ে গিরিবালাকে শেষ-মেষ জিতিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার।

মোক্ষদা চরিত্রের ফাঁকটুকু এবং হাস্যকতাটুকু উদ্ভাসিত করতে গিরিবালার সৃষ্টি। কিন্তু মোহিতের প্রকৃত পরিচয় পাবার পর তার যে চাঞ্চল্য, মোহিতকে সবাই থানায় দিতে চাইলে সাধ্বী স্ত্রী হিসেবে তার যে মর্মবেদনা ও ব্যাকুল অনুনয়, তার মধ্যেই গিরিবালা চরিত্রের অনন্যতা ধরা পড়ে। এখানেই এই চরিত্রটি নাটকের চরিত্রের প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েও স্বয়ং নাটকের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র হয়ে উঠেছে।

অন্যান্য চরিত্র ঃ আহ্লাদী চরিত্রের কথাবার্তা ও রাগ-অনুরাগের ভাষাটি পর্যন্ত স্মরণ করিয়ে দেয় দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'র আদুরীকে। ব্রাহ্মসমাজের মাথা রাজর্ষি মনোমোহন মাইতি, বঙ্গচন্দ্র প্রমুখের চরিত্রও সুচিত্রিত। হাস্যরসের উৎসারে এই চরিত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

হাস্যরস ঃ 'খাসদখল' নাটিকার মূল রস হাস্যরস। হাস্যরস সৃষ্টিতে অমৃতলালের কৃতিত্ব লক্ষ্য করা গেছে বিশেষ কয়েক রূপে (ক) আচরণগত শৈথিল্যে (খ) অশ্লীল প্রসঙ্গের উপস্থাপনায় (গ) ভাষা ব্যবহারে ও শব্দ প্রয়োগের মুদ্রাদোষে।

আচরণগত শৈথিল্যের মাধ্যমে কৌতুকরস সৃষ্টির জন্য নাট্যকার এই নাটিকার প্রায় সব চরিত্রগুলিকেই কম বেশি ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত মোহিতের রোমান্টিক কাব্যবিলাস, মোক্ষদার বিবিয়ানা ও প্রগতিশীলতার ভান, রামকমলবাবু ও লোকেনের বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারমূলক ব্যাপারে কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য, নিতাই-এর আন্তরিক বিশ্বাস ও বাইরের আচরণ, রাজর্ষি মনোমোহন মাইতির ভন্ডামি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আচরণে স্বাভাবিকতার সুর যেখানে রক্ষিত নয় হাস্যরসের উদ্বেল স্রোত সেখানে বাধাবন্ধহীন। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মোক্ষদার চরিত্রে অশ্লীলতার উপস্থাপন করে, আহ্লাদীর কণ্ঠে সে কাজের প্রতিধ্বনি সৃজন করে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে ভাষা ব্যবহারেও শব্দপ্রয়োগের মুদ্রাদোষই এই নাটকে উচ্ছ্বসিত হাস্যরস সৃষ্টির কারণ। 'খাসদখলে'র বিশিষ্টতা এর বুদ্ধিদীপ্ত ও শ্লেষ-তীক্ষ্ণ সংলাপ। অমৃতলালের স্বভাবসিদ্ধ অনুপ্রাসপ্রিয়তা থেকে শুরু করে নানা অলঙ্কার সন্নিবেশের গৌরব একে পরম করে তুলেছিল। নাট্যকারের স্বভাবসিদ্ধ অনুপ্রাস প্রয়োগ প্রবণতা বাংলাভাষার সীমাকে অতিক্রম করে ইংরেজি ভাষা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে মুচিরামের একটি উক্তিতে। মুচিরাম বলেছে,—

"And have you condistanted to confirm the inestimable grass of honorable honor on this city of palaces and Policies ? This Sanititarium of stables and Statues ? On this Town of Taxes and Taxicars ? of Rates and Rats, of Riches and Ditches; of Rupees and রূপসীজ—"

সংলাপ ঃ ভাষার মধ্যে বঙ্কিমী উদাহরণ প্রবণতা স্থানে অপরূপ কাব্যময়তার সৃষ্টি করেছে। গিরিবালা ও মোক্ষদার সৌন্দর্যের তুলনা প্রসঙ্গে মোহিত বলে

"গিরিবালা লক্ষ্মণ পোদ্দারের দোকানের গিনি সোনার চিক আর মোক্ষদাদেবী হ্যামিলটনের বাড়ীর নেকলেস্"

স্থানে স্থানে বুদ্ধিদীপ্ত শ্লেষতীক্ষ্ণ তির্যক বাক্যবিন্যাস 'খাসদখলে'র নাট্যকারের মধ্যে কবিওয়ালার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে স্মরণ করায়। বিখ্যাত নট অহীন্দ্র চৌধুরী বলেছেন,

"কথার খেলার, ধ্বনি মাধুর্যে ও শব্দঝঙ্কারের মধ্য দিয়ে অপূর্ব মায়াজাল রচনা করে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করার যাদু ছড়িয়ে রয়েছে অমৃতলালের 'খাসদখল' নাটকে।"[১]

প্রথম শ্রেণীর নাট্য সংলাপ এক সঙ্গে বহু উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। 'খাসদখল' হাস্যরসাত্মক নাটকটিতেও তির্যক, চমৎকারিত্বপূর্ণ বাগ্‌বিন্যাস একদিকে যেমন প্রথম শ্রেণীর সংলাপের নমুনা উপস্থাপিত করেছে, অন্যদিকে তেমনি বিধবাবিবাহ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সমস্যা সম্পর্কে নাট্যকারের মতামতটিও অভিব্যক্ত করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মোহিতের সঙ্গে গিরিবালা নিজ সম্পর্ক জানতে পেরে তার সঙ্গে বিদূষী নারীর মতো যে কথাবার্তা বলেছে তাতে কয়েকটি উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্ট,—

১। গ্রামীণ মেয়ে গিরিবালা শহুরে আদব-কায়দা যখন-তখন রপ্ত করতে পারে।

২। কথাবার্তার ক্ষেত্রে বুদ্ধি দীপ্তি শহুরে মানুষের চেয়ে তারও কোনো অংশে কম নেই বরং বেশীই, অন্তত নাট্যকারের সে উদ্দেশ্য মোহিতের স্বগতোক্তিতে ব্যক্ত। মোক্ষদার চেয়ে গিরিবালা উঁচুস্তরের মহিলা—প্রাচীনপন্থী অমৃতলালের কাছে এটাই ছিল প্রমাণের বস্তু।

৩। বিধবাবিবাহ সম্পর্কে রক্ষণশীল নাট্যকারের মতামত এতে ব্যক্ত। সংলাপটি নিম্নরূপ—

"মোহিত। বিধবা বিবাহ কি মন্দ:
গিরিবালা। আকাশ-পিদ্দিম কি চাঁদ?" ইত্যাদি

হাস্যরস সৃষ্টির জন্য নাট্যকার আরও কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, সেগুলি হল—ইংরেজি শব্দকে ভেঙে ভেঙে তার পৃথক পৃথক অর্থসৃষ্টি করে হাস্যরসের উদ্ভাস। যেমন 'গ্রাস-উইডো' শব্দটি। লাবণ্য মোক্ষাদার সম্পর্কে মহালক্ষ্মীকে বলেছে '...স্বামী কাছে, নেই, একা বসে ঘাস কাটেন, তাই গ্রাস-উইডো!' হল মোক্ষদা। 'গ্রাস- উইডো' থেকে 'গ্রাস' শব্দটি ছাঁটাই করে দিয়ে প্রহসনকার মোক্ষদাকে 'উইডো' করে দেন এই দৃশ্যেই লোকেনের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে—প্রকৃতপক্ষে 'গ্রাস-উইডো' শব্দ ব্যবহারের দ্বারা নাট্যকার

১. বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র/অহীন্দ্র চৌধুরী/পৃঃ ১৬৯

একদিকে যেমন ভিন্ন ভাষার শব্দ নিয়ে চাতুর্যপূর্ণ খেলা করেছেন, অন্যদিকে মোক্ষদার 'উইডো' বা 'বিধবা' হবার পূর্বাভাস দিয়েছেন।

দর্শকদের মুখ চেয়ে স্থূল হাস্যরস সৃষ্টির নেশা নাট্যপরিচালক অমৃতলালকে এমনভাবে আবিষ্ট করে রেখেছিল যে মোহিতের বিধবাবিবাহ করার সংবাদ পেয়ে তাকে প্রাক্-বিবাহ শুভেচ্ছা। শ্রেণীবদ্ধভাবে জানাতে এসেছে বিকৃতাঙ্গ সব মানুষেরা। খোঁড়া লোচনের খোঁড়াতে খোঁড়াতে মঞ্চে প্রবেশ ও শুভেচ্ছা জানানো, বঙ্গচন্দ্রের পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় স্বেচ্ছাকৃত টান, রামতোৎলা প্যারীর অসম্ভব তোৎলামি, খোনা নেপালের ভৌতিক নাসিক্যঝঙ্কার এবং মোহিতকে সম্ভাষণ জানানোর মধ্যে গ্রাম্য রসিকতার স্থূলতাই প্রকাশিত। সেদিক থেকে বলা যায় অমৃতলালের মধ্যে দীনবন্ধুর ভাষার উত্তরাধিকার বর্তেছে।

প্রহসন কিনা : হাস্যরসের উচ্ছ্বাস, সমকালীন বিষয়কে অবলম্বন করে নাট্যরচনা প্রভৃতি প্রাহসনিক ধর্ম পালন করলেও 'খাসদখল' সার্থক প্রহসন নয়। কারণ এই নাটিকায় উদ্দেশ্যমূলকতা, নীতিশিক্ষা এত স্পষ্ট এবং পরিণামে মিলনের উল্লাস এত উচ্চরিত যে একে কমেডি শ্রেণীর নাটক বলে কখনও কখনও মনে হয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' যেমন সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এক তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তেমনি 'খাসদখল' নাটকটিও সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে মহৎ ভূমিকা নিয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অমৃতলালের সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ যে তাদের সংস্কারের নিমিত্তই—এ অর্থে ব্রাহ্মসমাজও সেদিন সাদরে অমৃতলালকে বরণ করে নিয়েছিলেন। ব্রাহ্মনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল 'খাসদখল' দেখে তাঁর মুগ্ধতা ও শিক্ষালাভের কথা জানিয়ে এক পত্র দিয়েছিলেন অমৃতলালকে। পত্রটি নিম্নরূপ,—

ওঁ

"কালীঘাট
২১ এ অগ্রহায়ণ
[সাল দেওয়া নাই।]

প্রীতি নমস্কারপূর্বকম্,

সেদিন আপনার 'খাসদখল' দেখিয়া কত প্রীতি ও শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাহা মুখেই বলিয়াছি। দেখছি আপনার 'খাসদখল' আমাকে বেশ দখল করিয়া রাখিয়াছে। একটা কিছু না লিখলে শান্তি পাব না। একখানা বাংলা মাসিকে কিছু লিখব ভাবছি। তাতে কিছু ছবি দিতে পারলে ভালো হয়। অগ্রহায়ণের সংখ্যাতেই দিতে চাই। যে ক' খানা ছবি দরকার পত্রবাহক শ্রীমান রমেশচন্দ্র চৌধুরী আপনাকে বলিবেন। সময় বড় কম, যদি 'রঙ্গালয়ে'র নিকট হইতে ব্লকগুলো ভাড়া পাওয়া যায়, সুবিধা হবে। অলমতি বিস্তরেণ।

আমার মেয়েরা একদিন 'খাসদখল' দেখে ইচ্ছা করি। বালিগঞ্জের হাওয়া যাদের লাগার সম্ভাবনা তাদের দেখা বড়ই প্রয়োজন। সুবিধা মতো একদিন লইয়া যাইব। আবার কবে রবিবার সন্ধ্যায় এটী দিবেন?

আপনার
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

পুনশ্চ— এই কখানা ছবি পেলে ভালো হয় :

(১) আপনি; (২) আমরবাবু; (৩) ঠাকুরদাদা; (৪) মোক্ষদাসুন্দরী; (৫) গিরিবালা।[১]

সঙ্গীত : 'খাসদখল' প্রহসনের অন্তর্ভুক্ত পনেরটি সঙ্গীত এর বিশিষ্ট সম্পদ। জনৈক সমালোচক। বলেছেন 'গীতগুলি ঘটনাপ্রবাহের সহিত সুপ্রযুক্ত, বাণীবিন্যাসভঙ্গীও মনোরম।[২] প্রহসনটির পূর্বরঙ্গে রয়েছে কলিকামিনীদের গীত। এই গীতটির প্রারম্ভ এই রূপ,—

"এই যায় যায় যায়
কলির রাজত্ব বুঝি যায় যায়
পাপ-পুণ্য দুটো কথার আজো রয়েছে ধারায়।।"

পাপ-পুণ্যের প্রসঙ্গ উপস্থাপনের পর নাট্যকার আধুনিক চিন্তার সঙ্গে পুরাণো সংস্কার বা ঐতিহ্যের সংঘাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতিপূর্ণ সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু ধর্মাচারের প্রতি কৃতজ্ঞ নাট্যকার তাই কলির রমণীদের কণ্ঠে যোজনা করেন এই গানটি,—

"শঙ্খ—ঘন্টাধ্বনি শুনি সন্ধ্যাকালে,
শিব-শিরে নারী আজো বারি ঢালে,
(যায়) অকাল-কুষ্মান্ড কত পিন্ড
দিতে এখনো গয়ায়।।"

পুরুষ-নারীর অবাধ প্রেমলীলাকে বিদ্রুপ, সভ্যতাভিমানীর প্রকৃত সভ্যতার রূপ প্রভৃতি উল্লেখের পর এই সঙ্গীতেই এই প্রহসনের মূল সমস্যাকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সে সমস্যা বিধবাবিবাহ প্রচলন বিষয়ক সমস্যা। কলিকামিনীদের গীতে বিধবাবিবাহ বিষয়ে নাট্যকারের ব্যঙ্গপ্রিয় মনটিকে চেনা যায়। তাই কলি-কামিনীগণ গান করে,—

"বুক ফেটে যায়, বেঁধে বিষবাণ অঙ্গে,
ছি! ব্রহ্মচারিণী বিধবা আজো এত বঙ্গে,
নব নব এডিসনে পতি য়্যাডিসন
নাহি নায় যায় যায়।।"

এই গানটিই 'খাসদখল' প্রহসনের সূত্ররূপ। 'নব নব এডিসনে পতি য়্যাডিসন' পংক্তিতে লোকেনের মৃত্যুতে মোক্ষদা-মোহিতের বিধবাবিবাহ আয়োজনের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আবার, 'লীলাখেলা লইয়া লভারে' উক্তির মধ্যেও মোক্ষদা-মোহিত সম্পর্ক বিজ্ঞাপিত।

পূর্বরঙ্গের দ্বিতীয় গান বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য যুববৃন্দের দ্বারা রাজ্য পঞ্চম জর্জের স্তুতি মাত্র,—

"জয় জয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ নামে।
জয় নারী-কুলোত্তমা মেরী মনোরমা
সম্রাজ্ঞী বামে।
ভঙ্গ-অঙ্গ বঙ্গ মিলায়ে আবার,
কিনেছ রাজেন্দ্র হৃদয় সবার,
কিনেছ রাজেন্দ্র হৃদয় সবার

---

১. অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য/ড. অরুণকুমার মিত্র/পৃঃ ২০৩
২. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস/ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য/পৃঃ ৩৩৬

জীও শতবর্ষ এই ধরাধামে
জয় জয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ নামে।
জয় নারী-কুলোত্তমা মেরী মনোরমা
সম্রাজ্ঞী বামে।"

প্রহসনের কাহিনী চয়নে এই গানটির যে খুব একটা প্রয়োজনীয়তা ছিল—তা মনে হয় না। সমসাময়িক সব জটিল প্রসঙ্গকে দুই কভারের মধ্যে ধরে দেবার যে দুর্বল প্রয়াস তৎকালীন প্রায় অধিকাংশ নাট্যকারের ছিল, অমৃতলালও তার থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তাই ছদ্ম দেশ-সেবকদের নিয়ে একটু মস্করা করার জন্য তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ জানাতে রাজা পঞ্চম জর্জ এবং বঙ্গভঙ্গ রদের কথা উত্থাপন করেছেন।

পূর্বরঙ্গে আর একটি গানে, যেটি রতির কণ্ঠে গীত, সেটি নিম্নরূপ,—

"লালিত্য-আধার অতি সুকুমার নারী ফুলহার।
....
দাগা পেলে সেই নারী একা কোটি বিষধর ফণী
নিশ্বাসে করে বিশ্ব ছারখার।।"

কারও কারও মতে এই গানটিও নাকি নাটকের মূল সুরের দ্যোতনা করেছে। এই গানে যে বিশ্ব-বিধ্বংসী নারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে—এই প্রহসনে তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি? আঘাত খেয়েছে গিরিবালা, কিন্তু সে বিধ্বংসী হয়ে উঠল কোথায়? সুতরাং এই গানটির প্রয়োগ সার্থকতা কিছুমাত্র নেই বলেই মনে হয়।

এই গানগুলি ছাড়াও দর্শক মনোরঞ্জক এই নাটিকায় আরও অনেকগুলি সঙ্গীত যোজিত হয়েছে। সেগুলির অধিকাংশই সার্থক প্রয়োগের স্বাক্ষরবাহী নয়। তবে রতির সঙ্গিনীগণের গীত,—

"আমরা নতুন বেদেনী, রূপেতে মোহিত মেদিনী
আমোদিনী মধুর হাসি মধুর ভাষ মনটি মধুময়।" (১।২)

কিংবা গোয়ালিনীদের গীত, দই সম্পর্কে ডাক্তারদের আলোচনার পরের দৃশ্যে, 'আমরা এবার বিলাত গিয়ে বেচবো দই' গান দুটি খুবই উপভোগ্য। লোকেনের মৃত্যু সংবাদে 'শোকাকুল' মহিলাগণের গীত,—

'সখি বিধিমত রীতিমত হও শোকাকুল।
কবরী খসায়ে দাও এলাইয়ে চুল।।" (২।৫)

বিবাহ সভায় বিধবাবিবাহ কার্য শুরু করার আগে পূর্বতন স্বামীর কাছে গানের মাধ্যমে মোক্ষদা অনুমতি যাচ্ঞা করে,—

"দেহ অনুমতি, দেহ অনুমতি
ওহে পরলোকগত মম প্রিয়তম পতি।।"

ব্রাহ্মনেতা রাজর্ষি মনোমোহন মাইতির অনুমতি প্রদানকারী সঙ্গীতটিও যথেষ্ট কৌতুককর,—

"কর কর আরোহণ প্রেমের স্যন্দনে।

বিদুষী বিধবা, রূপে চক্ চক্
পতি হবে তার অতি বিদূষক
আশীষে আমার দুলিবে দোঁহে উদ্বাহ-উদ্বন্ধনে।”

অমৃতলালের সমসাময়িককালে লক্ষিত হয় স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার ব্যাপক প্রসারের তোড়াজোড়ে মেয়েরা বহু প্রাচীন অবরোধ প্রথা ভেঙে বেরিয়ে আসছে। রক্ষণশীল কবি ঈশ্বরগুপ্ত 'আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি গড়ের মাঠে হাওয়া' খাওয়ার ইচ্ছুক এই নারীদের ব্যঙ্গ করেছিলেন। স্বাধীনতার নামে 'পটের বিবি' সেজে বাইরে বেরুনো ছাড়া তৎকালে স্বাধীনা মেয়েদের আর কিছু করণীয় ছিল না। একটি গানে কাব্যবিলাসী প্রগতিশীলা মোক্ষদার মাধ্যমে এই শ্রেণীর রমণীদের স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। গানটি উদ্ধৃত করা যাক,—

“আমি যেন ছবিটি
ললিত লবঙ্গলতা কবিটি
তায় ভালবাসে স্বামী
সর্বে সর্বময়ী আমি
তিনি আনেন খেটে খুটে আমার হাতে চাবিটী।।

সারা বেলা হাসি খেলা
এলিয়ে পড়ি কাজের বেলা,
সেজেগুজে ব'সে থাকি যেন পটের বিবিটী।

স্বামী আমার সোনার মাইন
কিন্তু কেবল আইন আইন
এক দুঃখ মাইন্ আমি এক ফাইন
উনি উঁয়ের টিবিটী
আমি এমন ফুল্ল কমল কোথায় আমার রবিটী।।” (২।৫)

লোকেন বা রামবাবুর মতো মানুষদের কাছে সমাজ সংস্কার ব্যাপারটা দাদাঠাকুরের ভাষায় ছিল 'কাছারীর পোষাক'-এর মতো। এরা এ -কুল ওকুল দু কূল রক্ষায় প্রয়াসী ছিলেন। একটি গানে এই শ্রেণীর মানুষদের ব্যঙ্গাবিদ্ধ করা হয়েছে,—

“ওরা এ-কুল ও-কুল রাখবে দু'কূল মিলে ক' জানে।
থেকে জাতের ভেতর জাত মারবে
এইটী আছে মনে।

ডিনারে টাউন হলে
বসে যান দলে দলে
(আবার) রাত পোহালে পালে মিশে।
যান দলপতি ব'নে।

হেথা পৈতে প'রে ক্ষেত্রী
হেথা নব্যতন্ত্রে নেতৃ

এদের মাতৃভূমি বঙ্গাদেশে, ধাত্রী ভূমি লন্ডনে।"...

গিরিবালার কণ্ঠে স্বামী প্রশস্তিমূলক যে গানটি দেওয়া হয়েছে (২/৪) তার মধ্যে প্রহসনকারের স্থূলরুচির পরিচয় মেলে। মানটি 'ওলো কেউ বল না গো। ভাতার কেমন মিষ্টি।' তবে নাটকের শেষ দৃশ্যে কৌতুকপূর্ণ ভঙ্গিতে মহিলাদের কণ্ঠে যে গান দেওয়া হয়েছে তা অপূর্ব,—

"হ'ল না ইজদি নতুন বন্দোবস্ত
সদর তশীল কল্লে দাখিল না হ'তে ওই সূর্যি অস্ত।
দু'খানি ইজ দি সরেস জমিদারি
নাই বাকি খাজনায় ডিক্রী জারী
সেটা ইজ দি কিস্তি কিস্তি
হস্তগত বাজে আদায় মস্ত।"

বিংশ শতকের প্রথম দু'দশক পর্যন্ত অমৃতলালের প্রাহসনিক ক্ষমতার বিস্তার লক্ষ্য করি। অতঃপর ব্যঙ্গ কবিতা রচনার দিকে তাঁর অধিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাই ১৯২০ এর পর অমৃতলালের প্রহসনের সংখ্যা বড়ই কম। আরও একটি কারণ প্রসঙ্গা। ত উল্লেখ করা যায়। কারণটি এই, গোঁড়া হিন্দুধর্মের সমর্থক, ব্রাহ্মবিদ্বেষী ও খ্রীষ্টধর্মের অ-সমর্থক অমৃতলাল সমাজসচেতন নাট্যকার ছিলেন। রাজনীতি নয়, সামাজিক আবর্তই তাঁকে প্রহসন রচনায় বার বার উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই বিংশ শতকের প্রারম্ভে জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতায় যখন সামাজিক আন্দোলন অনেক দুর্বল হয়ে গেল—সমাজের মানুষ স্ত্রীশিক্ষা, স্বাধীনতা, ব্রাহ্মসমাজের মতামত ইত্যাদিকে যখন খুব একটা অভিনব ব্যাপার বলে আর মনে করল না তখনই অমৃতলালের প্রহসন রচনার উপাদানে টান পড়ল। এ কারণেই উনবিংশ শতকের শেষদিকে অসংখ্য প্রহসন রচনা করলেও বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে তাঁর প্রহসনের সংখ্যা এত কম।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রহসন হল—'দ্বন্দ্বে মাতনম' এবং 'ব্যাপিকা বিদায়'।

দ্বন্দ্বে মাতনম্ঃ 'বন্দে মাতরম্'-এর আদর্শভ্রষ্ট হয়ে কীভাবে আমরা ক্রমাগত ভোটের রাজনীতিতে আত্মপর বিস্মৃত হচ্ছি 'দ্বন্দ্বে মাতনম্' (১৩৩৩) এর বিষয়বস্তু তাই।[১] এই প্রহসনে কোনো অঙ্ক বিভাগ নেই। পরিবর্তে রয়েছে প্রথমে 'স্বস্তিবচন' তারপর যথাক্রমে— 'বোধন,' 'উৎসবারম্ভ,' সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, বিজয়া। এতে মোট গানের সংখ্যা দশ। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে এটি স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।

ব্যাপিকা বিদায়ঃ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৫ আষাঢ় বা ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মিনার্ভা থিয়েটারে 'ব্যাপিকা বিদায়' প্রহসনটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। প্রহসনকার এটিকে 'প্রমোদ প্রহসন'

১. সেই সময় কলকাতা কর্পোরেশনের একটা ইলেকশন আসন্ন ছিল। তখন থেকেই 'ভোট ভোট' চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। ওই ভোট-যুদ্ধকে ব্যঙ্গ করে ভোটের ব্যাপারটা যে কত অন্তঃসারশূন্য—সেটা বুঝিয়ে একটা নাটক লিখলেন অবিলম্বে, এবং, সেটি মিত্র থিয়েটার বা মিনার্ভা, নয় দিলেন আমাদের।" নিজের হারায়ে খুঁজি / শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী পৃঃ ৫২৭-২৮।

বলেছেন। এই প্রহসনেও কোনো অঙ্ক বিভাগ নেই। প্রথমে 'প্রবেশক' পরে 'পূর্বচিত্র ও উত্তরচিত্র'। প্রহসনটিতে গানের সংখ্যা ১২টি।

মিনির মা কর্তৃত্বের মোহে অন্ধ। কন্যা জামাতার সুখের সংসারে ব্যাপিকার মত তাঁর কয়েক দিনের আবির্ভাব—সংসারের চালচিত্রে বিরাট লন্ডভন্ডের পর তাঁর জব্দ হওয়া সংসারে শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা এই প্রহসনের মূল কাহিনী।

বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ রচনায় নাট্যকারের পারদর্শিতা অনবদ্য। এই প্রহসনে তার প্রমাণ আছে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারে 'ব্যাপিকা বিদায়' এর অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন আঙুরবালা ও নগেন্দ্রবালা,—

> "There are fine songs which were well rendered by Angurbala. The name of Nagendra Bala is associated with the comedy because of her remarkable portrayal of Mrs. Pakrashi's Character."[১]

'ব্যাপিকা বিদায়' প্রহসনটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এর রসাল কাহিনীর জন্যই। বাঙালি পরিবারের এক চিরন্তন আনন্দ-বিষাদের স্থান শ্বশুরালয় এবং তৎসম্পর্কিত নানাজন। এই নাটিকায় নায়কের শাশুড়ী মাতার আগমন—নায়ক-নায়িকার ছোট্ট মিলনবাসরকে সংশয় সন্দেহ ও পারস্পরিক অশ্রদ্ধার দাবানলে ভস্মীভূত করা এবং পরিণামে ব্যাপিকা, যা এই উটকো ঝামেলার সৃষ্টিকারী, সেই শাশুড়ীর বিদায়ে সংসারে শান্তি পুনঃস্থাপন কথা বিবৃত হয়েছে। শাশুড়ী মাতার চরিত্রে অত্যাধুনিকা মহিলার আচার-আচরণ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মিসেস পাকড়াশীর কন্যাকে আদরের সঙ্গে ডাকার সুরটিও বড়ই হাস্যোদ্রেক করতে সমর্থ। কন্যাকে জামাইয়ের বিরুদ্ধে সন্দেহপ্রবণ করে তোলার মুহূর্তগুলিও বড়োই উপভোগ্য হয়েছে। সংসারে ব্যাপিকারূপী শাশুড়ীর আজও অভাব নেই বলে 'ব্যাপিক বিদায়' আজও বাংলাদেশে একটি জনপ্রিয় হাসির নাটক।

১ The story of the Calcutta Theatre/S. K. Mukherjee/P. 603

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪—১৯১২)

মঞ্চসফল নাট্যকার : কবি, নট, ন্যাট্যকার ও বিখ্যাত অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা নাট্য সাহিত্য জগতের প্রবাদ পুরুষ। প্রায় তিরিশ বৎসর যাবৎ বাংলা নাটকের জগতে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বলা বাহুল্য, সব শ্রেণীর নাটকে নয়—অবতার, মহাপুরুষ ও পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অসাধারণ অধিকার। নাটক ও নাট্যমঞ্চের সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ীর যোগ। দর্শকদের অভিরুচি অনুসারে নাটক রচনা ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেদিক থেকে তাঁর উদ্দেশ্য ইংল্যান্ডের নাট্যশালার ইতিহাসলেখক জেনেস্ট এর মন্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়—"Every theatrieal work should (if possible) be written according to the seasons."

নট এবং নাট্যকার হিসেব বাংলা নাটকের জন্য সবকিছু সমর্পণের পূর্বে গিরিশচন্দ্র ছিলেন সদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী। নাটকের প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণ বশেই স্থায়ী চাকরির মোহ ত্যাগ করেন এবং জাতীয় নাট্যশালা গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কাজেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমগ্র নাট্য-প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্র এটা নয়—নাটকের একটি মাত্র শাখা প্রহসন বা হাস্যরসাত্মক নাটিকা রচনায় গিরিশচন্দ্রের দক্ষতা বিচারই আরব্ধ।

গিরিশ-প্রতিভার সীমাবদ্ধতা : প্রহসন বা রঙ্গব্যঙ্গমূলক সামাজিক নাটক রচনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব তখনই প্রকাশ পায় যখন তাঁর মধ্যে থাকে দুটো বিশেষ গুণ। প্রথমটি বস্তব পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা দ্বিতীয়টি সহৃদয়তার সঙ্গে তা বিবেচনা ও উপস্থাপনা। গিরিশচন্দ্র সমকালীন ব্যস্ত নাট্যকার হলেও এবং তাঁর নাটক ও প্রহসন মিলিয়ে সর্বমোট শ'দেড়েক গ্রন্থ থাকলেও এ কথা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো যুক্তি মার্গের চেয়ে ভাব মার্গেই তাঁর অগাধ আস্থা। বাস্তবতার উপর যুক্তির সত্যতা অসত্যতা নির্ভরশীল—ভাবমার্গ ভক্তি এবং বিশ্বাসের উপর ভর করে প্রতিষ্ঠিত। ভাব-মার্গী লেখকেরা সাধারণত যতটুকু বাস্তববোধের পরিচয় দেন তা উপর-উপর মাত্র। গিরিশচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম নন। তাই পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে রাজাধিরাজ গিরিশচন্দ্রের প্রহসন মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন গিরিশচন্দ্রের *'হাস্যরসের এই প্রহসনগুলির হাসির মূল উৎস—লেখকের হাস্যরসসৃষ্টির শোচনীয় অক্ষমতা।'*

যুগ চাহিদায় সৃষ্ট রচনায় : গিরিশচন্দ্রর রচিত প্রহসনের সংখ্যা প্রচুর। পঞ্চরং, রঙ্গ ব্যঙ্গমূলক নাটক, সামাজিক নক্সা প্রভৃতি অভিধায় এগুলি চিহ্নিত। এই নাটিকাগুলি অধিকাংশই লেখা হেয়েছিল রাতারাতি। দর্শকদের বিশেষ রুচির ক্ষুধা মেটাবার ঐকান্তিক ইচ্ছায়। সেই কারণেই তাঁর অধিকাংশ হাস্যরসাত্মক নাটক পরবর্তীকালে অনুল্লেখ্যই থেকে গেছে। গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার বৈচিত্র্য এবং গভীরতা অসীম। কিন্তু তবু সচেতন মানসিকতা এবং সময়বিস্তারী নিষ্ঠার অভাবে তাঁর অধিকাংশ প্রহসন ব্যর্থ হয়েছে। যদিও তাঁর বহু পূর্বে রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যে প্রহসন রচনার এক ঈর্ষণীয় মজবুত পথনির্মাণ করে গিয়েছিলেন।

যামিনী চন্দ্রমাহীনা গোপন চুম্বন ঃ

সম্ভবত গিরিশচন্দ্রের প্রথম প্রহসন 'যামিনী চন্দ্রমাহীনা গোপন চুম্বন।' 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার ১৩৫২-র চৈত্র সংখ্যায় এটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়। এই নাটিকাটির গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুলাই। গিরিশচন্দ্রের যে চারটি হাস্যরসাত্মক নাটকে তাঁর নাম ছিল—এটিও তারই একটি।

এই প্রহসনটি ব্রাহ্মসমাজের আচার-আচরণকে ব্যঙ্গ করে লেখা। মুরারি বাবু, মথুর বাবু দুই বন্ধু। মথুরবাবু মুরারিবাবুর স্ত্রী বসন্তকুমারীর প্রতি আসক্ত। তার স্ত্রীও মথুরবাবুকে একলা কাছে পেতে চায়। তাই সে স্বামীকে তাড়াতাড়ি সমাজে পাঠাতে চায়—

"ব। যাও, এস। (স্বামীর প্রস্থান)
—মথুরবাবু জানো তো, ও বোকা, ওরে শীগরির তাড়ান যায় না।
ম। জানি। কিন্তু আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আচি।
....
ম। দেখ, গদা বেটা কি মনে করে?
ব। মনে কে মা করে?
ম। আমি দিন কতক আসা বন্ধ করি।
ব। লাভের মধ্যে আমার প্রাণে ব্যথা; নিন্দেতে ঘুচবে না।"

চাকর গদাধর মুরারি বাবুর এহেন দুর্বলতায় কিছুটা ক্রুদ্ধ। স্ত্রীকে শাসন করতে পারেন না। অথচ পরপুরুষকে স্ত্রীর কাছে রেখে দিয়ে বার ঘুর ঘুর করে ঘরে ঘুরে ফিরে আসেন। স্ত্রী বসন্তকুমারী কৌশল করে ঘরের আলো সরিয়ে দিয়ে মথুরবাবুকে চুম্বন করে। এই সময় আবার ফিরে আসেন মুরারিবাবু, গদাধর তাঁকে ঝাঁটাপেটা করে। পরিশেষে—মুরারিবাবু বলেন—

"মু। ঝেঁটায় ছেড়েছে বিষ ওরে বাপ ধন।
ম। যামিনী চন্দ্রমা হীনা গোপন চুম্বন।"

এই সংক্ষিপ্ত নাটিকায় একদিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ফাটল দেখানো হয়েছে স্ত্রীর পরপুরুষ সংস্পর্শের মাধ্যমে—অন্যদিকে স্বামী স্ত্রৈণ হলে তার কী দুরবস্থা ঘটে তারও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নক্সাধর্মী এই হাস্যরসাত্মক নাটিকাটি প্রহসন হিসেবে সার্থক হতে পারে নি।

ভোট মঙ্গল ঃ

গিরিশচন্দ্র রচিত দ্বিতীয় প্রহসনটি হল 'ভোট মঙ্গল' বা 'সজীব পুতুলো নাচ' (১৮৮২, ১৪ অক্টোবর), ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার রিচার্ড টেম্পেলের সময় কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন বিধিবদ্ধ হয়। আইনের মাধ্যমে নির্বাচিত কমিশনারদের দ্বারা কোলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বায়ত্তশাসন প্রথা চালু হয়। এ সম্পর্কে মিঃ কটন জানান,—

> The constitution of the Municipal Goverment of Calcutta on an elective basis, must however be reckoned the most important of Sir Richard Temple's achievements. By Act IV of the Bengal Council for the year 1876, the Justices handed over their administrative functions to a corporation consisting of seventy-two commissioners, of whom

two-thirds were elected and the remaining third appointed by the Government."[১]

গিরিশচন্দ্রের 'ভোট মঙ্গল' প্রহসনটি এই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। দক্ষ এক পুতুল খেলোয়াড় যেভাবে পুতুলের মাধ্যমেই কোনো বিশেষ যুগ ও গল্পকাহিনীকে তুলে ধরেন, এখানে নাট্যকার সুকৌশলে সুকৌশলে তেমনি পুতুলের সঙ্গে কল্পিত কথোপকথনের মাধ্যমে ভোটপ্রার্থী কমিশনারদের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন মাত্র একটি সম্পূর্ণ দৃশ্যে। প্রহসনের কোনো গুণই এতে নেই। হাস্যরসে সূক্ষ্মতার চেয়ে ভাঁড়ামি বেশি। সাময়িক বিষয় অবলম্বী ব্যঙ্গনাট্যরূপে নাট্যকার এই গ্রন্থটিকে রচনা করলেও এর বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতা সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়।

'ভোটমঙ্গল' প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয় ন্যাশানাল থিয়েটারে। এই প্রহসনের উদ্বোধনী দিনটি ছিল শিল্পীদের সাহায্যে উৎসর্গীকৃত। তাই ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর তারিখে 'ইংলিশম্যান্' পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দেখি,—

"ACTOR'S BENEFIT NIGHT
National Theatre
Saturday, the 14th October, 1882
GRAND DOORGA POOJAH PANTOMIME
VOTE MONGUL
And SITA'S EXILE.....,,

সমকালীন মিউনিসিপ্যাল ভোট সংক্রান্ত বিশেষ আইন, তার প্রয়োগে এবং ভোটের ফলাফল পরবর্তী সময়ে জনমানসের প্রতিক্রিয়া সরসভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ প্রহসনে।

বেল্লিক বাজার ঃ

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের একমাত্র চলনসই প্রহসনটি প্রকাশিত হয়—এটি 'বেল্লিক বাজার।'"[২] এক অঙ্কে সম্পূর্ণ মাত্র ছেচল্লিশ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি 'বড়দিনের পঞ্চরং' নামেও উল্লিখিত হয়ে থাকে। বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে সে সময় বিভিন্ন মঞ্চে নানা ধরনের নাটিকা অভিনীত হত— বড়দিন উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছে এই নাটিকাটি। তামাসার উদ্দেশ্যে হাল্কা মেজাজে এটি পরিবেশিত।

---

১. Calcutta old & New / H. E. H. Cotton / p. 203

২. 'Englishman' পত্রিকায় 'বেল্লিক বাজার'-এর প্রথম অভিনয় রজনীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর। এটি প্রথম অভিনীত হয় ২৫ ডিসেম্বর,—

"Grand Xmas Pantomime
STAR THEATRE
BEADON STREET
. . ..
Next Day, Sunday Boxing Day, at 6-30 p.m.
KAMALAY KAMINI
And a Superbly Mounted Grand New Pantomine
'BALLICk BAZAR
OR THE
'Scamps' Exchange.'......"

বিত্তবান পিতার কুলাঙ্গার পুত্র পিতার মৃত্যুতে মোটেই ব্যথিত নয়, এমন কি নিজ আনন্দের বখরায় কম পড়ে যাবার আশঙ্কায় পিতৃশ্রাদ্ধের দায়দায়িত্ব কুলপুরোহিতের উপর ন্যস্ত করে। দুই বন্ধু—একজন বেকার ডাক্তার, অন্যজন কুটচালে অভ্যস্ত উকিল—এদের পরামর্শে পিতৃ-শ্রাদ্ধের দিন সে এক বনভোজনের আয়োজন করে। কিন্তু সেই পার্টিস্থলে হঠাৎ দুই মত্ত মাতঙ্গের মতো মাতাল গোরার অভ্যুদয় ঘটে। তাদের হাতে যারপরনাই হেনস্তা হয়ে পার্টির দফা হয়ে যায়। কাহিনী এই।

দর্শকেরা যাতে হাস্যরসের সাথে সাথে গীতিরসও আস্বাদন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এতে কয়েকটি গানও সংযোজন করেছেন গিরিশচন্দ্র। কিন্তু এই নক্সাধর্মী ছিন্নচিত্রের সংযোজন, হাস্যরসাত্মক গীতি যোজনা প্রভৃতি এখানে নাট্য-ঐক্যের সৃষ্টিতে সমর্থ হয় নি। চরিত্রসৃষ্টিতেও নাট্যকারের তাদৃশ কৃতিত্ব লক্ষিত হয় না। তবে 'বেল্লিক বাজারে'র বিসদৃশ ঘটনাবিন্যাস এর হাস্যরস উদ্বোধে কিছুটা সহায়তা করেছে।

প্রসঙ্গত আর একটা অনুল্লেখ্য দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের দুটি নাটিকা প্রকাশিত হয়। একটি অবতার মূলক নাটক 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', অন্যটি 'বেল্লিক বাজার' প্রহসন। সচেতন পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন দুটি কাহিনীর মূলেই আছে পিতৃশ্রাদ্ধের দিন নায়কের অনুপস্থিতি। 'বিল্বমঙ্গলে'র কাহিনীতে ওই ঘটনাবিন্যাসের গভীরতায় নায়ক যেখানে হাস্যাস্পদ নয়, সেখানে 'বেল্লিক বাজারে' প্রহসনকারের কাহিনী পরিবেশনের গুণে হাস্যাস্পদ। সম্ভবত 'বিল্বমঙ্গলে'র উক্ত ঘটনাই নট্যকারকে এই ধরনের হাস্যরসাত্মক নাটিকা রচনায় উৎসাহিত করেছে।

'বেল্লিক বাজার' নাটিকার নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গ—দোকড়ি—অমৃতলাল বসু, ললিত—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, পুঁটিরাম—মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মাষ্টার), খুদিরাম—প্রবোধ ঘোষ, কান্তিরাম—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, নসীরাম—শ্যামাচরণ কুণ্ডু, মুক্তারাম—শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণু বাবু), শিব চৌধুরী—অমৃতলাল মিত্র, রঙ্গদার—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), পুরোহিত—অবিনাশ দাস, রামা মুর্দফরাস ও খানসামা—পরাণকৃষ্ণ শীল; চিনাম্যান, মুর্দফরাস ও মেথর —রামতারণ সান্যাল; ললিতের মা, ও মুর্দফরাসনী—গঙ্গামণি, ললিতের পিসি ও মগ—ক্ষেত্রমণি, খেমটাওয়ালীদ্বয়—ভূষণকুমারী ও খোঁড়াকুসুম, রঙ্গিনী—বিনোদিনী।[১]

বড়দিনের বক্‌শিশ্‌ঃ

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের মজাকে ষোলকলায় পূর্ণ করার জন্য গিরিশচন্দ্র একখানি ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্য রচনা করেন; এটি বড়দিনের পঞ্চরৎ শুধু নয়, দর্শকদের উদ্দেশ্যে নাট্যকার তথা নাট্যমঞ্চের বখশিশ্—তাই এটি 'বড়দিনের বক্‌শিশ্‌।[২] এর কাহিনীমূলে রয়েছে অন্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি যুব সমাজের আত্যন্তিক আকর্ষণ জনিত বিসদৃশতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ, হোক, সভ্য হবার নূতনতম পথ অনুসরণের দুর্নিবর হাস্যকর স্পৃহা এতে অভিব্যক্ত। উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণের মাধ্যমে কোলকাতার নব্য-নাগরিকেরা

১. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান / শঙ্কর ভট্টাচার্য / পৃঃ ২২৮

২. ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর 'বড়দিনের বক্‌শিশ্‌' (বা মজা) মিনার্ভা থিয়েটার অভিনীত হয়।

চেয়েছে সভ্য হতে। নক্সাধর্মী এই পঞ্চরংটিতে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর্যহীন অতিরঞ্জিত কাহিনী অনাবিল হাস্যরসের ফেনিল উৎসার ঘটিয়েছে। তবে একথাও ঠিক কোন্ কোন্ স্থানে অন্ধ পাশ্চাত্য-প্রেমিকদের প্রতি প্রাচ্য মানসিকতার অধিকারী গিরিশচন্দ্রের মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। সেই কারণে এটি পরম স্বাদ্য হয় ওঠে নি, হয়ে ওঠে নি সার্থক প্রহসনও।

সভ্যতার পাণ্ডা ঃ

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় গিরিশচন্দ্রের আর একটি পঞ্চরং-জাতীয় রচনা। নক্সধর্মী বা খণ্ডচিত্রধর্মী এই রচনাটির খণ্ডচিত্র-সংস্থাপনই প্রাণ। সিরিয়াস নাটকের অবকাশে দর্শকদের মনে প্রসন্ন হাস্যরসের অনুভব জাগানোর প্রয়াসে এই পাঁচমিশালী পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনার সংযোগে সৃষ্ট 'সভ্যতার পাণ্ডা' রচিত হয়।

উনিশ শতকের আট-নয়ের দশকের স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রসারের প্রচেষ্টা, অত্যাধুনিক হবার প্রয়াসে হিন্দুধর্মের কৃত্য ত্যাগ প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। 'সভ্যতার পাণ্ডা' সৃজনের কারণ সম্ভবত সভ্যতাগর্বী পূর্বোক্ত সমাজের অর্বাচীনতা সম্পর্কে নাট্যকারের পরিহাসপ্রবণ মনোভাব। নূতন বৎসরকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে 'সভ্যতা'র নানান চিন্তা দিয়ে পঞ্চাশ পৃষ্ঠার প্রহসনটি শুরু। তারপর একে একে নানান মজাদার চিত্রের সমাহার।

ভবতারিণী ও বিশ্বেশ্বরী উগ্রাধুনিকা। নিজেদের মধ্যে স্বামীর সম্পর্কে কথা বলতে বলতে ভবতারিণী জানায় "আমার স্বামী মরতে রুমালে একটু অডিকলোম দিয়ে মুখে দিলুম। অডিকলোমের ঝাঁজে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো, আর ফোঁপাতে লাগ্‌লুম।" অতঃপর ভবতারিণী আর তার স্বামী বিচিত্র উপায়ে পরস্পরকে 'ডেথ্ রেজেস্টারী সার্টিফিকেট' দিয়ে চলে যায়—নিজের নিজের জন্য বর আর কনে নীলামে কিনতে। প্রবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সর্বেশ্বর আর তার স্ত্রীর কাহিনীও। যুক্ত হয়েছে এক বৃদ্ধার কাহিনী—যে পাঁচ-ছয়টা বর কেনার কৈফিয়ৎ দিয়েছে এইরকম,—"কি জানেন, পাঁচটি স্বামী আমার মারা গিয়েছে, গোটা পাঁচ ছয় কিনে রাখি, যটা, মরে যটা থাকে।" জুলজিক্যাল গার্ডেনে ছ'টি তামাসা দেখানো হয়েছে। তাতে যথাক্রমে সমাজ সংস্কারক, অধ্যাপক, স্মার্ত ব্রাহ্মণ, স্বেচ্ছাসেবক বা সমাজসেবক, কমিশনার ও পূজারি ব্রাহ্মণদের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বাণের আঘাতে জর্জরিত করা হয়েছে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি মিনার্ভা থিয়েটারে 'সভ্যতার পাণ্ডা' প্রথম অভিনীত হয়।[১]

---

১. প্রথম রজনীতে (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি) 'সভ্যতার পাণ্ডা' প্রহসনের নানা ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের নাম ও ভূমিকালিপি দেওয়া গেল,—পুরাতন বর্ষ—গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়; নূতন বর্ষ—শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রানু বাবু) ; নীলকান্ত ও সেলমাস্টার—অঘোরনাথ পাঠক; পুরোহিত—রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য; সৃষ্টিধর—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু); শীশভূষণ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য; দীনু—অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী; সর্বেশ্বর—ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাসু বাবু); বদ্যিনাথ—নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব; নসে ও বিডার—শ্যামাচরণ কুণ্ডু; ক্রিস্‌মাস্—নীলমণি ঘোষ। খুদেবর—বিজয়কৃষ্ণ দাস (ভোলা); যুবাবর—মণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য; বেহারা—অটলবিহারী চক্রবর্তী; গর্দভ—তিতুরাম দাস; ভেড়া—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ; হাড়গিলে—বামাচরণ সেন; সভ্যতা—তিনকড়ি দাসী; ভবতারিণী ও বৃদ্ধা—জগত্তারিণী; বিশ্বেশ্বরী—গুলফম্‌হরি; কুমুদিনী—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)।

(বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান / শঙ্কর ভট্টাচার্য পৃঃ ৪৫১-৫২)

সপ্তমীতে বিসর্জন :

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় গিরিশচন্দ্রের 'সপ্তমীতে বিসর্জন' প্রহসন। গিরিশ-জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র জানাচ্ছেন,—"পূজার বাজারে কাপ্তেন বাবুদের অকথা বর্ণনা করিয়া এই সামাজিক শ্লেষাত্মক পঞ্চরংখানি লিখিত।"[১] কোলকাতার নব্যবিত্ত সমাজের বেশ্যার প্রতি অন্ধ আসক্তি, পূজোর সময় বেশ্যা মনোরঞ্জনের জন্য সর্বস্বান্ত হওয়া কাপ্তেন বাবুদের নিয়েই এই হাল্‌কা রসের প্রহসনটি রচিত।

গোবর্ধনের মেয়েমানুষ বিরাজের দুর্গাপূজো করে বেদানা নাম্নী বেশ্যার সরস্বতী পূজো করাকে টেক্কা দিতে চাওয়া—এই নাটিকার প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। সপ্তমীর রাত্রিতে হঠাৎ বিরাজের এই মানস হওয়ায় সাতকড়ি গিয়েছিল প্রতিমা কিনতে। কিন্তু হতাশ হয়ে চালচিত্র ঘাড়ে করে ফিরে এসেছে সে। তবে আশ্বাস এই, চালচিত্র এবং কার্তিকের মূর্তি থাকলে দুর্গাপূজোয় ফাঁক থাকে না আর। কারণ সাতকড়ি জানায় "নদের টোল থেকে দাঁয়েরা এই ব্যবস্থা এনেছে, দেবকণ্ঠ পদরত্ন তাঁতে নামসই করে দিয়েছে; কার্ত্তিক আর চালচিত্তিরতে যেমন শুদ্দো পূজো হয়, এমন আর কিছুতেই নয়।"

কিন্তু দুর্গার প্রতিমা না মিললে কার্তিক মিলবে কী করে— কেউ তো আর অযথা কার্তিক মূর্তি বানিয়ে রাখে না। বিরাজকে বিশুদ্ধ প্রেম নিবেদন করতে আসা মামাবাবুকে কার্তিক আর সাতকড়িকে ময়ূর সাজিয়ে পূজো করতে বসে বিরাজকে 'গুহ্যতত্ত্ব' শেখাতে-আসা হুইস্কি-মত্ত গোঁসাই ঠাকুর। পূজোর যা কিছু হুল্লোড় শখের যাত্রাপার্টি, মদের ফোয়ারা, সবই আছে—সব শেষে আসে বিসর্জনের পালা,—কার্তিক, ময়ূরকে একসাথে বেঁধে তাদের সঙ্গে পাথর বেঁধে গঙ্গায় বিসর্জন দেবার আয়োজন করা হল। পাহারাওলা এসে মদে মত্ত এই লোকগুলোর হাত থেকে মামাবাবু আর সাতকড়িকে রক্ষা করে।

অত্যন্ত হাল্‌কা রসের এই পঞ্চরং জাতীয় রচনাটিতে উচ্চ শিল্প সৌকর্যের পরিচয়মাত্র নেই। সমাজ সম্পর্কে পূর্ণদৃষ্টির অভাব এই নাটিকার ব্যর্থতার মূলে। সব চরিত্রই যদি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে—অশালীন আচরণ করে—তবে তাতে যে স্থূল ধরনের হাস্যরসের প্রকাশ ঘটে তা নাট্যকারের যে ক্ষমতার পরিচয় জানায়—তা তাঁর কিছুটা রুচি বিকৃতির।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ অক্টোবর মিনার্ভা থিয়েটারে 'সপ্তমীতে বিসর্জন' অভিনীত হয়। 'সপ্তমীতে বিসর্জন' নাটিকাটি 'আবু হেসেনের' পর অভিনীত হয়েছিল। এই নাটিকার ভূমিকালিপিটি কৌতূহলী পাঠকের জন্য উদ্ধৃত করছি—মামা—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী; গোবর্ধন—বিনোদ বিহারী সোম (পদবাবু), গোঁসাই—হরিভূষণ ভট্টাচার্য; উকিল ও প্যালারাম— কুমুদনাথ সরকার; সাতকড়ি ও দালাল— গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়; বলরাম—দেবকণ্ঠ বাগচী; যাত্রার দলের অধিকারী—পূর্ণচন্দ্র অধিকারী ; আদালতের বেলিফ—অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল; বিরাজ—তিনকড়ি দাসী; বিরাজের মা—গুলফমহরি রেবতী—ভবতারিণী; কৃষ্ণ—টলহরি; রাধিকা—ভূষণকুমারী।[২]

১. গিরিশচন্দ্র/অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় / পৃঃ ৩৯৫

২ বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান / শঙ্কর ভট্টাচার্য / পৃঃ ৪৪৬-৪৭

পাঁচ কনে ঃ

প্রগতিশীলতার নামে যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিষোদগার ঘটেছে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পাঁচ কনে' (১৮৯৬,৫ জানুয়ারি) প্রহসনে।[১] নব্য শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের হামবাগ-ভাব এবং সমাজ সংস্কারের নামে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এই নাটিকার কাহিনী মূলে।

মধুসূদন কিংবা দীনবন্ধুর মতো বাস্তবতার ধার ধারেন নি গিরিশচন্দ্র। পরী-হুরীদের নিয়েই তাঁর কারবার। এই নাটিকাতেও রয়েছে অবাস্তব অস্বাভাবিকতার ভিড়। ঠক দালাল প্রথমেই যে কনের সন্ধান নিয়ে আসে সে কাঁদলে, হাসলে, হাঁচলে, কাশলে নাকি মোহর-সিকি-টাকা দুয়ানি বেরোয়। এসব উদ্ভট কথা বিশ্বাস করেছে এই নাটকের সবচেয়ে কূট মনোভাবাপন্ন চরিত্র ধনকুবের লক্ষ্মীচরণ—এম. এ. পাশ অমূল্যের পিতা। অমূল্য সমাজ সংস্কারক। বিবাহ বিষয়ে তার স্পষ্ট মতো—বিবাহকালে নারীর বয়স হওয়া চাই কমপক্ষে তিরিশ বৎসর। পণ থাকবে না যৌতুক কেবলমাত্র লালপেড়ে শাড়ি, স্ত্রীআচার, বারণ, বাসরঘর নিষিদ্ধ। লক্ষ্মীচরণ পুত্রের বিবাহ দিয়ে বাগান বাড়ি, কোম্পানীর কাগজ আর পুত্রের ওজন সোনার প্রত্যাশী। ঠক ঘটক কালাচাঁদ দরিদ্র শান্তিরামবাবুর চৌদ্দ বৎসরের কন্যা বনবিহারীর সঙ্গে অমূল্যের বিয়ে দেবার জন্য অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। অমূল্যের লাল নিশানের দলের পাল্টা সবুজ নিশানের দল তৈরি করে। কৌশলে অমূল্যকে জানায় যে যেন শান্তিরামের তেত্রিশ বৎসরের মেয়ে (কেননা মেয়ের বয়স কম পক্ষে ত্রিশ না হলে অমূল্য বিয়ে করবে না, তাই চোদ্দ সেজেছে তেত্রিশ) বনবিহারীকে বিয়ে করে সবুজ নিশান দলের সবচেয়ে বড়ো বীর শান্তিরামকে হাত করে নেয়। কারণ এতে একদিকে তার দলের শক্তিবৃদ্ধি হবে। অন্যদিকে Practical Reformationও হবে। অমূল্য তাই করে।

এই কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থপিশাচ লক্ষ্মীচরণের অর্থের লোভে আর একটি বিবাহ। তাছাড়া একজোড়া উড়ে-উড়েনী, টহলদার-কাঠকুড়ুনীর বিবাহ সংঘটনের অবিশ্বাস্য অতিরঞ্জিত কাহিনী রয়েছে। 'পাঁচ কনে' প্রহসনে। সমাজসমস্যা সম্পর্কিত নানান কাহিনী এতে স্থানলাভ করেছে। স্থান পেয়েছে তৎকালীন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্মতি সূচক

---

১. 'পাঁচ কনে' প্রহসনখানি ১৮৯৬ তারিখের ৫ জানুয়ারি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর নাটকের নাম ছিল 'পঞ্চরং'। এটি অভিনয়ের দিনই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রহসনে রূপক-ছলে সমাজের নগ্নচিত্র এবং স্বার্থপর শ্রেণীর বর্ণনা যথাযথ চিত্রিত হয়েছে প্রথম অভিনয় রজনীতে প্রধানত অভিনয় করেছিলেন, কালাচাঁদ—অক্ষয় চক্রবর্তী, অমূল্য—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, নসীরাম—শ্যামাচরণ কুন্ডু, বিপিনকুমারী—তিনকড়ি দাসী।

৪ জানুয়ারি, ১৮৯৬ 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় 'পাঁচ কনে' প্রহসনের প্রথম রজনীর অভিনয় সম্পর্কে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ,—

"THE MINERVA THEATRE
6 Beadon Street, Calcutta.
... ...
Next Day, Sunday. At 7 P.M.
I. Drama....Nal Damyanti
II. New Pantomime...Panch Konay
or five Brides.

G.C.GHOSH.
Manager"

আইন প্রসঙ্গও। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক বিযুক্ত হয়ে উঠেছে এগুলি গ্রন্থন নৈপুণ্যের অভাবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, নাটিকায় সংঘর্ষ সৃষ্টির মুহূর্তে হঠাৎ ঘটেছে সাহেবের আবির্ভাব এবং হস্তক্ষেপে সমস্ত সমস্যার নিরসন ঘটেছে। এই দুর্বলতা নাট্যকার ঢাকা দিতে পারেন নি। তবে সোস্যল রিফরমেশন এর পক্ষপাতী অমূল্যের এবং তার মায়ের আচার আচরণ যথেষ্ট হাস্যরসের খোরাক যোগায়। অমূল্য বাড়ি ফিরলে তার মা তাকে খেতে ডাকেন। সে বলে 'কখন না; ওয়ার ডিক্লেয়ার করেছি, ভাত খাব?' ওয়ারটা যেন তার ভাতে? পুত্রের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ অথচ অর্থলুব্ধ গিন্নি স্বামীকে যখন পরামর্শ দেন 'আমার সতীন হয় হবে, তুমি মেয়ে তিনটে হাতছাড়া কর না' তখন হাস্যরস আর চাপা থাকে না।

আয়না ঃ এতগুলি সামাজিক নক্সা লিখেও গিরিশচন্দ্রের সাধ পূরণ হয় নি, আরও একখানি সমাজদর্পণ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করলেন 'আয়না' প্রহসন। তাঁর অন্যান্য প্রহসনের মতো হাস্যরস সৃষ্টির সব কটি উপাদানই এখানে একসাথে জগাখিচুড়ি পদ্ধতিতে পরিবেশিত। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'বলিদানে' চিত্রিত কন্যাদায়গ্রস্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের হাহুতাশ থেকে শুরু করে বৃদ্ধ গৌরীশঙ্কর মিত্রের তৃতীয়া পত্নীর মৃত্যুতে প্রতিবেশির এক কিশোরী কন্যাকে বিয়ে করার অভীপ্সা প্রকাশ এবং আর এক প্রতিবেশির কৌশলে সেই কিশোরী কন্যার সঙ্গে বৃদ্ধের পৌত্রের বিবাহ বিপন্ন করানো প্রভৃতি নানান হাল্‌কা কাহিনীও রয়েছে।

নক্সাধর্মী এই নাটিকার মধ্যে রয়েছে সভ্য যুবক ও শিক্ষিত যুবতীদের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস। ঘটক, উকিলের উপর কটাক্ষ। মোট কথা গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'আয়না' প্রহসনটি কাঁচ নির্মিত একথা স্বীকার করে নিলেও, সে কাঁচ যে laughing mirror-এর সে কথাও স্বীকার করতে হয়। এর ফলে নাটিকার চরিত্রগুলি অতিরঞ্জনের ছোঁয়ায় অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে—মানবিকতার দাবী পূরণ করে Humour-ধর্মী হাস্যরসের যোগান দিতে পারে নি।

মনের মতন ঃ 'আয়না' প্রহসনটি রচনার পূর্বে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র একটি লঘুরসের নাটিকা রচনা করেছিলেন। হাস্যরসাত্মক মিলনান্ত এই নাটিকা 'মনের মতন'পারস্য উপন্যাসের আখ্যান নিয়ে রচিত। কল্প-গল্পভিত্তিক এই হাল্কা রসের নাটকটির শেষের দিকে সেক্সপীয়রের 'As you like it'-এর আংশিক প্রভাব লক্ষণীয়। তবে এটি কোনো অংশেই প্রহসন গুণান্বিত নয়। 'মনের মতন' নাটিকাটি ক্লাসিক থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয় ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ বৈশাখ (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল) আর 'আয়না' অভিনীত হয় ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ১০ পৌষ (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর)।

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা ঃ

১৩১৩ সালের ১৭ পৌষ (১৯০৭, ১ জানুয়ারি) গিরিশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য প্রহসন 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।[১] ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের

---

১. 'Girish Chandra's 'Jaisa-Ka-Taisa' an entertaining farce based of a Moliere play, was the New Year's offering played on I January, 1907, It had Ardhendu Mustaffi as Haradhone (later done by Dani Babu as well) and Sushila as garab, on of her most successful roles."
(S.K.Mukherjee / The Story of the Calcutta Theatres (1753-1980) P.-90]

'ল' আমুর মেদিস্যাঁর ('L' Amour Medecin') ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র এই নাটিকাটি রচনা করেন। ফরাসী নাটক এর ভিত্তি হলেও পরিবেশনের ঢঙটি সম্পূর্ণ এদেশী।

এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁর একমাত্র কন্যাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। কন্যার বিবাহের বয়ঃকাল উপস্থিত, অথচ পাছে কন্যা পর হয়ে যায় এই আশঙ্কায় পিতা কন্যার বিবাহের আয়োজনের উৎসাহ দেখান না। কন্যা ভালোবাসে এক ডাক্তার যুবা পুরুষকে। বাধ্য হয়ে কন্যা অসুস্থতার ভান করে এবং সেই ডাক্তারকে বাড়িতে আসার সুযোগ করে দেয়। পরিশেষে কীভাবে ধনাঢ্য ব্যক্তি আত্মসম্মান রক্ষার্থে তারই হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করেন 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' প্রহসনের কাহিনী তাই। নাটিকার শেষে রয়েছে নাট্য শিল্প-বহির্ভূত উপায়ে একটি চরিত্রের মুখে নাট্যকারে উদ্দেশ্য বর্ণনা 'হিন্দুয়ানীর মুখ চেয়ে কামড় একটু কম করুন। তা'হলে গৌরিদান প্রভৃতি প্রাচীন শুভ বিবাহ-ক্রিয়া আবার স্থাপিত হয়।"

'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' প্রহসনটিতে একটি প্রস্তাবনা এবং পরিসমাপ্তিতে পট-পরিবর্তন সংযোজিত হয়েছে। তবে মলেয়ারের অনুসরণে বাংলা নাটক রচনায় অমৃতলাল যে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন গিরিশচন্দ্রের মধ্যে আমরা তার ততখানি সমুৎকর্ষ লক্ষ্য করি না। কিন্তু কৌতুকরসের সহজ উৎসারে এই প্রহসনটি পরম স্বাদ্য হয়ে উঠেছে।

এগুলি ছাড়াও গিরিশচন্দ্র আরও কয়েকটি প্রহসন রচনা করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'চাবুক' উল্লেখযোগ্য।

ত্রুটি : গিরিশচন্দ্রের প্রহসনগুলি কোনও ক্ষেত্রেই সার্থক প্রহসন রূপে মর্যাদা পাবার যোগ্য হতে পারে নি। কারণ তাঁর প্রহসনগুলি অজস্র ত্রুটিপূর্ণ। প্রথম ত্রুটি গিরিশচন্দ্রের প্রহসনগুলি রচিত হয়েছে কেবলমাত্র মঞ্চের প্রয়োজন মেটাতে দর্শক-রুচির দিকে তাকিয়েই—এক্ষেত্রে তিনি নীতি-দুর্নীতি, সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার বাছ-বিচারে মনোযোগী হন নি। দ্বিতীয় ত্রুটি, প্রহসন-গুলির কাহিনীতে অসংবদ্ধতায়—কাহিনীর স্কেচধর্মিতা এবং ধারাবাহিকতার অভাব এর প্রমাণ। তৃতীয় ত্রুটি উদ্দেশ্য-সর্বস্বতায়। নাটিকায় শেষে আগবাড়িয়ে নীতিকথা শোনানোর প্রয়াসে তা প্রমাণিত। চতুর্থ ত্রুটি বাস্তব অনুসরণের ক্ষেত্রে অবাস্তব কাহিনী ও চরিত্র সৃজন—যেগুলি পুরোপুরি বাস্তবতা বিবর্জিত। পরিশেষে বলা যায়, মলেয়ারের নাটকের কাহিনী অনুসরণ করতে গিয়েও তিনি সার্থক হন নি। কারণ মলেয়ারের নাটকের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে নৃত্যগীতের প্রচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে ফার্সের অংশও বেশি পরিমাণে উপস্থিত। যে কারণে এগুলি 'musicalj comedy' বা 'Human Comedy[১] নামে অভিহিত হয়েছে। কিন্তু মলেয়ারের এই 'Comedy-ballet' গিরিশচন্দ্রের হাতে নৃত্যগীত সর্বস্ব স্কেচে পরিণত হয়েছে।

---

১১. মলেয়ারের নাটক 'monsieur de Pourceaugnac'. সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন—"His comedy-ballet Monsieur de Pourceaugnac, which played havoc with a Provincial who finds himself at sea in the capital proved to be one of his broadest farces and capped his experiments in what would now be called 'Musical comedy'-The 'Human comedy' of Moliere' More"-Masters of the Drama/John Gassner / P. 299

গিরিশচন্দ্রের প্রহসনগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রসঙ্গত আলোকপাত করা যায়। (এক) গিরিশচন্দ্রের প্রহসনগুলিতে কোনো অঙ্ক বিভাগ নেই, দৃশ্য বিভাগ আছে। (দুই) প্রায় অধিকাংশ প্রহসনের হাস্যরসের উৎস দৃশ্যবিন্যাস বা অসংলগ্ন কথাবার্তা। (তিন) প্রতিটি প্রহসনেই সমাজের প্রায় সমস্ত সমস্যার কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে উপস্থিত—অনেকক্ষেত্রে সেগুলি এসেছে প্রসঙ্গ বহির্ভূতভাবে। কোথাও-বা মঞ্চে নাটক জমাবার ইচ্ছায় গিরিশের প্রহসনে ঘটেছে দীনবন্ধু অথবা মধুসূদনের প্রহসনের সচেতন অনুসরণ। (চার) নাট্যকারের রক্ষণশীল মনোভাবের অসহিষ্ণু প্রকাশও গিরিশচন্দ্রের প্রহসনগুলির একটি বৈশিষ্ট্য। ফলত উগ্র satire-ধর্মী হয়ে গেছে তাঁর অধিকাংশ হাস্যরসাত্মক নাটিকাগুলি।

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯—১৮৯৪)

রাজকৃষ্ণ রায় বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি বহু উচ্চারিত নাম। তাঁর বিখ্যাতি তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির জন্য। ভক্তিরস-পিপাসু বাঙালি দর্শককুলকে তিনি গিরিশচন্দ্রের মতো ভক্তিরস ধারায় নিষ্ণাত করেছিলেন। তবে গিরিশচন্দ্রের মতো ভক্তিরসের গভীরে প্রবেশ না করে তিনি সহজ ফরমূলায় সাধারণের কাছে সহজবোধ্য এবং গ্রহণযোগ্যরূপে পৌরাণিক নাটক পরিবেশন করে দর্শকদের অনায়াসে আকৃষ্ট করেছিলেন। মৌলিক কল্পনাশক্তির দীনতা নাট্যকার রাজকৃষ্ণকে মর্যাদার উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে দেয় নি। বাস্তব পরিস্থিতির চিত্রায়ণে সঠিক ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতাও ছিল তাঁর অনায়ত্ত। তাই প্রহসনে রচনাতে তিনি তাদৃশ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। বীণা থিয়েটারের কর্ণধার হবার পর থিয়েটার অভিনয়ের জন্য রাজকৃষ্ণ অনেকগুলি প্রহসন জাতীয় ক্ষুদ্র হাস্যরসাত্মক নাটিকা রচনা করেছিলেন। কিন্তু প্রহসন হিসেবে এগুলি অধিকাংশই ব্যর্থ হয়েছে, যদিও এই নাটিকাগুলির কয়েকটি বেশ মঞ্চসফল হয়েছিল। রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহসনগুলিতে দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদনের প্রহসন ও গিরিশচন্দ্রের পঞ্চরং জাতীয় গ্রন্থগুলির কাহিনীগত কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়।

উৎকট বিরহ—বিকট মিলন ঃ

রাজকৃষ্ণ রায় রচিত প্রথম হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'উৎকট বিরহ—বিকট মিলন' বা 'আগমনী-বিজয়া'। নাট্যকার নিজে এই গ্রন্থটিকে 'ঔপহাসিক—হাস্যনাট' (A PAOODICAL COMEDY) রূপে উল্লেখ করেছেন চার অঙ্কে রচিত এই হাস্য নাটিকাতে মদ্যপানের কুফল এবং তার পরিণাম কেমন হয় তাই চিত্রিত হয়েছে। কাহিনী বিন্যাসে অভিনবত্ব কিছু নেই। চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করেই রাজকৃষ্ণ তাঁর এই হাস্যরসাত্মক নাটিকাটি রচনা করেছেন। তবে প্রাহসনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব নাটিকাটিকে প্রহসনের স্তরে উন্নীত হতে দেয় নি।

মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বোদে এই নাটিকায় তার সমস্ত চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত। বাবুদের অনুপস্থিতিতে মদ্যপান পর্যন্ত সে করেছে মধুসূদনের বোদের ঢঙে। তাছাড়া এই নাটিকার কথোপকথন রচিত হয়েছে মিলনান্ত পদ্য সংলাপে। যেমন, নিমাই ছুতোর (সূত্রধর) কে দিয়ে জগৎবাবা নদীর উপর গোলবারান্দা নির্মাণ করাতে চান। ভৃত্য গেছে তাকে ডেকে এনেছে। তাদের পারস্পরিক সংলাপ,—

"বো। ওই জানালার উদিক পানে/একটা আছে কাজ;
গোল বারাণ্ডা গোড়্‌তে হবে/বাবুর হুকুম আজ।
নি। ওরে বাবা, দেয়াল ঘেঁসে/জল ছুট্‌চে যেন ঘোঁড়া।
বো। বারান্ডাটা কোত্তে হবে/ওরি ওপর খাড়া।" (১/১)

মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ভোজনবিলাসী ব্রাহ্মণ 'সংস্কৃত নাটকের বয়স্য' ভারতচন্দ্রের একাবলী ছন্দের খেলে কবি রাজকৃষ্ণের এই প্রহসনটি উৎকট হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। নাটিকার পাঠ্যগুণ যেটুকুও-বা আছে অভিনয় যোগ্যতা তার এক সিকিও নেই। নিমাইচরণের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার জন্য জগৎ চৌধুরী, সুবল বসু যুগল ভাদুড়ীর শাস্তিলাভ এবং পরিশেষে নিমাই ও রাধামণির উৎকট মিলন এ নাটকের কাঙ্ক্ষিত সমাপ্তি ঘটিয়েছে।

দ্বাদশ গোপাল ঃ

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জুলাই প্রকাশিত রাজকৃষ্ণের 'দ্বাদশ গোপাল' নাটি-কাটিতেও মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। হুগলি জেলার মাহেশের দ্বাদশ গোপালের মেলা দেখতে গিয়ে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বাবুয়ানী-সর্বস্ব মানুষেরা যেভাবে গঙ্গাবক্ষে মদ্যপান, ব্যভিচার ও হুলস্লোড় করত তারই এক নক্সাধর্মী চিত্র এঁকেছেন নাট্যকার এই নাটিকায়।

'সমাচার দর্পণ' (১১ আষাঢ়, ১২২৮) পত্রিকার একটি সংবাদে জানতে পারি,—

শৌকিন বাবু

নগরবাসি অনেক ভাগ্যবান লোক ও বাবু লোক অনেকে দর্শন সুখার্থী অল্প পারমার্থিক স্নানযাত্রা দেখিতে কেহবা দেখাইতে বৎসর ২ গিয়া থাকেন এবং এ বৎসরও গিয়াছিলেন যাঁহার যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তিনি তাহার মতো দ্রব্যাদি এবং লোক লইয়া যান কেহ ২ গায়ক গুণী কেহবা বেশ্যা কেহবা ভাঁড় কেহবা বাই লইয়া বজরা অথবা পিনীষ কিংবা কয়াটার ভাউলে পানসী ডিঙ্গী এবং জেলে ডিঙ্গী প্রভৃতি যাহার যেমত শক্তি তাহাই ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রতিবৎসর দেখিয়া শুনিয়া এ বৎসর একজন নতুন শৌকীন বাবু শৌক করিয়া আপন স্ত্রীকে লইয়া এক হাপ বজরা ভাড়া করিয়া স্নানযাত্রা দেখিতে প্রস্থান করিয়া যখন নৌকায় আরোহণ করেন তখন মাজিরা কহিলেক যে বাবুজী নৌকায় যাইতে বড়ো কাদা অতএব বিবি ঠাকুরাণীকে আমরা দুই জন মাজি লইয়া নৌকারোহণ করাই পরে আর ২ বিবিরদিগকে যে প্রকার করিয়া লইয়া যায় এ বিবিকেও সেই প্রকার না করিলে হইবেক কেনো।

অনন্তর নৌকার উপরে গিয়া বাবু চতুর্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে সকল বজরা প্রভৃতির উপরে আর ২ যত অপ্সরারা আছেন সকলি প্রায় নৃত্য করিতেছেন কেহবা গান কেহবা পান মান ইত্যাদি করিতেছেন। এ সুন্দরী তাহার কিছুই জানেন না ইহাতে বাবু খেদান্বিত হইয়া কহিলেন তুমি এক কর্ম্ম কর কেবল শোজা খেঁউড় গীত গাও আমি খেমটা বাদ্য বাজাই আর সেই তালে নৃত্য কর। তিনি সাধ্বী স্ত্রী বাবুর শৌক অনুযায়ি তাবৎ কর্ম্ম সমস্ত রাত্রি করিলেন কোন প্রকারে বাবুর খেদ রাখিলেন না।

প্রভাতে মাহেশের ঘাটে যখন নৌকা লাগিল গুণানিধি বাবু স্নান দর্শনার্থে চলিলেন সেই সময়ে তাহার মনোরমা নৌকা হইতে নামিয়া পূর্ণিমার মধ্যে গঙ্গাস্থান করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে ভগবান জোয়াররূপ হইয়া আইলেন পরে অনেক নৌকায় ভিড় হওয়াতে বড় গোল হইল। গুণবতী আপন নৌকা চিনিতে না পারিয়া কোনো পুণ্যবানের নৌকাতে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করিলেন কিংবা কাহারো সহিত সংকেতই বা ছিল কিছু বুঝা গেল না কিন্তু পুনরায় গুণনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না সেই স্থানযাত্রায় শুভযাত্রা করিয়াছেন মনে করি হতভাগার ভাগ্যে আর দেখা হয় কি না হয় কিন্তু বাবু সেই ঘাটে ২ মঙ্গল গান গাইয়া বেড়াইলেন এবং ওই নগরের দ্বারে ২ অন্বেষণ করিলেন সাক্ষাৎ হইল না।

অতএব নিবেদন হে শৌকীন মহাশয়েরা এই মত শৌক শুনিয়া বমি উঠে সাবধান ২ এমত কর্ম্ম আর কেহ না করেন।"[১]

১. সংবাদপত্রে সেকালের কথা/ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/পৃঃ ১০২

'সমাজ সংস্কারের শুভবুদ্ধি প্রণোদিত' হয়ে একাঙ্কাঙ্গ 'দ্বাদশ গোপাল' প্রহসনটি লেখা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র নাটিকাটিতে তৎকালীন অনেকগুলি সামাজিক ব্যাধিকে এক-সঙ্গে স্থান দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক প্রহসনটির কাহিনী নিম্নরূপ—

একজন অবিদ্যা বা রক্ষিতাকে নিয়ে চার ইয়ার—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরলাল ঘোষাল, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, জহরলাল পন্ডিত মাহেশে দ্বাদশ গোপালের মেলা দেখতে চলেছে। নন্দলাল শালগ্রামের পৈতা চুরি করে তিরিশ টাকায় বিক্রি করেছে। তিলোত্তমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সে 'ডজন ডজন সুরেশ্বরী / এই এনেচি বাক্সভরা'। হরলাল তিলোত্তমার হাসি দেখার জন্য স্ত্রীকে প্রহার করে তার কণ্ঠহার ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। বিধুভূষণ Peley & Co. এর চাকরির দেড়শ টাকা স্ত্রী পুত্রকে না দিয়ে তিলোত্তমার হাতে তুলে দেয়। জহর তিলোত্তমাকেই সর্বস্ব জ্ঞান করে। তিলোত্তমা মনে মনে হাসে এসবে। ভাবে,—

"চার শালাকে পায়ের তলে
নাটাই ঘোরাই মনের সাধে,
আর দু'দিনে ভিটেয় ঘুঘু
চরিয়ে দেবো জড়িয়ে ফাঁদে!"

পুনঃ পুনঃ মদ্যপান করতে করতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে তারা। বন্ধুত্বের বন্ধন খসে পড়ে। তিলোত্তমাকে তারা কে কতখানি ভালোবাসে তা দেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিধুভূষণ ইংরেজ কোম্পানীতে কাজ করে তাই সে স্কটল্যান্ডের কবি রবার্ট বার্ন্সের Bonny Peggy Alison নামক গীতিকবিতা থেকে আবৃত্তি করতে থাকে—

"I'll kiss thee yet, yet,
And I'll kiss thee O'er again;
And I'll kiss thee yet, yet,
My bonnie Peggy Alison !"

চার ইয়ারের পারস্পরিক কোন্দল দেখে ইন্সপেক্টর সাহেব পুলিশ নিয়ে হাজির। নারীরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে মদ্যপদের ধিক্কার দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত চার ইয়ার আর তিলোত্তমাকে নিয়ে ইন্সপেক্টর থানায় চললেন। পরিশেষে বাউলের গান,—

"তোদের মতন অনেক বদ্ ইয়ার
দ্বাদশ গোপাল দেক্তে এসে, দেখে কারাগার...."

হাস্যরসের মধ্যে Humour এর তুলনায় wit-ই এখানে পেয়েছে। 'জ্ঞানগর্ভ শিক্ষাভিমানী' ছদ্মনামে এই প্রহসনটি রাজকৃষ্ণ রচনা করেছিলেন। শিক্ষাভিমানীর মতই শিক্ষগর্ব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন প্রহসনটিতে। 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের মতো তাঁর প্রহসনেও বিধুভূষণ ইংরেজি বুকনি আওড়াতে যায়—তবে তাও নেহাৎ প্রসঙ্গ-হীনভাবে এবং মাত্র একবারই। মনে হয়, ইংরেজি শিক্ষিতদের শিক্ষাভিমানকে তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যই রাজকৃষ্ণের এ নাট্য-প্রয়াস।

কলির প্রহলাদ ঃ

'প্রহলাদ চরিত্রে'র জনপ্রিয়তা রাজকৃষ্ণ রায়কে যতটা সম্মান দিয়েছিল ততটা অর্থ দেয় নি। নারী পুরুষ একত্রে থিয়েটার করায় নাট্যকারের ঘোর আপত্তি ছিল। 'অনুসন্ধান' পত্রিকার

১৪ ডিসেম্বর সংখ্যায় জানানো হয়—"বীণা রঙ্গভূমি। কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় বীণা রঙ্গ ভূমির একমাত্র অধিকারী ও পরিচালক। সাধারণ থিয়েটারে যে যে কুরুচি আছে, তাহাই দুর করা তাঁহার উদ্দেশ্য; সুতরাং এ থিয়েটারে বারাঙ্গনা নাই; পুরুষ দ্বারা স্ত্রী অংশ অভিনীত হয়। আর, ইহাই এ থিয়েটারের নূতনত্ব"।[১]

'কলির প্রহলাদ নাটিকায় রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী নিয়োগের কুফল বর্ণনা করেছেন রাজকৃষ্ণ। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে রাজকৃষ্ণ রায়ের মানসিক গঠনের পার্থক্যটুকু এখানে ধরা পড়েছে। তবে 'কলির প্রহলাদ'কে খাঁটি প্রহসন বলা যায় না। এটি ব্যঙ্গ নাটিকা। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর বীণা রঙ্গমঞ্চে আর্যনাট্য সমাজ কর্তৃক এটি অভিনীত হয়েছিল। নাটিকাটি বেশি বার অভিনীত হয় নি। কারণ দর্শক হৃদয় জয় করার সামর্থ্য এ নাটিকার অতখানি ছিল না। তবে নারীকে যাঁরা ঘরের আসবাবের মতো সাজিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁর 'কলির প্রহলাদ' প্রহসনটি দেখে তারা পরম তৃপ্তি পেয়েছিলেন।

কাণাকড়ি ঃ

রাজকৃষ্ণের satirist মানসিকতায় পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁর নক্সাধর্মী হাস্যরসাত্মক রচনা 'কাণাকড়ি'তে (১৮৮৮, ২৮ অক্টোবর)। এই ক্ষুদ্র প্রহসনে (২২ পৃষ্ঠার) নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় ডাক্তার, পত্রিকা সম্পাদক, এটর্নি, বড়বাবু ও সমালোচক সবাইকেই এক হাত করে নিয়েছেন।

মেসার্স মেকেঞ্জি লায়েল এন্ড কোম্পানীর নীলাম ঘরের কাছে একে একে নীলাম হবে উপরোক্ত 'মাল'দের। খদ্দেররা হাজির এটর্নী এক নম্বর লাটের মাল। 'মালে'রা নিজেরাই খদ্দেরদের কাছে নিজ নিজ উৎকর্ষ বর্ণনা করে। এটর্নী না-পড়ে পন্ডিত। এটর্নী মানে অতরণী অর্থাৎ তরণীর মতো সে তরায় না কারণ সে তরণী নয়, তাই সে ডোবায়। আবদুল মিঞা তাকে আট কড়া কানাকড়ি দিয়ে কিনে নেয়।

দু'নম্বর মাল ডাক্তার। জগবন্ধু উড়ে তাকে তিন কানাকড়িতে কিনে নিয়েও ভাবে যে সে লোকসান করেছে। কারণ "মক্কেলের যম মোক্তার, রুগীর যম ডাক্তার।" Anatomy শিখতে গিয়ে রোগীর হাড়ে দুব্বো গজানোর কায়দা সে শিখে নিয়েছে।

তিন নম্বর মাল এডিটর অর্থাৎ Aid-eater 'শব্দগত অর্থ হচ্ছে 'সাহায্য ভক্ষক' কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ 'জুয়াচোর'—কারণ সম্পাদকের জাতধর্ম বলে কিছু থাকে না, নিজের মতেরও স্থিরতা নেই। তার নিজের ভাষায় "আজ যা লিখি কাল তা নিজেই কাটি—অর্থাৎ থুথু ফেলে আবার চাটি।"

চার নম্বর মাল হেডবাবু। নিজের গুণপনা বর্ণনা করতে গিয়ে সে বলে 'যেখান খাইবার পাশের পশ্চিমে কাবুল—পূর্বে ইন্ডিয়া, তেমনি আমার ডাইনে সাহেব—বাঁয়ে বাঙ্গালী..... এডিটরকে এ কানাকড়িতে হরেকচাঁদ আর বড়বাবুকে ছন্নামল জহুরী দুই কানাকড়িতে কিনে নেয়।

পাঁচ নম্বর মাল ক্রিটিক। যে 'কেউ কিছু ঘুষ-ঘাস দিলে তাকেও মাথায় করে ঢাক

১. সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ৫০/পৃঃ ১৮

বাজান।' এক বুড়ি আধ কানাকড়িতে তাকে কিনে নিয়ে যায়। কসাই-এর মতো অর্থ রোজগারে অমানবিক পন্থা অবলম্বন করে যারা, তাদের সবার বিরুদ্ধে রাজকৃষ্ণ এমন রূঢ় হয়ে উঠেছেন যে 'কানাকড়ি'র নাট্যমূল্য কানাকড়িও অবিশিষ্ট থাকে নি। আক্রমণই মুখ্য হয়ে উঠেছে এখানে। হাসির চেয়ে আক্রোশ প্রধান হয়ে উঠেছে।

খোকাবাবু, বেলুনে বাঙ্গালী বিবি, জুজু ঃ

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ রাজকৃষ্ণ রায়ের ক্ষেত্রে প্রহসন রচনার ঐশ্বর্য যুগ বিশেষ। কেননা এ বৎসর প্রায় সাতখানি প্রহসন রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে আবার মার্চ মাসে ২ তারিখে প্রকাশিত হয় দুটি নাটিকা 'খোকাবাবু' ও 'বেলুনে বাঙ্গালী বিবি এবং ২৫ তারিখে প্রকাশিত হয় 'ডাক্তারবাবু', ৯ জুলাই 'জুজু', ৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় 'টাট্‌কা-টোট্‌কা', ১৫ সেপ্টেম্বর 'জগা পাগলা,' ৪ অক্টোবর 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্র'। এ নাটিকাগুলির আয়তন খুবই সংক্ষিপ্ত।

'খোকাবাবু' প্রহসনের পরিশিষ্টরূপে নাট্যকার উল্লেখ করেছেন 'বেলুনে বাঙ্গালী বিবি' ও 'জুজু' প্রহসন দুটিকে। মায়ের প্রশ্রয়ে মাথায় ওঠা বড়লোকের ঘরের আদুরে ছেলে নন্দদুলালের বিচিত্র কেরামতি ব্যক্ত হয়েছে এখানে। খোকাবাবুর বাবা দয়াল বড়লোক, তার দুই মোসাহেব মনসা আর ফেলারাম। দয়াল স্ত্রী বশ। 'খোকাবাবু' প্রহসনে রয়েছে তৎকালীন হুজুগে বাঙালির সাহেবদের দেখাদেখি সখের কাজ কবার প্রবণতার কাহিনী। সাহেবদের তাঁবু দেখে খোকাবাবুর তাঁবুতে ইচ্ছা প্রকাশ, পত্নীর অনুরোধে দয়ালের পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তাঁবু কিনে আনা ও মাতা পুত্রের তাঁবুতে বাস। বৃক্ষে হনুমানের ডাক শুনে খোকাবাবুর হনুমান দেখার সাধ, স্ত্রীর আদেশে দয়ালের হনুমানের সজ্জা ধারণ ও হনুমানের মতো নৃত্যকরণ প্রভৃতি। পরিশেষে দয়ালের ক্ষোভ 'আমার মত যারা মেগের বশ, তাদের ভাগ্যে এম্‌নি যশ।" 'খোকাবাবু' প্রহসনটি ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর 'বীণা' থিয়েটারে' অভিনীত হয়। যদিও মুদ্রিত আকারে পর বৎসর প্রকাশিত হয়।

কোলকাতা শহর মেতে উঠেছে বেলুনে চড়ে আকাশে ওড়াকে কেন্দ্র করে।[১] বাউলেরা গান গাইছে 'National Magazine' পত্রিকায় সংবাদ বেরিয়েছে। বাঙ্গালী রামচন্দ্র

---

১ বেলুনে চড়ে আকাশে ওড়ার ঘটনা তৎকালীন মানসে এমন ছাপ মুদ্রিত করেছিল, যে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও উৎসাহভয়ের মানুষের আকাশে ওড়ার ইতিহাস অন্বেষণ করেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন'

তিনি লিখেছেন—"সামান্য মনুষ্যের চিরকাল সাধ গগন পর্যটন করে। কথিত আছে, তারন্তম নগরবাসী আকাইতস নামক এক ব্যক্তি ৪০০ খৃষ্টাব্দে একটি কাঠের পক্ষী প্রস্তুত করিয়াছিল; তাহা কিয়ংক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল। ৬৬ খৃষ্টাব্দে, সাইমন নামক এক ব্যক্তি রোমনগর প্রাসাদ হইতে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়াছিল। এবং তৎপরে কনস্তান্তিনোপল নগরে একজন মুসলমান ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দান্তে নামক একজন গণিত শাস্ত্রিবৎ পক্ষ নির্মাণ করিয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া ফ্লাসীমিন হ্রদের উপর উঠিয়া গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। .... ১৬৩৮ সালে গোল্ডউইন নামক এক ব্যক্তি শিক্ষিত হংসদিগের সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন। ১৬৭৮ সালে বেনিয়র নামক একজন ফরাসী পক্ষ প্রস্তুতপূর্বক হস্ত পদে বাঁধিয়া উড়িয়াছিল। ১৭১০ সালে লরেন্ত দে গুজমান নামক একজন ফরাসী দারুনির্মিত বায়ুপূর্ণ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিল।"

চট্টোপাধ্যায় বেলুনে আকাশে উঠেছেন প্রথম।[১] স্পেনসর সাহেব উঠবেন চতুর্থ বার "Mr. spencer's fourth attempt will be ever memorable for, on this occasion a native of India–a Bengalee gentleman named Babu Ramchandra Chatterji for the first time in the annals of India, ascended with Mr. Spencer in a ballon from the grounds of the Calcutta Gas Works in Narikeldanga"[২]

বেলুন সম্পর্কে এই হৈচৈ-এর খবরে খোকাবাবু বিচলিত। সেও বেলুনে চড়তে চায়। কিন্তু খোকার মা খোকার এই ইচ্ছের কথা শুনে নিজেই বেলুনে চড়তে মনস্থ করেন, খোকাকে নিরুৎসাহিত করতে মা বলেন 'বাঙালী পুরুষ বেলুনে উড়লে বাঙ্গালীরে তাকে উৎসাহ দেয়না।[৩] নিজের পক্ষে তাঁর বক্তব্য 'ইংরেজের দেশে বিবিতেও বেলুনে চোড়ে ওড়ে... তবে কি দোষ কল্লে ইংরিজি পড়া বাঙালি বিবি?' সুতরাং গ্যাসভরা বেলুনে চড়ে বসেন গাউন পরা খোকার মা। আকাশে উড়তে গিন্নী আওয়াজ করেন 'হুর্‌রে'। দয়াল দড়ি ধরে থাকেন, পাছে গিন্নী নিরুদ্দেশ হয়ে যান। স্ত্রৈণ স্বামী, আদুরে ছেলে এবং মুখরা স্ত্রীর চরিত্র এতে চমৎকার ফুটেছে।

সমকালীন কোন ইতিহাস নিয়ে নয়, খোকাবাবুর বিচিত্র কান্ডকারখানা নিয়ে সৃষ্ট হাস্যরসাত্মক 'জুজু' প্রহসনটি। ধনীর দুলাল খোকাবাবুর শিক্ষার জন্য শিক্ষক চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। মনসারামের কৌশলে মাত্র একজন পন্ডিত টেকেন; যিনি এক সঙ্গে পূজো করা, পড়ানো এবং মুরগী রান্নায় এক কথায় রাজী। নাম তাঁর সর্বভক্ষ মুখোপাধ্যায়। জুজু সেজে কীভাবে খোকাবাবু সেই মাস্টারমশাইকে তাড়ালে—তারই এক অবাস্তব হাস্যকর চিত্র আঁকা হয়েছে 'জুজু' প্রহসনে। এখানে রাজকৃষ্ণ যেন দর্শকদের নাবালক শিশু ভেবে বসেছেন, তাই তাঁর চরিত্রেরা যা খুশি তাই করে দর্শকের উপর বিশ্বাসের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে অনেকটা আদেশের সুরে।

'জুজু'র শেষ অংশে রয়েছে একটি চিরন্তন নীতিশিক্ষা 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' যে গিন্নী খোকাবাবুকে ভালোবেসে নাকি প্রাণ দিতে পারেন, যাঁর ভালোবাসা পেয়ে পেয়ে

১. বিশ্বে প্রথম বেলুনে চড়ে মানুষ আকাশে উড়েছিলেন ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুন, ফ্রান্সের এলোন শহরে, দুই ভাই জোসেফ আর মগোল হলেন সেই আরোহীদ্বয়। কোলকাতায় প্রথম বেলুনে ওড়ার কৃতিত্ব জনৈক ফরাসী রবার্টসনের। ১২৪৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (১৮৩৬) মুচিখোলায় তিনি প্রথম বেলুনে চড়ে উড়ে দেখান। তারপর কাইট নামে ইংরেজ সাহেব বেলুনে চড়েন। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি আকাশে ওড়েন তিনি পার্সিভেল স্পেনসার। চতুর্থ ব্যক্তিরূপে বেলুনে চড়ে আকাশে ওড়েন রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কোলকাতার বিখ্যাত ধনী গোপাল মুখোপাধ্যায় এ ব্যাপারে রামচন্দ্রকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

২ National Magazine / 1890 July.

স্পেনসার বেলুনে চড়ে আকাশে উঠে বেলুন ছেড়ে দিয়ে প্যারসুটে করে নেমে আসতেন মাটিতে। পরে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও একাজ করেছেন। তবে স্পেনসারকে নিয়েই হৈচৈ হয়েছে অনেক বেশি। পার্সিভেল স্পেনসার কে নিয়ে 'গড়ের মাঠে বেলুনে' নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছিল এই বিশেষ ঘটনার স্মারক হিসেবে।

৩ স্মরণীয়, বেলুনে আকাশে উঠে স্পেনসার সাহেবের মতো আকাশ থেকে প্যারাসুটের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে মাটিতে নেমে এলেও রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্পেনসারের মতো বাহবা পাননি।

খোকাবাবুর এই সর্বনাশ, জুজুর হাত থেকে বাঁচার তাগাদায় তাকে ফেলে সেই মাও পগার পার।

সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং অন্যের গ্রন্থের বর্ণনাকে অনুসরণ করে প্রহসনকার রাজকৃষ্ণ সমকালীন বহু আলোচিত বাবুদের জীবন-চিত্রকে হাস্যরসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন এই নাটিকাত্রয়ীতে।

ডাক্তারবাবু ঃ

ডাক্তারদের উপর বোধ হয় রাজকৃষ্ণের কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ ছিল, 'কানাকড়ি' প্রহসনে 'ডাক্তারবাবু'র গুণপনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন তাদের tiitle আসলে 'tie-tail' অর্থাৎ লেজে বাঁধা। 'ডাক্তারবাবু' (১৮৯০, ২৫ মার্চ) প্রহসনে স্বল্পাবকাশে ডাক্তারের চরিত্রভ্রষ্টতা ও কবিরাজের অক্ষরজ্ঞানশূন্যতাকে তুলে ধরেছেন সরস ভঙ্গিতে। প্রহসন হিসেবে এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি সার্থক নয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি এই নাটিকাটি প্রথম বীণা থিয়েটারে অভিনীত হয়।

টাট্‌কা-টোট্‌কা ঃ

রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহসন নামধারী আর একটি রচনা 'টাট্‌কা-টোট্‌কা' (১৮৯০, ৯ সেপ্টেম্বর) চরিত্রহীন ছাত্রের চরিত্র সংশোধনের পদ্ধতিতে উপযোগবাদের ভিত্তিতে নির্মিত। লম্পট, চরিত্রহীন ছাত্রের সংশোধনের 'টোট্‌কা' অর্থাৎ মুষ্টিযোগ এই নাটিকায় রয়েছে। চন্ডীপুরের ব্রাহ্মণ সন্তান হেমচন্দ্র কোলকাতায় বি. এ. পড়তে এসে এমন মদ্যপ ও লম্পট হয়ে উঠেছে যে ছুটির সময় বাড়ি ফিরলে গ্রামের লোকেরা এবং মেয়েরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মাধবের বৌ চন্দ্রমুখী হেমচন্দ্রের জ্বালার অতিষ্ঠ। মাধব সব কথা শুনে গ্রামের ছেলে নিমাই-এর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করে, কারণ নিমাই একদিন হেমচন্দ্রের কাছে অপমানিত হয়েছিল। মাধবের পরামর্শে চন্দ্রমুখী হেমচন্দ্রকে ঘরে ডেকে আসে—স্বামী তিন চার দিনের জন্যে বাইরে গেছে বলে। নিমাই নারী সেজে রাত্রে হেমচন্দ্রকে ঘরে বসায়। ইতিমধ্যে মাধব শরীর খারাপের অজুহাতে বাড়ীতে ফিরে আসে। চন্দ্রমুখীর ছদ্মবেশী নিমাইকে মা ও মাধবকে বাবা সম্বোধন করেও সে নিস্তার পায় না। চড়চাপড়, ঝাঁটার বড়ি বুপ দিব্য ঔষধের গুণে যে স্বীকার করে যে তার 'বাই তো বাই পিত্তি পর্য্যন্ত ছুটে গেছে।'

প্রহসনটির সংলাপের গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা নাটিকাটিকে নষ্ট করেছে। দীনবন্ধুর অনুকরণ স্থানে স্থানে বড়ো দৃষ্টিকটু ঠেকেছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ ফেব্রুয়ারি বীণা থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে ইন্ডিয়ান থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত হয় 'টাট্‌কা-টোট্‌কা'।

জগা পাগ্‌লা ঃ

সমকালীন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়, বহু প্রচলিত লৌকিক গালগল্পের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে 'জগা পাগ্‌লা' বা 'জ্যান্তে মরা' (১৮৯০, ১৫ সেপ্টেম্বর) প্রহসনটি।

'শিবায়ন' কাব্যে শিবের বর দেওয়ার সঙ্গে এখানে পরীদের বর দেওয়ার এক ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য রয়েছে। জগবন্ধু ওরফে জগা কিছুটা খ্যাপাটে গোছের মানুষ। সে হঠাৎ দিব্যচক্ষুতে অনুভব করে মানুষগুলো সব 'জালা' বিশেষ, সেই জালা ভেঙে দেবে উদ্দেশ্য তার এই।

তার মা পার্বতী ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে 'মর্ মর্' বলেন—শ্মশানে মরতে গিয়ে সে নরহরি ভট্টাচার্যের আশীর্বাদ পায় 'বেঁচে থাক।' মায়ের কথা রাখতে গিয়ে তার মায়ের চেয়েও সম্মানে বড়ো ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ পেয়ে সে জ্যান্তে মরা হয়ে গেল।

এই সুযোগে নরহরি তাকে দিয়ে অযথা পরিশ্রম করিয়ে নেন। পরীরা এই সময় জগাকে একটি মগ আর দুটো লাঠি দেয়। লাঠির অলৌকিক ক্ষমতা আছে। মালিকের আদেশ অনুসারে ভূত হয়ে সে অন্যকে প্রহার করে থাকে। পাঁচজন পরীর উপর জগা সে পরীক্ষা করিয়ে চলে যায় জীবন ময়রার দোকানে। মগের কাছে যা চাইবে তা পাবে—একথা শুনে জীবন কৌশলে সেটা চুরি করে, জগা লাঠির জোরে নিজের জিনিস উদ্ধার করে।

জগাকে পরীদের মগ ও লাঠি প্রদান—লৌকিক গল্পে হাঁড়ি, দড়ি ও লাঠি দানের সঙ্গে তুলনীয়। কোথাও কোথাও কোন্ গল্পে এই হাঁড়ি ছাগল হয়েছে।[৭] অভীষ্ট দ্রব্য দিতে সমর্থ যে। পরীদের উপর লাঠির পরীক্ষা ভস্মলোচনের বরপ্রাপ্তি কাহিনী অথবা লৌকিক শিবের বরদানের কাহিনী স্মরণ করায়। প্রহসন হিসেবে এই নাটিকাটি আদৌ সার্থক নয়, তবে জগার কয়েকটি উক্তিতে গভীর জাগতিক সত্য প্রকাশ পেয়েছে,—সে বলে,—

> "আমি দেখে শুনে, ঠেকে ঠুকে একক্ষণে বেশ বুঝলুম, এ দুনিয়া জ্যান্তর জন্যেও নয়, মরার জন্যেও নয়, কেবল জ্যান্তে মরার জন্যে।"

লোভেন্দ্র গবেন্দ্র ঃ

বরপণের বিরুদ্ধে রাজকৃষ্ণের তিক্ততা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শেষ প্রহসন 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্রে' (১৮৯০, ৪ অক্টোবর)। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২ নভেম্বর বীণা থিয়েটারে এটি প্রথম অভিনীত হয়।

লোভেন্দ্র একজন অর্থপিশাচ কলকাত্তাই বড়লোক। গবেন্দ্র তার পুত্র। লোভেন্দ্র পুত্রের বিয়ে দিয়ে প্রচুর অর্থ পেতে চায়। দুঃখ তার, একটি বৈ আর ছেলে নেই। সে তার স্ত্রীকে আরও অন্তত কুড়িটা ছেলে প্রসব করতে বলে। স্ত্রী গোলাপসুন্দরীকে বিব্রত অবস্থা থেকে রক্ষা করে তার গুণধর লম্পট মদ্যপ পুত্র গবেন্দ্র। সে জানায় তার মতো 'কুলের মুখোজ্জ্বল গ্যাস-লাইট' ছেলে থাক্‌তে ষষ্ঠী পূজোয় মন দেওয়া চলবে না।

গবেন্দ্রের বিয়ে দিয়ে নিজস্ব Investment সুদে-আসলে তুলে নিতে গিয়ে পরাণবাবুর সঙ্গে লোভেন্দ্র খারাপ ব্যবহার করে। এদিকে গবেন্দ্র মায়ের কাছ থেকে গহনা ও টাকা নিয়ে বেশ্যা পান্নার বাড়ি যায়। সেখানে লোভেন্দ্র পুত্রকে নিষেধ করতে গিয়ে ঘাড় ধাক্কা খায়। অন্যদিকে পরাণবাবু এবং তার দুই বন্ধু শ্যামবাবু ও হরিবাবু কৌশল করে লোভেন্দ্রকে মানিকতলায় সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যায় নিজের সব দ্রব্য সোনা করিয়ে নেওয়ার লোভ দেখিয়ে। শ্যামবাবু হন ছদ্ম-সন্ন্যাসী। লোভেন্দ্র সেখানে যাবার পর কাফ্রীর মুখোশ পরে আসে হরি, মধু, গোপাল। তারা লোভেন্দ্রের মুক্তি পণ কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে তবে তাকে ছাড়ে। চাকর রঙ্গা বাবুর হাহুতাশ শুনে বলে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই বাবু 'আপনার জীবন্তা ষষ্ঠী ঠাক্‌রুণের গব্‌ভকোষ টাঁকশাল।'

---

৭. গ্রাম্য সঙ যাত্রায় এ কাহিনী এখনও ব্যবহৃত হয়। মেদিনীপুর জেলার অমরপুর গ্রামের গুণধর ধাড়া এই ধরনের একটি সঙযাত্রার কথা জানিয়েছেন।

নক্সাধর্মী রচনা এটি। কাহিনীটি এমন অস্বাভাবিক ও অসঙ্গতভাবে পরিবেশন করা হয়েছে যে হাসির পরিবর্তে তা বিরক্তি উদ্রেক করে। রাজকৃষ্ণ নিজে নাটিকাটিকে প্রহসন বলেন নি। বলেছেন 'সামাজিক ব্যঙ্গ' নাটক। ছেলের বিয়ে দিয়ে অতুল ঐশ্বর্য করার প্রত্যাশায় যে পিশাচেরা কন্যার পিতাকে শোষণ করে থাকে, আজও যে প্রথা আমাদের সমাজের কলঙ্ক-স্বরূপ, 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্রে' সে কথাই ব্যক্ত। বক্তব্য অত্যন্ত বলিষ্ঠ—যদিও আঙ্গিক বিন্যাস অত্যন্ত দুর্বল। নাটিকাটির উদ্দেশ্য তির্যকভাবে ব্যক্ত হয়েছে পিতা লোভেন্দ্রের এক উক্তিতে। লোভেন্দ্র জানাচ্ছে সে নিজে—

> "Model Bridegrooms Father ! যাকে বাংলায় বলে আদর্শ বরের বাপ! অন্য অন্য বাবারা আমার কাছে ছেলেরূপ পাঁঠা বেচা শিখে নিক।"

প্রহসনকাররূপে রাজকৃষ্ণ রায়ের বিশেষত্বটুকু প্রসঙ্গত লক্ষ্য করা যাক। রাজকৃষ্ণ রায় অনেকটাই যেন রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁর নাটকে যেমন রয়েছে যাত্রাধর্মিতার স্পর্শ, প্রহসনে তেমনি মেলে লৌকিক হাস্যরসাত্মক নাটকের অনুসরণ। হাস্যরস সৃষ্টির জন্য পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান হওয়া লেখকের অবশ্য কর্তব্য। গ্রন্থ সংখ্যাই প্রমাণ করে রাজকৃষ্ণ রায় গ্রন্থ রচনায় যতটা না আন্তরিক তাগিদ অনুভব করেছেন, তার চেয়েও বেশি সমকালীন হুজুগকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। বটতলার বই ধর্মী পুস্তিকার চাহিদা এই সময় খুব বেশি ছিল। তাই তাঁর প্রহসনগুলি মুলত অভিনীত হবার জন্য লেখা হলেও, স্থূল রসপিপাসু পাঠকের রুচির দিকে তাকিয়েও রচিত হয়ছে। বাগ্‌ভঙ্গির তির্যকতায় ঘটনা সংস্থাপনের অভিনবত্বে, চরিত্রের আচার-আচরণে যে অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি করা যায়—রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর প্রহসনগুলিতে প্রহসনের সেই আধুনিক চিন্তাধারার পরিপুষ্টিতে যত্নবান হন নি। যুগরুচি মিটিয়ে হাততালি পাবার প্রত্যাশায় তাই তিনি তাঁর অধিকাংশ প্রহসন রচনা করেছিলেন।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭—১৯১২)

গিরিশ যুগের অন্যতম নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের অনুগামী নাট্যকারদের মধ্যে একজন হলেন তিনি। তাই তিনি প্রচুর পৌরাণিক নাটকও রচনা করেছিলেন। কিন্তু অন্ধ অনুকরণ প্রবণতা তাঁর নাটকগুলিকে রসোত্তীর্ণ হতে দেয় নি। অতুলকৃষ্ণ অনেকগুলি প্রহসনধর্মী নাটিকা রচনা করেছিলেন। কিন্তু প্রখর বাস্তব দৃষ্টি এবং সরস মানসিক মেজাজের অভাবে সেগুলির অধিকাংশই চর্বিত চর্বণে পর্যবসিত হয়েছে। রঙ্গাব্যঙ্গমূলক নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকার অনেক সময় হাস্যরসের মাত্রা বিস্মৃত হয়েছেন। মনে হয়, গিরিশ অনুগামী ছিলেন নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র বাংলা হাস্যরসাত্মক নাটকের ধারায় সে রকম কোনো বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর মুদ্রিত করতে পারেন নি—তাই বুঝি তাঁর অনুগামীরও এই ব্যর্থতা।

গাধা ও তুমি ঃ

অতুলকৃষ্ণ মিত্র রচিত প্রথম প্রহসনটির নাম 'গাধা ও তুমি' (২১ এপ্রিল, ১৮৮৯)। 'গাধা ও তুমি' বিদ্রূপাত্মক প্রহসনটি নিউ ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত উপেন্দ্রনাথ দাসের 'দাদা ও আমি' নাটিকার জবাব। কেউ কেউ মনে করেন, অতুলকৃষ্ণের এই প্রহসনটি অভিনয়ের পূর্বেই গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড থিয়েটার ছেড়ে স্টার থিয়েটারে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি স্টেটস্‌ম্যান্‌ পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যাচ্ছে—গিরিশচন্দ্রই তখনও এমারেল্ড থিয়েটারের ম্যানেজার। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ,—

"EMERALD THEATRE
BEADON STREET
MANGER–BABOO G.C. GHOSE

....

SATURDAY, THE 26TH JANUARY, 1889/AT 9P.M.

....

A NEW SOCIAL SATIRE
GUDHA—o—TUMI
OR ASS AND YOU.
Comic Situations Throughout,......"[১]

মাত্র চল্লিশ পৃষ্ঠার এই প্রহসনটির কাহিনী কোলকাতায় বিত্তশালী বামন দাস গুঁইএর দুই পুত্র—সদ্য বিলাতফেরৎ সারদা ও বরদাকে নিয়ে রচিত। সারদা দেশে ফিরেই বরদার বেশি পোষাক ঘুচিয়ে বিলাতী পোষাক পরায়। সমাজ সংস্কারের কার্যসূচী স্থির করে তারা প্রথম পরিবর্তনটা নিজেদের উপর দিয়েই সারে। অতঃপর স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচার ও বেশ্যাবিবাহ। বেশ্যাবিবাহের জন্য বেশ্যা আবশ্যক। সে দায়িত্ব নিল তাদের পুরোহিত পুত্র পেলারাম। সে বয়স্কা বেশ্যা লালনমণি ও তার কন্যা ল্যাভেন্ডারকে অনেক বুঝিয়ে বিবাহে রাজী

১. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান/শঙ্কর ভট্টাচার্য/পৃঃ ২৫১

করায়। লালনের বাড়িতে বিবাহের ব্যবস্থা হল। পুরোহিত পেলারাম। শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ে সে মা মেয়ের সঙ্গে দু'ভায়ের বিয়ে দেয়। ইতোমধ্যে বামনদাসের আবির্ভাব ঘটল। লালনমণি তার রক্ষিতা। বাবার ধমক খেয়ে বরদা জানিয়ে এই অঘটনের মূলে রয়েছে তারা দু'ভাই। জন বুলও বামনদাসের সঙ্গেই এসেছিলেন। তিনি একজন গোয়েন্দা। ইংলন্ড থেকে দাগী আসামী সারদাকে ধরতে এসেছেন। বামনদাসের অনেক মিনতি শুনে তিনি সারদার মুখে গাধার মুখোস পরিয়ে তাকে রেহাই দেন। সারদা সমাজ সংস্কারমূলক এক ছড়া আবৃত্তি করে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে—"সভ্য মহাশয়, আমরা ভাক্ত সমাজ সংস্কারক, আপনাদের মধ্যে আমাদের মতো কেউ আছেন কি? থাকেন তো সাবধান!!!

এই প্রহসন রচনায় অতুলকৃষ্ণ মধুসূদন থেকে শুরু করে অমৃতলালের প্রহসন পর্যন্ত সবার প্রহসন থেকেই কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করেছেন। তবে 'গাধা ও তুমি' প্রহসনের পরিকল্পনায় অতুলকৃষ্ণ উপেন্দ্রনাথ দাসের ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দাদা ও আমি' প্রহসনের কাছে অশেষভাবে ঋণী। গ্রন্থের মলাটে রয়েছে পুস্তক পাঠরত সাহেবী পোষাকে সুসজ্জিত একটি গর্দভের ছবি। অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণ প্রবণতা, লাম্পট্য এবং কপট সমাজ সংস্কারকের অনাচারী-আচরণ এই প্রহসনে ফোটানো হয়েছে।

বক্কেশ্বর ঃ

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুলাই এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র রচিত 'বক্কেশ্বর' গ্রহসনটি[১]। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের নৈতিক ভ্রষ্টাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এই পঞ্চাশ পৃষ্ঠার প্রহসনটিতে। প্রচ্ছদপত্রে লেখা আছে—'বক্কেশ্বর—The Discomflited lover–A faithful picture of the growing evils an Unworhy Cause." নক্সাধর্মী অনাবিল হাস্যরসাত্মক এই নাটিকাটিও একজন বিলাত ফেরতের কেরামতি নিয়ে রচিত।

অজ্ঞান খাস্তগীর বিলেত ফেরৎ। বন্ধু চালাক গড়গড়িকে নিয়ে বাংলাদেশে free love প্রবর্তন করতে চায়। নীতিভ্রষ্ট স্বাধীন প্রেমের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে গিয়ে অজ্ঞান পত্রিকা সম্পাদক চালাকের মারফৎ সন্ধান করে এই বিবাহের উপযুক্ত বিত্তশালী লোকের। পরবর্তী অংশে দেখি পরস্ত্রীর সঙ্গে পুরুষেরা 'রোলকলে'র সঙ্গে সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় ঢোকে। অজ্ঞান তাদের free love-এর মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দেয় এবং বিবাহের বিরুদ্ধে তার স্পষ্ট মতামত জানায়,—

> "হায়, না জানি কবে—আর কত বৎসর পরে ঘৃণিত বিবাহ প্রথা উঠিয়া গিয়া নরনারীর মধ্যে স্বাধীন সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। এদিকে অজ্ঞানের মেয়ে মিস্ অবলা তাদের বাড়ির বামুন ঠাকুর রামকিঙ্করের সঙ্গে প্রণয় করে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ায় সে বিয়ে ব্যাপারটাকে সমর্থন না করে পারে না।"

চালাকের পরামর্শে অজ্ঞান নিজের অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের সঙ্গে মেথর জমিদারের বিয়ে দেবার প্রস্তাব করে পাঁচহাজার টাকা আগাম নিয়ে নেয়। অন্যদিকে বক্কেশ্বর অবলার অবলার গৃহশিক্ষক। অবলা বিবাহিত বক্কেশ্বরকে প্রেমের দোহাই দিয়ে অনুরোধ জানায় তাকে বিয়ে করতে ও পত্নীকে ত্যাগ করতে। বক্কেশ্বরের স্ত্রী চতুরা মেথর জমিদারের সঙ্গে অবৈধ

১. 'বক্কেশ্বর' প্রহসনে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। 'স্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকার ১৩ জুলাই সংখ্যার বিজ্ঞাপনে একথা জানা যায়।

প্রেমে সংযুক্ত। সে তার সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। আর সেদিন রাত্রিতে অবলা এসে বক্কেশ্বরকে তার উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বলে। রামকিঙ্কর এসে বক্কেশ্বরের ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে চলে যায়। ইতোমধ্যে মেথর জমিদার চৌখসরাম জেনে যায় যে অবলা অন্তঃসত্ত্বা। তখন সে তার টাকা ফেরৎ চায়। টাকা খরচ হয়ে যাওয়ায় অজ্ঞান ও চালাককে চৌখসের নির্দেশে দুই ভাঁড় ময়লা কাঁধে করে ডিপোয় নিয়ে যেতে হয়। বক্কেশ্বর দুঃখে বৈষ্ণব হতে চায়, অজ্ঞানের বাড়ীর ঝি বোষ্টমী হতে রাজী হয়।

প্রহসনটির নামকরণ 'বক্কেশ্বর' না হয়ে 'অজ্ঞানচন্দ্র' হলেই ভালো হত কারণ সে-ই এই কাহিনীর উপজীব্য। কিন্তু কাহিনীর নিখুঁত বিন্যাসে 'গাধা ও তুমি'র তুলনায় 'বক্কেশ্বর' অনেক সচেতন হাতের রচনা। বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত রচনায় অতুলকৃষ্ণের সিদ্ধিলাভ হয়েছে এখানে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য free love-এর সভায় সমবেত সঙ্গীত,—

"এবার মদ্দামাদী এক হয়েছি জুটে;
সমাজ বাধা আপনি যাবে টুটে'—
ভাই-ভগিনী সবাই মিলে বলবো গো মুখ ফুটে;—
যারে দেখব ভালো, বাসবো ভালো
মেরে বিয়ের মুখে ঝাঁটা।"

এই গানের তির্যকতা লক্ষিত হয়,—

"হাঁটি হাঁটি পা পা,
গায়ের ওপর দিয়ে গা!
গুটি গুটি চল ভাই,
জোড়া গেঁথে বাড়ি যাই।"

তবে একথা স্বীকার করতে হয় এর কথা বলতে গিয়ে অতুলকৃষ্ণ সর্বত্র শ্লীলতার মাত্রা বজায় রাখতে পারেন নি।

'বক্কেশ্বরে'র অভিনয় সম্বন্ধে একটি পত্রিকা লেখো,—

"Bakyaswar put the house into roars of laughter nearly two hours."[১]

ভাগের মা গঙ্গা পায় নাঃ

অতুলকৃষ্ণ মিত্রের পরের প্রহসনটি হলো 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না।' এটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর এমারেল্ড থিয়েটার প্রথম অভিনীত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বাংলাদেশের যৌথ পরিবার প্রথা কীভাবে আস্তে আস্তে ভেঙে পড়েছে তারই এক নির্মল চিত্র হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে প্রহসনটিতে পরিবেশিত।

ব্রহ্মময়ীর চার ছেলে। বড়ছেলে লখিন্দর প্রথমে হ্যান্ডনোটের দালালী করত, এখন মুদি দোকান দিয়েছে। স্ত্রী এবং রক্ষিতাকে নিয়ে তার দুটি পৃথক সংসার। মেজ অজারাম মোক্তারী করে। স্ত্রী এবং শালী—এই দু'জনের দুটি সংসার সূত্রে তারও মোট বারটি সন্তান। সেজ পুত্র ভয়ানকচন্দ্র ব্রাহ্ম। তার স্ত্রী মিসেস মদ্দামণি সবাইকে টেক্কা দেয়। ভয়ানকচন্দ্র প্রচুর তৎসম শব্দ সহযোগে ধর্মীয় বক্তৃতায় এই কথায় প্রতিপন্ন করতে চায় যে, মা পুত্রকে দুঃখময় পৃথিবীতে এনে যে শত্রুতা করেছেন তার জন্য তাঁকে উপবাসে রাখাই উচিত।

১. Statesman/1889, 16th July.

ছোটো ছেলে ষন্ডামার্ক মা ও নিজ বিধবা বোন তারাকে দেখাশোনা করে। বড়ো তিন ভাই কুকুর-কুকুরীর বিয়েতে অর্থ খরচ করে অথচ মা-ভাইকে দেখতে পারে নি—জ্ঞাতি খুড়ো রঙলাল এ ব্যাপারে তাদের উপদেশ দিতে গিয়ে ঠকেছেন। শেষে তাঁরা এক পরামর্শ করেন। ষন্ডামার্ক তার তিন দাদাকে আলাদা-ভাবে গিয়ে বলে মায়ের সিন্দুকে কুড়ি হাজার টাকা আছে। মায়ের দেনা তিনশ পঞ্চাশ টাকা। মা মরমর, দেনা শোধ হয়ে গেলে সব টাকা তারা দুজনে ভাগ করে নেবে। প্রত্যেকে ছোটো ভায়ের এই প্রস্তাবে রাজী হয়। তার হাতে সবাই মায়ের দেনার টাকা তুলে দেয়। ইতোমধ্যে সব কথা ফাঁস হয়ে যায়। তিন ভাই তখন সিন্দুক আগলে দাঁড়ায়। তাদের সামনে অতঃপর সিন্দুক খোলা হলো। সিন্দুক থেকে তিনটে জুতোর মালা ও তিনটে মুড়ো ঝাঁটার মালা বের করে ভাইদের ও তাদের বউদের পরিয়ে দেওয়া হয়। ভায়েরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন তারা জানতে পারে তাদের সম্ভাষণ জানানোর জন্য বাইরে দশজন জোয়ান বাগদী লাঠি হাতে বসে আছে—তখন তারা শান্ত হয়। মা তাদের ধিক্কার জানান।

নীতি-উপদেশপূর্ণ এই প্রহসনটির সব চেয়ে বড়ো দুর্বলতা—বাস্তব সমস্যাকে অবলম্বন করে রচিত হলেও এতে বাস্তবতার অপ্রতুলতা ও অতিরঞ্জনের মাত্রাতিরিক্ততাই দৃশ্য হয়। রচনাভঙ্গিটিও অতি নিম্নস্তরের। উপসংহার গ্রাম্য ফার্সধর্মী।

ষণ্ড ঃ

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট তারিখে এমায়েল্ড থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা ও রাণী' নাটকের পর অভিনীত হয় 'ষন্ড' (A prehistoric Fool) নাটিকাটি। অতুলকৃষ্ণ মিত্র রচিত এই নাটিকাটির গুরুত্ব কেবল প্রহসনের সংখ্যা বৃদ্ধিতে অবশ্য এই প্রহসনটি এমারেল্ড থিয়েটারে বহুবার অভিনীত হয়েছিল। Statesman পত্রিকায় 'ষন্ড' নাটিকার প্রথম অভিনয় রজনীর বিজ্ঞাপনটি ছিল নিম্নরূপ,—

"…….

New Sparkling Extravaganza
SHANDA
Or A PREHISTORIC FOOL
The Minthful specimen of a new way to pay old debth
This our new Piece is replete with picturesque sight
Seeings and extraordinary Iudicruous situations !!
A matter of only an hour or two's wholesale Jollity...."[১]

কলির হাট ঃ

বাবু কালচারের নগ্নরূপ—চারিত্রিক অধোগামিতা দেখানো হয়েছে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'কলির হাট' (১৮৯২) প্রহসনটিতে। শিবদুর্গার পরিবারকে অবলম্বন করে। হাস্যরসাত্মক নাট্যসৃষ্টি প্রচেষ্টায় এটি একটি অতিরিক্ত সংযোজন মাত্র। সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে তাতে, উৎকর্ষ বাড়ে নি।

গনেশবাবুর বাড়িতে দুর্গাপূজো উপলক্ষ্যে সপরিবারে মা আসছেন। পূজোর ব্যবস্থা চলছে

১. Statesmn/1890, 30th August.

জোর কদমে, সঙ্গে সঙ্গে চলেছে অনঙ্গমঞ্জরীর মতো বেশ্যার সঙ্গে চুক্তিও। কার্তিক নিজেও বেশ্যাসক্ত, সোজা হাজির হয়েছে অনঙ্গের বাড়িতে। যে ভট্টাচার্য পূজো করবে সেও জনায় যৌবনকালে সেও বেশ্যালয়ে গেছল একবার। মদের ব্যবস্থাও মন্দ নয়। বিশুদ্ধ পূজার জোগাড়যন্ত্রের পাশে চলেছে বিলিতী খানা তৈয়ারী। গণেশ তার কলা বৌকে নিয়ে বিব্রত। ছোটবৌ সে চায় না কেন না নূতন আইনে[১] অল্পবয়সী রমণীকে বিয়ে করা নিষেধ। তাই মোচাসহ কলাবৌ সে চায়। নিজেই তাকে ঘাড়ে করে সে গঙ্গাস্নানে চলে। গণেশবাবু এবং অনঙ্গদেবীকে যে পুষ্পাঞ্জলি দেয় তা মদমেশানো বমি! খবর আসে যাত্রার দল এসে গেছে। পূজো মাথায় উঠে—সবাই ছোটে কোন্ পালা হবে তার খবর নিতে। 'আলালের ঘরের দুলাল' কিংবা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র মতো নক্সাধর্মী 'কলির হাট' প্রহসনটি। মৌলিক চিন্তাধারায় একান্ত অভাবই অতুলকৃষ্ণের প্রহসনের বড় বৈশিষ্ট্য।

বুড়ো বাঁদর ঃ

অতুলকৃষ্ণের প্রহসন প্রতিভার সীমা পরিলক্ষিত হয় 'বুড়ো বাঁদর (১৮৯৩) বা 'The Old Culkold'-এ। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল এমারেল্ড থিয়েটারে এটি প্রথম অভিনীত হয়। প্রচ্ছদে রয়েছে দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র একটি ছড়া,—

"বুড়ো বয়সে বিয়ে করা
আপনা হতে জ্যান্ত মরা।"

দুই বিবাহ করে ষাঁড়েশ্বর বড় গিন্নি ও পুঁটে গিন্নিকে নিয়ে সংসার পেতেছে। যুবকদের চোখের আড়ালে যুবতী স্ত্রী পুঁটে গিন্নিকে রাখার জন্য বাসা বদল করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কীভাবে পুঁটের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দিল এবং সেই অস্থিরতা কোন বিশেষ পদ্ধতিতে দমন করা হল—এই এক চিত্র অত্যন্ত মোটা দাগে অঙ্কিত হয়েছে 'বুড়ো বাঁদরে'। বুড়ো বয়সের স্ত্রীর প্রতি ষাঁড়েশ্বরের দুর্বলতা এমন যে সে অনায়াসে বলতে পারে

"তুই যে আমার কোল জোড়া পুঁটে বউ! আমার সঙ্গে চ! তোর বেরিয়ে আসা পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটান, সব ভুলে যান।"

"বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে অতুলকৃষ্ণ মিত্র এ সময় আর দুটি প্রহসন ধর্মী নাটিকা রচনা করেছিলেন—'বিধবা কলেজ'। এদের অভিনয়ের তারিখ জানা যায় নি। 'আমোদ প্রমোদ' (১২৯২), 'ঠিকে ভুল' (১৩১৪), এবং শেরিডানের 'স্কুল অব স্ক্যান্ডাল' অবলম্বনে লেখা রঙ্গরসাত্মক নাটিকা 'আসল ও নকল' (১৩১৯) প্রভৃতি অতুলকৃষ্ণ রচনা করেছিলেন।

অতুলকৃষ্ণের প্রহসন সমকালীন দর্শকদের চাহিদা পূরণ করেছে এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রহসনের জগতে কোনো নূতন মাত্রা যোগে তা অসমর্থ হয়েছে। অমৃতলালের মতো নক্সাধর্মী কাহিনী বয়নের দিকে তাঁর সমধিক ঝোঁক ছিল যদিও তাঁর মতো মাত্রাবোধ অতুলকৃষ্ণের ছিল না।

১. Civil Marriage Act 1878.

অপ্রধান প্রহসনকার (১৮৭৭—১৮৯০)

নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকের আসনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে' মজে যাওয়া রাঢ়বঙ্গের দর্শককে প্রকৃত নাট্যরসের আস্বাদ দিয়ে ধন্য করার জন্য। কিন্তু সহজেই যখন নাটক লেখা যায়—সংলাপের পিঠে সংলাপ বসালেই যদি নাট্যকার হওয়া যায় —তবে এ সুলভ সম্মানের মোহ ত্যাগ করা বড়ো কঠিন। তাই উনিশ শতকের শেষার্ধে একদিকে যেমন এখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছিল শখের নাট্যশালা—তেমনি আবির্ভূত হয়েছিলেন অসংখ্য নাট্যকার। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের সৃষ্ট নাটিকাগুলির গুরুত্ব প্রায় নেইই—গুরুত্ব শুধু সংখ্যার হিসাবে। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, উনিশ শতকের সাত এবং আট দশকের জাতীয় চেতনার ও সমাজ আলোড়নের প্রতিচ্ছবিরূপে অনেকগুলি লঘু নাটিকা বা প্রহসনকেই গ্রহণ করা যায়। সাহিত্যের অঙ্গনে এই শ্রেণীর নাটক এবং তার রচয়িতাদের কালের পৃষ্ঠে স্থায়িত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ড. সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় একস্থানে বলেছেন,—বীণা থিয়েটার যেমন অনেক নতুন নাট্যগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে, তেমনি অসংখ্য নতুন নাট্যকারকে জনগণের সামনে এনেছে—তেমনি তা নাট্যগোষ্ঠীও নাট্যকারদের কথা সহজেই ভুলে যেতে সহায়তা করেছে নূতনের আগমনে। ড. মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—

> "A few new plays by new writers. Jogendranath Chatterjee, Durgadas Day, Kedarnath Mondal were brought the foot-lights by the miscellaneous theatres that played here. But they faded away as quickly as the footlights themselves."[১]

'নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন' প্রবর্তনের প্রেক্ষিতে এই সময় রচিত প্রহসনগুলি ব্যক্তি আক্রমণের পথ থেকে সরে এসেছিল। ফলে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সাথে কিছু কিছু নাট্যকারের মধ্যে গতানুগতিক পথে প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক হাসি বিতরণের জন্য এ সময় কোনো কোনো রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকার কয়েকটি সুলভ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন—বাঙালি সমাজের কুলপ্রথা, জামাইকে নিয়ে রঙ্গরস, আধুনিকা স্ত্রী, মুখরা, শিক্ষিত পুত্রের অনাচার প্রভৃতি।

সামাধ্যায়ী ভট্টাচার্য ঃ

সমাজের অনাচার ব্রহ্মব্রত সমাধ্যায়ী ভট্টাচার্যকে হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'যুগল-নায়িকা' বা 'ষড়্‌রসামোদ নাটক' (১২৮৪ সাল) রচনায় অনুপ্রেরণা জোগিয়েছে। টোলের ছাত্র থেকে শুরু করে চতুষ্পাঠীর সামগ্রিক চিত্র কৌতুককরভাবে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দ্বাদশ অঙ্কে। তাই নাটকটিকে সঠিকভাবে প্রহসনের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

তাঁর দ্বিতীয় নাটিকা 'পন্ডিত-মুর্খ প্রহসন' (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে)। এই প্রহসনে আচার-ভ্রষ্ট, চরিত্রভ্রষ্ট বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ সমাজকে নিয়েছেন নবদ্বীপের পন্ডিত নাট্যকার। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ থেকে চারজন ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে উজ্জয়িনীতে হাজির হন। পথে কয়েকজন স্ত্রীলোককে ঘুমোতে দেখে তাঁদের মনে সম্ভোগ জাগে। স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করে ওঠায় তাঁরা ধরা পড়েন এবং পরদিন রাজসভায় আনীত হলে বিক্রমাদিত্যের কাছে উপহসিত হন। 'পঞ্চতন্ত্রে'র পন্ডিতে মূর্খের

১ The Story of the Calcutta Theatres (1753-1980)/ S.K. Mukherjee/P-125

গল্পের সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের কাহিনী যোগ করে এই গল্পাংশ গড়ে তোলা হয়েছে। যদিও এর নাট্যিক গুণ একেবারে নেই বললেই চলে।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬মে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয় **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'ও ঘুরে আয় সোনার চাঁদ' প্রহসনটি। এটি একটি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী ও উক্ত থিয়েটারের অভিনেতৃদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে লেখা এটি। এই প্রহসনের অভিনয় দেখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' অত্যন্ত তীব্র ভাষায় থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে ভর্ৎসনা করে। পরিশেষে দর্শকরূপে উপস্থিত পুলিসের ইন্সপেক্টর সর্বানন্দ রায়কেও ভৎর্সনা করে লেখে,—

> "যাহা হউক, অভিনীত পুস্তক পরীক্ষা করিবার জন্য যে একটি অফিস হইবার কথা ছিল তাহার কি হইল? নাট্যাভিনয় আইনে পুলিশ কর্মচারীদিগের উপর এরূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে, যদি তাঁহারা বিবেচনা করেন যে অভিনীত বিষয় অশ্লীল অথবা অপবাদজনক তাহা হইলে তদ্দন্ডে তাহার অভিনয় বন্ধ করাইতে পারেন, এবং যদি নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ তাঁহাদের কথা না শুনেন তাহা হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ধৃত করিতে পারেন।"[১]

কিছুদিনের মধ্যেই 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রবন্ধকারের এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল—ফলে বাংলা প্রহসনের উপর একটা বড়ো আঘাতও নেমে এসেছিল। কেননা সাহিত্যের বিচারকে যেখানে পুলিশ, সেখানে সাহিত্যের যা গতি হবার তাই হয়েছিল।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত আর কয়েকটি প্রহসনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে— **বটবিহারী চক্রবর্তী**'র 'কলির কুলটা প্রহসন' (১৫ এপ্রিল, ১৭৭) **কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** 'যেমন দেবা তেমনি দেবী' (৩ আগস্ট, ১৮৭৭) **রামনিধি কুমার** রচিত 'ঘোঁট মঙ্গল,' **কিশোরলাল দত্তের** 'হায়রে পয়সা' (২২ মার্চ, ১৮৭৭), **পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের** 'কুলীনকুমারী', জনৈক **অজ্ঞাতনামার** 'ঝকমারীর মাশুল' (১৮৭৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত **দুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের** 'দর্পণ' (২১ জানুয়ারি, ১৮৭৮), **নন্দলাল রায়ের** 'বাসরকৌতুক' (২৩ জানুয়ারি, ১৮৭৮), **শশিভূষণ কর** রচিত 'মজার কিশোরী ভজন' (৩১ এপ্রিল, ১৮৭৮), **বিষ্ণু শর্মা**র 'কপালে ছিল বিয়ে, কাঁদলে হবে কিঁ (৬মে, ১৮৭৮), **শ্যামাচরণ ঘোষালের** 'বারইয়ারী পূজা প্রহসন' (১০ মে, ১৮৭৮) **নগেন্দ্রনাথ সেনের** 'এবারকার অল্প মজা, দু তিনদিন দুর্গাপূজা' (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮), **প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়** রচিত 'সভ্যতা সোপান' (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮), **মহেশচন্দ্র দাস দে** রচিত 'মামাভাগ্নীর নাটক' (৭ আগস্ট, ১৮৭৮) **নটবর দাস** রচিত 'মক্কেল মামা' (১৮ আগস্ট, ১৮৭৮) **প্রিয়নাথ পালিতের** 'গুপ্তবৃন্দাবন', (?)। **কেশবচন্দ্র ঘোষের** 'খন্ড প্রলয়' (?) উল্লেখযোগ্য।

বেচুলাল বেণিয়া ঃ

নামে এবং কাজে উভয় দিকেই বেণিয়া বেচুলাল বেণিয়া। সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে ব্যবসা ছাড়া তিনি আর কিছুই ভাবতে পারেন নি। বেচুলালের মতো গ্রন্থ রচনার ব্যবসায়ে যাঁরা লিপ্ত ছিলেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে বিভিন্ন নাট্যশালা। কারণ বিকৃত রুচির মানুষেরা ছিলেন এই ধরনের স্থূল হাস্যরসাত্মক নাটিকার রসগ্রাহী পাঠক। এই সব পাঠকের অভিরুচি মাফিক প্রহসন রচনা করে বেচুলাল নিশ্চিন্ত ছিলেন এই ভেবে যে 'বৈখানি আমার যে হুড়মুড় করে বিক্রি হবে তাতে দৃঢ়বিশ্বাস আছে। নিশ্চয় জানি আমার ব্যবসা ফস্কাবে না।"

---

১. সমাচার চন্দ্রিকা/১৮মে, ১৮৭৭

ক্লাসিক থিয়েটার ও মিনার্ভা থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরনের প্রহসন শয়ে শয়ে লেখা হয়েছিল। জনৈক সামালোচক বলেছেন,—'উহাদের স্মৃতি শীঘ্র লোপ হয়, ততই সাহিত্যের—সমাজের মঙ্গল।''

বেচুলালের লেখা প্রহসনধর্মী রচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'সচিত্র হনুমানের বস্ত্রহরণ' (১৮৮৫) এই হনুমান আর কেউ নয় স্বয়ং নব্যবাবু। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারী সে, ব্যতিক্রম নয়। বাবু মদ্যপানসক্ত লম্পট ও নানা নেশাগ্রস্ত—গঞ্জিকাও তার মধ্যে একটি। লম্পট নব্যবাবু হনুমান কীভাবে লাম্পট্য করতে গিয়ে হেনস্তা হয়েছিল তারই এক আকর্ষণীয় চিত্র (?) উপহার দিয়েছেন নাট্যকার। নীতি-উপদেশও রয়েছে এবং সেটা নববাবুর মুখেই। যার সার কথা 'এমন কর্ম আর কোরো না।' তবু মনে হয় যেন বেশ্যা চুণীর মুখে উচ্চারিত একটি ছড়াতেই বাবুদের সম্পর্কে সার কথা উচ্চারিত হয়েছে—

"বেঁচে যদি থাকি প্রাণ সুখে দেখব কত আর।
যত নব্যবাবু হয়েছে নচ্চা কলির
কল্কে অবতার।।"

বেচুলাল রচিত আরও দুটি ক্ষুদ্র প্রহসন সেলে। চরিত্রহীন নারীর কুকার্য ও দুষ্প্রবৃত্তি নিয়ে লেখা এই দুটি রচনা 'ছোট বউর বোম্বাচাক', 'কমলিনীর মধুচাক'।

মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাঁধা প্রাহসনিক পথে যাত্রা করেছিলেন অনেক প্রহসনকার। এদের নাটিকাগুলি পুস্তিকাকার। মঞ্চে অভিনীত হবার গুণ এগুলির বেশির ভাগেরই ছিল না। পুস্তিকাধর্মী এই নাটিকাগুলি সমকালের পাঠকবর্গের অভিরুচি অনুসারে তাৎক্ষণিক হাস্যরসের জোগান দিয়েছে—যা শ্লীলতার মাত্রাকে অনেকাংশেই অতিক্রম করে গেছে।

জয়কুমার রায়ের 'এঁরা আবার সভ্য কীসে।' (২৪ জানুয়ারি, ১৮৭৯)—কাহিনী এমনকি নামকরণেও মধুসূদনের প্রভাব স্পষ্ট। **অম্বিকাচরণ গুপ্তের** (১৮৪২-১৯১৫) 'সুর সম্মেলন' (৩ মার্চ, ১৮৭৯), 'কলির মেয়ে ছোট বউ' (১৮৮১), **যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** 'আমি তোমারই' (২৩ মার্চ, ১৮৭৯), **দুর্গাচরণ** রায়ের 'পাশ করা ছেলে' (২৮ আগস্ট, ১৮৭৯), **কামিনীগোপাল চক্রবর্তীর** 'শশী সন্দর্শন' বা সামাজিক দৃশ্য' (১০ আগষ্ট, ১৮৭৯) ও 'বক্কেশ্বরের বোকামী'; **রামপদ ভট্টাচার্যের** 'কালের কি কুটিল গতি' (৩ আগস্ট, ১৮৭৯), **গোপালচন্দ্র মিত্রের** 'পদীর বেটা পদ্মলোচন' (২০ জুলাই, ১৮৭৯), **হীরালাল ঘোষের** 'রোকা কড়ি চোকা মাল' (৪ অক্টোবর, ১৮৭৯), **গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের** 'এই কি সেই' (১৬ অক্টোবর, ১৮৭৯), **মোহিনীমোহন ঘোষালের** 'প্রণয়ের প্রতিফল' (২ ডিসেম্বর, ১৮৭৯)।

মহিমচন্দ্র গুপ্তের লেখা 'রাজা হওয়া বিষম দায়' (১৮৮০), **নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ** রচিত 'অপূর্ব ভারত উদ্ধার' (১৮৮০), **উপেন্দ্রকৃষ্ণ মন্ডলের** লেখা দুটি প্রহসন 'আশ্চর্য কেলেঙ্কার' (১৮৮০), এবং 'পাজীর বেটা ছুঁচো' (১৮৮০), **কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়** রচিত 'পাশ করা বাবু (১৮৮০), **দীননাথ চন্দ্রের** লেখা 'কমলা কাননে কলমের চারার আঁটি' (১৮৮০), **হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের** 'কালের বৌ' (১৮৮০), **অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** রচিত 'ডিক্রি-ডিসমিস্' (১৮৮০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০—১৯০১)

রয়াল বেঙ্গল থিয়েটারের বর্ণধার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে—শুধু নাটক রচনার জন্য নয়—নাট্য প্রযোজনা, নাট্যরচনা এবং অভিনয় প্রতিভার ত্রয়ী-কীর্তির জন্য। বাংলা প্রহসন রচনায় তাঁর কৃতিত্বও স্মরণীয়। তবে তিনিও কোনো মৌলিক পথে পদচারণা না করে গতানুগতিক ভাবেই প্রহসন রচনা করেছেন।

বিহারীলালের লেখা উল্লেখযোগ্য প্রহসনগুলি হল—'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' (১০ আগষ্ট, ১৮৮০), 'খন্ড প্রলয়' (১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩), 'জ্যান্ত বাপের পিন্ডদান' বা 'অবাক কান্ড' (১৮৯৩), 'মুই হ্যাঁদু' (১৩ জানুয়ারি, ১৮৯৪) 'যমের ভুল' (২৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৪), 'রক্তগঙ্গা' (২৩ অক্টোবর, ১৮৯৬), 'নবরাহা' বা 'যুগমাহাত্ম্য' (৯ জানুয়ারি, ১৮৯৭)।

'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' প্রহসনটি 'নাদাপেটা হাঁদারাম' ছদ্মনামে লিখেছিলেন বিহারীলাল। প্রহসনগুলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেল—"এই রচনাগুলির ভিতর দিয়া বিহারীলাল কেবলমাত্র গতানুগতিকতাই অনুসরণ কলিয়াছিলেন, কোনো মৌলিক বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নাই।"[১] প্রকৃতপক্ষে নিজ পরিচালিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্যই এগুলি লেখা হয়েছিল।

'খন্ড প্রলয়' প্রহসনটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুলাই রয়াল বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। Indian Daily News পত্রিকার 22nd July 1893 সংখ্যায় এ সম্পর্কে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

মুই হ্যাঁদু ঃ

বিহারীলালের লেখা 'মুই হ্যাঁদু' প্রহসনটি হিন্দুয়ানি নিয়ে রত যারা তাদের ব্যঙ্গ করে লেখা। সমাজে বুক ফুলিয়ে চলে—অন্যের পাপকার্যের ব্যাখ্যান করে অথচ নিজেই গোপনে সে সব কাজ করে—এমন চরিত্রদের নিয়েই 'মুই হ্যাঁদু' লেখা। এই দলে সদারং ও সবলুট নামে দুই সন্ন্যাসী, লম্বোদর সার্বভৌম ও খগপতি তর্কচঞ্চু নামে দুই ব্রাহ্মণ, চেঁদবাবু এ বন্ধু গোলোক বসুও আছেন। তাঁরা আধুনিক যুগোপযোগী দুর্গাপূজা করার ব্যবস্থা করে,— "সারি সারি ঘটে কারণ বারি, নৈবেদ্যর বদলে স্তূপে স্তূপে কেক বিস্কুট সাজান।" লম্বোদর পূজা করতে করতে যে নারীর কপালে সিন্দুর পরিয়ে দেন তিনি বিধবা। সব জেনেও অন্যের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে লম্বোদরের মত দেন,—"পুরুষ কুল নির্মূল না হলে উনি বিধবা হতে পারেন না।" পরিশেষে লম্বোদর খেদ সহকারে বলেন,—"হিন্দুয়ানী কি আর আছে? তুমি উনি মুই—সকলেই মুই হ্যাঁদুর দলে।" ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর রয়াল বেঙ্গল থিয়েটারে 'মুই হ্যাঁদু' প্রথম অভিনীত হয়।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর বিহারীলালের 'যমের ভুল' (The Devil In carnate) পঞ্চরংটি প্রথম অভিনীত হয়। ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক ব্যঙ্গ নাটিকা 'রক্তগঙ্গা।'

১. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খন্ড) আশুতোষ ভট্টাচার্য/পৃঃ ৩৭০

(The Deed of Blood)। প্রথম অভিনীত হয় রয়াল বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ আগষ্ট। এই নাটিকাগুলির নাট্যিক মূল্য নেই বললেই চলে।

নবরাহা ঃ

'নবরাহা' বা 'যুগ মাহাত্ম্য' প্রহসনটিতে বিহারীলাল গতানুগতিক প্রাহসনিক বিষয় অবলম্বন করেছেন। তবে তিনি পৌরাণিক কাঠামোর মোড়কে কাহিনী পরিবেশনেই বেশি তৃপ্তি পেতেন। তাই এখানে দেখি সপরিবারে পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছেন শিব। কলির প্রভাবে শিব, দুর্গা, ছেলেমেয়েরা ফ্যাসন দুরস্ত পোষাক পরে ফেলেছেন। এরপর নক্সার মতো এক একটি খন্ড চিত্র দেখানো হয়েছে—কৃষকদের দারিদ্র্য ও তাদের উপর ফাঁড়িদারের অত্যাচার, তৎকালীন Bubonic fever-এর দৌরাত্ম্য, ফোঁটাকাটা ব্রাহ্মণের ত্রিবেনীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে মেয়েদের দেখে বিদ্যাসুন্দর গাওয়া প্রভৃতি। ব্রহ্মা বিষ্ণুরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়। বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা ইডেন তাঁরা ইডেন উদ্যানে এলে কনস্টেবলেরা দৌড়ে আসে তাঁদের বন্দী করতে—কারণ এঁদের তারা অদ্ভুত জীব ভেবে ধরতে চেয়েছিল। পিশাচদের চেষ্টায় শেষপর্যন্ত কলিরাজের রাজ্যের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা নিয়ে দেবতারা স্বর্গে ফিরে যান। এই হাস্যরসাত্মক নাটিকাটি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি রয়াল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

সুতরাং বিহারীলালের প্রহসনগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য গতানুগতিকতা, সমকালীনতা এবং মঞ্চের প্রয়োজনপূর্তি। এ ছাড়া এগুলির আর কোন বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত প্রহসনগুলির নাম ও বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায় এখনও পূর্বানুসৃতি চলেছে সমানে। বাঙালি সমাজ কাঠামোয় শ্বশুর-শাশুড়ী-জামাই সম্পর্ক নিয়ে লেখা হাস্যরসাত্মক নাটিকার সংখ্যা প্রচুর। ব্যক্তি-আক্রমণের ঝোঁক এ সময় অনেকটা কমে গেছে নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিলের দরুণ। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে উপন্যাসে ও গল্পগাথায় এ সময় ব্যঙ্গের ছড়াছড়ি শুরু হয়ে গেছে সে কারণেই। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচু ঠাকুর,) যোগেন্দ্রনাথ বসু, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালি পাঠকের হাস্য-রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করেছেন নক্সাধর্মী হাস্যরসাত্মক গল্প-কাহিনী রচনা করে, যাতে অনেক সময় ব্যক্তি আক্রমণও মুখ্য হয়ে উঠেছে।

জনৈক **অজ্ঞাতনামা** কৃত 'এই এক প্রহসন' (১৮৮১), মুঙ্গের নাট্য সমাজের দ্বারা অভিনীত জনৈক **অজ্ঞাতনামা** কৃত 'বঙ্গরত্ন' (১৮৮১), **রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের** 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' (১৮৮১), **কালিপদ ভাদুড়ীর** 'গুণের শ্বশুর' (১৮৮১), **হেমচন্দ্র দত্তের** 'শালাবাবুর আক্কেল' (১৮৮১), জনৈক **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'বৌ ঠাকুরণ' (১৮৮১) প্রভৃতি এ সময়কার উল্লেখযোগ্য হাস্যরসাত্মক নাটিকা।

সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নিউ ক্লাসিক থিয়েটারের নাট্যকার সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু হাস্যরসাত্মক গুটিকয়েক নাটিকা রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত নাটিকাগুলি অনেকটা নক্সাধর্মী। তবে সমকালীন থিয়েটার-রসিক দর্শকদের এই নাটিকাগুলি যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছিল।

কর্মকর্ত্তা ঃ

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় সুরেন্দ্রচন্দ্রের 'কর্মকর্ত্তা' প্রহসন। এটি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়। 'কর্মকর্ত্তা' প্রহসনের কাহিনী নির্বাচনে প্রহসনকারের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় প্রহসনকার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন লৌকিকতা রক্ষার দায়ে তৎকালীন বাঙালি সমাজ কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। তিনি দেখেছেন,—

> "যাঁহার অতিকষ্টে শাকান্ন ভোজনেও দিনাতিপাত করা দুঃসাধ্য, সে ব্যক্তিও আপনকার দারিদ্র্য সংগোপন পূর্বক অশেষ ঋণে আবদ্ধ হইয়া সকলের নিকট মাননীয় হইবার চেষ্টা করেন; অবশেষে তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারস্থ সকলকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।"

'কর্মকর্ত্তা'র কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ—নবীনবাবুর দুই ছেলে আহ্লাদ ও পেহ্লাদ। আহ্লাদের রোজগারের সামর্থ্য নেই, অথচ কর্ম উপলক্ষ্যে বিরাট খরচ করে নাম কেনার ইচ্ছে আছে তার। ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধে তার বাবা এবং ভায়ের অমতে সে বহু টাকা খরচ করে—এ জন্য তার কিছু দেনা হয়ে যায়। পাওনাদারের গুঁতোয় সে অস্থির। ইতোমধ্যে মা মারা যান। আহ্লাদের বাবা, তার ভাই পেহ্লাদ, বোন দিয়া তিনজনেই তাকে সংক্ষেপে শ্রাদ্ধ কার্য করতে বলে—কিন্তু আহলাদ শোনে না। ঘরে স্ত্রী-পুত্র তার উপোসে রয়েছে অথচ নাম কেনার জন্য বহু ঋণ করে সে মাতৃশ্রাদ্ধ করে। পাওনাদারেরা বার বার তাগাদা দিয়ে ব্যর্থ হয়ে আদালতে নালিশ করে। লজ্জায়, ঘেন্নায় এবং কারাবাসে যেতে হচ্ছে এই দুঃখে আহলাদ যখন ভেঙে গড়ে—তখন তার পিতা নবীনবাবু তার সমস্ত দেনা শোধ করে তাকে অবশ্যম্ভাবী জেল থেকে বাঁচান। আহলাদের চৈতন্যের হয়।

'কর্মকর্ত্তা'র এ-কাহিনী বাঙালী সমাজের চিরন্তন কাহিনী। এ শুধু উনিশ শতকের সমাজ-সাক্ষ্য নয়—আজও এর জাজ্জ্বল্যমান বহু প্রমাণ এ সমাজে উপস্থিত। প্রহসনকার তাই ভূমিকায় এই প্রহসন রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন—"জনসমাজকে এই ভ্রমান্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার প্রয়াসই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

এই প্রহসনে হাসির চেয়ে কান্নার ভাগ বেশি, সুখের চেয়ে দুঃখের। তাই 'কর্মকর্ত্তা' নাটিকাটি ঠিক প্রহসন না হয়ে দুঃখ-সমুদ্রোত্তীর্ণ রসাল কমেডির স্বাদ এসে দিয়েছে। তবে একথাও ঠিক যে প্রহসনের মতো এ নাটিকা উপর-উপর সব কিছু দেখিয়েছে—মানুষের মনের গভীরের উচ্চভাব নিয়ে এই সামাজিক লৌকিকতার সমস্যাকে দেখা হয়নি। হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত জোগান দেওয়া হয়েছে—শিশুদের ছড়ায়, চাষীর গুঁতোয় এবং ছড়া আবৃত্তিতে,—

> "এস বাবা, কর্ম্মকর্ত্তা কাঁধে ওঠ ধন
> গোবিন্দ হোরিতে চল শ্রীঘর এখন
> বাবা শ্রীঘর এখন।"

সুরেন্দ্রচন্দ্র বসুর লেখা আরও দুটি নক্সার পরিচয় মেলে—'হ'ল কি' (নক্সা), 'দেশ গুল্‌জার' (স্বদেশী নক্সা ১৩১৩ বঙ্গাব্দ)।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দেও বাংলা প্রহসনের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য নব সংযোজন ঘটে নি। তবে শ্রোতৃ-মনোরঞ্জনের জন্য আদিরসাত্মক কতকগুলি নাট্যপুস্তিকা রচনা করেছিলেন কয়েকজন প্রহসনকার। এগুলির বিষয়বস্তু বাঙালি সমাজের দৈনন্দিন জীবনাচরণে নানা

ত্রুটি বিচ্যুতিকে যেমন আশ্রয় করেছে, তেমনি চাকুরীজীবী মানুষের জীবনের বেদনা হাস্যকরুণরূপে ফুটে উঠেছে কয়েকটি নাটিকায়। যেমন **কেশবচন্দ্র ঘোষ** রচিত 'বড়বাবু' (১৮৮২), বাংলার সমাজজীবনের নানা কাহিনীকে আশ্রয় করে রচিত পুস্তিকাগুলি হল— **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের** 'বড় ঘরের বড় কথা' (১৮৮২) **রাজেন্দ্রনাথ রায়ের** 'আক্কেল সেলামী' (১৮৮২), **কৃষ্ণচন্দ্র পালের** 'দুর্গাপূজার মহাধুম' (১৮৮২), **শশাঙ্কবিহারী গুহ** রচিত 'বাবার ছেলের মা' (১৮৮২), **ঈশানচন্দ্র মুস্তাফী** রচিত 'জলযোগ' (১৮৮২), **বঙ্গবিলাস সমজদার** (ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষরচন্দ্র সরকার) রচিত 'হাতে হাতে ফল' (১৮৮২), জনৈক **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'অপূর্ব দল' (১৮৮২), **রাজকৃষ্ণ দত্ত** রচিত 'যেমন রোগ, তেমনি রোঝা' (১৮৮২), **শরৎচন্দ্র গুপ্ত** রচিত 'ত্রিপুরা শৈল নাটক' (১৮৮২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী গতানুগতিক পথেই প্রহসনের রাজপথে এসে পড়েছিলেন। তাঁর রচিত দুটি প্রহসনের সন্ধান পাওয়া যায়।—'চক্ষুঃস্থির প্রহসন' এবং 'গোলোক ধাঁধা'।

'চক্ষুঃস্থির' প্রহসনটির (Stunned eye) প্রথম অভিনয় হয় বেঙ্গল থিয়েটার রঙ্গামঞ্চে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারি। মৌলিকতার অভাব, বিষয়বস্তু নির্বাচনে পরকীয় দৃষ্টিভঙ্গি -সর্বস্বতা কালীকৃষ্ণকে অনালোকিত দিগন্তের নাট্যকাররূপে চিহ্নিত করেছে। 'চক্ষুঃস্থির' প্রহসনটির বিষয়বস্তু গ্রাম্য জীবন ও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে উদ্ভাসিত। পাড়াগাঁয়ের হরগোবিন্দের স্ত্রী বৈষ্ণবী। কৃষ্ণদাস বৈরাগী তার মোসাহেব। কৃষ্ণদাসের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ষড়যন্ত্রের এক নিপুণ জাল বিছায়। উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হবার আকাঙক্ষায় সে জমিদার হরগোবিন্দকে বিষ খাইয়ে মারতে চায়। হরগোবিন্দ সন্দেহও করেন নি। কিন্তু যতীনের সহায়তায় ও প্রয়াসে হরগোবিন্দ রক্ষা পেয়ে যান। কৃষ্ণদাস ও বৈষ্ণবী উত্তমমধ্যম সাজা পায়। প্রহসনটিতে একটি নীতিশিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে,—

"কুলেতে কলঙ্ক সদা অপমান,
যদি বশ কেহ হয় রমণীয়।
ভন্ড চাটুকার কথায় ভুল না,
দেখে শুনে আজ হলো চক্ষুঃস্থির।"

বেঙ্গল থিয়েটার রঙ্গামঞ্চে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি 'গোলোক ধাঁধা' প্রহসনটি অভিনীত হয়। যদিও 'চক্ষুঃস্থির' ও 'গোঁলোকধাঁধা' দুটি প্রহসনই ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। কালীকৃষ্ণের প্রহসন দুটির প্রাহসনিক মূল্য কম হলেও এগুলির অভিনয় গুণে দুটি প্রহসনই দর্শক মন জয়ে সমর্থ হয়েছিল।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ঃ

উনিশ শতকের বাঙালির বিশেষ মানস-প্রবণতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রহসন-গুলিতে লক্ষিত হয়। বিত্তবান সমাজের যুগরুচি (বাবু কালচার) অনুসারে একই সঙ্গে ঘর এবং বরমহলে পুরুষের গতায়াতে নিজের আপন ঘরে ঘরে যে দৈন্য প্রকট হয়ে ওঠে তাই ব্যক্ত হয়েছে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রহসনে।

আক্কেল গুড়ুম ঃ

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ অক্টোবর প্রকাশিত 'আক্কেল গুড়ুম' প্রহসনে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ। কুলীন ব্রাহ্মণ পদ্মনাথের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বসন্ত, সেবাদাসী মাতঙ্গিনী ও পালিত পুত্র নরেনকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। স্ত্রীর বদলে পদ্মনাথ মাতঙ্গিনীর সঙ্গই বেশি কামনা করেন। বেশ্যাবাড়ীতেও যাতায়াত আছে তাঁর। এনিয়ে বসন্ত ক্ষুব্ধ। বসন্তের উপর পদ্মনাথকে রুষ্ট করে তোলে সেবাদাসী। একদিন পদ্মনাথ বেশ্যাবাড়ী গিয়ে নরেনের সামনে (তারও বেশ্যাবাড়ী যাওয়ার অভ্যাস ছিল) বেশ্যা কমলার দ্বারা লাঞ্ছিত হয়। পদ্মনাথ বাড়ি ফিরে নরেনকে বিতাড়িত করেন। বসন্তকে মিথ্যা অপবাদ দেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনে 'কুলের প্রদীপ' বলে ডাকেন। এজন্যই এই প্রহসনের নাম 'আক্কেল গুড়ুম বা কুলের প্রদীপ'।

পিণ্ডদান ঃ

স্ত্রী প্রতি অত্যধিক বিশ্বাস এবং ভালোবাসা যে সর্বনাশ ও বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে তারই পরিচয় রয়েছে 'পিন্ডদান' (১৮৮২) প্রহসনে। স্ত্রী বিনোদিনীর একান্ত বশংবদ স্বামী নিত্যানন্দ। তবু বিনোদিনী স্বামীর বন্ধু বিনয়ের সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত। বিশেষ কাজে নিত্যানন্দ কয়েকদিনের জন্য একবার অন্যত্র যায়। বিনয়কে, না বুঝে, সংসারের দায়িত্ব দিয়ে যায়। বিনোদিনী-নিত্যানন্দ অবৈধ সঙ্গমে লিপ্ত হয়। এমনই এক সময় নিত্যানন্দ ফিরে আসে। বিনয় ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ভৌতিক শব্দ করতে থাকে। স্ত্রীর ছলনায় বিশ্বাস করে পিতৃপুরুষকে উদ্ধারের জন্য নিত্যানন্দ গয়ায় পিন্ডদানের জন্য যায় পত্নীকে একশ টাকা দিয়ে। সেই টাকা নিয়ে বিনোদিনী বিনয়ের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। ঘরে ফিরে নিত্যানন্দ ভেঙে পড়ে। এই রকম গতানুগতিক কাহিনী নিয়ে অজস্র প্রহসন রচিত হয়েছে। নূতনত্বহীন, বর্ণনা চাতুর্যহীন এই রচনাগুলি লেখকের প্রাহসনিক প্রতিভার দুর্বলতাই প্রকট করে তোলে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের আর একটি প্রহসন প্রকাশিত হয় 'গুঁফো গম্বুজ' বা 'রসরত্ন।' ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর আর একটি প্রহসন 'ট্রাএল ব্রাহ্মণী—জগদ্ধাত্রী'।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে একই ধরনের কতকগুলি প্রহসন রচিত হয়েছে। কী বিষয়বস্তুতে, কী আঙ্গিকে প্রহসনগুলির কোনো নূতনত্ব নেই। **শম্ভুনাথ বিশ্বাস** রচিত 'শাশুড়ী-জামাই,' 'ফচ্‌কে ছুঁড়ীর গুপ্তকথা', **মনোরঞ্জন বসুর** 'প্রণয়ী বিচ্ছেদ,' **রামনারায়ণ হাজরার** 'পূজাতে সাজা মজা,' **দিবাকান্ত রায়** রচিত 'অমৃতে গরল', **গোঁসাই দাসগুপ্ত** রচিত 'বৌ বাবু', জনৈক **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'কুলীন বিরহ,' জনৈক **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'গোবর্দ্ধন,' **ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষাল** (টি, এন্, জি) রচিত 'সমাজ সংস্করণ,' **অঘোরচন্দ্র ঘোষ** রচিত 'মায়ের আদুরে মেয়ে,' 'মহন্তের খেদ' 'ড্রেনের পাঁচালি' **বিনোদবিহারী বসু** 'সরসীলতার গুপ্তকথা,' **বিপিনবিহারী ঘোষালের** 'ভারতে কোর্টশিপ', **বনোয়ারীলাল গোস্বামী** রচিত 'কার মরণে কেবা মরে মলো মাগী কলু' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা **অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর** 'কৌলীন্যে কি স্বর্গ দেবে?' **সারদাচরণ ঘোষের** 'বাল্যবিবাহের অমৃতফল' কোনো নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়

দিতে পারে নি। গতানুগতিকভাবে প্রহসনের রচনা করে এর সংখ্যাবৃদ্ধি করেছেন আরও কয়েকজন প্রহসনকার। যেমন,—**গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** রচিত 'তুমি কার,' **রামকানাই দাস** রচিত 'মাগ সর্ব্বস্ব', **প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়** রচিত 'বড়বৌ বা ডাক্তার,' **অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়** রচিত 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়', **নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়** রচিত 'তিন জুতো,' **মর্দ্দা গাজী** রচিত 'গ্রাবু খেলা প্রহসন'।

রাধাবিনোদ হালদার ঃ

উনিশ শতকের শেষদিকে অর্ধশিক্ষিত বিকৃতরুচির পাঠকদের চাহিদা পূরণের জন্য অনেকগুলি প্রহসনধর্মী গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। রাধাবিনোদ রচিত গ্রন্থগুলি এই ধরনেরই। নাট্যকার সমসাময়িক সমাজ-জীবনের সমস্যাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তাঁর প্রহসনগুলিতে। তাঁর প্রহসনগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য—(ক) ঈশ্বরগুপ্ত ও অমৃতলালের মতো বিহারীলাল প্রহসনগুলিতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। (খ) সামাজিক সমস্যা—বহুবিবাহ, ঘরজামাই প্রথা প্রভৃতিকে ব্যঙ্গ করেছেন। বলা বাহুল্য, বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে মৌলিক যোগ্যতার পরিচয়ের অভাব, শব্দ প্রয়োগ ও সংলাপ প্রয়োগে অশ্লীলতার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক রাধাবিনোদের প্রহসনগুলিকে মঞ্চে অভিনীত হবার সুযোগ করে দেয়নি। রাধাবিনোদের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি অনেকগুলি হাস্যরসাত্মক নাটিকা রচনা করেছিলেন। এই পর্যন্তই। কিন্তু সেগুলি কখনোই গ্রাম্যসঙযাত্রা কিংবা বটতলার রসরচনার ঊর্দ্ধে উঠতে পারে নি।

রাধাবিনোদ হালদারের লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রহসন হল—'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' (১৮৮৫), 'একঘরে দুই রাঁধুনি পুড়ে মলো ফ্যানগালুনি' (১৬ নভেম্বর, ১৮৮৭), 'দোজবরে ভাতারের তেজবরে মাগ' (২২ নভেম্বর, ১৮৮৭), 'পাস করা মাগ' (১০ মে, ১৮৮৮), 'পাস করা জামাই' (২৩মে, ১৮৮৮), 'শ্রীযুক্তা বৌ বিবি' (২১ জুলাই, ১৮৯০)

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত প্রহসনগুলি হল—**বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** রচিত 'কলির ছেলে প্রহসন,' **নলিনী দাসগুপ্ত** রচিত 'তোমার ভালবাসার মুখে আগুন', **আশুতোষ বসু** রচিত 'সমাজ কলঙ্গ,' **অমৃতলাল বিশ্বাস** রচিত 'গাঁয়ের মোড়ল বা গৃহস্থের সর্ব্বনাশ,' জনৈক **অজ্ঞাতনামা** 'কলির মেয়ে ও নব্যবাবু', জনৈক **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'যৌবনের ঢেউ'। এই প্রহসনগুলি নরনারীর সামাজিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে লেখা। শিক্ষার বিস্তারের সাথে সাথে কীভাবে রুজির সন্ধানে শহরে এসে মানুষ বিদেশি শিক্ষায় বশংবদ কেরাণীতে পরিণত হয়ে যায়—তার পরিণামই বা কি—তাই হাস্যরসের আধারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। **প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়**-এর 'কেরাণী চরিত'-এ (১৮৮৫, ১৪ ডিসেম্বর) ও **পূর্ণচন্দ্র সরকার**-এর 'হাল আমলের সভ্যতা'য় (১৮৮৫, ১১ ফেব্রুয়ারি)।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রহসনগুলির তালিকা নিম্নরূপ—**লালবিহারী সেন**—'ভালবাসার মুখে ছাই,' **এস্. এন্. লাহা** রচিত 'বুড়ো পাগ্‌লার বে', 'ঘিয়ের গন্ধে প্রাণ গেল' (১৮৮৬) 'গোপালমণির স্বপ্নকথা' (১৮৮৭) **চুনীলাল শীল** রচিত 'কি মজার শ্বশুরবাড়ী, যার যার আছে পয়সা কড়ি' (১৮৮৬), **অজ্ঞাতনামার** 'হরি ঘোষের গোয়াল' **অজ্ঞাতনামার** 'ফচ্‌কে ছুঁড়ীর ভালবাসা,' **কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের** 'বাপ্‌রে কলি' (১৮৮৬), 'সাজার কাজে হাজার গোল' (১৮৮৭) **হরিমোহন পাল** রচিত 'রসিক নাটক',

নীলমণি শীল রচিত 'ঘিয়ের সাত কান্ড,' **ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়**-এর 'ছোট বৌয়ের গুপ্ত প্রেম,' 'পিরীতের বাঁদর নাচ' ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় 'রাঙ্গা বৌয়ের গোদা ভাতার'। **কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের** 'রহস্য মুকুর' প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর। **সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ** রচিত 'সংস্কারক প্রহসন' ২০ ডিসেম্বর, ১৮৮৬-তে প্রকাশিত হয়।

রাখালদাস ভট্টাচার্য

উনিশ শতকের শেষদিকে যে ক'জন প্রহসনকার অমৃতলালের বিদেশ গমনসূত্রে রঙ্গ মঞ্চের যে শূন্যতা তা পূরণের উদ্দেশ্যে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে দীনবন্ধু অমৃতলাল-ধর্মী কয়েকটি প্রহসন উপহার দিয়েছেন—তাঁদের মধ্যে রাখালদাস ভট্টাচার্য একজন। রসরাজ অমৃতলালের পথ অনুসরণ করে তাঁর প্রহসনগুলিতে তিনি গোঁড়া হিন্দুধর্মের প্রতি নিজ প্রকাশ্য, কখনো-বা পরোক্ষ সমর্থন জানিয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষের মূলে ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, স্ত্রীস্বাধীনতা, ব্রাহ্মসমাজের আত্যন্তিক সমাজ-সংস্কার প্রবণতা, সর্বোপরি পাশ্চাত্য ধর্ম ও আচার-আচরণের সঙ্গে এদেশীয় ধর্ম ও প্রাত্যহিক জীবনাচরণের সংঘাত। দ্বন্দ্বের গভীরে গিয়ে সমাজ সমস্যার স্বরূপ অনুধাবন করে প্রহসনে প্রকাশ করার মতো প্রতিভা রাখালদাসের ছিল না। তিনি তাই উপর-উপর সমস্যাগুলিকে স্পর্শ করে গেছেন। হাস্যরসের যোগান দিতে গ্রাম্য সুরা পরিবেশন করেছেন আবার অতি শহুরে মতো ও পথকেও হাস্যাস্পদ করে তুলেছেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য প্রহসনগুলি হল—স্বাধীন জেনানা' (৩০ জানুয়ারি, ১৮৮৬), সুরুচির ধ্বজা' ৩০ অক্টোবর, ১৮৮৬), 'অবলা ব্যারাক' (২ জুলাই, ১৮৮৭), 'রুকিমণী রঙ্গ' (৮ অক্টোবর, ১৮৮৭), ভন্ডবীর (১৮৮৮) প্রভৃতি।

স্বাধীন জেনানা ঃ

'স্বাধীন জেনানা' প্রহসনটি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি 'বেঙ্গল থিয়েটার' মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটিকাতে রাখালদাস ভট্টাচার্যের অন্ধ হিন্দুয়ানীর পরিচয় মুদ্রিত রয়েছে। অমৃতলালের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রচিত কিছুটা ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক কিছুটা অশ্লীল রচনা এটি। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসারে বিরূপ সমাজিক মানসিকতার পরিচয় এই প্রহসনটিতে মেলে।

শিক্ষিত নেপাল স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে একটি প্রেস কিনেছে, সংবাদপত্র প্রকাশ করছে—কেবল কার্য করার জন্য। কারণ তার বিশ্বাস, 'এখন কার্য চাই....তবেই দেখিবেন আমরা আবার উন্নত হ'ব।' উন্নত হবার জন্য পিতামাতার অবাধ্য হয়ে স্ত্রী হেমাঙ্গিনীকে স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে উৎসাহিত করে তোলে। পত্রিকায় 'ফেমিন ফান্ডে'র টাকা ভেঙে স্ত্রীকে বিলাতি পোষাক কিনে দেয় এবং তাকে প্রতিবেশী কালীপদবাবুর সঙ্গে সান্ধ্য ভ্রমণে উৎসাহিত করে। এদিকে দেনার দায়ে নেপালের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। স্ত্রীর কাছে গহনা চাইলে সে সেদিকে দৃকপাত না করে কালীপদবাবুর সঙ্গে উদ্যান ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। তারা নারী পুরুষের মধ্যে অবাধ মিলন, চুম্বন দোষের কিনা তা নিয়ে আলোচনা করে। এমন সময় নেপাল এসে বাধা দিতে গেলে সে প্রহৃত হয়। কালীপদবাবু ও হেমাঙ্গিনী পলায়ন করে। নেপাল স্ত্রীকে স্বাধীন করার ফল হাতে হাতে পায়—তখন কিন্তু তার আক্ষেপই সম্বল।

তৎকালীন শিক্ষিত যুবসমাজের সংলাপে ইংরেজি-বাংলা ভাষার যে জগাখিচুড়ি প্রায়ই লক্ষিত হত—দ্বিজেন্দ্রলাল, তারও পূর্বে দীনবন্ধু অমৃতলালে যার প্রকাশ—এই নাটিকায় রাখালদাস তাও প্রয়োগ করেছেন। বিশেষ করে কালীপদবাবুর উক্তি তো বাংলা ইংরেজির ককটেল বিশেষ। যেমন উদ্যানে নেপাল তার স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করতে গেলে কালীপদবাবু বলে—"আপনার ন্যায় দৈত্যের হস্তে কখনই আমার দুর্বল female friend-কে রেখে যেতে পারি না"। হেমাঙ্গিনীও কম যায় না। স্বামী তার খারাপ আচরণের জন্য তাকে তিরস্কার করলে ও দেনার হাত থেকে বাঁচার জন গহনা প্রার্থনা করলে সে বলে,— 'female, এর Sacred body তে assault করিলে অভিযুক্ত হইতে হইবে।' আসলে এই নাটিকায় হেমাঙ্গিনী চরিত্রের দুই রূপ অঙ্কন করা হয়েছে—স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক শিক্ষা পাবার পূর্বে সে স্বেচ্ছায় নিজের অলঙ্কার স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছে, আর শিক্ষালাভের পর সে গহনা স্বামীর হাতে তুলে দেবার কথা ভাবে নি। সুতরাং স্বাধীনা রমণী সংসারের সুখের পথে কিরকম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তাই এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সুরুচির ধ্বজা ঃ

রাখালদাস ভট্টাচার্য রচিত 'সুরুচির ধ্বজা' প্রহসনটি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর বেঙ্গল থিয়টার মঞ্চে অভিনীত হয়। এই দিনের 'Statesman' পত্রিকার বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ,—

> 'GRAND OPENING NIGHT/BENGAL THEATRE/
> SATURDAY, THE 30TH OCTOBER. AT 9. P.M/
> Boboo R. K. Roy's well-known Drama/Bhismer Sarasjjya/
> Followed by a new Society Play–
> "Suruchir Dhaja"
> Or a monument of fair taste...."[১]

বাঙ্গাল গিরিধারীর পুত্র লালচাঁদ আধুনিক শিক্ষার গুণে মডার্ণ হয়েছে। সে তার স্ত্রীকে পছন্দ করতে পারছে না—কারণ স্ত্রীর জোরেই এখন সব কিছু পসার। ব্রাহ্মবন্ধু চারুর পরামর্শ সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে বঙ্গাজ ও গ্রাম্য কালাচাঁদের স্ত্রী সুরুচিকে গ্রহণ করতে আগ্রহ দেখায়। এ ব্যাপারে উৎসাহে দেখান ব্রাহ্মসমাজের আচার্যও। সুরুচি স্বামীকে ত্যাগ করে লালচাঁদকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। লালচাঁদ অর্থ দিয়ে আচার্যকে এ ব্যাপারে বিশেষ চেষ্টা করতে অনুরোধ করেছে। এদিকে গিরিধারী অসৎমার্গগামী পুত্র লালচাঁদকে ফেরানোর জন্য তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। এ সংবাদ পাবার পর সুরুচি অর্থহীন দরিদ্র লালচাঁদকে গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছে। আচার্যও লালচাঁদের প্রদত্ত অর্থ ফেরৎ দেন নি। অগত্যা লালচাঁদ সুরুচির পরামর্শে ঘরে ফিরে বাবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছে। প্রহসনটিতে পূর্ব কাহিনীই ঘুরে ফিরে এসেছে। বাংলা-ইংরেজি মিশ্রিত সংলাপ ব্রাহ্মসমাজের চরিত্রগুলির মুখে দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ রাখালদাসের গোঁড়া হিন্দুয়ানি ও অন্ধ-ব্রাহ্ম বিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় এই প্রহসনেও মেলে।

১ The Statesman/30th oct. 1886.

অবলা ব্যারাক ঃ

রাখালদাস ভট্টাচার্য লিখিত এই প্রহসনটিও ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক রচনা। এটিও একটি সামাজিক নকসা। নাটিকাটি সার্থক প্রহসন হয়ে উঠতে পারেনি এজন্য। 'অবলা বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর অবলা ব্যারাক নামক বাড়ির প্রতি কুৎসিত আক্রমণ করা হয়েছে এই প্রহসনটিতে। শ্রীরাধারমন মিত্র এই নাটিকাটির সম্পর্কে বলেন,—'দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'অবলা বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বলে ও নারীদের সবরকম অধিকার ও উন্নতির জন্য লড়াই করতেন বলে লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'অবলা বান্ধব'। অবলা বান্ধব' ১৩ নং কর্ণওআলিস্ স্ট্রীটের বাড়িতে থাকতে বলে হিন্দুরা এই বাড়িতে বলত 'অবলা ব্যারাক'। 'ব্যারাক' বলবার কারণ এই যে বহু হিন্দুসন্তান ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর হিন্দুসমাজ থেকে এবং পৈতৃক বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে এই বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।"[১] তাছাড়া দীনবন্ধু মিত্রের জামাই বারিকে'র জামাই ব্যারাক রাখালদাসকে এই নাটিকার নামকরণে উৎসাহিত করতে পারে বলে মনে হয়।

'অবলা ব্যারাক'-এর কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ—কালীপদ একটি মহিলা আশ্রম বা 'অবলা ব্যারাক' করেছেন। অনেক রমণীকে উদ্ধার করে তাঁর আশ্রমে রেখেছেন। সুহাসিনী ও হেমাঙ্গিনী কালীপদকে বিয়ে করতে চায়—দুজনকেই কালীপদ কথা দিয়েছিলেন। অর্থের অন্বেষণে কোলকাতায় এসে ভাগ্যধর তলাপাত্র হঠাৎ সপ্তমবার দারগ্রহণকারিণী মনোমোহিনীর প্রেমে পড়ে গেছেন। এদিকে বিপিন নামে একটি নিজ পুত্রের চেয়েও ছোট যুবক মনোমোহিনীকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মনোমোহিনীর ছেলেদের আপত্তি বিপিনকে 'father' বলায়। ভাগ্যধর মনোমোহিনীকে পরার জন্য বহু খরচ করেছেন। ছেলেরা তাদের ভাবী পিতাকে Examine করতে চায় শুনে ভাগ্যধরবাবু ব্যারাকে হাজির হলেন। হঠাৎ তিনি মনোমোহিনীর আঁচল ধরে টানায় আশ্রমে দক্ষযজ্ঞ বেধে যায়। প্রেমিকার পুত্রদের হাতে প্রহৃত হয়ে, হৃতসর্বস্ব ভাগ্যধার সেখান থেকে চলে যান। কালীপদবাবুও ফ্যাসাদে পড়ে যান—কারণ সুহাসিনী আর হেমাঙ্গিনী দুজনই তাঁকে বিয়ে করবে বলে টানাটানি করতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণই এই নাটকের মূল লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে এই প্রহসনে কালীপদ রূপে চিত্রিত করা হয়েছে বলে মনে হয়।

এই প্রহসনটি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। দীনবন্ধুর নানা প্রহসনের প্রভাব এ নাটিকার নামকরণ থেকে শুরু করে চরিত্র নামে পর্যন্ত রয়ে গেছে।

রুক্মিণীরঙ্গ ঃ

রাখালদাস ভট্টাচার্য রচিত 'রুক্মিণীরঙ্গ' প্রহসনটিও ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক অশ্লীলধর্মী রচনা। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ অক্টোবর এটি বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। 'রুক্মিণীরঙ্গ' প্রহসনটিকে প্রহসনকার 'সাময়িক রঙ্গনাট্য' রূপে অভিহিত করেছেন।

কান্তারাম রায়ের শিক্ষিতা কন্যা রুক্মিণীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে হাঁদারাম চট্টোপাধ্যায়ের। রুক্মিণী স্বামীর ঘরে যেতে চায় না। কারণ স্বামীকে তার পছন্দ নয়—দিনেশের প্রতি তার love আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ করে সে তাকেই স্বামী হিসেবে পেতে চায় কান্তরাম মেয়েকে

১. এক্ষণ/শারদীয়া, ১৩৮৩/কলকাতার টুকিটাকি/রাধারমণ মিত্র।

প্রশ্রয় দেন। দিনেশ-রুক্মিণী ঘরের ভেতর ঢুকে আমোদ-প্রমোদ করতে থাকলে তিনি দরজায় প্রহরা দেন। একদিন হাঁদারাম বন্ধু বিষ্ণুকে নিয়ে এইরকম সময়ে হাজির হয়। রুক্মিণী স্বামীর ঘর করতে নারাজ হওয়ার হাঁদারাম কেস করে। জেমি ও ব্রুশ নামে দুজন অ্যাংলো রুক্মিণীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং তাকে চিন্তা করতে নিষেধ করে। টাউন হলে রমণী উদ্ধার নিয়ে এক মিটিং শুরু হয়। সে সময় পুলিস এসে রুক্মিণীকে গ্রেফতার করে। দিনেশ পালিয়ে যায়। পিতা তাকে সান্ত্বনা দেন—যে মাত্র ছমাস জেলে থাকতে হবে—"ভয় কি মা, মনে করে যেন ছমাস সোয়ামীর ঘরে যাচ্চ...." রুক্মিণী নিজ কর্মের জন্য অনুশোচনা করতে থাকে। এই প্রহসনে অমৃতলালের প্রহসনের অনুসরণে স্বাধীনাদের সঙ্গীত সংযুক্ত করা হয়েছে। অবাধ প্রেমের গুণগান করে তারা গেয়েছে,—

"মিলি সবে চল্ প্রেমের হাটে
হয়ে একমন্, মনো মতো ধন;
পাপ স্বামীর মুখে কালি দিয়ে।....."

বলা বাহুল্য, এ গানের ভিত্তি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলি সবে ভারত সন্তান।"

ভণ্ডবীর ঃ

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ মে বেঙ্গল থিয়েটারে 'ভন্ডবীর' প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয়। ছদ্ম স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে বিষোদগার এই প্রহসনের উদ্দেশ্য। এই নাটিকাকে বলা হয়েছে 'Socio-political satire'।

প্রফুল্লনলিনী দাসী

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম নারী প্রহসনকার **প্রফুল্লনলিনী দাসী** রচিত প্রহসন 'ষষ্ঠিবাঁটা প্রহসন' উল্লেখের দাবি রাখে। অসম-বিবাহের ত্রুটি ও ক্ষতি প্রসঙ্গ এ নাটিকায় অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অঙ্কিত হয়েছে। হরনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর দুই মেয়ে কুমুদিনী ও চারুশীলাকে শিক্ষিতা করেছেন। কুমুদিনীর বিয়ে দিয়েছেন এক শিক্ষিত নব্যযুবকের সঙ্গে। চারুশীলার বিবাহ স্থির করেন এক ব্যাকরণ পড়া ভট্টাচার্যের সঙ্গে। চারু অন্যে আসক্তা। সে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু কেউই সে বাধা গ্রাহ্য করে না। চারুশীলার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যায়। জামাইষষ্ঠীর দিন কোলকাতা থেকে বড়ো জামাই এসেছে। পাশের ঘরে তারা হৈ হুল্লোড় করছে। অন্যঘরে চারুশীলা দ্বিচারিণী হবার লজ্জায় আত্মহত্যা করেছে বিষ খেয়ে। সুতরাং প্রহসনের প্রথম শর্ত এখানে রক্ষিত নয়—নাটিকাটি শেষ পর্যন্ত tragedy হয়ে গেছে।

শ্রীনাথ লাহার 'যুগীর পৈতে রঙ্গ' (১৮৮৭), **মহেন্দ্রনাথ দাসের** 'কলির অবতার' (১৮৮৭), **মণিলাল মিশ্রের** 'শান্তমণির চূড়ান্ত কথা' (১৮৮৭), **চন্দ্রকান্ত দত্তের** 'আজব জোলা' (১৮৮৭), **তিতুরাম দাসের** 'কলির ছেলে প্রহসন', **কানাইলাল ধরের** 'মাগ ভাতারের খেলা (১৮৮৭), **ওয়াহেদ বক্সের** 'মাতাল সন্ন্যাসী' (১৮৮৭), 'প্রেমসাগর' (১৮৯১), **কুঞ্জবিহারী** দেব রচিত 'ঠেঙ্গাপাথিক ভুঁইফোঁড় ডাক্তার' (১৮৮৭)। শেষোক্ত প্রহসনটিতে হোমিওপ্যাথিক হাতুড়ে ডাক্তারকে নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করা হয়েছে।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'ভন্ড দলপতি দন্ড' (১৮৮৮), **সুধামাধব দাস** রচিত 'দিল্লিকা লাড্ডু' (১৮৮৮), **আর. এন. সরকার** রচিত 'কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে স্বর্গ হইতে সোনার টালী পতনে কলির অবতার' (১৮৮৮), **সারদাকান্ত লাহিড়ী** রচিত 'ঘোষের পো' (১৮৮৮), জনৈক **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'স্টুডেন্টস্ রহস্য' (১৮৮৮), **রসিকপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়** রচিত 'জয় জগন্নাথ' (১৮৮৮), **অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়** রচিত 'বারারী বিভ্রাট' (১৮৮৮), **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** রচিত 'বিজ্ঞানবাবু' (১৮৮৮) প্রভৃতি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

হারানশশী দে ঃ

রঙ্গমঞ্চে বিশেষ স্থান না পেয়ে কোনো কোনো অসমর্থ প্রহসনকার কেবলমাত্র গ্রন্থের সংখ্যাবৃদ্ধি করে নিজেদের নাম রাখার প্রয়াস করেছিলেন। বটতলার সাহিত্যধর্মী রচনার সে সময় বাজারে বেশ চল হয়েছিল। হারানশশী দে সেই যুগমানস তথা বিকৃত রুচির মানুষদের মানসিকতাকে বেশ ভালো করে পড়তে পেরেছিলেন। নাটকে পরিবেশিত হাস্যরসের অর্থ তাই কাছে ছিল ভাঁড়ামি, ইতর শব্দের বহুল প্রয়োগে পর্যবসিত হয়েছে তাঁর প্রহসনগুলি আর সমস্ত অখ্যাত প্রহসনকারদের মতো। সমাজচিত্র হিসেবে হারানশশীর প্রহসনধর্মী রচনাগুলির নামোল্লেখ করা যায় মাত্র, সাহিত্য হিসেবে এর মূল্য একেবারেই নেই।

একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পড়ছে। শিক্ষার বিস্তার এবং চাকরী-নির্ভরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সংসারের মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে কীরূপ—তাই হারাণশশী তাঁর প্রহসনগুলিতে দেখিয়েছেন। তাঁর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হাস্যরসাত্মক ছোট নাটিকাগুলি হলো—'মা মাগীর গলায় দড়ি, বৌয়ের হাতে সোনার চুড়ি।' 'পিরীতের মুখে ছাই', 'কলিকালের প্রেমের রঙ্গ, বেশ্যা নিয়ে রঙ্গ ভঙ্গ,' 'কলিকালের রসিক মেয়ে,' 'প্রণয়ের ভালোবাসা।' ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কলিকালের রসিক মেয়ে' (২নং)। এই নাটিকাগুলি ওই সময় সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিল।

কালীচরণ মিত্র তিনটি প্রহসন রচনা করেছেন। 'অম্লমধুর', 'ক্যাপ্টেনবাবু' (১৮৮৯) 'সই' (১৮৯৭)। ফরাসী নাট্যকার মলোয়ার-এর 'ল মেদিস্যাঁ মাল্‌গ্রে লুই' প্রহসন অবলম্বনে কালীচরণ তাঁর 'অম্লমধুর' প্রহসনটি রচনা করেছিলেন।[১]

মতিলাল শীল রচিত 'তোমার উচ্ছন্নে যাবার সুর' (১৮৮৯), **আশুতোষ সেন** (জনৈক ঘরসন্ধানে ছদ্মনামে) -এর রচনা 'স্কুল মাস্টার' (১৮৮৯), **গোবর্ধন বিশ্বাসের** 'বেল্লিক বামন' (১৮৮৯), **বিপিনবিহারী দে** রচিত 'অবলা কি প্রবলা?' ও 'সাতশো রগড়' (১৮৮৯), **গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়**- এর 'প্রাণের জ্বালা' (১৮৮৯), **গুরুদাস বৈরাগীর** 'লম্পটের নাকে খৎ (১৮৮৯), **মোহনলাল মিশ্র** রচিত 'কলির হঠাৎ অবতার', 'রসিক কামিনীর হদ্দ মজা, রথ দেখা আর বেচা' (১৮৮৯) **রামকানাই দাসের 'মাগ সর্বস্ব'** (১৮৮৯),

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড)/ড. সুকুমার সেন/পৃঃ ৩১৮

ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্তীর 'চক্ষুঃস্থির', **সিদ্ধেশ্বর রায়ের** 'বৌবাবু' (১৮৮৯), জনৈক **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'ভোটমঙ্গল' এটি মজিলপুর লীলা থিয়েটারে অভিনীত হয়। **উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের** 'বাসর কৌতুক' (১৮৮৯), **লালবিহারী দে** রচিত 'বাসর যামিনী' (১৮৮৯) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত অন্নপ্রাশন নিয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য প্রহসনটি হল **পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য** রচিত 'বিচিত্র অন্নপ্রাসন'।

বিপিনবিহারী বসু গুটিকয়েক প্রহসন রচন করেছিলেন। তাঁর লেখা প্রহসনগুলি হল— 'মাণিকজোড়' (১৮৯০), 'বুঝলে' (১৮৯০)। **কুসুমেষুকুমার মিত্রের** নামে প্রকাশিত পুস্তিকাটির নাম 'মাইরি দিদি!' (১৮৯০), 'ডুমুরের ফুল' (১৮৯৮), **কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের** 'বৌবাবু' (১৮৯০), **রমেশচন্দ্র নিয়োগী** রচিত 'সকলেই শুখায়' (১৮৯০) **অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** 'বিধবা সঙ্কট' (১৮৯০) প্রভৃতি এসময়কার উল্লেখযোগ্য রচনা।

জনৈক **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'নাট্যবিকার বা The Dramatic Delirium প্রহসনটিকে অনেকে জানকীনাথ বসুর রচনা বলে মনে করেন। কিন্তু শঙ্কর ভট্টাচার্য যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন যে এটি জানকীনাথ বসুর লেখা নয়। এই নাটিকাটির প্রথম অভিনয় হয় রয়াল বেঙ্গা ল থিয়েটারে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মে। এই নাটিকায় যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন—হরিশ—যোগেন্দ্রনাথ ঘটক, পাঁচকড়ি—কালীপ্রসন্ন মল্লিক। রমেন্দ্রমোহন—কুঞ্জবিহারী বসু, দিগম্বর—শশীন্দ্রনাথ দে, রাসমণি—নিস্তারিণী, কমলমণি—রানী, ভূতি—হরিদাসী "এই প্রহসনের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নেই, "(কলিকাতা ১৬৭ নং মাণিকতলা স্ট্রিট হইতে) শ্রীজানকীনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ৬নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন প্রেস, ইউ. সি. বসু এন্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত। ১২৯৮। মূল্য দুই আনা।" হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভুল করে এই প্রহসনের রচয়িতা হিসেবে বৈকুণ্ঠনাথ বসুর (জানকীনাথ বসু) নাম ও এর প্রথমাভিনয়ের তারিখ ২৫ ডিসেম্বর ১৮৮৯ লিখে গেছেন। এই ভুলের জের আজও চলেছে।"[১]

১. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান/শঙ্কর ভট্টাচার্য/পৃঃ ৭৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্য : হেঁয়ালী নাট্য : রবীন্দ্র প্রতিভার বিশালতা ও বৈচিত্র্যের কোনো সীমা নেই। বাংলা সাহিত্যের সব শাখাতেই—যেকোনো রসের রচনায় তাঁর অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যেরও তাই তুলনা দেওয়া মুশকিল। কিশোর বয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ীর ঔপনিষদিক আবহাওয়ায় মানুষ রবীন্দ্রনাথের রচনায় এক উচ্চ আদর্শবোধের পরিচয় মেলে। রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের রচনায় এ সময় রোমান্সজনিত বিস্ময়রসেরই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষ্য করি। হাস্যরস পরিবেশনের ধার কাছ দিয়ে যাবার প্রবণতা তখন তাঁর মধ্যে লক্ষিত হয়নি। 'ভারতী'ও 'বালক' এবং পরবর্তীকালে একত্রে প্রকাশিত 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় হাস্যরসাত্মক ক্ষুদ্র নাটিকা—হেঁয়ালী নাট্য প্রকাশ করা হত। রবীন্দ্রনাথের হাতে যখন এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ে তখন পূর্ব পরিবেশিত 'হেঁয়ালী নাট্যে'র ধারাকে অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে তিনিও কতকগুলি 'হেঁয়ালী নাট্য' রচনা করতে শুরু করেছিলেন। হাস্যরসাত্মক দু'তিন পৃষ্ঠার এই নাটিকাগুলি এক-একটি ধাঁধা বিশেষ। পরবর্তী সংখ্যায় এই হেঁয়ালীর উত্তর দেওয়া হত। রবীন্দ্রনাথের লেখা এই ধরনের নাটিকাগুলির ভাষার তির্যকতা ও তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করার মতো। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার ১২৯৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'হেঁয়ালী নাট্য'টি রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের নাটিকা রচনার সামর্থ্য প্রমাণ করে। এক নিমন্ত্রণ সভায় চন্ডীচরণবাবু ও কেবলরাম পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়। কেবলরাম চন্ডীচরণের কুশল জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে কী বিভ্রাট বাধিয়ে বসেছিল এই হেঁয়ালীর কাহিনী তাই। একটু উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যেতে পারে,—

"কেবলরাম। মশায় ভাল আছেন?
চন্ডী। "ভাল আছেন" মানে কি?
কেবল। অর্থাৎ সুস্থ আছেন।
চন্ডী। স্বাস্থ্য কা'কে বলে?
কেবল। আমি জিজ্ঞাসা করছিলেম মশায়ের শরীর গতিক—
চন্ডী। তবে তাই বল। আমার শরীর কেমন আছে জান্‌তে চাও। তবে কেন জিজ্ঞাসা করছিলে, আমি কেমন আছি? আমি, আর আমার শরীর কি একই হল?"[১]

পরের সংখ্যায় জানানো হয়েছে এই ধাঁধার উত্তর 'কেবল'। 'আর্য্যশাস্ত্র' বিষয়ক হেঁয়ালী নাট্যটি প্রকাশিত হয় 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার ১২৯৩ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায়। হেঁয়ালী নাট্যগুলিতে হিউমার বা স্যাটায়ার নেই—রয়েছে সামান্য wit এবং অজস্র কৌতুক।

কৌতুকনাট্য সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সামর্থ্য : রবীন্দ্রনাথ কৌতুকনাট্য খুব কম রচনা করেছেন। এ কারণে তার বিরুদ্ধবাদী সমালোচকেরা বলেছেন—রোমান্টিক কবি প্রতিভা প্রহসন বা কৌতুক নাট্য রচনার অন্তরায় স্বরূপ, সে কারণেই রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটকের এত স্বল্পতা। তাঁদের কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করেছেন যে কবি রচিত গুটি কয়েক রঙ্গ

১. ভারতী ও বালক / ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ সংখ্যা / পৃঃ ৪১-৪২

ব্যঙ্গমূলক নাটিকা তাঁর রচনার শৃঙ্খলিত ধারার সৃষ্টি নয় by product মাত্র। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের সদা-সরসতার কথা কারো অগোচর ছিল না। 'খামখেয়ালী সভা' কিংবা সঙ্গীত সমাজের দ্বারা অভিনীত নাটক এর প্রমাণ নাটকের উপস্থাপন সম্পর্কে কবির চিন্তাভাবনার শেষ ছিল না—কীভাবে সংলাপগুলি বললে দর্শকেরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে সব সময় এই চিন্তা ছিল নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক রবীন্দ্রনাথের। হেমেন্দ্রকুমার রায় রবীন্দ্রগোষ্ঠীর 'চিরকুমার সভা'র রিহার্সাল সম্পর্কে লিখেছেন,—'হাস্যনাটকের পাঠ, তাই তাঁর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল রীতিমতো চুটল এবং চোখে মুখে ফুটতে লাগল তরলভাবে লীলা।....ভালো করে ভাবাভিব্যক্তির জন্য মাঝে মাঝে যথাস্থানে নিপুণ অঙ্গুলি ইঙ্গিতের অভাব হল না।"[১] তাই রবীন্দ্রনাথের রঙ্গব্যঙ্গমূলক রচনাগুলিকে তাঁর by-product রচনা মনে করার কোনো কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের বহু গদ্যনিবন্ধে, উপন্যাসে ও করিতায় কবির সরস হাস্যরসের অবতারণার সামর্থ্য লক্ষ্য করা যায়। তবে একথা ঠিক রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসের পরিবেশনভঙ্গি এমন মার্জিত এবং এমন সূক্ষ্ম সে সাধারণ দর্শকের কাছে সে হাসির আকর্ষণ বড়ো বেশি থাকে না। সোজা কথায় রবীন্দ্রনাথের বঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটকগুলিতে যে হাসির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা মোটা তুলির দাগে নয়—অনুভূতিপ্রবণ শিল্পীর সূক্ষ্ম তুলির স্পর্শ রয়েছে সেগুলিতে।

হাস্যরস পরিবেশনের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক' এবং 'ব্যঙ্গ কৌতুক' সংকলন গ্রন্থ দুটি। হাস্যকৌতুকের মধ্যে সঙ্কলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র হেঁয়ালী নাটকগুলি। পাঠেই যার নাট্যসার্থকতা। ব্যঙ্গকৌতুক গ্রন্থের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়ো ব্যঙ্গ নাটকগুলি সংকলিত। প্রথম নাটিকাটির নাম বশীকরণ। এটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য রঙ্গনাট্যগুলি হল 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুন্ঠের খাতা' ও 'চিরকুমার সভা।' এবার নাটিকাগুলির পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

বশীকরণ ঃ

'বশীকরণ' নাটিকাটি কৌতুকজনক ঘটনাজটিল প্রহসন।[২] এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ক্ষুদ্র নাটিকার মর্যাদা লাভ করতে পারে। এতে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসুলভ মনোভাবের বশবর্তী হয়ে হিন্দুধর্মের প্রতি কিছুটা খোঁচা দেবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কটাক্ষপাত করা হয়েছে পন্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও চন্দ্রনাথ বসুকৃত শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতি। কিন্তু তবু অনাবিল স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসের প্রবাহ এতে ক্ষুন্ন হয়নি। অন্নদা নামক এক যুবক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার তার সংসারে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল, আশু নামে এক তন্ত্রমন্ত্র বিশ্বাসী যুবক এ কাহিনী ধারায় এসে পড়ায় যে জটিল আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল—তন্ত্রমন্ত্রসিদ্ধ অন্নদার স্ত্রীর বশীকরণ মন্ত্র প্রভাবে সে সমস্ত জটিলতা মুহূর্তে ঘুচে গেল। মিলনের উল্লাসে এই জটিল কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটল। নাটিকাটির মূলে যে ভ্রান্তি

---

১. সৌখীন নাট্যকলার রবীন্দ্রনাথ / হেমেন্দ্রকুমার যায় / পৃঃ ৯৭

২. বঙ্গ সাহিত্যের হাস্যরসের ধারা / ড. অজিতকুমার ঘোষ / পৃঃ ৩৮৭

রয়েছে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সে কারণে 'বশীকরণ' প্রহসনটি রবীন্দ্র সাহিত্যের অনাদৃত সম্পদ হয়েই রয়ে গেছে।[১]

গোড়ায় গলদ বা শেষরক্ষা :

১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনটি রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে চরিত্রগুলির কয়েকটি ভুলের মাধ্যমে হাস্যরসের উতরোল প্রবাহ বইয়ে দিয়ে পরিশেষে শেকসপীয়রের Comedy of Errors এর মতো সমস্ত রহস্যের জাল উন্মোচন করা হয়েছে এতে।

'গোড়ায় গলদ' নাটিকার প্রথম অভিনয় প্রসঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাট্য পরিচালন দক্ষতার কাহিনী। এর কাহিনীটি এইরকম,—'গোড়ায় গলদ' অভিনয়ে বেণীমাধব দত্ত নিমাই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তিনি কিছুতেই স্টেজে অট্টহাস্য হাসতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তবু বেণীমাধবকে দিয়ে ওই ভূমিকায় অভিনয় করাবেন ঠিক করলেন। তবে তিনি তাঁকে বলে দিলেন অভিনয়ের সময় বেণীমাধব যেন তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখেন। প্রহসনে নিমাই-এর হাসির জায়গা আসতেই রবীন্দ্রনাথ এমন অদ্ভুত মুখভঙ্গি করলেন যে নিমাইরূপী বেণীমাধব অট্টহাস্য না হেসে পারলেন না। অভিনয় সফল হল।[২]

'গোড়ায় গলদ' ঘটনাশ্রয়ী প্রহসন। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এ নাটিকা রচিত নয়। বাঙালির পরিচিত সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে চরিত্র আহরণ করে কিছু কল্পনার অতিরেকের মাধ্যমে এই নাটিকা রচিত। মূল কাহিনী নিমাই ও ইন্দুমতীর পারস্পরিক সাক্ষাৎ সংসক্তি, পরস্পরকে ভিন্ন নামে ভিন্নাবস্থায় দেখে চিনতে না পারা এবং তজ্জনিত সমস্যা সৃষ্টি। বিশেষ ঘটনায় সে ভুলের পর্দা অপসৃত হল। মিলন হল নিমাই ইন্দুমতীর।[৩] এই নাট্যকাহিনীর পাশাপাশি রয়েছে আর একটি শাখা কাহিনী বা উপকাহিনী—সেটি বিনোদবিহারী ও কমলমুখীর সম্পর্কের কাহিনী। কাহিনীতে এ উপকাহিনী কোনো বিশেষ মাত্রা যোগ করতে পারেনি।

রসতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে নাট্য-বিশ্লেষণ : ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ-দশকে লেখা এ প্রহসন। একটু তথ্যনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণে ঐ সময়কার বাংলাদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়

---

১. মিনার্ভা থিয়েটারে যখন প্রহসন নিজ দ্যুতিতে দ্যুতিময়, সে সময় অনেক পুরানো বাংলা প্রহসনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বশীকরণ' নাটিকাটি পুনরায় অভিনীত, হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারি মিনার্ভায় 'বশীকরণ' অভিনীত হয়।

২, নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ / পবিত্র সরকার / পৃঃ ৯৭
১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জনুয়ারি কোহিনুর থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' পুনরায় অভিনীত হয়।

৩. ড. সনৎকুমার মিত্র বলেছেন,-"যে নাটকীয় বিভ্রান্তির ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২) বা তার পুনর্লিখিত রূপ 'শেষ রক্ষা' (১৯২৮)-প্রহসনে যে হাস্যরস উৎসারিত করেছেন, তা বহুলাংশে শেকসপিয়রের 'দি কমেডি অব এরস'—নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মেলে। এ-ছাড়াও 'মাচ্ এ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং' -এর বেনেডিক ও বিয়াত্রিস্-এর ঘোর বিবাহ-বিরেধিতার প্রভাব এখানে থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়।" (শেকসপিয়র ও বাঙলা নাটক/পৃঃ ১৫৯)

দৃষ্টিক্ষেপণ করলে দেখা যাবে—সময়টা ভাঙা গড়ার যুগ। ঐ শতকের মধ্যভাগে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে জীবনদর্শন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে প্রাচ্যপন্থী এবং পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যে বাদবিতন্ডার সূত্রপাত ঘটে। ফলত প্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থী এই দুই বিবদমান শিবিরে হিন্দু সমাজের ভেদ-বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীদের ভাব-সমীকরণের প্রয়াসে সমাজজীবন তখন উত্তাল। বাংলা সাহিত্যেও এ সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতি প্রীতি-অপ্রীতির দ্বন্দ্ব লক্ষিত হয়। এদেশী সাহিত্যের অনুরাগীরা কালিদাসকে, পাশ্চাত্যপন্থীরা সেক্সপীয়রকে সেরা কবি রূপে সম্মান দিতে তৎপর। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ধরনের একপেশে সিদ্ধান্তের অধিকারী হয়েছেন তৎকালে প্রকাশিত তাদের কোন কোন প্রবন্ধে।[১] প্রবন্ধ ও অন্যান্য সাহিত্য শাখার কথা ছেড়ে দিলেও বলা যায় প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সাহিত্যকে বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে কোথাও কোথাও অনুসরণ করেছেন।

'গোড়ায় গলদ' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সূচনার সঙ্গে সেক্সপীয়রের 'Merchant of Venice' এর কয়েকটি ছত্র মিলিয়ে পড়া যায়—সেখানে ব্যাসানিও জানাচ্ছে যে তার মনে সুখ নেই—এক শূন্যতা তার মনকে গ্রাস করছে। কেন এমন হচ্ছে সে জানে না। আর এ নাটকে চন্দ্রকান্ত শুরু করেছে শূন্যতার কথা দিয়ে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্য 'সারদা মঙ্গল' কিছু পূর্বেই প্রকাশ লাভ করেছিল ১৮৭৯-তে। সে কাব্যে কবি বলেছেন,—

"সর্বদাই হু হু করে মন—
বিশ্ব যেন মরুর মতন—"

বিহারীলালকে গুরু বলে বরণ করে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নলিনাক্ষের মুখে যখন নাট্যকার সংলাপ দেন—'বুঝতে পারছ না? সমস্ত কেমন যেন শূন্য—যেন ফাঁকা—যেন মরুভূমি' তখন তাই বিহারীলালের কথাই মনে পড়ে যায়।

চন্দ্রকান্তের বাসায় বসে রোববারের সকালে তিন বন্ধুর আলাপচারিতা চলছিল।

চন্দ্রকান্ত কিছু ভাববাদীর ভূমিকা নিয়েছে, নলিনাক্ষ কেবল তাদের কথার পোঁ ধরে গেছে আর বিনোদবিহারী বিজ্ঞের মত নানা মন্তব্য করেছে। বৈঠকী মেজাজ, মাঝে মধ্যে কিছু বিদ্রূপের মেজাজ—কাছের জন, কিংবা দূরের অদৃশ্য জনের প্রতি অভ্রান্ত শরবর্ষণ করেছে। 'গোড়ায় গলদে'র কিছু পরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' গ্রন্থেও এই একই মেজাজ লক্ষিত হয়। তাই 'পঞ্চভূতে'র পূর্বমেজাজ 'গোড়ায় গলদে'র মধ্যে লক্ষ্য করা যায় একথাও বলা যেতে পারে। প্রথম দৃশ্যে তিন বন্ধু ছুটির দিনটা উপভোগ করা নিয়ে কথাবার্তা বলেছে। চন্দ্রকান্তের মেজাজ বড় রোমান্টিক। তার মতে এমন একটা কিছু করা দরকার যাতে দিনটা মনটাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে যেতে পারে। তার মেজাজের অনুরূপ হয়েছে তার প্রস্তাবগুলি—(ক) 'চলো', 'গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসা যাক', (খ) 'ক্লাবে চলো' (গ) 'চলো, আমরা বোষ্টম ভিক্ষুক সেজে বেরিয়ে পড়ি'। কিন্তু তিনটি প্রস্তাবের

১. স্মরণায় 'বঙ্গদর্শন পত্রিকার সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা মিরন্দা দেসদিমোনা প্রবন্ধ এবং 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকার এক সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ।

কোনটিই বিনোদবিহারীর মনঃপূত না হওয়ায় সে সারাদিন বসে থাকার প্রস্তাব দেয়—এ প্রস্তাব অবশ্য বন্ধু বিনোদ মেনে নেয়। বিনোদও স্বভাবে রোমান্টিক। তবে ধাতটা তার একটু অলসের। সে এক জায়গায় বসে বসে শুধু আকাশ-পাতাল ভাবতে পছন্দ করে। আইনের ছাত্র হলে কি হয় বিনোদের মনটা পটলডাঙার মেসের বাসায় বসে বসে কল্প-স্বপ্ন রচনায় বেশ পটু। সে বলে এই অলস ছুটির দিনের মুহূর্ত ভরে উঠত, নিরামিষ দিন কালের ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে যেত যদি—'একটি রাঙা পাড়, একটু মিষ্টি হাসি, দুটো নরম কথা—তার থেকে ক্রমে দীর্ঘনিশ্বাস, ক্রমে অশ্রুজল, ক্রমে ছটফটানি—' পাওয়া যেত। বস্তুতপক্ষে রসিকতার ছলে সে যে স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে বসে তাই dramatic Irony হয়ে তার জীবনে পরবর্তীকালে ঘনিয়ে আসে। চন্দ্রকান্ত এবং বিনোদবিহারী দু' জনে পাল্লা দিয়ে নানা নূতন কথা ভাবতে পারে বলে তাদের মধ্যে মানসিকতার মিল অনেক বেশি। কিন্তু নলিনাক্ষ শুধু তাল দিয়ে যায়। তাই সে তাদের কারো মনই জয় করতে পারে না বলে কেটে পড়ে।

এই দৃশ্যেই আর এক বন্ধু নিমাই-এর প্রবেশ। সে বস্তুবাদী, ভাববাদীদের সে ব্যঙ্গের খোঁচায় আহত করে পরম তৃপ্তি পায়। তার মতে ভালোবাসা ব্যাপারটা আসলে স্নায়ুর রোগ। শরীরে অম্বল রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে এই অসুখের জন্ম হয়। 'বালক-বালিকাদের যেমন হাম হয়, যুবক যুবতীদের তেমনি ঐ একটা স্নায়ুর উৎপাত ঘটে', কিন্তু নিমাই বিনোদ ও চন্দ্রকান্তকে উপহাস করতে গিয়ে নিজেই উপহাসিত হল। তখনও সে মৃদু খোঁচা দিয়ে বলে—"তোমরা ধোঁয়ার মধ্যে বাস কর, তোমাদের আর তামাকের দরকার হয় না, আমরা পৃথিবীতে থাকি আমাদের তামাকটা, পানটা, এমন-কি, সামান্য ভাতটা ডালটাও আবশ্যক ঠেকে।"

নিমাই চুপ করতেই উৎসাহিত হয়ে বিনোদ ও চন্দ্রকান্ত তাদের নিজ নিজ পছন্দানুযায়ী নারীর কথা বলতে থাকে। বিনোদবিহারী জানায় যে সে চায় এমন নারী যে কবিতার কল্পনালক্ষ্মীর মত : 'যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়—পালাতে গেলে ধরে টেনে নিয়ে আসে।' চন্দ্রকান্ত বিবাহিত। তবু সে বিনোদের এ কথায় উৎসাহিত বোধ করে। সেও সাদাসিধে ভাবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানায়—"বিয়ে করলেই মেয়েগুলো দু-দিনেই বহুকেলে পড়া-পুঁথির মতো হয়ে আসে.....কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কোথায় সে সোনার জল ছাপ—" চন্দ্রকান্ত জানায় পুরানো স্ত্রী নীতিবাক্য, আপ্তবাক্য মেনে কেবল স্বামীর সেবা করে যায়—নূতনত্ব বলতে কিছু তার মধ্যে মেলে না। নিমাই আর চুপ করে থাকতে না পেরে ব্যঙ্গ করে ওঠে। বিনোদ-চন্দ্রকান্ত সে কথায় খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করে না। চন্দ্রকান্তের কথা রাখতে বিনোদ বলে যায় তার পছন্দ নারীর রূপ। সে পছন্দ করে ছিপছিপে নারী—বিদ্যুতের মত, একটি আলোর রেখার মত—তার মধ্যে থাকবে অজস্র চাঞ্চল্য, হাসি আর 'কত বজ্রতেজ'। চন্দ্রকান্ত বিনোদের এই নারীকে সনেটের[১] সঙ্গে তুলনা করেছে। এবং নির্দ্বিধায় সে জানিয়েছে তারও আকাঙ্ক্ষা ছিল এমনই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে এক নির্ভেজাল গদ্যের। নিমাই অনুপস্থিত বউদির পক্ষে টেনে চন্দ্রকান্তকে ব্যঙ্গ করলে চন্দ্রকান্ত জানায়—'আমি, যাকে বলে, চম্পূকাব্য!' সে বলে তারও কল্পনাবিলাস

---

[১] স্মরণ করা যেতে পারে 'কড়িও কোমলে'র সনেটগুলি কিছু পূর্বে রচিত হয়েছে।

ভালো লাগে। সাধ হয় চাঁদের আলোয় শুয়ে শুয়ে জ্যোৎস্নার রূপ উপভোগ করতে—সুসজ্জিতা প্রেয়সীর হাতের সযত্নে গাঁথা এক গাছি মালা গলায় পরতে—সাধ হয় প্রেয়সীর কণ্ঠে শুনতে প্রেমের চিরন্তন প্রেম গীতি—'জনম অবধি হাম'। নিমাই জানায় বাড়ীর স্ত্রী যদি পুরুষ মানুষের মত 'জ্যান্ত গোছের' হয়, অর্থাৎ সেও যদি নিজ ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে তবে সংসারে সুখ থাকে না। নিমাই ও চন্দ্রকান্ত উভয়েই বিনোদকে অবিলম্বে বিয়ে করার পরামর্শ দেয়।

'গোড়ায় গলদ' নাটিকার গোড়ায় গলদের প্রকৃত সূচনা এরপরেই। নূতন-কিছু-করার প্রত্যাশী বিনোদবিহারীর কর্ণকুহরে এ সময় এক নারী কণ্ঠের গান এসে প্রবেশ করে। এই গান শুনে না-চেনা, না-জানা ঐ রমণীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে সে। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে 'love at the first sight' বা প্রথম দর্শনেই প্রেম। সংস্কৃত সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি প্রেম জাগরণের বহু উপায় ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীতে কেবল বংশীধ্বনি শ্রবণ করেও রাধিকা কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হয়েছেন। তাছাড়া বংশীধ্বনি নয়, নারীকণ্ঠ নিষিক্ত সঙ্গীত শুনে। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বে' বিনোদের সিদ্ধান্ত অনেকটা সে রকম হয়েছে বিনোদকে বাধা দেবার চেষ্টা করে ভুক্তভোগী চন্দ্রকান্ত 'কেবল গান বিয়ে করতে চাস, তো একটা আর্গিন কেন্-না?' কিন্তু বিনোদ জীবনটা বাজি রাখতে চায়।

নিমাই তখন প্রস্তাব দেয় নিবারণবাবুর বাড়ীতে গিয়ে মৃত আদিত্যবাবুর কন্যা কমলমুখীকে দেখে আসার জন্য। কিন্তু বিনোদ এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় না। সে প্রতিবাদ করে জানায় 'সে (নারীটি) তো আর কচি মেয়ে নয়, যে কটি দাঁত উঠেছে গুনতে যাবে কিংবা বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা নেবে।' তখন আদিত্যবাবুর কন্যার রূপ সম্পর্কে তিনজন তিন রকমের বর্ণনা দেয়। এখানে আপেক্ষিক তত্ত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথম দৃশ্যের শেষে বিনোদের প্রস্তাব অনুযায়ী কমলমুখীর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব পাকা করার জন্য নিবারণবাবুর গৃহে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিনজনে।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রয়েছে বঙ্গদম্পতির মধুর প্রেমালাপের এক রসায়িত উপস্থাপন। চন্দ্রকান্তের কল্পনাবিলাস আড়াল থেকে শুনেছে তার বউ ক্ষান্তমণি। তাই স্বামীকে কাছে পাবার পরই মোক্ষম অস্ত্রে তাকে সে কাবু করে ফেলে। স্বামীর কাছে অনুযোগ করে এভাবে অন্যের কাছে তাকে ছোট করার জন্য। চন্দ্রকান্তও উপায়ান্তর না দেখে জানায় সেও জানে যে পাড়াপড়শীর কাছে চন্দ্রের নামে কত বাজে কথা বলে তার স্ত্রী। ক্ষান্তমণি অত্যন্ত সরলমনা। সে স্বামীর কথায় কিছু না বুঝেই সে জানিয়ে দেয় পদ্মঠাকুরঝিকে নয় সৌরভীদিদিকে সে সব কথা বলেছিল। পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটে। কাঁধে চাদর ফেলে চন্দ্রকান্ত বাইরে বেরিয়ে আসে।

তৃতীয় দৃশ্যের শুরুতেই নিবারণের কন্যা ইন্দুমতী ও শিবচরণের পুত্র নিমাই এর বিবাহের সম্বন্ধ দুই অভিভাবক পাকা করে ফেলেন পাত্র-পাত্রীর অজান্তেই। এটা হল এই নাটকের দ্বিতীয় গলদ। দুই পিতাই নিজ নিজ পুত্র ও কন্যার উপর এমন বিশ্বাস স্থাপন করেছেন যে তাঁদের মতেই যেন তাঁদের পুত্র কন্যা বিবাহে সম্পূর্ণরূপে রাজি হয়ে উঠবে। পুত্রের পিতা যা চান—পুত্রবধূ এসে তাঁর সেবা করুন—শিবচরণের কথায় সে ইচ্ছাও ব্যক্ত হয়েছে।

শিবচরণ ডাক্তারী করেন এখানে সে কথাও জানা গেছে। শিবচরণ চলে যাবার পরেই ইন্দুমতী প্রবেশ করে। পিতা-কন্যার কথাবার্তায় একটি স্নেহমধুর চিত্রের উদ্ভাস ঘটেছে—কিন্তু এ কথাও বলতে হয় 'নিমাই' নামের প্রতি ইন্দুমতীর অবজ্ঞা এখানেই ব্যক্ত হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রায়শই দেখা যায় এক বৃদ্ধকে স্নেহের শাসন করছে হয় তার কন্যা, নয় অতিপ্রিয় কোন ভৃত্য। এখানেও দেখা গেল ইন্দুমতীর হাতে তার পিতার সে শাসনভাব। পিতার স্নান খাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে তার সদাসতর্ক দৃষ্টি। তাই বাইরের লোকেরা দেখা করতে ইন্দু পিতাকে দেরী করতে নিষেধ করে। অতঃপর চন্দ্রকান্ত, বিনোদ ও নিমাই প্রবেশ করে। চন্দ্রকান্ত বিনোদবিহারীর কবি খ্যাতির পরিচয় দেবার পর প্রস্তাব করে বিনোদের সঙ্গে কমলমুখীর বিবাহের। সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে নিবারণের গভীর আসক্তি, এখানে ব্যক্ত হয়। পঠন-পাঠন বেশি না থাকলেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার সুযোগ পেলে যে তিনি ছাড়েন না তাও এখানে বোঝা গেল। বিনোদের কোন লেখার কথা স্মরণ করতে না পারলেও তিনি বিনোদকে ক্ষণজন্মা লেখক বললেন। পরমুহূর্তেই বলেন 'আমি মেয়েদের কাছে শুনেছি আপনি দিব্যি লিখতে পারেন।' এই নাটিকায় মেয়েদের 'আমি মেয়েদের 'আড়ি পেতে, কথা শোনা যেন একটা বদ্ অভ্যেস। ইন্দুমতী এ কাজে পারদর্শিনী। সে কমলমুখীকে টেনে এনে আড়াল থেকে তার বহু বর বিনোদকে দেখায়। রবীন্দ্রনাথের হাসির নাটকের আর একটি পরিচিত বিষয় বৃদ্ধের স্মৃতিভ্রংশতা—এ নাটকেও উপস্থিত। নিবারণ বার বার ভুল করেছেন বিনোদের বইয়ের প্রতি। কিন্তু সে কথা সে বিরপীতভাবে পিতার কাছে প্রকাশ করেছে। কমলমুখীকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করছে ইন্দু, কেননা বিনোদবিহারীর 'কানন-কুসুমিকা' তার ভালো লাগত না। ইন্দু কলমকে বলে যে এবার সে একটা পোষা কবি হতে পেয়েছে, তাকে দিয়ে যেন সে নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নেয়। যতক্ষণ না পছন্দ হয় ততক্ষণ যেন সে তাকে না ছাড়ে। এটাও এ নাটকের এক Irony সৃষ্টি করেছে। কেননা ইন্দুমতীর (কাদম্বিনী) ছদ্ম নামেই নিমাই (ললিত) কবিতা লিখেছে এর পরেই।

চতুর্থ দৃশ্য এক নাটকে আরও এক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। চন্দ্রকান্তের সঙ্গে আসা বিনোদবিহারী ছাড়া অন্য ব্যক্তিটিকে একথা জানতে ইন্দুমতী চন্দ্রকান্তের বাড়ীতে এসে হাজির হয়। ইন্দু যে বর্ণনা দেয় তাতে সে বলতে পারে যে সেই সুন্দর যুবকটি হল কলুটোলার নৃত্যকালী চাটুজ্যের ছেলে ললিত চাটুজ্যে। ইন্দুমতী নিশ্চিত হয়। এর পর ক্ষান্তমণির ইচ্ছানুসারে সে তার স্বামী যে রকম চায় সে রকম শিক্ষা দেবার জন্য পুরুষের বেশ ধরে এবং তাকে নানা কৌশল শিক্ষা দিতে থাকে। ঐ সময়ই এসে যায় চন্দ্রকান্ত। ইন্দুমতী পালিয়ে যায়, যাবার সময় বলে যে সে যেন তার সঠিক পরিচয় না দেয়। সে যেন তার স্বামীকে বলে যে 'বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী' এসেছিল।

ইন্দুমতী ক্ষান্তমণির ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে সাক্ষাতের ভয়ে কিন্তু পাশের ঘরে আত্মগোপন করতে এসে যার মুখোমুখি হয়ে যায় তাকে খুঁজতেই আসলে ইন্দুমতীর এই অভিসার। কিন্তু পৌছে কিছু বেঁফাস বেরিয়ে পড়ে, পাছে ধরা পড়ে যায় সে—তাই আবার ছলনার আশ্রয় নেয় সে। নিমাইয়ের কাছেও পরোক্ষে সে নিজেকে

ভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত করায়। তাছাড়া নিমাইকে সে চকিত করে তুলে চন্দ্রবাবুর বাড়ীর চাকর বানিয়ে দেয়। নিমাইও মুগ্ধ হয় তার এই স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ আচরণে। নিমাই-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে চন্দ্রকান্ত তাকে জানয় যে ঐ রমণী বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী। এখানে পরোক্ষে চন্দ্রকান্ত গলদের আর একটি মাত্রা যোগ করেছে। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নাটকের পাত্র-পাত্রীদের ছদ্ম পরিচয় গ্রহণের রেওয়াজ সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল, বাংলা নাটকেও তা লক্ষ্য করি।

গেরাসিম লেবেডফের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত 'কাল্পনিক সংবদলে'র কাহিনীর সঙ্গে 'গোড়ায় গলদে'র কাহিনীর কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। এ মিল নিতান্ত বাহ্যিক। কোন পরীক্ষা নেবার জন্য নয়—হঠাৎই খেয়ালের বশবর্তী হয়ে সাজবদল নয়—কেবল নামবদল করেছে ইন্দুমতী ও নিমাই। মিল এখানেই। আবার এই ঘটনায় নির্দোষ আনন্দেরও উপকরণ রয়েছে। কারণ বাঙালী দর্শকমাত্রই পূর্বাহ্ণ জেনে নেবেন যে এই দুই নারী পুরুষের বিবাহ অবশ্যম্ভাবী। একথা জানবে না শুধু যাদের বিয়ে হবে তারা। ফলে তারা সৃষ্টি করেছে সংকট। বাংলা নাটকে রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে কী পৌরাণিক নাটক, কী ঐতিহাসিক নাটক, কী লঘুনাট্য সর্বত্রই প্রয়োজনে নায়ক-নায়িকা ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। মধুসূদন, দীনবন্ধুর নাটকেও এর প্রমাণ রয়েছে।

সেক্সপীয়ারের নাটকের কমিক চরিত্রের ঢঙ্ যেমন রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদে'র কোন কোন চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় তেমনি অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালে রচিত দীনবন্ধুর কোন কোন রঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটিকায় স্থূলতাবাদ দিয়ে রসিকতার ঢঙটি রবীন্দ্রনাথে অনুসৃত হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই নাটিকায় বৃদ্ধ রাজীবলোচনের মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর জাগরণের প্রমাণ তাঁর কবিতা প্রীতি, কবিতাচর্চা। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কবিতায় সঠিকভাবে তরুণীর রূপ তুলে ধরার তার কী অসীম প্রয়াস! তিনি নিজেই কবিতা লিখেছে আর বলেছেন,—

'রাজী। "কুচ হতে উচ্চ কেশরী মধ্যখান"—
না হয় নি—
"কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে,
কাঁদেরে কলঙ্কি চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে"....প্রভৃতি

'গোড়ায় গলদে'র দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কাদম্বিনীর প্রেমে মশগুল নিমাইও এরকমই কবিতা রচনায় প্রযত্ন করেছে। শেষ পর্যন্ত সে ভেবেছে চোদ্দ অক্ষর মিলানোর চেষ্টা 'একটা প্রেজুডিস' মাত্র। এই রকম এক মুহূর্তে নিমাই-এর পিতা শিবচরণ নিমাই-এর বিবাহের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান। কিন্তু নিমাই ইন্দুমতীকে বিয়ে করতে তার অনিচ্ছার কথা ব্যক্ত করে। শিবচরণ চলে যাবার পর নিমাই ব্যাজার মুখে বসে থাকে। চন্দ্রকান্তের অনুরোধে সে বাধ্য হয়ে চলে বিনোদের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুরে বিনোদের বিবাহের পূর্বের তোড়জোড় চলেছে। ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী পরস্পর এই বিবাহ সংক্রান্ত কথাবার্তা বলেছে। তাদের কথাবার্তায় একথা স্পষ্ট যে বিবাহে ধূমধাম বিনোদ একাবারে পছন্দ করে না। রমণীরা অন্তরালে গেলে

আসে বিনোদ, চন্দ্রকান্ত, নিমাই, নলিনাক্ষ, শ্রীপতি ও ভূপতি। বন্ধু বান্ধবের মধ্যে হালকা রসিকতা দৃশ্যটিকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। চন্দ্রকান্ত তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিবাহের পূর্বেই বিনোদকে অভিজ্ঞ করে তুলতে চেয়েছে। বাঙালীর বাড়ীতে বিবাহে শ্যালীর ভূমিকা নিয়েও রসিকতা করা হয়েছে। অতঃপর যখন সকলে বিনোদের বিবাহের কার্যে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তখন একটা তুচ্ছ কারণে ইন্দুমতী রয়ে গিয়েছে। সে ক্ষান্তমণিকে বলেছে,—

"তুমি এগোও ভাই আমি তোমার স্বামীর বইগুলি গুছিয়ে দিয়ে যাই।"

এই কারণে ইন্দুমতীর থাকার প্রয়াস হাস্যকর ও অবাস্তব। কারণ প্রথমত বিবাহের দিন, বিশেষত যার বোনের বিবাহ, সে অন্যের বাড়ীতে বৃথা রঙ্গরস করতে যায় না। দ্বিতীয়ত শুধু তাই নয়, বিবাহের লগ্ন যখন সমাসন্ন তখন সে বিবাহ বাসরে না গিয়ে ক্ষান্তমণির স্বামীর টেবিলের বই গুছাতে গিয়েছে—এ ব্যাপারটাও বাঙালী সমাজে অন্তত অসম্ভব প্রায় ঘটনা। তৃতীয়ত, বাড়ীর থেকে সবাই যেখানে বিবাহ বাসরে রওনা হয়ে যাচ্ছে সেখানে ইন্দুমতীর মত এক রমণীকে একা ঘরে রেখে দিয়ে আর সবাই চলে যাচ্ছে—এটা ভাবাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এখানে নাট্যকার যেন জোর করে ইন্দুমতী নিমাইকে মিলিয়েছেন। বন্ধুদের সংসর্গ ছেড়ে হঠাৎ নিমাই এর প্রবেশ—এবং যে কারণে এই প্রবেশ, 'খাতা অন্বেষণ', তাও হাস্যকর। চন্দ্রকান্তের বাড়ীতে যে প্রায়ই আসে, তার বাড়ীতে যদি খাতা বা কোন জিনিস পড়ে রয়ে যায়—বন্ধুর বিবাহসভা ছেড়ে সেই জিনিস খুঁজতে আসার কোন মানে হয় না। এর পশ্চাতে কি নাট্যকারের কোন বস্তুবুদ্ধি ক্রিয়াশীল ছিল! যাহোক, নিমাই-এর কবিতা লেখা খাতা পড়েছে ইন্দুমতীর হাতে। কবির কবিতাটি কাদম্বিনীকে উদ্দেশ্য করে লেখা হলেও এ নারী যে সেই এব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হল। তখন কবির 'হাতরে লেখার প্রশংসা করল সে—"কিন্তু কী চমৎকার হাতের অক্ষর। একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে।" অতঃপর কবিতার খাতাটিকে আহ্লাদে বুকে ধরেছে ইন্দু আর সে সময় প্রবেশ ঘটেছে নিমাই-এর। সে ঐ অবস্থায় তার প্রেমিকাকে দেখে ভেবেছে,—

"জন্ম জন্ম সহস্রবার আমার সহস্র খাতা হারাক—কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিস পায় না"(২/২)

নিমাই-ইন্দুমতী সাক্ষাৎকারের পরের দৃশ্যেই বিনোদের বিবাহ সভয়ে মুখোমুখি হয়েছে উভয়ের পিতা শিবচরণ, নিবারণ। বাঙালীর ঘরের বিবাহের চিত্র, অকারণ ব্যস্ততা কন্যার পিতার উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা ইত্যাদির যথাযথ বর্ণনা রয়েছে এখানে। কথায় আছে, কাজ কাজের লোককে খুঁজে নেয়। শিবচরণ কর্মী মানুষ। নিবারণের সঙ্গে বন্ধুতা সূত্রে এখানে এসে তিনি কাজে লেগে পড়েছেন। নিবারণকে আশ্বস্ত করেছেন। তবে শিবচরণের এক বদরোগ অপরকে উৎকণ্ঠিত করে তুলে কুণ্ঠামুক্ত করা তাও এখানে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—

শিবচরণ। এখন কেবল সন্দেশগুলো এসে পৌঁছলে বাঁচি। আমার তো বোধ হচ্ছে ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবারণ। বল কী ভাই!

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব দেখে শুনে নিচ্ছি।"

বাসর ঘরের চিত্রেও (চতুর্থ দৃশ্য) বাস্তবতা রক্ষিত হয়েছে। বর এস্থানে নারী পরিবৃত হয়ে থাকে। বিনোদও রয়েছে। ইন্দুমতী সম্বন্ধে তার শ্যালিকা। ক্ষান্তমণি বন্ধুপত্নী, এছাড়া রয়েছে প্রথমা ও দ্বিতীয়া নারী। সকলে বিনোদকে নিয়ে রসিকতা করছে। বিনোদও তাতে যোগ দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে এসব নিতান্ত সাধারণ কথা অন্যত্র কথিত হলে মোটেই হাসি আসে না অথচ বাসর ঘরে তা অনায়াসে ছোটখাটো খোঁচায় হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছে। বাঙালীর ঘরে বিয়ের বাসরে বরের উপর শ্যালীর অধিকার। অধিকারের প্রথম প্রয়োগ কর্ণমর্দনে। বিষয়টির মাধুর্য উপভোগের জন্য কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা যায়,—

"ইন্দুমতী। এতক্ষণে বুঝি তোমার মুখ ফুটল!

বিনোদবিহারী। আপনার ও হাতের স্পর্শে বোবার মুখ খুলে যায়, আমি তো কেবল বর।

ক্ষান্তমণি। দেখেছিস ভাই, আমরা এতক্ষণ এত চেষ্টা করে একটা কথা কওয়াতে পারলুম না আর ইন্দুর হাতের কানমলা খেয়ে তবে ওর কথা বেরোল।

প্রথমা। ও ইন্দু, তোর কাছে ওর কথার চাবি ছিল না কি? তুই কী কল ঘুরিয়ে দিলি লো।

দ্বিতীয়া। তা দে ভাই, তবে আর এক পাক দে। ওর পেটে যত কথা আছে বেরিয়ে যাক। (মৃদুস্বরে) জিগ্‌গেস কর্ না, আমাদের নাতনিকে লাগছে কেমন—"

ঘরের বাইরে বিনোদবিহারীর বন্ধুবর্গ পদচারণা করছে—বার বার উঁকিঝুঁকি মারছে। আর বন্ধু রসিকাদের ঠাট্টার মুখে বোসামাল হয়ে পড়েছে কিন না তা বোঝার চেষ্টা করছে। আইন পেতে বাইর থেকে কর্ণমর্দন কাহিনী এবং কমলমুখীর অনুযোগ শুনে চন্দ্রকান্ত সেখান থেকেই কমলমুখীকে ঠাট্টা করে। কিন্তু দ্বিতীয়া, সম্পর্কে যিনি কমলমুখীর ঠাকুমা-দিদিমা স্থানীয়া, তিনি নিজ নাতনীর প্রতি এই ব্যাঙ্গে মুখিয়ে ওঠেন। ক্ষান্তমণি তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সামাল দেয়। এবং নিজ স্বামী দেবতাকে গৃহে গিয়ে শোবার অনুরোধ জানিয়ে দেয়। ইন্দুমতীও ছটপট করতে থাকে। কোন্ এক অনির্দেশ্য আকর্ষণ তাকে তাকে আকৃষ্ট করে দরজার কাছে দরজা বন্ধের অজুহাতে। নিমাই ও বাইরে ঘুরছিল কেবল বন্ধুর জন্য বুঝি নয়। সাক্ষাৎ হয়ে গেল উভয়ের। তির্যক বুদ্ধিদীপ্ত বাচনভঙ্গী উভয়কে উভয়ের কাছে এনে ফেলেছে ক্রমশ। এখানে নিমাই সামান্য সুযোগ পেয়েই ইন্দুমতীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে নিজের খাতার কথা; ইন্দুমতীও যেন ক্রমশ বাচাল হয়ে উঠেছে এখানে। দৃশ্যের শেষ সংলাপে ইন্দু তাই নিজেকে বলেছে—'আজ আমার কী হয়েছে?'

তৃতীয় অঙ্কে 'কাল্পনিক সংবদলে'র ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ইন্দুমতী নিজেকে বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী বলে পরিচয় দেওয়ায় মেডিক্যাল কলেজে না গিয়ে নিমাই বাগবাজারের রাস্তায় চৌধুরীদের বাড়ীর কাছে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। ভেবেছে এতক্ষণে বুঝি তার প্রিয়া কাদম্বিনীর স্নান সারা হয়েছে। তারই কাপড় দাসী মিলতে এসেছে। তার প্রিয়া পিঠের উপর ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড় পরে এতক্ষণে কি করছে জানতে ইচ্ছে করে তার। দেওয়াল-প্রাচীর বানিয়ে মানুষের মিলনের বাধাসৃষ্টিকারীদের প্রতি তার অনুযোগও ব্যক্ত হয়েছে। এমন সময় সেখানে এসে পৌঁছেছেন শিবচরণ তিনি পাল্‌কিতে

করে চলেছিলেন রোগী দেখতে। পথে পুত্রকে এ অবস্থায় দেখে পালকি থামিয়ে তিনি পুত্রের কাছে এলেন। এবং এমন ভাষায় তিনি স্বগতোক্তি করতে লাগলেন যা পুত্রের সম্পর্কে পিতার মন্তব্য বলে মনে হয় না। মনে হয় যেন দর্শকদের মুখের দিকে তাকিয়ে এসব লিখেছেন নাট্যকার। এখানে লৌকিক রঙ্গরসের নাটকের সঙ্গে 'গোড়ায় গলদে'র মিল লক্ষ্য করা যায়। একেবারে পুত্রের কাছে গিয়ে হাজির হলেন শিবচরণ। তাকে অসহায় অপদস্থ করার জন্য প্রশ্ন বললেন,—'বাপু, মেডিকেল কলেজটা কোন্‌দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি।' পিতা-পুত্রের পরপর কয়েকটি সংলাপ বেশ কৌতুক রসসঞ্চারী। নিমাই-এর অসংলগ্ন উত্তর—শিবচরণের জেরা—দর্শক হৃদয়কে প্রচুর হাসির খোরাক দেয়। পিতা জিজ্ঞাসা করছেন কলেজ না গিয়ে নিমাই বাগবাজারে এসে ঘুরছে কেন? নিমাই জানিয়েছে যে খেয়েই কলেজে গেলে তার শরীর খারাপ হয়। তাই একটু বেড়িয়ে নিয়ে সে তারপর কলেজে যাবে। পিতা জিজ্ঞাসা করেন বাগবাজার ছাড়া শহরে আর কোথাও কি শুদ্ধ হাওয়া নেই? বাগবাজার ঘুরে ঘুরে যে পুত্রের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে! কথা বলায় নিমাই জানায় আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে সে একটু বেশি এক্সেসাইজ করে নিচ্ছে। কিন্তু কেন সে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল একথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল বলেই একটু বিশ্রাম করছিল। শিবচরণ জানান ক্লান্ত যদি সে হয়ে থাকে তবে তাঁর পালকিতে চেপে সে যেন কলেজ চলে যায়। পিতার নাছোড়বান্দা আচরণে নিমাই বাধ্য হয়ে পালকিতে ওঠে। বেহারাদের উৎকোচ দিয়ে নিমাই তাদের চন্দ্রবাবুর বাসায় নিয়ে যেতে বলে, আর শিবচরণ হেঁটে গন্তব্যস্থলে যান।

দ্বিতীয় দৃশ্যে চন্দ্রকান্ত কিছুটা অনুতপ্ত হয়েছে। কেননা বিনোদবিহারীর সংসারে দেখা দিয়েছে অশান্তি। বিরক্তিভরা কণ্ঠে চন্দ্রকান্ত স্বগতোক্তি করেছে 'ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের দু-দিন না যেতেই কিছু আর মনে ধরছে না।' নিমাই এসে ঢোকে এসময়। চন্দ্রকান্তের ক্ষোভ এমনই যে সে নিমাইকে বিবাহ করতেই নিষেধ করে বসে। নিমাই সাথে সাথে বলে ওঠে 'তোর ঘাড়ে ম্যালথাসের ভূত চাপল নাকি', প্রসঙ্গত স্মরণীয় উনিশ শতকের শেষদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুক মনীষীরা তাঁদের প্রবন্ধে কখনও ডারউইনের তত্ত্ব, কখনও ম্যালথাসের তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে গভীর আলোচনা করেছেন। মানুষের জন্ম ও জনসংখ্যা বিষয়ক তত্ত্ব ম্যালথাস তত্ত্বের মূল কথা। অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসের মতে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার GP হারে এবং খাদ্য সম্পদ বৃদ্ধির হার AP হারে। তাই যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে সে হারে খাদ্য সম্পদ বৃদ্ধি হয় না। জনসংখ্যা যখন ১, ২, ৪, ৮ হারে বাড়ে, 'তখন খাদ্য সম্পদ ১, ২, ৩ হারে বাড়ে। তাই এক সময় এ ব্যাপারে চরম সঙ্কট সৃষ্টি হতে বাধ্য। তখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া সে সমস্যা প্রশমনের কোন উপায় নেই। উপায় আর একটা রয়েছে তা হল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন। নিয়ন্ত্রনের ব্যাপারে অন্যতম পদক্ষেপ হল বিয়ে না করা। অবশ্য এখানে নিমাই তির্যকভাবে রসিকতা করার উদ্দেশ্যে ম্যালথাসের কথা উল্লেখ করেছে। চন্দ্রকান্ত তখন ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছে বিনোদবিহারীর কথা। নিমাই তখন তাকে অনুরোধ করে তার বিয়ের ব্যাপারটা মেটানোর জন্য। কিন্তু প্রথমটা অরাজি হলেও পরে চন্দ্রকান্ত রাজি হয়। এদিকে চাদর আনতে গিয়ে সে দেখে তার বউ রাগ

করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। তাই চন্দ্রকান্ত ঠিক করে ফেলে 'তোদের কারো সঙ্গে আমি আর বাক্যালাপ করছি নে'।

এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আসে বিনোদবিহারী। সে চন্দ্রকান্তকে বোঝাতে চায় যে কেন সে বিয়েটা 'মনের মধ্যে গ্রহণ করতে' পারছে না। সে জানায় যখন সে অবিবাহিত ছিল তখন ওকালতি ব্যবসা করে যা জুটত তাতে তার বেশ চলে যেত। ভাঙা ঘর ছেঁড়া বিছানাও ঠিক-ঠিক মানিয়ে যেত। কিন্তু একন তার 'কেবল মনে হয় আমায় এই ভাঙা ঘর ছেঁড়া বিছানাটুকু বেদখল হয়ে গেছে।' সে জানায় ভালোবাসাকে সে স্নায়ুর ব্যামো বলে মনে করে না নিমাই-এর মতো। সংসারে দারিদ্র্য যদি না থাকত তাহলে বিনোদের কাছে জগৎটা স্বর্গতুল্য হতে পারত। সে তাই বলে,—

> "আমি বেশ বুঝতে পারি, চতুর্দিকটি বেশ মনের মতো হত, ট্রামের ঘড়ঘড় না থাকত, দাসীমাগী ঝগড়া না করত, গয়লা ঠিক নিয়মিত দুধ জোগাত এবং দাম না চাইত, মাসান্তে বাড়িওয়ালা একবার করে অপমান করে না যেত, জজসাহেব বিচারাসনে বসে আমার ইংরিজি ভুল সংশোধন করে না দিত, তাহলে আমিও ক্রমে ক্রমে ভালোবাসতে পারতুম কিন্তু এখন সংগীত, চাঁদের আলো, প্রেমালাপ, এ কিছুই রুচছে না—আমার পটলডাঙার সেই বাসার মধ্যে এ-সমস্ত শৌখিন জিনিস পুষতে পারছি না।"

এই অভাববোধ, স্ত্রীর সব চাহিদা পূরণ করতে না-পারার অক্ষমতার জন্য বিনোদ তাঁর স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। চন্দ্রকান্ত তাকে স্ত্রীর বিষয়ে আর একবার ভাবতে বলে নিজের শ্বশুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কেননা স্ত্রীর মান ভাঙিয়ে তাকে ও তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে হবে। বিনোদ এসময় বড়ই উতলা হয়ে ওঠে। কিন্তু নাছোড়বান্দা বন্ধু—অন্যে তার সঙ্গ না চাইলেও সে সঙ্গ দেয়। দেবেই এবং উপযাচক হয়েই অন্যকে সর্বব্যাপারে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও যায় সে।

তৃতীয় দৃশ্যে ইন্দুমতী ও কমলমুখীর কথায় বার্তায় নারীর সম্ভ্রম ও অধিকার রক্ষার জন্য নারী প্রগতির ধ্বজাবাহী মহিলাদের কণ্ঠের স্বর শোনা গেছে ইন্দুর কণ্ঠে। আর চিরন্তন বাঙালী বধূর সর্বংসহা মূর্তির সাক্ষাৎ মিলেছে কমলমুখীর আচরণে ও কথায়-বার্তায়। নিজের স্বামীকে সে ভালোবাসে কারণ তা না হলে যে তার খুব অসুবিধা হবে। এ যেন বৈষ্ণবীর মধুর প্রেম। রাধা কৃষ্ণকে ভালোবেসেছেন—সে ভালোবাসায় রয়েছে স্বসুখবাসনাহীন-কৃষ্ণনিষ্ঠা। কমলমুখীর মধ্যেও রয়েছে সেই ভাব। এই দৃশ্যে আর একটা বড় সংবাদ আমরা জানতে পারি। হাসির নাটক ও অদ্ভুত বিষয় অবলম্বী নাটকে সচরাচর যা ঘটে থাকে তা এই—নায়ক বা নায়িকা হঠাৎই জানতে পারে তার প্রভূত ধনসম্পদ রয়েছে। সম্পত্তি না থাকলে বিলাসবহুল জীবনযাপন হয় না—কাউকে বাজিয়ে নেওয়ার কোন সমাজসঙ্গত অধিকার মেলে না। 'গোড়ায় গলদে'ও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। ব্যাপারাটাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করার কাজে নাট্যকার অতি সচেতন। তাই নিবারণ কমলমুখীকে জানালেন যে তার জন্য তার পিতা প্রচুর ধনসম্পদ রেখে গেছেন। এখানে কমলমুখীর পিতার আকাঙক্ষা ব্যক্ত করতে গিয়ে দু'টি বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন—

(i) কমলমুখী পিতার ইচ্ছে ছিল কুড়ি বৎসর বয়স হলে যেন কমলমুখী তার গচ্ছিত সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে।

(ii) পাছে বিষয়ের লোভে কেউ তাকে বিয়ে করে এবং পরে মদ খেয়ে অসৎভাবে সে সম্পত্তি যথেচ্ছ নষ্ট করে দেয়। সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

নিবারণের হঠাৎই মনে হয়েছে কুড়ি বছর বয়স না হলেও এখন কমলমুখী যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পেরেছে। জীবন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা, স্বামী সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি কারণে কুড়ি বৎসর বয়স হবার আগেই নিবারণ কমলমুখীকে সম্পদশালী বানাতে চেয়েছেন যাতে তার স্বামী সেই সম্পদের টানে এসে তার কাছে ধরা দেয়। কিন্তু বুদ্ধিমতী কমলমুখীও কাকাকে দিয়ে শর্ত করিয়ে নেয়,—

(i) কমলমুখী স্বামী নিবারণ যেন জানতে না পারে যে তার স্ত্রী অতুল সম্পত্তির মালিক হয়েছে।

(ii) এ কথা তিনি ছাড়া অন্য কেউ যেন জানতে না পারে।

কমলমুখীর এই দুই শর্ত আরোপের পশ্চাতে কিছু কারণ আছে বলে মনে হতে পারে—সেগুলি হল,—

(i) কমলমুখীর পিতা চেয়েছিলেন সম্পত্তির লোভে কেউ যেন তাঁর কন্যাকে বিবাহ না করে।

(ii) কমলমুখীর সম্পত্তি হঠাৎ পেয়ে কেউ (তার স্বামী) যেন তা উড়িয়ে-পুড়িয়ে না দেয়।

কমলমুখীও এই দুটি শর্ত আরোপ করে পিতার আকাঙক্ষাকেই চরিতার্থ করতে চেয়েছে ভিন্নভাবে। সম্ভবত সে দেখতে চেয়েছে তার স্বামী দরিদ্র হলেও ধনলোভী কিনা। তাছাড়া অন্য রমণীর প্রতি তার আচরণে কোন দুর্বলতা রয়েছে কিনা, তাও সে দেখে নিতে চায়। সেই কারণে সে পরিকল্পনা করেছে, "আমি আর একটা বাড়ি নিয়ে ছদ্মবেশে ওঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব।" 'কাল্পনিক সংবদলে'-ও এ ঘটনা ঘটেছে।

তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে শিবচরণ নিমাই-এর কথোপকথনে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ব্যক্ত রয়েছে। পিতা শিবচরণ পুত্রস্নেহে দুর্বল। তিনি পুত্রকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে নিবারণকে, তিনি কথা দিয়ে ফেলেছেন এখন তাঁর কন্যা ইন্দুমতীকে নিমাই বিয়ে করতে না চাইলে বুড়ো বয়সে তিনি নিজে বড় দুঃখ পাবেন। কিন্তু নিমাই তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। সুতরাং তৃতীয় অঙ্কের শেষ পর্যন্ত সমস্যার জট কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে। 'গোড়ায় গলদে'র দুটি 'গলদ'-কাহিনীর মধ্যে,—

(i) বিনোদবিহারী কমলমুখী কাহিনীর মীমাংসা-সূত্র পাওয়া 'সত্ত্বেও তা মিটিয়ে না নিয়ে কমলমুখী আবার এক জাল বোলার প্রয়াস করেছে।

(ii) নিমাই এবং ইন্দুমতী দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসে কিন্তু কেউ কাউকে প্রকৃত নামে চেনে না ভিন্ন নামে চেনে। তৃতীয় অঙ্কের শেষে দেখা যাচ্ছে নিমাই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে ইন্দুমতীকে সে বিয়ে করবে না—করবে বাগবাজারের চৌধুরী-তনয়া কাদম্বিনীকে। আর ইন্দুমতীও জানিয়েছে নিমাই নামের কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করতে তার আপত্তির কথা।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে কমলমুখী রাণী বসন্তকুমারী সেজে বিনোদকে নিজ সম্পত্তির উকিল নিযুক্ত করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। রাণীর গৃহের ঐশ্বর্য দেখে

নিজের স্ত্রীকে ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুল, অথচ স্ত্রী তার সঙ্গে দেখাই করছে না। আর ইন্দুমতী চায় তার ললিতকে, কিন্তু ললিতই যে নিমাই-এর ছদ্মনাম—একথা তার কাছে স্পষ্ট হয়নি। ফলে প্রকৃত ললিতের কাছে স্বীকৃতি না পেয়ে পুরুষ জাতির প্রতি তার রাগ-দুঃখ অভিমান পর্বত প্রমাণ জমে উঠেছে। তাই চতুর্থ অঙ্কের শেষে নাট্যকাহিনী যে climax-এ পৌঁচেছে এ কথা বলা যায়।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় ইন্দুমতী দুঃখে ভেঙে পড়েছে। পৃথিবীর তাবৎ পুরুষজাতির উপর তার ক্ষোভ। যে পুরুষ তার নামে কবিতা লিখেছে সে কিনা শেষ পর্যন্ত তাকে চিনতেই পারে নি? কিন্তু ইন্দুমতী এখানে একবারও ভাবে নি যে সে যেমন ছদ্মনাম নিয়েছে নিজের প্রিয়জনের কাছে, তেমনি তার প্রিয় পুরুষটিও নাম বদলাতে পারে! তাই এখানে ঘটেছে আর একপ্রস্থ ভ্রান্তিবিলাস। এই দৃশ্যে কমলমুখীর উক্তিতে তৎকালীন সমাজে জীবনের আর একটি সমস্যার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা কন্যাকে ঘরে রাখলে কন্যার পিতাকে তৎকালীন সমাজ একঘরে করত। ইন্দুমতীর বিয়ে যেহেতু কম বয়সে দেওয়া হয়নি সেহেতু নাকি সমাজ তার বাবাকে 'প্রায় একঘরে করেছে'। সন্দেহ নেই এটা ঐ সময়কার হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুরতাকে যথাযথ তুলে ধরেছে। বিশেষ করে ইন্দুমতীর উক্তিতে সে যন্ত্রণা যেন গুমরে উঠেছে—'তা দিদি, কলাগাছ তো আছে। সে তো কোনো উৎপাত করে না।' 'কলাগাছ মৃত্যুর প্রতীক—আত্মহত্যার প্রসঙ্গে পূর্বে কলাগাছের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হত। শ্রাধের কার্যেও কলাগাছ কাজে লাগে। কিন্তু উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এখানে কিছু ত্রুটি অবশ্যই রয়ে গেছে, যেমন,—

(i) কমলমুখী ইন্দুমতীর চেয়ে বয়সে বড়। তার বিবাহ হয়েছে স্বল্পকাল মাত্র—সে সময় এক মুহূর্তের জন্যও এ সমস্যার কথা ওঠে নি।

(ii) ইন্দুমতীর বিবাহ দেবার উদ্যোগ সবেমাত্র তার পিতা নিতে শুরু করেছিলেন—সে উদ্যোগ যে সমাজের চাপে পড়ে—কিংবা সমাজে যে এমন কোন কড়া বিধান রয়েছে সে সম্পর্কে কোন কথা পূর্বে জানানো হয়নি।

এই দৃশ্যের দ্বিতীয় অংশে নিবারণ কমলমুখীর কথোপকথনে জানতে পারি নিবারণ ললিত চাটুজ্যের উক্তিতে বড় ভেঙে পড়েছেন। তাঁর ইচ্ছে শিবচরণের পুত্র নিমাই-এর সঙ্গে ইন্দুমতীর বিয়ে দেন—কিন্তু ইন্দুমতী কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। কমলমুখী জানায় যে নিমাইয়ের মনের ইচ্ছে কি সেটা না জানলে এব্যাপরে এগোন যায় না। নিবারণের স্থির বিশ্বাস নিমাই একবার ইন্দুমতীকে দেখলে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে। নিমাই-এর পিতাও চান এ বিবাহ হোক। কিন্তু নিমাই নাকি পিতাকে জানিয়ে দিয়েছে উপার্জন করতে ন শিখে সে বিবাহ করবে না। নিবারণ তাই চন্দ্রকান্তের মাধ্যমে নিমাইকে মেয়ে দেখতে রাজি করাতে চান কেননা তাঁর মতে 'চন্দ্রবাবুর কথা সে খুব মানে'। কমলমুখীও ইন্দুকে রাজি করাবার দায়িত্ব নিল। এরপর সে ইন্দুমতীকে নিমাই-এর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ করেছে। ইন্দুমতী ললিত এর ব্যাপার নিয়ে প্রায় মুষড়ে পড়েছিল। তাই সামান্য অনুরোধেই সে নিমাই-এর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়ে গেছে।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কমলমুখীর ঘরে এসেছে নিমাই শুধু ইন্দুমতীকে দেখতে। চন্দ্রকান্তের একান্ত পীড়াপীড়িতে সে এখানে এলেও তাকে বিয়ে করার জন্য সে আসে

নি। এখানে তার আসার মূল উদ্দেশ্য নিজের অসহায় অবস্থা বুঝিয়ে বলে পিতার বাকদান নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানোর জন্য। নিমাই-এর বিশ্বাস তাহলে "....তিনি নিজেই আমাকে বিবাহ করতে অসম্মত হবেন। তাহলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে—বাবাও আর পীড়াপীড়ি করবে না।" আর ইন্দুমতীও নিমাই-এর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে মোটামুটি একই উদ্দেশ্যে। তাই সাক্ষাতের সময় ইন্দুমতী এসেছে ঘোমটা পরে। শুধু তাই নয়, উভয়ের প্রথম কয়েকটি সংলাপ—পরস্পর পরস্পরকে দেখে চমক বড় কৌতুককর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই অংশের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে নিমাইকে ইন্দুমতী চেনে ললিতবাবু নামে, আর পূর্বের দৃশ্যে ললিতবাবু নামক এক ব্যক্তি বিনোদের কাছে তার সম্পর্কে কোন আগ্রহ তো প্রকাশ করে-ই নি—বরং প্রায় প্রত্যাখান করেছে তাকে। এবং ইন্দুমতী ভেবেছে এই ব্যক্তিই সেই ললিতবাবু। কেননা ঘোমটার মধ্য দিয়ে সে তাকে দেখতে পেয়েছে। তাই প্রথমাবধি ইন্দুমতী কিছুটা ক্ষুব্ধ থাকলেও—ক্ষুব্ধ থাকার কারণ নিমাই, নিমাই নামক যুবকের কাছে এসেছে সে কনে দেখার আয়োজনে—অথচ এই নামে তার পূর্বাপর প্রবল আপত্তি ছিল। নিমাই ওরফে ললিতবাবুকে দেখে তার ক্ষোভ আরও বেড়ে যায় তাই তার ভাষা আরও ঝাঁঝালো হয়ে যায়। নিচে তাদের কথোপকথনের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি,—

"ঘোমটা পরিয়া ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। বাবা যখন বলছেন তখন দেখা করতেই হবে; কিন্তু কারো অনুরোধ তো আর পছন্দ হয় না। বাবা কখনোই ইচ্ছের বিরুধে বিয়ে দেবেন না।

নিমাই। (নতশিরে ইন্দুর প্রতি) আমাদের মা বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্য যাঁরা পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্দুমতী। এ কী? এ যে ললিতবাবু? (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাবু, আপনাকে বিবাহের জন্য যাঁরা পীড়াপীড়ি করছেন তাঁদের আপনি জানাবেন বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করছেন।

নিমাই। এ কী! এ যে কাদম্বিনী! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এখানে আমি তা জানতুম না। আমি মনে করেছিলুম নিবারণবাবুর কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্ছি—কিন্তু আমার এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দুমতী। ললিতবাবু, আপনার সৌভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখি নে।

নিমাই। আপনি কাকে ললিতবাবু বলছেন? ললিতবাবু বারান্দায় বিনোদের সঙ্গে গল্প করছেন যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

ইন্দুমতী। আপনার নাম কি ললিতবাবু নয়।

নিমাই। যদি পছন্দ করেন তো ঐ নামই শিরোধার্য করে নিতে পারি কিন্তু বাপ-মায়ে আমার নাম রেখেছিলেন নিমাই।

ইন্দুমতী। নিমাই?—ছিছি, এ কথা আমি আগে জানতে পারলুম না কেন?"

এরপর যথারীতি নিমাই ইন্দুমতীর মিলনের পথ প্রশস্ত হয়ে গেল।

এই গেল একজনের ভ্রান্তি অপনোদনের ব্যাপার। কাদম্বিনী-রহস্যের উদঘাটন ও ইন্দুমতীর প্রকৃত নাম প্রকাশের চিত্র নিম্নরূপ,—

"নিমাই। আপনার নাম তবে—

ইন্দুমতী। ইন্দুমতী। তার প্রধান কারণ আপনার বাপ-মা যেমন আপনার নাম রেখেছেন নিমাই, তেমনি, আমার বাপ-মা আমার নাম রেখেছেন ইন্দুমতী।

নিমাই। হায় হায়, আমি এতদিন কী ভুলটাই করেছি। বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় বৃথা ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বসতে দু' বেলা বাপান্ত করেছেন, কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা ভাঙাভাঙি করেছি—" ইত্যাদি

ইন্দুমতী-নিমাই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল অতি সহজেই। কাদম্বিনী ললিত ছদ্মনাম উধাও হয়ে গেল পলকে। নিবারণ এমন সময়ে নিমাই-এর সঙ্গে নিজ 'পারিবাবিক বন্ধনে'র প্রস্তাব দিলে সঙ্গে সঙ্গেই সে রাজি হয়ে যায়। কৃতজ্ঞের মত সে বলে 'আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।' নিবারণ ভাবেন যে ইন্দুমতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবামাত্রই যেমন আন্দাজ করেছিলেন তেমনই ফল পেয়েছেন। শিবচরণ এসে ঢোকেন। নিমাইকে তিনি বলেন যে কাদম্বিনীর সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব তিনি পাকা করে এসেছেন এবং তারা আজই তাকে দেখতে আসবে। কিন্তু নিমাই কিছুতেই বাগবাজারের কাদম্বিনীকে বিয়ে করবে না বলে জানায়। পুত্রের ফের মত পরিবর্তনে পিতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। চন্দ্রকান্ত এহেন সময়ে উভয়ের সঙ্কট-ত্রাতারূপে হাজির হয়। সে জানায় কাদম্বিনীর জন্য পাত্র সেই দেখে দেবে। সুতরাং নিমাই ইন্দুমতীর বিবাহ পাকা হয়ে গেল। শিবচরণ নিবারণের মধ্যে পুরাণো বন্ধুতা গাঢ় হয়ে ওঠার পথ খুঁজে পেল।

কমলমুখীর অন্তঃপুরে তৃতীয় দৃশ্যে কমলমুখী ও ইন্দুমতীর হাল্কা কথাবার্তা হয়েছে। কমলমুখী বোনের সঙ্গে কৌতুক করেছে কেননা সে নিমাই নামের কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে পূর্বে রাজি ছিল না—অথচ ঐ নামই এখন তার কাছে নাকি আপনার লোকটির মত লাগছে। কমলমুখী জানায় নামের চটক নেই বলে ঐ নামে বই বাজারে কাটবে না, ইন্দুমতী তখন জানায় তার কোন বই সে ছাপতে দেবে না—সে একাই হবে ওর লেখার পাঠক। কমলমুখী খুব খুশী হয়ে ওঠে এ কথায়। এমন সময় শুকনো মুখে বিনোদবিহারী প্রবেশ করে। সে জানায় যে বহু চেষ্টা করেও সে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারে নি। তাই তাকে রাণীর কাছে আনতে পারেনি। কমলমুখী মুখে কপট গাম্ভীর্য এনে জানায় বিনোদই বুঝি চাচ্ছে না তার স্ত্রী তার সঙ্গে থাকুক। বিনোদ তখন নিজের স্ত্রীর তুলনায় রাণীর প্রশংসা করে। রাণী তখন কৌশলে জানায় যে সে বিনোদের স্ত্রীর মুখে শুনেছে 'তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য নন'।

বিনোদ তখন বিনীতভাবে জানিয়েছে যে সেই তার ভালোবাসার যোগ্য নয়। কেননা তার স্ত্রী লক্ষ্মী। নিজের দারিদ্র্য দুখ সহ্য করতে না পেরে—স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যই সে তাকে বাপের বাড়ীতে দিয়ে এসেছে। এখন রাণীর কাজ করে হাতে কিছু টাকা হওয়ায়

সে তাকে আনতে চায় নিজের কাছে। কমলমুখী তখন বলে যে বিনোদের স্ত্রীকে সে নিজের কাছেই এনে রেখেছে। বিনোদ উদ্‌গ্রীব হয়ে তার সঙ্গে মিলতে চায়। তখন রাণী ছদ্মবেশ উন্মোচন করে। ঘোমটা সরিয়ে জানায় যে সেই কমলমুখী। মুখের ঢাকা সরে যেতেই বিনোদ-কমল মিলন পর্ব সমাপ্ত হল। ইন্দুমতী এসে কৌতুকরসের আর একটু যোগান দিল।

নিমাই-ইন্দু, বিনোদ-কমল প্রসঙ্গ মিটে যাবার সাথে সাথেই এই দৃশ্যে দেখা যায় ক্ষান্তমণি বাপের বাড়ী থেকে এসে হাজির। কারণ দুদিন সাধ করে করে বাপের বাড়ী থাকতে গিয়ে সে শুনেছে তার কর্তা চন্দ্রকান্ত 'রাগ করে ঘর ছেড়ে' বিনোদদের বাড়ীতে এসে রয়েছে। বাপের বাড়ীতে গিয়েও ক্ষান্তমণি স্বামীর খাওয়ার দিকে নজর দিয়েছে। খাবার রেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু স্বামীর বৈরাগ্যের কথা শুনে থাকতে না পেরে চলে এসেছে।

চতুর্থ দৃশ্যে দেখা গেল চন্দ্রকান্ত সত্যি সত্যিই করিৎকর্মা। ললিতের সঙ্গে বাগবাজারের চৌধুরীদের কুৎসিত মেয়ে কাদম্বিনীর বিয়ের কথা পাকা হয়ে এসেছে। সকলেই এতে খুশি। নিমাই আবার মত বদলে ফেলে এই ভয়ে শঙ্কিত হয়েছে তার পিতার হৃদয়। কেননা ভেতরের রহস্য তার অজানা। তাই তিনি সব কিছু আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শিবচরণ ও নিবারণ চলে গেলে চন্দ্রকান্তের কাছে আসে ক্ষান্তমণি। কিন্তু চন্দ্রকান্ত কিছুতেই স্ত্রীর উপর অভিমান ত্যাগ করতে রাজি নয়। স্ত্রী তখন ঘাট মেনে বলে যে তার খাওয়া-দাওয়ার তো কোন অসুবিধা সে হতে দেয় নি। তখন চন্দ্রকান্ত তাকে বলে রাঁধুনি বামুনের কাজ খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করা স্ত্রীর নয়। ক্ষান্তমণি আবার ঘাট মেনে বলে। 'আমি আর কখনো এমন কাজ করব না।' তখন চন্দ্রকান্ত স্ত্রীর সঙ্গে যেতে রাজি হয় তবে নিবারণ বাবুর দেওয়া জলখাবার খাবার পর। কিন্তু ক্ষান্তমণি জানায় যে সে সে-ব্যবস্থাও করে এসেছে। অগত্যা চন্দ্রকান্ত যাবার জন্য প্রস্তুত হয়—কিন্তু বিনোদ, নিমাই, নলিনাক্ষ হৈ হৈ করতে কবতে এসে পড়ায় ক্ষান্তমণিকে বিদায় নিতে হয়। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আবার রসিকতা শুরু হল। বিনোদ প্রস্তাব দিল যে এই জগৎকে মরুভূমি না বলে নলিনও একটা বিয়ে করে ফেলুক। চন্দ্রকান্ত নলিনের জন্য মেয়ে দেখতে বেরুতে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যায়। কিন্তু নলিনের অগাধ আস্থা বিনোদের উপর। সে বলে 'বিনু ভাই, আর কেউ নয়, কেবল তুমি যাকে পছন্দ করে দেবে, আমি তাকেই নেব'। বিনোদবিহারীও তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। তখন নিমাই প্রস্তাব করে তাড়াতাড়ি সভাভঙ্গের। চন্দ্রকান্ত বলে যে তার নিজের বিরহ অবস্থায় মর্মান্তিক মানস বেদনায় অভিভূত হয়ে সে একটি গান লিখেছে— সেটা গেয়ে তবেই তারা যে যার লক্ষ্মীর কাছে যাবে।

গানটির বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

যার অদৃষ্টে যেমন নারীই জুটুক না কেন—সব নারীই ভালো। তারা আমাদের এই অন্ধকার গৃহে এসে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে যায়। এরা সকলেই একই স্বভাবের বা একই মেজাজের নয়। কেউ অতি উজ্জ্বল, কেউ কিছুটা ম্লান, কেউ-বা আবার কিছুটা তেজী; তাই দহন করে থাকে—আবার কেউ স্নিগ্ধ আলো বিতরণ করে থাকে। প্রেম যখন নূতন, নূতন বধু—তখন আগাগোড়া সব কিছুই মধুর তুল্য—কিন্তু পুরাণো হয়ে গেলে কেবল মধু থাকে না—হয়ে যায় অম্ল-মধুর। তাই একটু ঝাঁঝালো-ও মনে হয়। নারীর বাক্য যখন

তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে ওঠে, তখন যেন তার চোখ তথা মন এসে পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করতে থাকে। ফলে রাগ আর অনুরাগ মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। পুরুষ তৃষ্ণা স্বরূপ আর নারী সেই তৃষ্ণা নিবারক সুধা। নারী হল তৃপ্তি আর পুরুষ হল ক্ষুধা—এর চেয়ে বেশি কথা কবি বলতে পারেন নি। নারীর রূপ যাই হোক না কেন—কালো সাদা অর্থাৎ গৌরবরণ—সবই কবির ভালো লাগে।

এই ভালোলাগার অনুভূতিতে নাটকটির মধুরেন সমাপয়েৎ ঘটেছে।

নামকরণ ঃ 'গোড়ায় গলদ' নাট্যের নামকরণের মধ্যে আপতিক দৃষ্টিতে এক স্থূল ইঙ্গিতের পরিচয় মেলে। গোড়ায় গলদ শব্দের স্থূল অর্থ প্রারম্ভেই যা ভুলে ভরা। এই সরস নাটিকাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর প্রারম্ভিক গলদ শেষ পর্যন্ত প্রতিটি চরিত্রকেই একবার না একবার বিষাদগ্রস্ত করে ফেলেছিল। এবং তাদের চরিত্রে এ বিষাদ, তাদের আচরণের দুঃখাচার—দর্শকদের হৃদয়ে দুঃখানুভব জানানোর বদলে মৃদু হাসি হাসিয়েছে কেননা নাট্যের চরিত্রের গোপন কথা জানার উপায় যথেষ্ট কারণ তারা নাট্যকারের হাতের পুতুল। সে পুতুল চলবে নাট্যকারের ইঙ্গিতে আর কারো ইচ্ছায় নয়। A. Nicoll বলেছেন কোন নাটকে কিভাবে পরিস্থিতির বদলে হাস্যরসের অবতারণা করা যায়—

"The situation, however, as forming the basis of the plot of any comedy, presents to the dramatist possibly the very fullest opportunity for the introduction of the laughable. The physical person and the character are nearly always shown not isolated, but in the midst of some other persons in a situation will lead to nothing but farce ; that although an audience look to situation far more than to character or to words, siutation offers an opportunity only for the intruduction of a very limited kind of laughter."[১]

'গোড়ায় গলদ' নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই নাটকে যে তিন জোড়া পুরুষ নারীর গলদের কথা উল্লেখিত হয়েছে তারা হল ক্ষান্তমণি, চন্দ্রকান্ত, নিমাই-ইন্দুমতী আর বিনোদ-কমলমুখী। এদের মধ্যে কিছু কম আকর্ষণীয় ক্ষান্তমণি-চন্দ্রকান্ত কাহিনী। কারণ এরা বিবাহিতা নারী পুরুষ। দম্পতি। যে কারণ উভয়ের মধ্যে এনেছিল সাময়িক বিরহ বিষাদ তা হল অভিমান। ক্ষান্তমণি তার স্বামীর উপর চায় সম্পূর্ণ অধিকার। কিন্তু স্বামীর অবিবাহিত বন্ধু বন্ধবেরা নাকি চন্দ্রকান্তকে এমন প্রভাবিত করছে যার ফলে তার অভীপ্সা সম্পূর্ণ হচ্ছে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যও একতরফা। চন্দ্রকান্তের স্ত্রীর প্রতি কিছু অনুযোগ অভিযোগ আছে। অভিযোগগুলি নিম্নরূপ ঃ

(i) বিবাহের পূর্বের মত এখন আর তার স্ত্রী আঁটোসাঁটো নেই।

(ii) সাজসজ্জা করে না রোমাণ্টিক নায়িকার মত।

(iii) আদালত থেকে ফিরে আসার পর তাকে সম্ভাষণ করে না প্রকৃত নায়িকার মত।

(iv) আকাশের চাঁদ, নিসর্গের মাধুরী তাকে আবিষ্ট করে না কখনও। কোনদিন কোন মুগ্ধতার মুহূর্তে আপন হস্তে গ্রন্থিত মালা সে পরিয়ে দেয় না স্বামীর কণ্ঠে।

(v) বস্তুত, আগাগোড়া একটি পদ্য নয় তার স্ত্রী বরং সে নির্ভেজাল গদ্য।

১. The Theory of Drama/A. Nicoll/P. 203

আড়াল থেকে এই সব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ক্ষান্তমণি। স্বামীর উপর তার তীব্র অভিমান জন্মে। ইন্দুমতীর সঙ্গে সে পরামর্শ করে স্বামীকে জব্দ করার জন্য বাপের বাড়ী চলে যায়। চন্দ্রকান্ত স্ত্রী-অন্ত প্রাণ। সুতরাং, সহজেই কাবু হয়ে পড়ে সে। বার বার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েও ফিরিয়ে আনতে পারে না। স্ত্রী চলে যাবার পর প্রথমে চন্দ্রকান্ত পুরুষসুলভ রাগ দেখাতে চায়—বিনোদকে সে বলে,—

"মনে করছি আমি উলটে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে চলে আসব। তোর এখানেই থাকব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস; আমি তাকে বলি, আমার এ ঝুনো মাথায় বিনুর দন্তস্ফুট করবার জো নেই কিন্তু সে বোঝে না। সে যদি খবর পায় আমি চব্বিশ ঘণ্টা তোর সংসর্গে কাটিয়েছি, তা হলে পতিত উদ্ধারের জন্যে পতিতপাবনী তেমনি তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে আসবে।"

হলোও তাই। ক্ষান্তমণি কোন মারফৎ খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ হাজির। চন্দ্রকান্তের গলদে সে নিজে সাজা পেয়েছে, আবার ক্ষান্তমণির দুর্বলতার জন্য আত্মসমর্পণ করে সে নিস্তার পেয়েছে। গলদের মাত্রা এ কাহিনীতে কম থাকলেও চন্দ্রকান্ত ক্ষান্তমণি এ নাটকের মূল কাহিনীকে কিছু কিছু অংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে একথা স্বীকার করাই ভাল।

দ্বিতীয় গলদ বিনোদবিহারী কমলমুখীর পারস্পরিক আচরণে সৃষ্ট। কবি বিনোদবিহারী হঠাৎ কমলমুখীর সঙ্গীত শুনে তাকে না দেখেই বিবাহের জন্য উতলা হয়ে ওঠে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই পটলডাঙা মেসে বসবাসকারী এই হবু-দামী-উকিল বিয়ে করে বসল কমলমুখীকে। বিয়ের আগে শুরু হয়েছে তার রোমান্টিক কল্পলোক যাত্রা। স্মরণ করা যেতে পারে প্রায়-সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'চোখের বালি' উপন্যাসেও বিবাহ-পরবর্তী এই রোমান্স এবং অচিরে রোমান্স ভঙ্গের চিত্র চমৎকার আঁকা হয়েছে মহেন্দ্র-আশালতার দাম্পত্যকে অলম্বন করে। বিনোদের স্বপ্নজগৎ ভেঙে গেছে বাস্তব জগতের নিত্য চাই-চাই এর আঘাতে সে বলেছে,—

"এতদিন আমার টাকা ছিল না, অভাবও ছিল না—বিয়ের পর থেকে দারিদ্র্য বলে একটা কদর্য মড়াখেকো শ্মশানের কুকুর জিব বের করে সর্বদা আমার চোখের সামনে হ্যাঁ হ্যাঁ করে বেড়াচ্ছে তাকে—আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি নে।"

তাই সে হঠকারীর মত বিয়ে করে যেমন ভুল করে বসেছে তেমনি জীবনের ছন্দ মেলাতে না পেরে স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ীতে রেখে এসে আর একটা ভুল করে বসল। চন্দ্রকান্ত এখন বিনোদকে সঙ্গ দিতে নারাজ, কেননা তার বউও রাগ করে বাপের বাড়ী চলে গিয়েছে। সুতরাং সে বিনোদকে পরামর্শ সে দেয় 'যদি বন্ধুত্ব রাখতে চাও তো ও আলোচনায় আর কাজ নেই, তোমার যা কর্তব্য বোধ হয় তুমি কোরো।

অবনত মস্তকে বিনোদ গিয়েছে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু তার স্ত্রী চেয়েছে তাকে বাজিয়ে নিতে। এতকাল কমলমুখী দরিদ্রের মেয়ে বলে জানা ছিল সবার। এবার জানতে হল সে বিত্তবান পিতার কন্যা। ফলে সেও হল উত্তরাধিকার সূত্রে ধনী। এবার সে আর কেবল স্বামীর অনুগত স্ত্রীর ভূমিকা পালন করল না। স্বামীকে বাজিয়ে নেবার জন্য সে এক ফাঁদ পাতল। নিজের ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে ফেলল নিজ প্রকৃত সৌন্দর্যকে—

সে হল রাণী। কিন্তু প্রথমেই স্বামীকে নিজের হস্তগত করতে ভুল করল না সে। স্বামী বেচারা জানে না অথচ স্ত্রী তাকেই বানিয়ে ফেলল তার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। বার বার বিনোদকে যন্ত্রণা দিয়েছে সে—ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করেছে স্ত্রীর প্রতি তার আকর্ষণ বেশি না অর্থের প্রতি! শেষমেশ বিনোদকে প্রায় নাজেহাল করে নিজের ঘোমটা সরিয়ে দিয়েছে সে। মিলন ঘটেছে বিনোদবিহারী-কমলমুখীর। স্মরণ করা যেতে পারে হবু স্বামীর চরিত্রের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেবার উদ্দেশ্যে 'কাল্পনিক সংবদল' নাটকের নায়িকাও ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছিল।

নিমাই-ইন্দুমতীর কাহিনীতে দেখি গলদের মাত্রা আরো বেশি। কাহিনীর শুরুতেই দেখি দু'জনে দু'জনকে দেখামাত্রই ভালোবেসে ফেলল; অথচ দু'জনের সামান্য ভুলে দু'জনকে চিনল আলাদা আলাদা নামে। ফলে ইন্দুমতীর কাছে নিমাই হয়ে উঠল ললিত আর নিমাই-এর কাছে ইন্দুমতী হল কাদম্বিনী। বিনোদ-কমল কাহিনী আর নিমাই-ইন্দুমতী কামিনী উভয়ত্রই ছদ্মনাম ধারণ এবং ছদ্ম আবরণের আড়াল লক্ষ্য করি। কিন্তু বিনোদ কাহিনীতে কমল ছদ্মবেশ ধরেছে একা। সে ছদ্মবেশ পাঠক ও শ্রোতার কাছে অনাবৃত। আর নিমাই-ইন্দুমতী কাহিনীতে দু'জনই ছদ্ম নামের মাধ্যমে পরস্পরের কাছে ছদ্মবেশী। ঘটনাচক্রে ইন্দুমতী নিমাই-এর কাছে নিজের পরিচয় জানায় বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী বলে। আর ইন্দু ক্ষান্তমণিকে জিজ্ঞেস করে নিমাই এর শরীরের বর্ণনা করে তার নাম অনুমানে জানতে পারে সে—ললিত।

এদিকে নিমাই-এর ললিত নামে, এক বন্ধু ছিল। বাগবাজারে চৌধুরীদেরও কাদম্বিনী নামে এক কন্যা ছিল। ফলে ইন্দুমতীর ভুলে কাহিনীতে জট পাকিয়ে যায়। নিমাই তার পিতার কথানুযায়ী ইন্দুমতীকে বিবাহ করায় অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং সোজাসুজি জানিয়ে দেয় সে বিয়ে করতে চায় বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনীকে। নিমাই এর পিতা ফ্যাসাদে পড়ে যান। কারণ তিনি ইন্দুমতীর বাবাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে নিজের পুত্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেবেন। কিন্তু কি আর করেন তিনি! পুত্রের ইচ্ছানুযায়ী চৌধুরীদের হাতে পায়ে ধরে তাদের কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে কাদম্বিনীর সঙ্গে নিজ পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব পাকা করে এলেন। অন্যদিকে ইন্দুমতীও নিমাই নামের কোন ব্যক্তিকে স্বামীত্বে বরণ করতে রাজী নয় একথা দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করে বসে। কেননা নিমাই নাম তার স্বামী হবার যোগ্য নয়। বিপাকে পড়ে তার বাবাও কমল ও বিনোদের সহায়তায় ললিত নামে ব্যক্তিকে নিয়ে আসে তাদের বাড়ীতে। ইন্দুমতী এই ললিতকে দেখেনি, ললিতও তাকে ভালোবাসে নি কোনকালে। বিনোদ যখন তার কাছে ইন্দুমতীর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করে তাই তখন ললিত ক্ষিপ্ত হয়ে যা তা বলে বসে। এই অংশে বিনোদবিহারীর সঙ্গে তার কথোপকথন উদ্ধৃতিযোগ্য,—

"বিনোদবিহারী। আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুনলেই তোমার পছন্দ হয়?

ললিত। The idea! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's safe a proposition!

বিনোদবিহারী। আগে শোনো, তারপর যা বলতে হয় বোলো—মেয়েটির নাম—কাদম্বিনী।

ললিত। কাদম্বিনী! She may be all that is nice and good কিন্তু I must

confess তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা I should যায় না। যদি তার নামটাই তার best qualification হয় তাহলে try my luck in some other quarter!"

এই কথোপকথন আর একটি গলদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলে নিমাই-এর কবিতার খাতা। সে খাতায় সে কাদম্বিনীর উদ্দেশ্য লিখেছিল অনেক কবিতা। ইন্দুমতী এখন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে যে কাদম্বিনী নাম শুনলেই তার ললিত আবেশগ্রস্ত হবে। কিন্তু এখানেও গোড়ায় গলদ ঘটেছে। কারণ প্রকৃত ললিতকে আনা হয়েছে কাদম্বিনীর প্রতি তার ভালোবাসা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে। ফলে ললিতের প্রত্যাখ্যান আর এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ইন্দুমতী নিমাই-এর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। পরিশেষে অবশ্য ঘটেছে মধুরেন সমাপয়েৎ। নিমাই ও ইন্দুমতী স্ব-স্বনামে পরস্পরের কাছে পরিচিত হবার পর সমস্ত গলদের মুলোৎপাটন সম্ভব হয়েছে।

গোড়ায় গলদের পরিবর্তিত রূপ শেষরক্ষা ঃ

রবীন্দ্রনাথের যে কোন সাহিত্যশাখায় রচিত সাহিত্যগুলির প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি ক্ষেপণ করলে দেখা যায় বার বার তিনি তাঁর পুর্বের রচনাকে বদলেছেন। কখনও তিনি তার পূর্বের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন নি। তাই তাঁর প্রতিভার উন্মেষের প্রথম নিদর্শন রূপে যে কবিতার নাম আমরা প্রায়শই উল্লেখ করে থাকি সেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতারও অবয়বে দেখি নানা সময়ে নানা পরিবর্তন। গল্প কাব্য উপন্যাস প্রবন্ধেরও স্থান বিশেষে বার বার অদল-বদল করেছেন রবীন্দ্রনাথ। নাটকের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। নাটকটিকে অভিনয়পযোগী করে গড়ে তুলবার জন্য গোড়ায় গলদের কিছু অংশ ছেঁটে কেটে তিনি শুধু নাটকটিকে সময়োপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। একথাই সব নয় এর নামও পরিবর্তন করে রেখেছেন 'শেষ রক্ষা'।

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা', প্রায়শ্চিত্ত', 'অচলায়তন' 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকের নাম পরিবর্তনের কথাও প্রসঙ্গত মনে পড়ে।

'গোড়ায় গলদে'র ত্রুটি নিয়ে সবিস্তার আলোচনার পূর্বে একটা কথা জেনে নেওয়া দরকার। ১২৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজে' অভিনয়ের জন্য এ নাটকটি রচিত। এই সমাজের প্রথম সম্পাদক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঐ বছর শীতকালে নাটকটি লেখার ইচ্ছা একটি পত্রে প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সমাজের তাড়ায় ভাদ্র মাসেই তাঁকে লেখা শেষ করতে হয়। "কিন্তু পালা খাড়া করিয়া দেখা গেল যে, নাটকীয় রস তেমন তেমন জমিতেছে না। তখন রবীন্দ্রনাথ অভূতপূর্ব অধ্যবসায় ও ক্ষিপ্রতার সহিত উহার আমুল সংশোধন করিলেন।" বস্তুতপক্ষে এটাই হল 'গোড়ায় গলদে'র প্রথম সাধারণ সংশোধন। বলা বাহুল্য নাটকটি তখন যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল, রসরাজ অমৃতলাল বসু মনে করেছিলেন এটি বুঝি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা। এমনই ভালো লেগেছিল তাঁর। তবু পবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি আবার সংশোধন করেন।

'গোড়ায় গলদ' নাটকের আঙ্গিকে এ পরিবর্তন কি জরুরী ছিল? জরুরী যদি হয় তবে 'গোড়ায় গলদ' নাটিকায় ত্রুটিগুলি কোথায়? সে ত্রুটিগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে হলে প্রথমেই ওঠে (১) নাটক বৃথা বা বাগাড়ম্বরের কথা। বিনোদ, নিমাই, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি

চরিত্রগুলি সুযোগ পেলেই বৃথা বাক্য ব্যয় করেছে। একটি চরিত্র দীর্ঘক্ষণ সংলাপ বলতে থাকায় নাটকের কাহিনীর গতি শ্লথ হয়ে যায়। (২) প্রতিটি চরিত্রটি অতিরিক্ত স্বগতোক্তি করেছে। নাটকের মধ্যে চমৎকারিত্ব, সৃষ্টিতে দু একটা স্বগতোক্তি প্রয়োগ যুক্তি সিদ্ধ এবং তা সৌন্দর্য বর্ধকও। কিন্তু বার বার স্বগতোক্তি উচ্চারণ নষ্ট করে দেয় চরিত্রের মহিমা। (৩) গল্প কাহিনীতে দেখা যায় ঠাসবুনানির অভাব। বিস্তৃত প্রেক্ষাপটই এই ত্রুটির মূল কারণ। (৪) অনেক কিছু অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত যেন দর্শকের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার। বিশ্বাসের দায় যেন তাদেরই। অল্প বয়সের অপরিণত মানস এর পশ্চাতে দায়ী। 'শেষরক্ষা'য় এই ত্রুটিগুলি বহুলাংশে দূর করা হয়েছে।

'গোড়ায় গলদে'র মত 'শেষরক্ষা' নাটিকা খাপছাড়া ঢিলে ঢালা ভাবে শুরু হয় নি। প্রথম থেকেই যেন এর গল্পাংশ হয়ে উঠেছে ছিলেটান ধনুকের মত। অপ্রয়োজনীয় বহু অংশ বাদ দিয়ে নাটকের আবহ আকর্ষণীয় করার জন্য কয়েকটি সঙ্গীত সংযোজন করেছেন নাট্যকার। সব চেয়ে বড় কথা নিমাই চরিত্রের নাম নিয়ে রসিকতা জমানো সহজ নয় বুঝে রবীন্দ্রনাথ 'শেষরক্ষা'য় ইন্দুমতীর প্রেমিকের নাম দিয়েছেন গদাই।

'গোড়ায় গলদে'র মূল গলদের দিকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল— কিন্তু 'শেষরক্ষায়' নাট্যকারের আকর্ষণ শেষ অংশে। গোড়ায় যে গলদ তার যদি শেষরক্ষা হয় তবে তা নিয়ে দুঃখের কিছু নেই। তাছাড়া 'শেষ রক্ষা' নামকরণের মাধ্যমে এর মিলনান্তক কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করা সম্ভব হয়েছে। 'গোড়ায় গলদ' নামকরণের মাধ্যমে এ ইঙ্গিত সম্ভব ছিল না। 'গোড়ায় গলদ'-এর কমলের পূর্ব পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজনবোধ করেন নি নাট্যকার, এমনকি তার সুললিত কণ্ঠের গান শুনে বিনোদ একেবারে বিয়ের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল তার কোন পরিচয় সে নাটকে ছিল না। কিন্তু 'শেষরক্ষা'র প্রথম দৃশ্যেই কমলের কণ্ঠ নিঃসৃত সে সুমধুর গীত শুনি,—

"ডাকিল মোরে জাগার সাথি।
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে,
প্রভাত হল আঁধার রাতি।" (শেষরক্ষা)

ইন্দুও সঙ্গীতজ্ঞা সে কথাও শুরুতেই জানতে পারি,—তার কণ্ঠের গানটি অসাধারণ। একদিকে এটি কাহিনীর কৌতূহলোদ্দীপক অন্য দিকে কাব্যগুণান্বিত,—

"হায়রে ওরে যায় না কি জানা!
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়,
পায় না ঠিকানা।
অলখ পথেই যাওয়া-আসা,
শুনি চরণধ্বনির ভাষা,
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায়
রইল ঠিকানা।" (শেষরক্ষা)

'গোড়ায় গলদ' নাটকে অঙ্কের সংখ্যা ছিল পাঁচ। 'শেষরক্ষায়' অঙ্ক দাঁড়িয়েছে চার-এ। ফলে আয়তন গত সংক্ষিপ্তর কারণে এতে এসেছে দ্যুতি ও গতি। তাই শেষরক্ষা 'গোড়ায় গলদে'র তুলনায় অভিনয় সফল প্রহসন হতে পেরেছে।

কিন্তু আর একটা কথাও আলোচনা করে নেওয়া দরকার। মননশীল নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' নাটকটি ছিল একমাত্র নিছক হিউমারাশ্রয়ী রঙ্গব্যঙ্গমূলক

নাটক। এ নাটকে কৌতুকই প্রধান—wit বা satire এর খোঁচা এতে প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে 'গোড়ায় গলদ-এর শুদ্ধ হাস্য দর্শককে যে অনাবিল আনন্দ দিয়েছে তা 'শেষরক্ষা' দিতে পারে নি। এখানে অনেকটা বিদগ্ধ ভাব এসে গেছে চরিত্রগুলির কথাবার্তা ও আচার আচরণে। তাদের সংলাপও হয়েছে অনেকটা বুদ্ধিদীপ্ত। তাই 'গোড়ায় গলদে'র অনাবিল হাস্যরসের স্রোত এখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে—এখানকার হাসিও বুদ্ধিদীপ্ত।

'গোড়ায় গলদ'এর চরিত্রগুলিরও কিছু কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে 'শেষরক্ষা'য়। নারীশিক্ষা ও নারী প্রগতি বলতে কি বোঝায় রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সেই অল্প বয়সে তা ধরতে পারেন নি। নারীশিক্ষার মানে যে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতা আর ঘোমটা ঘুচিয়ে যথেচ্ছাচার নয় তা বুঝতে না পারার কারণে শিক্ষিতা নারী ইন্দুমতীর আচরণ অনেকটাই অবাস্তব হয়ে পড়েছে। সে নিমাই-এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে যে সব আচরণ করেছে তা একেবারে ছেলেমানুষী ব্যাপার।

'শেষরক্ষা' তেও 'গোড়ায় গলদে'র কিছু ত্রুটি রয়ে গেয়ে যেমন এখানে সব চরিত্রই সর্বত্র অবাধে যাতায়াত করতে পেরেছে। গদাই এর পিতা শিবচরণ ডাক্তার। তিনি হঠাৎ বলা নেই, কহা নেই চলে এলেন চন্দ্রের অন্তঃপুরে। সাক্ষাৎ হল নিজের পুত্রের সঙ্গে। উদ্দেশ্য যেন নোট বই-এ গদাই এর লেখা নিয়ে কিছু রসিকতা করা। পিতার পুত্রের এ রসিকতা, তা আবার অন্যের বাড়ীতে বড় বিসদৃশ ঠেকে।

গোড়ায় গলদের বহু ত্রুটি 'শেষরক্ষা'য় সংশোধন করা হলেও কিছু ত্রুটি শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছে। তাছাড়া 'গোড়ায় গলদে'র সারল্য 'শেষরক্ষা'র সাহিত্যের নীতি নিয়মের পাকা বাঁধনে বাঁধা পড়ায় অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

'গোড়ায় গলদ' নাটকটিকে সার্থক প্রহসনরূপে উল্লেক করেছেন নানা নাট্য সমালোচক।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন : "সর্বপ্রথম আনুপূর্বিক গদ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ নাটক 'গোড়ায় গলদ'। ইহা একখানি প্রহসন। 'গোড়ায় গলদের মধ্যে শ্লেষ বা ব্যঙ্গের কোন লক্ষণ নাই, ইহা অনাবিল হাস্যরসের ধারায় সমুজ্জ্বল।"[১]

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন : "গোড়ায় গলদ' (৩১ ভাদ্র ১২৯৯, দ্বি-স ১৮৯৯) রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং বৃহত্তম প্রহসন।"[২]

> শ্রীঅশোক সেন বলেছেন : "গোড়ায় গলদ' নাটকটি প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সালে। দৃশ্যের পর দৃশ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিয়া পাত্রপাত্রীদের মধুর মিলনে নাটকের পরিসমাপ্তি। কয়েকটি হাস্যকর ভুলের ফলে নায়ক-নায়িকারা যেভাবে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল এবং ধীরে ধীরে আবার যেভাবে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইল তাহাই অতি সুন্দরভাবে এই Comedy of Errors টিতে দেখানো হইয়াছে।[৩]

ডঃ অজিতকুমার ঘোষও পরোক্ষে 'গোড়ায় গলদ' নাটিকাকে বলেছেন প্রহসন,— "রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা প্রহসনখানি 'গোড়ায় গলদ'-এর সংস্কৃত এবং মার্জিত রূপ।'[৪]

১. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (২য়) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য/পৃঃ ১২১
২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য়) / ডঃসুকুমার সেন/পৃঃ ২২৮-২৯
৩. রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা / শ্রী অশোক সেন / পৃঃ ১০৪
৪. বাংলা নাটকের ইতিহাস / ডঃ অজিত কুমার ঘোষ / পৃঃ ৩১০

সুতরাং প্রায় সব সমালোচকই 'গোড়ায় গলদ'কে প্রহসন রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু একটি নাটিকাকে প্রহসন রূপে গণ্য করার পূর্বে তার প্রহসনত্ব বিচারে জন্য কিছু পদ্ধতির কথা বলা যায়। যেমন প্রহসনের কাহিনী হবে (১) সমকালীন, বহু আলোচ্য, সমাজ, ধর্ম রাজনীতির দুর্বলতম কিংবা কলঙ্কময় বিষয় কেন্দ্রিক। (২) প্রহসনের কাহিনীতে পূর্বাপর প্রবাহিত হবে এর স্বচ্ছ হাসির স্রোতপ্রবাহ। (৩) এর চরিত্রগুলি হয় type ধর্মী। (৪) চরিত্রগুলির ভাষা হবে স্বাভাবিক বা আঞ্চলিক। (৫ প্রহসনে আঁকা হবে পরিচিত জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির চিত্র। (৬) প্রহসনে নীতিবাদ বা জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণী উচ্চারিত হবে না। (৭) এর কাহিনী সংক্ষিপ্ত হলে ভালো হয়। সংস্কৃত নাটকে যেমন দু'অঙ্কের বাঁধন ছিল বাংলা প্রহসনে তা নেই। তবু এর আয়তন এ কারণেই ছোট হওয়া প্রয়োজন যে প্রহসনের মধ্যে থাকে হাস্যরসের উতরোল প্রবাহ। দীর্ঘ সময় ধরে হাসির স্রোত ধারাকে নির্বাধ রাখা নাট্যকারের পক্ষে যেমন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার শ্রোতা ও দর্শকের পক্ষেও তেমনি এ দীর্ঘত্ব এক কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা-র কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

'গোড়ায় গলদ' নাটকের কাহিনী কেবল রবীন্দ্র-সমকালীন নয় বলা যায় চিরকালীন সামাজিক কাহিনী। এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে বহু মানুষেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগযোগ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথেরও ঘটেছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অবিবাহিত যুবকদের বিবাহ না করার প্রতিজ্ঞা পরিণামে সে প্রতিজ্ঞায় চ্যুতি এই বিষয়কে অবলম্বন করে লেখা হয়েছিল তাঁর আরও এক উল্লেখযোগ্য নাটিকা 'চিরকুমার সভা'। বিবাহ সমস্যা তাঁর বহু নাটকে প্রধান সমস্যা হয়ে উঠেছে। 'গোড়ায় গলদ'-এরপ পরিবর্তিত রূপ 'শেষরক্ষা'য় 'বৈকুণ্ঠের খাতা' 'বশীকরণ', 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতিতে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে,—

> "দীনবন্ধুর পরিকল্পনা আনুপূর্বিক বাস্তব, রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা বাস্তব ও কল্পনা মিশ্রিত। তাঁহার পরিকল্পিত একই চরিত্রের মধ্যে তাঁহার পরিচিত বিভিন্ন চরিত্রের বিবিধ গুণাবলীর সঙ্গে জিনস্ব মতবাদ আসিয়াও সংমিশ্রণ লাভ করে। ইহার ফলে যদিও অনুভব করিতে মোটেই বেগ পাইতে হয় না যে, রবীন্দ্রনাথের রঙ্গনাট্যের প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে একদিন যাতায়াত করিত, তথাপি কোনটি যে কে, তাহা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না।"

প্রসঙ্গত এ নাটকের প্রথম অভিনয় সম্পর্কে রবীন্দ্র জীবনীকারের বর্ণনা তুলে ধরলে বোঝা যাবে অভিনেতারা নিজেদের পরিচিত চরিত্রগুলিকে বাস্তব করে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখেন নি—" 'গোড়ায় গলদ'-এর অভিনয়কে সর্বাঙ্গসুন্দর ও অত্যন্ত স্বাভাবিক করিবার জন্য অটলকুমার সেন যিনি শিব ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তিনি নাকি সামনের গোটা দুই দাঁত তুলিয়া কৃত্রিম দন্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথ এ নাটকের পরিচালনা করেছিলেন। অন্যান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ—

চন্দ্রকান্ত—শ্রীশচন্দ্র বসু, নিবারণ—হেমচন্দ্র বসুমল্লিক ললিত চাটুজ্যে ব্যারিস্টার ভুবনমোহন চাটুজ্যে প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ এ নাটকের শেষ গানটি গাইতেন। কেননা শ্রীশচন্দ্র নিজে গাইতে পারতেন না। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে রঙ্গমঞ্চে আনার জন্য আরও কয়েকটি

কথা বলতেন "চন্দ্রবাবু তাঁহার বন্ধুদের রবিবাবুর গান শুনিবার জন্য একটু বসিতে বলেন, কারণ সেইদিনই তাঁহার দেখা করিতে আসিবার কথা আছে। পরে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলে সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল, তিনিই শেষ গানটি গাহিলেন, 'যার অদৃষ্টে যেমন জুটুক তোমরা সবাই ভালো।"

'গোড়ায় গলদ' উদ্দেশ্যমূলক নাটিকা নয়। কোন তত্ত্বকথা বা তথ্য এ নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ প্রচার করেন নি। নীতিবাক্য বা জ্ঞানগর্ভ বাণী প্রচার করারও চেষ্টা করেন নি। কোন বিশেষ আকর্ষণ সংঘাত বা climax এর শিখর দেশ এ নাটকে লক্ষিত নয়, ফলে এ স্নায়ুকে তেমন টান টান করেও তোলে না। 'গোড়ায় গলদের কাহিনী অত্যন্ত সাদাসিধে। যে ভ্রান্তির উপর নির্ভর করে comedy or errors এর সৃষ্টি করতে চাওয়া হয়েছে তা এত বড় নাটকের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী বলে নিমাই-এর ভুল করার একটা যুক্তি সঙ্গত কারণ রয়েছে। ইন্দুমতী নিজেই নিমাই-এর কাছে পরোক্ষে নিজের এই ভুল পরিচয় দিয়েছে। চন্দ্রকান্তের হাতে মজা করে উকিলের ছদ্মবেশধারী ইন্দুমতী ধরা পড়ে যাবার ভয়ে পাশের ঘরে দৌড়ে আসে। সেখানে সে দেখতে পায় নিমাইকে। তাকে দেখে কৌশল করে সে স্থান ত্যাগ করার জন্য সে বলে,—

> "ছি ছি, আর একটু হলেই চন্দ্রবাবুর কাছে এই বেশে ধরা পড়তুম। তিনি কী মনে করতেন? আমাকে বোধ হয় দেখতে পান নি। (হঠাৎ নিমাইকে দেখিয়া) ওমা, এ যে সেই ললিতবাবু। আর তো পালাবার পথ নেই। (সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান সামলা খুলিয়া নিমাইয়ের প্রতি) তোমার বাবুর এই শামলা আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিয়ো না। আর শিগ্‌গির দেখে এসো দেখি বাগবাজারে চৌধুরীবাবুদের বাড়ি থেকে পালকি এসেছে কি না।"

আর কিছু পরেই চন্দ্রকান্ত তারই জিজ্ঞাসার উত্তরে তাকে জানায় যে ঐ মেয়েটি হল—"বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী। আমার স্ত্রীর একটি বন্ধু।"

সুতরাং নিমাই এ ভুল করতেই পারে কিন্তু কাদম্বিনী নিমাইকে ললিত বলে যে ভুল করেছে তা বিচারসহ নয়। কারণ সে ক্ষান্তমণির কাছে নিমাই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে 'ললিতবাবু' নামটি কেবল জানতে পারে। ক্ষান্তমণি ললিতের নাম তাকে বলেছে কেননা ইন্দুমতী বলেছে 'তাকে দেখে আমার আদবে ভালো লাগল না'। ললিতের আদব কায়দা অনেকের ভালো লাগত না। আর এই স্বাভাবিক কারণেই ক্ষান্তমণি ইউরোপীয় আদাব কায়দা পটু ললিতের নাম করেছে। অতঃপর নামটি পছন্দ হয়ে যাবার সাথে সাথেই ইন্দুমতী এমনভাবে তার বর্ণনা করেছে যে সে হয়ে উঠেছে কলুটোলার নৃত্যকালী চাটুজ্যের ছেলে ললিত। এটা প্রায় অসম্ভাব্য সম্ভব হয়ে উঠেছে। ফলে কাহিনীর গোড়াতেই যেন কিছু গলদের সন্ধান পেয়েছেন অনেকেই।

কিন্তু মনে রাখা দরকার 'গোড়ায় গলদ' নাটিকার মূল রস হাস্যরস। হাস্যরসের উৎসার ঘটে স্খলন ও বিসদৃশ পতন থেকে। এখানেও চরিত্রগুলির অনেক বিসদৃশ ব্যবহার দেখ। যেমন চন্দ্রকান্ত ক্ষান্তমণির সম্পর্কে ফাটল যে তা ছেলেমানুষী সুলভ। বিনোদ-কমলমণির বিবাহ যেমন আকস্মিক তেমনি তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ফাটলও আকস্মিক।

মোট কথা 'গোড়য় গলদে'র সর্বত্রই আকস্মিকতা। তা স্বীকার করে নিয়ে আলোচনায় এগোনো ভালো।

'গোড়ায় গলদ নাটিকার মূল রস হাস্যরস—Humour এর হাস্যের উৎসারের মূলে। ফলে কৌতুকরসের স্নিগ্ধতা নাটিকাটিকে পরম উপভোগ্য করে তুলেছে কাউকে আহত না করে। হাস্যরসের উৎসমুখ খুলে গিয়েছে নিমাই-এর কবিতা রচনার দৃশ্যে। এবং বার বার তাতে ব্যর্থ হওয়ায় যে আমোদ বা কৌতুকের সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্র ব্যবহৃত ভাষায় তা সার্থক হয়েছে। নিমাই-এর ঘরে বসে সে লিখে চলেছে কিছুতেই মনের কথাকে কলমের ডগায় আনতে পারছে না। সে স্বগতোক্তি করেছে,—

"মুখে এত কথা অনর্থক বকে যাই বাধে না, সেই গুলেই চোদ্দটা অক্ষরে ভাগ করা যে এত মুশকিল তা জানতুম না। কাদম্বিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে," কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে। এই কবিতা পড়ে ইন্দুমতী চমৎকৃত হয়ে বলেছে,—

> 'ওমা! ওমা! ও মা! এ যে আমারই কথা। এইবার বুঝেছি পোড়ারমুখী কাদম্বিনী কে! (হাস্য) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখলেন! ও মা, কত কথাই বলেছেন! আর একবার ভালো করে সমস্তটা পড়ি। কিন্তু কী চমৎকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে।"

শ্যামবাজার-বাগবাজার এলাকার চলতি বুলি মাঝে মাঝে এসে গেছে নানা চরিত্রের মুখে। সংলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করা যাবে!

সুতরাং সামান্য কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও 'গোড়ায় গলদ' নাটিকাকে সার্থক প্রহসন বলতে দ্বিধা নেই।

রসবিচার ঃ

রবীন্দ্রনাথের রঙ্গব্যঙ্গমূলক প্রথম নাটক 'গোড়ার গলদ'। নাটকটিকে বহু বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক প্রহসন রূপে অভিবন্দিত করেছেন। আমরা জানি, প্রহসন হাস্যরসের আধারে গড়ে ওঠে। সুতরাং 'গোড়ায় গলদ' নাটিকারও মূলরস হাস্য। কিন্তু প্রয়োগ ভেদে, নাট্যকারের মানসিকতা ভেদে হাস্যরসের প্রকাশ ঘটে নানা ভাবে—Humour, Satire, wit, fun প্রভৃতি। Humour প্রভৃতি হাস্যরসের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা যায় এই শ্রেণীর নাটকে কৌতুকই মুখ্য। জীবনের নানা অসঙ্গতির চিত্র ফুটিয়ে তোলে এই রস— কোন আঘাতের মাধ্যমে নয় যেন শ্বেত উত্তরীয়ের উপর রঙ্গীন গুলালের হঠাৎ স্পর্শ। মানবিক অনুভূতির প্রকাশ Humour শ্রেণীর নাটকে বেশি লক্ষ্য করা যায় A. Nicoll বলেছেন—

"The word 'numour' has, of course, had an exceedingly varied history from its inception as of the kin of 'numid',...Humour is not the same as the ludicrous; humour in some of its forms barely makes us smile."[১]

সুতরাং ব্যঙ্গের চেয়ে শুদ্ধ হাসির পরিচয় দিতেই Humour উদগ্রীব। অন্যদিকে satire অর্থাৎ ব্যঙ্গাত্মক হাস্য। সংসার, সমাজ, মানুষের চরিত্রকে সংশোধন করার ভূমিকা নিয়ে

১. The Theory of Drama/A. Nicoll/P.198

বসেন। যেখানেই তিনি দেখেন স্খলন পতন সেখানেই তাঁর বিদ্যুৎ চাবুক ঝলসে উঠেছে। অধ্যাপক নিকল satire এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,—

> "Satire, as has been pointed out, can be so bitter than it ceases to be laughable in the very least...it has no moral sense; it has no pity or kindliness or magnanimity. It lashes the physical appearence of persons, sometimes with unmitigated crulety...There is always a certain vulgarity in true, satire; etc."[১]

wit হল বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস। মননশীলতা এর মূলে থাকে। প্রজ্ঞা পরিশীলিত এ হাসি তির্যক উচ্চারণে সৃষ্ট হয়। নিকল বলেছেন,—

> "unconscious incongruity must here, of course, be carefully distinguished from conscious inconguity, which is wit,...Bon mot, esprit, wit–these are the moods and expressions of a highly intelligent man playing with his fancies, and with the discrepancy and incongruity of his fancies, for the delectation of him elf and of others."[২]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনে বিশুদ্ধ কৌতুকরস তথা humour এর প্রকাশ ঘটেছে। তবে স্থানে স্থানে চরিত্রগুলির বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ বিনিময় wit এর সামান্য পরিচয় দেয়। এই নাটকে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য নাট্যকার তিনটি পথ অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমত কাহিনী বর্ণনায়; দ্বিতীয়ত চরিত্রের অসঙ্গতি প্রদর্শনে, তৃতীয়ত সংলাপ প্রয়োগে। নাটকটির সামগ্রিক বিচার করে এবার এ সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

'গোড়ায় গলদ' নাটকের নামকরণের মধ্যেই রয়েছে অসঙ্গতির প্রতি নাট্যকারের সচেতন ইঙ্গিত; আর সে গলদগুলি এ নাটকের বিষয়বস্তুকে করে তুলেছে রসসিক্ত সেগুলি বড়ই মোটা দাগের বা স্থূল। এই নাটকের কাহিনীতে গলদ ঘটেছে নানা ভাবে। শুরুতেই রয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গলদ। এ গলদের জন্য দায়ী এক তরুণ আর দুই বৃদ্ধ। বিনোদবিহারী হঠাৎ কমলমুখীর গান শুনে তাকে না-জেনে না-শুনে বিয়ে করতে উৎসুক হয়ে উঠল। একে এক ধরনের 'গলদ' ছাড়া আর কি বলা যায়? বিনোদের কৃত এই গলদের পর উল্লেখ করতে হয় শিবচরণ ও নিবারণের সিদ্ধান্তর কথা। উভয়েই অভিভাবক। যথাক্রমে নিমাই ও ইন্দুমতীর পিতা তাঁরা। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন তাঁরা নিজ নিজ ছেলে ও মেয়েকে। কিন্তু তবু তাদের পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা না করে নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করে বিবাহের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলায় আর এক ত্রুটি ঘটেছে। দ্বিতীয়ত ছদ্ম পরিচয়। নিমাই আর ইন্দুমতী উভয়েই ছদ্ম-পরিচয় দিয়েছে পরস্পরের কাছে। তাই পরস্পর পরস্পরকে চিনলেও নাম জেনেছে আলাদা। নিমাই চন্দ্রকান্তের কাছে ইন্দুমতীকে জেনেছে কাদম্বিনী বলে। আর ইন্দুমতী ক্ষান্তমণির কাছে নিমাইকে জেনেছে ললিত বলে। কিন্তু নামে তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে অচেনা থাকে। কেননা দর্শকগণ জানে ওই চরিত্র দুটির প্রকৃত পরিচয়, কিন্তু চরিত্র দুটি আদপে তা জানে না। তেমন ঘটনাই বিবৃত হয়েছে বিনোদবিহারী আর কমলমুখীকে ঘিরে। কমলমুখী সব কিছু জানে, অথচ সে যে

১. The Theory of Drama/A. Nicoll/P.–212

২. The Theory of Drama/A. Nicoll/P.–208-09

ছদ্ম পরিচয় দিয়েছে, ছদ্মবেশ ধারণ করেছে সে কথা বিনোদ জানে না। সুতরাং এই নাটকে কাহিনীগত দিক থেকে যে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য এই তৃতীয় কারণ, ছদ্মবেশ ধারণ উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি কারণেই যে হাস্যরসের ধারা সৃষ্টি করেছে তা বলা বাহুল্য, কৌতুক রসের ধারা। Humour-এ রসের প্রাণ।

"গোড়ায় গলদ" নাটকে হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটেছে চরিত্রের আচরণগত অসঙ্গতির কারণে। এ ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি চরিত্রের ভূমিকাই রয়েছে কম বেশি। চন্দ্রকান্ত পত্নীর প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য দেখিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার তার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা—বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বাসনা প্রকাশ—প্রভৃতি ঘটনা দর্শক মনে হাসির ঝিলিক জাগায়। স্বামীকে বশ করার জন্য ক্ষান্তমণির নানা প্রয়াস—ইন্দুমতীর শেষ দৃশ্যে চন্দ্রকান্ত জল খাবার খেয়ে বাড়ি ফেরার বাসনা প্রকাশ করলে ক্ষান্তমণি তাকে যেভাবে টেনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে তাতে হাস্যরস উছলে ওঠে।

অন্যদিকে বিনোদবিহারীর হঠাৎ বিবাহ–সিদ্ধান্ত এবং কন্যার বাড়ি যাওয়া, বিবাহের ব্যবস্থা পাকা করা—বিবাহ কার্য সমাধা পর্যন্ত ঝটিতি ক্রিয়াসমূহ দর্শককে কিছু প্রারম্ভিক-বিস্ময়রসের মুখোমুখি করলেও—অচিরেই তার দোলাচল-চিত্তবৃত্তির পরিচয় পেয়ে নাটকের দর্শক হাস্য সংবরণ করতে পারে না। কমলমুখী। সাতীসাধ্বী রমণী। কিন্তু স্বামীকে 'ছিপে-খেলানো'র সুযোগ পেয়ে সেও তাকে নিপুণভাবে 'খেলিয়েছে'। এই সব খেলার দৃশ্যগুলিতে বিনোদের ফ্যাকাশে মুখের অসহায়তা—কমলমুখীর ঘোমটা-ঢাকা মুখের চাপা হাসি—দর্শকদের প্রভূত হাস্যরসের যোগান দিয়েছে।

নিমাই-ইন্দুমতীর পারস্পরিক আচরণেও হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। নিমাই ইন্দুমতীকে দেখে যেভাবে উন্মত্ত হয়ে কবিতা রচনা করেছে, শামলা পরিহিতা ইন্দুমতী পালাতে গিয়ে হঠাৎ নিজের মনের মানুষের মুখোমুখি হয়ে যে ভাষায় সম্বোধন করে তাকে চন্দ্রকান্তের ভৃত্য বানিয়ে দিয়েছে তা কিছুটা রুচিতে বাধলেও তাৎক্ষণিক হাস্যরস সৃষ্টিতে এ প্রয়োগ চমৎকার হয়েছে। আবার বাগবাজার চৌধুরীদের বাড়ির গাড়ীবারান্দার নিচে নিমাই যখন হাঁ করে দাঁড়িয়ে বলেছে,—

> "আহা এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্ছে—ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয়।...ঐ যে পশ্চিমের জানালার ভিতর দিয়ে একটা সাদা কাপড়ের মতো যেন দেখা গেল না না, ওতো নয় ও তো একজন দাসী দেখছি—ও কী করছে। একটা ভিজে শাড়ি শুকোতে দিচ্ছে। বোধ হয় তাঁরই শাড়ি। আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিতুম। তাহলে এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি পরে এখন কী করছেন। একবার কিছুতেই কি দেখা হতে পারে না। আমরা কি বনের জন্তু। আমাদের কেন এত ভয়। এত করে এতগুলো দেয়াল গেঁথে এতগুলো দরজা—জানলা বন্ধ করে মানুষের কাছ থেকে মানুষ লুকিয়ে থাকে কেন।"

তখন হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। নিমাই এর কবিতা চর্চার সময় পিতার সঙ্গে তার সংলাপ বিনিময় অংশটিও যথেষ্ট হাস্যরসের সঞ্চার ঘটিয়েছে।

এ নাটকের হাস্যরস সৃষ্টিতে আরও কয়েকটি চরিত্রের ভূমিকা রয়েছে। এদের মধ্যে

নলিনাক্ষ, ললিত উল্লেখযোগ্য। নলিনাক্ষ যেন সবার কথায় সঙ্গত দেবার কাজ করেছে। কখনও বিনোদ, কখনও নিমাই এর কথার প্রতিধ্বনি করেছে সে। বিনোদ নলিনাক্ষের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নানা পুরুষ কথাবার্তা বলেছে কিন্তু নলিনাক্ষ তাতে তাকে রেহাই দেয় নি। অন্যদিকে ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে কথা বলায় ললিত এ নাটকে কিছু হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। শিবচরণের আচরণেও মাঝে মাঝে হাস্যরসের প্রকাশ ঘটেছে।

সংলাপ প্রয়োগে এ নাট্যে হাস্যরসের ফোয়ারা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। প্রথম দৃশ্য থেকে শুরু হয়েছে সেই প্রয়াস। উদ্ভট-কল্পনার মাধ্যমে জগৎকে মরুময় দেখছে চন্দ্রকান্ত, নলিনাক্ষ— তাদের পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের ঝাঁজ রয়েছে। চন্দ্রকান্ত যখন জানায় যে জগৎটা শূন্য ঠিক 'যেন নেড়া মাথার মতো' তখন কিছুটা তির্যক কণ্ঠে বিনোদ বলেছে,—'কে বলেছে মরুভূমি। তা হলে পৃথিবী সুদ্ধ এতগুলো গোরু চলে বেড়াচ্ছে কোন্‌খানে।' ললিতার উক্তির তির্যক ঝাঁজ এবং ইংরেজী বাংলার বিশাল এ নাটকে হাস্যরসের উৎস মুখ খুলে দিয়েছে। যেমন বিনোদবিহারী যখন ললিতের কাছে কাদম্বিনীর বিবাহ-সম্বন্ধ নিয়ে যায় তখন ললিত বিনোদের কথার উত্তরে বলে,—

"ললিত। I know that! একটি কেন। মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না।"

সে সময় ললিতের কণ্ঠের বক্র উচ্চারণ, বিনোদের মুখের অসহায়তার প্রতিচ্ছবি— দর্শকদের হাসির উপকরণ জোগায়।

নায়ক বিচার : 'গোড়ায় গলদ' নাটিকাটি প্রহসন জাতীয় রচনা। এই প্রহসনটি কোন একটি চরিত্রের স্খলন আধারে পতনের কিংবা অন্য কোন প্রথাসিদ্ধ উপায়ে গড়ে উঠে নি। তাই এ নাটিকায় দেখি একাধিক চরিত্র প্রায় সমপর্যায়ের গুরুত্ব পেয়েছে। সে কারণে নাটকটির নায়ক নির্বাচন করা বড় কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে।

নাটিকাটি বিচার করলে দেখা যায় যে এর মূল কাহিনী নিমাই-ইন্দুমতীর প্রেম ও বিবাহ, কিন্তু বিনোদ-কমলমুখীর কাহিনীকেও অবহেলা করা সম্ভব নয়। সুতরাং সাধারণভাবে মনে হতে পারে নিমাই অথবা বিনোদ এ নাটকের নায়ক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ নিমাই ও বিনোদ স্ব-স্ব কাহিনীর নিয়ন্ত্রণকারী নয়। নিমাই ও বিনোদ উভয়েই ঘটনা স্রোতে ভেসে গিয়েছে। বিনোদ ভালোবেসেছে কমলমুখীকে—তাকে বিয়ে করতে চায় সে—ছুটে এসেছে চন্দ্রকান্তের কাছে সাহায্যের জন্য। কমলমুখীকে বাপের বাড়িতে রেখে এসে অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে বিনোদ—ছুটে এসেছে চন্দ্রকান্তের কাছে। নিমাই ভালোবেসেছে কাদম্বিনীকে—শরণ নিয়েছে চন্দ্রকান্তের। তাই বলা যায় চন্দ্রকান্ত তাদের কিছুটা পরিচালিত করেছে, প্রভাবিত করেছে, নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেদিক থেকে চন্দ্রকান্তকে নায়করূপে বিবেচনা করা ভুল হবে না।

নাটকের শুরুতে চন্দ্রকান্তের খুব বেশি গুরুত্ব লক্ষ্য করি না। সেখানে দেখি বিনোদবিহারীর অনুভূতি, তার আচর আচরণের প্রতিই যেন দর্শকদের সমস্ত অভিনিবেশ। কিন্তু হঠাৎই সে হয়ে উঠে বিনোদবিহারীর বিবাহের ঘটক। যেখানে বিনোদ ছিল কয়েকটি অবিবাহিত যুবকের বন্ধু—সেখানে সে হয়ে উঠল তাদের friend philosopher and guide তবে

চন্দ্রকান্তের উপর বিনোদের কিছু প্রভাব পড়েছে একথা অন্তত ক্ষান্তমণি বুঝেছে। সে চেয়েছে নিজের স্বামী রত্নটিকে সযত্নে ওদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। স্বামীর উপর অভিমান করে সে যখন বাপের বাড়ি চলে যায় তখন অভিমানিনী নারীকে ফিরিয়ে আনার জানা চন্দ্রকান্ত এই বিনোদের সঙ্গে একত্রে বসবাসের ইচ্ছা পোষণ করেছে। কেননা তার স্থির বিশ্বাস—এ সংবাদ কানে যেতে না যেতেই ক্ষান্তমণি ছুটে আসবে স্বামীকে বাঁচাতে।

চন্দ্রকান্ত এ নাটকের দুটি প্রধান বিবাহের ব্যবস্থাপক। আর একটি বিবাহের পরোক্ষ বিধায়ক। প্রধান দুটি বিবাহ হল নিমাই-ইন্দুমতী ও বিনোদ-কমলমুখীর বিবাহ। ইন্দুমতীর ভুল বোঝাবুঝি নাটকে আর একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছিল—অবাঞ্ছিতরূপে বাগবাজারের চৌধুরী বাড়ির মেয়ে কাদম্বিনী বিবাহসূত্রে এ নাট্য-কাহিনী সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছেন। নিমাই ইন্দুমতীর বিবাহ সম্পন্ন করতে বিনোদের ভূমিকাকে যদি কিছুটা গুরুত্ব দিতে হয় তবে চন্দ্রকান্তকেও এড়িয়ে যাওয়া চলে না। কারণ নিমাই-এর পছন্দানুসারে তার বাবা শিবচরণ বাগবাজারের চৌধুরী বাড়ির মেয়ে কাদম্বিনীর সঙ্গে নিমাই-এর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে সমস্যাকে আরও ঘোলাটে করে তোলেন। চন্দ্রকান্ত যে সমস্যার সমাধান করে লতিকে অর্থলোভ দেখিয়ে। বাগবাজারের চৌধুরীরা অত্যন্ত বিত্তবান লোক। কাদম্বিনী অতিকুৎসিৎ দেখতে। কিন্তু ললিত সে ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়েছে—কোননা সে বিয়ে করে পণের টাকা নিয়ে চলে যাবে বিলেতে।

বিনোদ বিভিন্ন সময়ে নানা চরিত্রের দ্বারা চালিত। প্রথমে চালিত হয়েছে নিজের দ্বারা—তার আবেগ তাকে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ায় উৎসুক করেছে। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া তার একটি বিশেষ দোষ। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কেবল আবেগের বশবর্তী হয়ে সে নিজের বিবাহের সিদ্ধান্ত নেয় রমণীর নাম শুনে—আবার সংসারে দারিদ্র্য দেখা দিতে না দিতেই সে স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে রেখে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। চন্দ্রকান্তের দ্বারা ভৎর্সিত হয়ে তৎক্ষণাৎ সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য আগ্রহী হয়। নাটকের মধ্য অংশে সে চলেছে চন্দ্রকান্তের কথায় পরের অংশে চলেছে ছদ্মবেশী কমলমুখীর নির্দেশ।

নিমাই চরিত্রের বিবাহ এ নাটকের একটা মুখ্য ঘটনা সন্দেহ নেই। তার বিবাহের পরই প্রায় এ নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে। সুতরাং যদি বলা যায় যে নিমাই-ইন্দুমতীর মধ্যে জেগে ওঠা ভালোবাসা এবং পরিণামে বিবাহানুষ্ঠান, এ নাটকের মূল বিষয়—তাহলে অন্যায় বলা হয় না। কিন্তু নিমাই-এর আচরণে এমন কোন স্বতন্ত্র সত্তার প্রকাশ ঘটেনি যে তাতে তাকে এ নাটকের নায়ক বলা যায়। অবশ্য একথা বলা যায় প্রহসনের কেন্দ্রীয় চরিত্র সব সময় সমস্যার জট খোলে না বরং সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি করে। ঘটনাস্রোতে নানা জটিল আবর্ত সৃষ্টিতে নিমাই সমর্থ হয়েছে।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য কোন চরিত্রকে বেশি গুরুত্ব দিতে চান নি। তাঁর মতে এ নাটকে গুরুত্বপূর্ণ কেবল একটি চরিত্র রয়েছে—সেটি হল নিমাই-এর বাবা শিবচরণের। কিন্তু ডঃ ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক্ষেত্রে একমত হওয়া যায় না। কারণ শিবচরণ বৃত্তিতে ডাক্তার হতে পারেন—এ নাটকের জটিলতা অনাবৃত করণে তাঁর ভূমিকা অতি নগণ্য। রঙ্গরসের নাটকে চরিত্রের সার্থকতা ব্যক্তিত্বের প্রকাশে নয়—নানা দুর্বলতার যথাযথ আভাসে।

কাহিনীর দিক থেকে নাট্যকারের ইচ্ছানুযায়ী এ নাটকের প্রধান চরিত্ররূপে নিমাই-এর

কথা বলা যেতে পারে; কিন্তু ঘটনার অগ্রগতি তার নিয়ন্ত্রণ এবং শেষ পর্যন্ত জটিলতার উন্মোচনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকার জন্য চন্দ্রকান্তকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা খুব দোষের হবে না।

সংলাপ ও সঙ্গীত ঃ নাটক উক্তি প্রত্যুক্তিময় রচনা। তাই সংলাপ নাটক রচনার মাধ্যম। কিন্তু সংলাপ কেবল নাট্যরচনার বাহন এ কথা বললে সংলাপের গুরুত্বকে ছোট করা হয়। সমালোচক বলেছেন 'Dialogue is the soul of drama.' অর্থাৎ সংলাপ নাটকের আত্মা। নাটকে সংলাপের গুরুত্ব বিষয়ে নানা সমালোচক নানা কথা বলে গেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিক হাডসন বলেছেন,—

> "We may regard dialogue as means of characterisation under two heads; taking first the utterances of a given person in his conversation with others, and then the remarks made about him by other persons in the play."

অধ্যাপক A. Nicoll সংলাপের গুরুত্ব বিচার করতে গিয়ে বলেছেন,—

> "It is through the dialogue and through the dialogue alone as interpreted by the actors hat the can convey his story to the assembled audience."

সুতরাং চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ পায় তার সংলাপে। প্রহসনের চরিত্রের সংলাপে আর একটি লক্ষণ মুদ্রাদোষ। কোন বিশেষ শব্দের বারংবার ভুল প্রয়োগ মুদ্রাদোষের ফলে ঘটে থাকে।

সংলাপের উপকরণ শব্দ ও ভাষা। রঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটকের ভাষা অন্যান্য শ্রেণীর নাটকের তুলনায় একটু আলাদা হয়। রঙ্গরস দু'ভাবে প্রকাশিত হয় ঃ—(ক) স্থূলভাবে প্রকাশিত রঙ্গরস; (খ) সূক্ষ্ম রঙ্গরস। স্থূলভাবে যে হাস্যরসের প্রকাশ ঘটে তার ভাষা হয় অনেক মোটা দাগের। সূক্ষ্ম রঙ্গরসের ভাষায় থাকা তির্যকতা, বুদ্ধির মারপ্যাঁচ। উচ্চ সংস্কৃতি সম্পন্ন ঠাকুর বংশের সন্তান রবীন্দ্রনাথের পরিশীলিত মন স্থূল রঙ্গরসের প্রকাশে আগ্রহ দেখায়নি। তাঁর রচনায় রয়েছে হালকা হাসির ফুলেল বিস্তার তীক্ষ্ণ তির্যক সংলাপ ও কখনও কখনও কেবল হাল্‌কা কথায় হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে 'গোড়ায় গলদ' নাটিকায়। এখানে তির্যক সংলাপের একটু নমুনা উদ্ধৃত করা যায়,—

(ক) "বিনোদবিহারী।....আজ রবিবারটা আছে, আজ একটা-কিছু করা যাক, যাতে মনটা বেশ তাজা হয়ে ধড়ফড়িয়ে ওঠে।

চন্দ্রকান্ত। ঠিক বলেছ। ওষুধের শিশির মতো নিদেন হপ্তার মধ্যে একটা দিন নিজেকে খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে নেওয়া আবশ্যক—নইলে শরীরের যা কিছু পদার্থ ছিল সমস্তই তলায় থিথিয়ে গেল।

(খ) "নিমাই। ওহে চন্দর, তামাক ডাকো। তোমরা ধোঁয়ার মধ্যে বাস কর তোমাদের আর তামাকের দরকার হয় না, আমরা পৃথিবীতে থাকি আমাদের তামাকটা পানটা, এমন কি, সামান্য ভাতটা ডালটার আবশ্যক ঠেকে।"

নিমাই শিবচরণের উক্তিতে হাস্যরসের ফোয়ারা ছোটে যখন বাগবাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে পিতা-পুত্রের উক্তি বিনিময় হয়,—

শিবচরণ। হতভাগা কালেজে আবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘুর্ ঘুর্ করে। (নিকটে আসিয়া) বাপু, মেডিকেল কলেজটা কোন্‌দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি।

নিমাই। কী সর্বনাশ। এ যে বাবা!

শিবচরণ। শুনছ? কালেজ কোন্‌দিকে। তোমার অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে। তোমার সমস্ত ডাক্তারি শাস্ত্র কি ঐ জানলায় গলায় দড়ি ঝুলছে। (নিমাই নিরুত্তর)....

ছোট খাটো শব্দ প্রয়োগেও হাসির উচ্ছ্বল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। ক্ষান্তমণির সংলাপ অনেক দেশজ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বিনোদের বিবাহের প্রসঙ্গে বিনোদের কথাকে ইন্দুমতীর কাছে সে বর্ণনা করে 'শুম্ভ নিশুম্ভর যুদ্ধ', 'শোর সরাবৎ' প্রভৃতি লোক প্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করে। স্বামীর 'মকদ্দমার কাগজ' সম্পর্কে তার মন্তব্য 'হারাতে পারলে বাঁচেন বোধ হয়'। ললিতের ইংরেজি বাংলায় মিশানো খিঁচুড়ি ভাষাও হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

গোড়ায় গলদ নাটিকার সংলাপ প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের ক্ষমতার পরিচয় মেলে। নারীচরিত্র ও পুরুষচরিত্রের সংলাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি যথাসাধ্য তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু সব সেক্ষেত্রে সফল না হতে পারলেও মাঝে মধ্যে সংলাপ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশক হয়ে উঠেছে।

'গোড়ায় গলদ' নাটকে গলদের শুরু সঙ্গীত শ্রবণে হলেও সেখানে কোন সঙ্গীতের উল্লেখ নেই। গ্রন্থের একেবারে শেষে রয়েছে একটি সমবেত সঙ্গীত। এটি কিছুটা উপদেশাত্মক কিছুটা সান্ত্বনাবাচক সঙ্গীত।

'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভালো।
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো।'

এ নাটকের নারীদের সম্পর্কই শুধু নয়—নাট্যকার যেন কৌশলে সমস্ত দর্শককে নিজের নিজের সংসারে খুশী থাকার বিষয়ে উপদেশ দিয়ে দিয়েছেন।

চরিত্র বিচার ঃ

'গোড়ায় গলদ' নাটকের চরিত্র সংখ্যা বারো। এই বারোটি চরিত্রের মধ্যে প্রায় অর্ধেক চরিত্র এ নাটকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে। বাকি চরিত্রগুলি ঐ চরিত্রগুলির গুরুত্বকে যথোচিত ভাবে তুলে ধরেছে। এদের মধ্যে চন্দ্রকান্ত কেবল বিবাহিত, অন্যরা সকলেই অবিবাহিত নবযুবক। কিন্তু বিবাহ সম্পর্কে এরা কেউই উদাসীন নয়—নিজ নিজ সুখের আলয় গড়ে তুলবার জন্য এদের আকাশকুসুম কল্পনার অন্ত নেই।

চন্দ্রকান্ত ঃ চন্দ্রকান্ত বিবাহিত। তার স্ত্রীর নাম ক্ষান্তমণি। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত, করিৎকর্মা এই নবযুবক। বৃত্তি সূত্রে উকিল। বন্ধুবৎসল চন্দ্রকান্ত বন্ধুত্বের খাতিরে সব কাজ করতে রাজি। অবিবাহিত বন্ধুদের মন খারাপ হলে সে চেষ্টা করে তা দূর করতে। অবশ্য নিজেও সে তাদের সঙ্গ পেয়ে খুশি। বিনোদবিহারী হঠাৎ যখন বিবাহের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠে তখন চন্দ্রকান্ত তাকে সাবধান করে দিয়েছে অভিজ্ঞের বিবেচনা শক্তিতে—

"কেবল গান বিয়ে করতে চাস তো একটা আর্গিন কেন্ না? এযে ভাই মানুষ, বড়ো সহজ জন্তু নয়! এ যেমন গান গাইতে পারে তেমনি পাঁচ কথা শুনিয়ে দিতেও পারে।"

কিন্তু বিনোদের একান্ত ইচ্ছানুসারে সে বাধ্য হয়ে গিয়েছে কমলমুখীর পালক পিতার কাছে সে। এবং তার বিবাহ স্থির করে এসেছে।

নিজের স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্যবোধ এ নাটকে প্রমাণিত। ক্ষান্তমণির সঙ্গে তার দাম্পত্য কলহের সূত্রে নাট্যকার কৌশলে যেন বাংলার অতিপরিচিত ঘটনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সে চিত্র হল বঙ্গদম্পতির সংসারের চিত্র। মান অভিমানের চিত্র। কিন্তু এখানে স্ত্রী যখন তার উপর অভিমান করে বাপের বাড়ির চলে যায় তখন চন্দ্রকান্ত চোকে-কানে অন্ধকার দেখেছে। সে তাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় নি সে দুখে। পরের স্ত্রীর অভিমান ভাঙাতে না পেরে পাল্টা অভিমান করেছে। স্ত্রীর অপছন্দ যাকে তার সঙ্গে রাত্রিবাস করেছে। ফলে তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে, স্ত্রী ফিরে এসেছে।

চন্দ্রকান্ত এ নাটকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিবাহিত এই যুবক তার অবিবাহিত বন্ধুদের যাবতীয় সমস্যা দূর করেছে। বিনোদের বিবাহের ব্যাপারে তার আগ্রহ এবং প্রয়াস বিশেষ উল্লেখযোগ্য, অন্যদিকে নিমাই এর বিবাহ দেখার ক্ষেত্রেও সে একটি বিরাট দায়িত্ব নিয়েছে। চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনীর বিয়ে স্থির করে দেয় সে তাদেরই এক অর্থগৃধ্রু বন্ধু ললিত চাটুজ্যের সঙ্গে। এমন কি নলিনাক্ষের বিবাহ দেবার ব্যাপারেও সে আগ্রহ দেখিয়েছে।

চন্দ্রকান্ত যেমন বন্ধুদের বিবাহ দেবার কাজে উৎসাহ দেখিয়েছে তেমন তারা যখন কোন অন্যায় কাজ করেছে তখন করেছে তাদের নিন্দাও। বিনোদবিহারী বিবাহের কিছুদিন পরেই স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে চন্দ্রকান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেয়েছে। আবার বিনোদ স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনবার কথা বললে সে তাকে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়েছে বয়স্ক অভিভাবকের মত। বস্তুতপক্ষে নিমাই ও বিনোদের শ্রদ্ধেয় অভিভাবকের দায়িত্ব ও পালন করেছে যেন চন্দ্রকান্ত।

নিমাই এর বিবাহ দেওয়ায় তার ভূমিকা অসাধারণ। সেই বস্তুতপক্ষে নিমাই ইন্দুমতীর মিলনকে সহজ সাধ্য করে তুলেছে ললিত কাদম্বিনীর বিবাহ দেওয়ার মাধ্যমে।

বিনোদ বিহারী ঃ বিনোদবিহারীর চরিত্রের প্রধান লক্ষণ অতিরিক্ত আবেগ। অবিবাহিত এই যুবক কেবল আবেগের বশবর্তী হয়েই কমলমুখীর সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক পাকা করে ফেলে বিবাহিত হয়ে যায় অনতিকালের মধ্যেই। স্বভাবে কবি সে। কয়েকটি কবিতার বই রয়েছে তার। কবিরূপে বাজারে কিছু খ্যাতিও হয়েছে। কবির স্বভাব যেমন হাওয়া উচিত তার মধ্যে তেমন আবেগ প্রাধান্য রযেছে। সে এই বাস্তব জগতে নির্মাণ করতে গিয়েছে স্বপ্ন-কল্পনাভরা এক সংসার। কিন্তু বাস্তবে সে তো সম্ভব নয়। তাই তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে—বস্তু জগতের দুঃখ যন্ত্রণায় আর্ত হয়েছে সে। কমলমুখীকে বাপের বাড়ীতে রোখে এসেছে সে, কিন্তু সে দুঃখ পেয়েছে। ছদ্মবেশী কমলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে—অন্যে ভুল বুঝেছে। ছদ্মবেশী কমলের কাছ চাকরী পেয়ে সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কথা ভেবেছে। তার করিৎকর্মা স্বভাবের পরিচয় মেলে রাণীর নির্দেশ অনুসারে নানা কর্ম সম্পাদনে।

এম এ, বি এল বিনোদবিহারীর নারীদের সম্পর্কে কয়েকটি সুউচ্চ ধারণা ছিল—যেমন

তার নিজের জীবন সম্পর্কে ছিল একটা স্পষ্ট চিন্তা। কবি বিনোদ মাঝে মাঝে এই বাস্তবের একঘেয়েমির হাত থেকে ছুটি পাবার জন্যই বুঝি বন্ধুদের সঙ্গে কল্পনা বিলাসে মেতে উঠত। এমনই এক মুহূর্তে এক নারী কণ্ঠের গান শুনে সে মুগ্ধ হয়—আর নিজের বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। জীবনকে বাজি রেখে সে জীবনের স্বাদ পেতে চায় সম্পূর্ণ রূপে। কিন্তু এ সব কল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য যে মানসিক জোর থাকা দরকার, যে সহ্য ক্ষমতার প্রয়োজন, বিনোদের চরিত্রে তার বড়ই অভাব ছিল। অনেক কথা সে অবশ্য চেয়েছে একে ঢেকে দিতে—কিন্তু এই অংশেই তার বাস্তব ভীরুতা বড় বেশি করে চোখে পড়েছে।

নারী সম্পর্কে কেবল এক রোমান্টিক ধারণা ছিল তার। নারী যেন কেবল লীলা সঙ্গিনী। কেবল লীলা আর আনন্দ কিন্তু বিবাহের পরেই সে বুঝতে পারে দারিদ্র্যের মধ্যে নারীকে ঠিক মানায় না। অচিরেই সে উপলব্ধি করে ঐশ্বর্য হল নারীদের জন্য—ঐশ্বর্য-হীনতায় নারী ম্লান হয়ে যায়।

নিমাই ঃ নিমাই শিবচরণ ডাক্তারের পুত্র। ডাক্তারী পড়ছে মেডিক্যাল কলেজে। পরীক্ষা প্রায় দোরগোড়ায় এসে গিয়েছে। এহেন অবস্থায় হঠাৎ সে বিপত্তির মধ্যে পড়েছে। অত্যন্ত পিতৃভক্ত—পিতার বাধ্য সন্তান সে। বন্ধুদের সঙ্গে রূঢ় কখনও বলেনি, তাই কেউই তাকে অনাদর করেনি। নাট্যকারের বিশেষ সহানুভূতিও লাভ করেছে এই চরিত্রটিই। ফলে মনে হতে পারে সেই এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে গেলে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার যে ক্ষমতা চরিত্রের থাকা দরকার তা তার নেই। বরং রয়েছে সব কিছু বিশৃঙ্খল করে দিয়ে মন খারাপ করার অসম্ভব ক্ষমতা। অবশ্য মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নববাবুর থেকে শুরু করে অমৃতলালের 'খাসদখলে'র মোহিত পর্যন্ত সবাই কেবল একের পর এক শৃঙ্খলহীন আচরণে সব কিছুকে ওলটপালট করে দিয়েছে মাত্র। কেউ কেউ আবার প্রহসনের নায়কের আবশ্যকীয় গুণ রূপে উল্লেখ করেন তার সমস্যা সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতাকে। চক্রব্যূহে ঢুকে যাবার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান এরা, রক্ষার দায়িত্ব অর্জুনের—যে সময় যদি আবার অর্জুন নারায়ণী সেনা নিয়ে মেতে থাকে তাহলেই ভরাডুবি। কিন্তু মহাভারতে যাই ঘটুক—প্রহসনে তা ঘটে না। অবশ্যম্ভাবী ভরাডুবির হাত থেকে প্রহসনের চরিত্র রক্ষা পায় অভিভাবকের শেষকালীন সচেতন দৃষ্টিতে। এখানে অভিভাবকের ভূমিকায় দেখি চন্দ্রকান্তকে।

নিমাই চরিত্রের মধ্যে একটা মস্ত বড় বৈপরীত্য রয়েছে। সে নাটকে শুরুতে তার বন্ধুদের কাছে প্রেম সম্পর্কে রূঢ় মন্তব্য করেছে তার মতে প্রেম বায়ুরোগ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু Irony of fate এই যে সেই অনতিবিলম্বে পড়ল ইন্দুমতীর প্রেমে। তাও স্বনামে নয়, বানিয়ে তোলা নামে। প্রেমে পড়ার সাথে সাথে সে এমন মেতে উঠল যে কবিতা লিখতে শুরু করে দিল। পিতার মতের বিরুদ্ধতা করল সে। তার পছন্দ মেয়ের নাম বিভ্রাট ঘটায় পিতা কিছুটা অপদস্থ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছানুসারে বিবাহ কার্য সমাধা হয়েছে।

নিমাই এর চরিত্রে রয়েছে স্পষ্টত এক বিবর্তনের রূপরেখা। নিমাই নারীর রূপ সম্পর্কে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিল। নারীর প্রতি প্রেমকে সে কেবল রোগ অভিধা দিয়ে নিজেকে আড়াল

করতে চেয়েছে। বিনোদের হঠাৎ জাগা প্রেমানুভবও তার চোকে নিছক পাগলামি। কিন্তু অচিরেই সে এই রোগের শিকার হয়। বিনোদের পছন্দের কন্যাকে দেখতে গিয়ে দেখে ফেলে ইন্দুমতীকে। এবং love at the first sight, প্রথম দর্শনেই প্রেম।

তরুণ বয়সে প্রেমের পাগলামি নিমাই চরিত্রের আধারে চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিনোদের প্রেমের অনুভব এক রকম—সে প্রেম শ্রুতি নির্ভর। রূপের মায়াজাল নেই সেথা। রয়েছে সুরের মায়াজাল। সুরের মধুর শরীর সেই ধূপছায়াময়ী রমণীর জন্ম দিয়েছে। সেই দেশে এ ভালো লাগার জন্ম যে দেশে আকাশ মধুর বাতাস মধুর। তাই বাস্তব জগতের সঙ্গে স্পর্শমাত্রই সে প্রেম মিলিয়ে গেছে। কিন্তু নিমাই এর প্রেম রূপনির্ভর। ইন্দুমতীর রূপের লাবণ্য দর্শন মাত্রই তার হৃদয়ে জেগেছে এই গভীর অনুভূতি। নাম নয়, ধাম নয়—অর্থ নয়, সম্পদ নয়—নিমাই মজেছে কেবল রূপে। তার ডাক্তারী শাস্ত্র জলাঞ্জলি দিয়েছে সে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রায় সমকালে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের মহেন্দ্রও আশালতার প্রেমে ডাক্তারী পড়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছিল। তবে মহেন্দ্রের প্রেমের জোয়ার বিবাহের পর উঠেছিল আর নিমাই এর প্রেম বিবাহের পূর্বেই।

ইন্দুমতীর প্রতি নিমাই এর প্রবল আকর্ষণের চিত্র এ নাটকে অনেক জায়গায় অঙ্কিত হয়েছে। প্রথমত খাতা খোঁজার নামে ঘরে ফিরে আসায়। দ্বিতীয়ত বিবাহ বাসরে দরজার কাছে ঘুরঘুর করায়। এবং নাটকের শেষে যখন বিবাহের পর বন্ধু বান্ধবেরা কথাবার্তায় ব্যস্ত তখন সে-ই সবাইকে সচেতন করে দেয় ঘরে ফেরার জন্য—কেননা রাত্রি যত বাড়বে ততই নাকি গৃহের চন্দ্র ম্লান হয়ে যাবে।

শিবচরণ ঃ শিবচরণ নিমাই-এর পিতা। তাঁর চরিত্রের সামগ্রিক রূপ 'গোড়ায় গলদ' নাটকে চিত্রিত হয়েছে। শিবচরণ ডাক্তার। বেশ অবস্থাপন্ন তিনি। চিকিৎসায় তাঁর বেশ নাম রয়েছে। পুত্র নিমাইকে নিয়ে তাঁর সুখে সংসার। নিমাই এর উপর তাঁর অনেক আশা ভরসা। তাকে তিনি ডাক্তার করতে চান। শিবচরণের সদাসতর্ক দৃষ্টি রয়েছে তাঁর পুত্রের প্রতি। তাই সে কখন কোথায় যায়, করে এ সব খবরাখবরও তিনি রাখেন। পুত্রকে ভালোবাসেন বলে তাকে তিনি সুখী দেখতে চান। তাই নিজের ছোটবেলাকার বন্ধু নিবারণের কন্যা রূপবতী ইন্দুমতীর সঙ্গে নিজের পুত্রের বিবাহ দিতে চান। কিন্তু পুত্র এ ব্যাপারে অমত জানালে তিনি কিছুটা বিপন্ন বোধ করেন। কেননা তিনি নিবারণকে পাকা কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু তবু পুত্রের সুখ ও আকাঙক্ষাকে বলি দিয়ে তিনি নিজের জেদকে বড় করে প্রতিষ্ঠা চেষ্টা দেবার করেন নি। পুত্রের ইচ্ছানুযায়ী তিনি বাগবাজারের চৌধুরী বাড়ির কাদম্বিনীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা পাকা করেছেন। কিন্তু পুত্র ছদ্ম-কাদম্বিনীর প্রকৃত পরিচয় পাবার পর যখন জানাল যে সে ইন্দুমতীকে ছাড়া কাকেও বিয়ে করবে না তখন পুত্রের প্রতি দুর্বল স্নেহভীরু এই পিতা আবার ফ্যাসাদে পড়েন। এ সময় তাঁকে রক্ষা করে চন্দ্রকান্ত। কাদম্বিনীর বিবাহের অন্যত্র ব্যবস্থা করিয়ে।

ইন্দুমতীর সঙ্গে নিমাই এর বিবাহ দেবার পশ্চাতে শিবচরণের এক স্বার্থ ছিল। বিপত্নীক এই মানুষটির বৃদ্ধ বয়স বড় কষ্ট সৃষ্টে কাটছিল। তিনি সেবাকাঙক্ষী হয়ে উঠেছিলেন মনে প্রাণে। ইন্দুমতী বেশ বড়সড়ো মেয়ে সে একাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। তা ছাড়া নিমাইকে ঠিক পথে চালিত করতে হলে যে বড়সড়ো মেয়েরই দরকার—এ ধরনের একটা ভাবনাও দানা বেঁধেছিল শিবচরণের মনে।

শিবচরণের আচরণে তাঁর পিতৃত্বের পরিচয় প্রকাশিত, নিবারণেও তাই। ললিত চরিত্রের মেরুদন্ড খুবই নরম। নলিনাক্ষ যেন একজন সাকরেদ।

নারীচরিত্র গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষান্তমণি, কমলমুখী, ইন্দুমতী। তিনটি চরিত্রই ব্যক্তিত্বময়ী। শিক্ষা প্রাপ্ত নারীর আচার আচরণ কমলমুখী ও ইন্দুমুখীর চরিত্রে চমৎকার ফুটেছে।

ক্ষান্তমণি ঃ ক্ষান্তমণি চন্দ্রকান্তের স্ত্রী। নম্র স্বভাব, সরলাপতিগতপ্রাণা সাধ্বী ক্ষান্তমণি। পতির সেবা তার জীবনের ব্রত। অথচ বাঙালীর বধূর কিছু কিছু টিপিক্যাল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রে থাকার কারণে তাকে বিশেষ রূপে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। প্রথমত সে স্বভাবভীরু। কেউ তাকে কোন কথা বললে, কিংবা জবাব চাইলে সে অসহায় হয়ে পড়ে। স্বামী যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে বসে যে তার নামে বাইরে অপপ্রচার বা নিন্দা করেছে কিনা! তখন হঠাৎ সে বলে সৌরভী দিদির কাছে সে একবার বলেছিল। শিক্ষাদীক্ষা তার বিশেষণেই। উপন্যাসের নায়কদের মত করে সে তাই তার স্বামীর মন ভোলাতে পারছে না বলে তার দুঃখ। ইন্দুমতীর কাছে সে একজন যথার্থ আধুনিকার মত স্বামীর প্রতি প্রেম নিবেদনের কৌশল শিক্ষা নিতে চায়। কিন্তু শেষমেষ সে যে অস্ত্রে নিজের স্বামীকে কাবু করে ফেলেছে তা বাঙালী নারীর নিজস্ব অস্ত্র—শিবঠাকুরের আমলেও যা ছিল (এক কন্যা না খেয়ে বাপের বাড়ি যান)—ক্ষান্তমণি বাপের বাড়ি চলে গেছে।

কিন্তু পিতৃগৃহে গিয়েও তার শান্তি নেই। সে সদাসতর্ক দৃষ্টি রেখেছে নিজ স্বামীর খাওয়া পরা ইত্যাদি ব্যাপারে। সে বড় ভয় পায় চন্দ্রকান্তের অবিবাহিত বন্ধুদের। বিশেষ করে বিনোদবিহারীকে, কেননা সে কবি—তাই খামখেয়ালী। তাই তার গৃহে গিয়ে স্বামী রাত্রিবাস করছে খবর পাবামাত্রই সমস্ত অন্তরাল ঘুচিয়ে ক্ষান্তমণি পিতৃগৃহ থেকে ছুটে এসেছে। স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

কমলমুখী ঃ কমলমুখীর চরিত্রে রয়েছে ব্যক্তিত্বময়ী নারীর পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ এ সময় একাধিক ব্যক্তিত্বময়ী নারীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন—স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরাণী প্রমুখা। সুতরাং তাঁদের চরিত্রের কিছু প্রভাবও এ চরিত্রে পড়া খুব একটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। শিক্ষিতা, মার্জিত স্বভাবা, সঙ্গীতজ্ঞ এই নারীর সংযমী পদক্ষেপ সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। তবে কমলমুখী রসকষহীন প্রস্তরসদৃশ নয়। তার অন্তরে রয়েছে সরস অনুভূতির ফল্গুপ্রবাহ, ভাবের আবেগ বাষ্প অবলম্বনে শূন্যে ভেসে বেড়ানোয় তার রুচি নেই। যুক্তিবাদী এই রমণী যুক্তি ও সংযমের শৃঙ্খলায় বাঁধতে চেয়েছে জীবনকে।

কমলমুখীও তার স্বামীর প্রতি নিবেদিত প্রাণ। কিন্তু তার প্রেম ক্ষান্তমণির মত নয়। সে জানে তার স্বামী কবি। তাই তার স্বভাবে রয়েছে আবেগের বাড়াবাড়ি। সুতরাং সংসারকে সুখের আধার করে গড়ে তুলতে সে নিজেকে শক্ত করেছে। বিনোদবিহারীর সঙ্গে তার মনের যোগ ললিত কলার প্রতি উভয়ের আকর্ষণের কারণে। তাই এক কথাতেই সে বিনোদকে বিয়ে করার সম্মতি দিয়ে বসে। কিন্তু নিজ দারিদ্র্যের কারণে বিনোদ যখন কমলমুখীকে তার পিতৃগৃহে রেখে যায় তখন সে অতিরিক্ত বস্তু সচেতন হয়ে পড়ে।

এ সময়ই জানা যায় কমলমুখী নিবারণের নিজের নয়, বন্ধু কন্যা। মৃত্যুকালে মাতৃহীনা এই বালিকার দায়িত্বভার তিনি নিবারণের উপর দিয়ে গিয়েছিলেন এবং রেখে গেছলেন প্রভূত সম্পত্তি—তার কুড়ি বৎসর বয়স হলে তবে সে সম্পদের অধিকারী হবে কমল।

নিবারণ আর অপেক্ষা না করে কমলের হাতে সম্পত্তি তুলে দিয়ে তাকে স্বামীর ঘরে যেতে বললে কমলমুখী তার সম্পদের কথা কাউকে জানাতে নিষেধ করে। এবং নিজে রাণী বসন্তকুমারীর ছদ্মবেশে কয়েকটি কাজ করে নিবারণের সম্মতি সাপেক্ষেই—প্রথমত সে তার স্বামীকে নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করে। দ্বিতীয়ত সে তার স্বামীর অন্য নারীর প্রতি কোন দুর্বলতা আছে কিনা পরীক্ষা করে নেয়। তৃতীয়ত ইন্দুমতীর বিবাহের ব্যাপারে সবিশেষ চেষ্টা করে। বাস্তব-অবাস্তবের সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক অসাধারণ চরিত্র এই কমলমুখী।

ইন্দুমতী ঃ ইন্দুমতী সম্পূর্ণ আরেক ধরনের নারী। নিবারণের কন্যা ইন্দুমতীও উচ্চশিক্ষিতা, সংগীতজ্ঞা। তবে তার রূপ অসাধারণ একথা নিবারণ ও কমলমুখী উভয়ের উক্তিতে যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি নারী-বিদ্বেষ পোষণকারী নিমাই-এর তাকে লেখা মাত্র আচরণে প্রমাণিত হয়েছে। কমলমুখী যেমন সংযমী ইন্দুমতী তেমনি উচ্ছল রমণী। তার উচ্ছলতা বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মত, গ্রাম নগর-প্রান্তরকে ডুবিয়ে দিয়ে যায় তার প্রবাহ। কিন্তু তাবলে সে অসতর্ক নয়—নিজের চরিত্রের উচ্ছলতা এবং তরলতা সম্পর্কে তার মন সচেতন। তাই নিমাই-এর সঙ্গে কৌতুক করার পর সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেছে—আজ তার কি হয়েছে?

ইন্দুমতীর চঞ্চলতা ও তরলস্বভাবের কারণে একের পর এক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমেই সে সমস্যা করেছে নিজের নাম গোপন করে। সে ক্ষান্তমণির কাছে অনুরোধ করেছে যে সে তার স্বামীর কাছে তার গোপন করে যেন সে জানায় যে চৌধুরী বাড়ীর কাদম্বিনী এসেছে। নিমাই এর সঙ্গে শামলা পরিহিতা অবস্থায় সাক্ষাতের পর সে যেভাবে নিমাইকে চাকর বানিয়ে দেয় এবং নিজের নাম গোপন করে তা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু মনে হলেও হাস্যরসের নাটকে এটা মেনে নিতে হয়।

ইন্দুমতী আরও চঞ্চল হয়ে উঠেছে সম্ভবত কমলমুখীর বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হয়ে যাবার পরেই। তার দিদি স্বামী রূপে পাচ্ছে এক কবিকে—সে তার নামে কবিতা লিখিয়ে নিতে পারবে যে গুপ্ত বাসনা নিজের মনে ছিল তারও। তাই যখন সে নিমাই এর খাতায় যে কবিতা দেখে এবং তার মনে হয় এ কবিতা তাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে তখন সে খুশী হয়ে ওঠে। কবিতাটি খুব ভালো না হলেও প্রশংসা করে। খাতাটি বুকে চেপে ধরে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে সে। এমন কি খাতার মালিককেও সে ভালোবেসে ফেলেছে।

নাম সম্পর্কে ইন্দুমতীর তীব্র অনুভূতি ছিল। প্রেমের বাজারে নিমাই নাম যে অচল বোধ তার ছিল। তাই পিতার শত অনুরোধেও সে পিতার পছন্দ করা ছেলেকে বিয়ে করতে হয় না—কেননা তার নাম নিমাই। পরে নিজের ভালোলাগা ললিত নামধারী (ললিত চাটুজ্যে নিমাই নয়) যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে—তখন পিতার ইচ্ছামত সে নিমাইকে বিবাহ করতে নিমরাজি হয়। এ সময় জানা যায় সে যাকে ভালোবেসেছে তার আসল নাম ললিত নয়—নিমাই। এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ললিত নামের প্রকৃত অধিকারী কলুটোলার ললিত চাটুজ্যে, যার সঙ্গে তার কোন দিন সাক্ষাৎই হয় নি। সুতরাং ইন্দুমতীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল—পূর্ণ হল তাদের পিতাদের ইচ্ছেও।

প্রথমা দ্বিতীয়া প্রভৃতি নারীদের আচরণে বাসর ঘরে ঠাট্টা সম্পর্কেও অধিকারিণী বয়োজ্যেষ্ঠ নারীদের আচরণ চমৎকার ফুটেছে।

বৈকুণ্ঠের খাতা

রবীন্দ্র প্রতিভার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তির কথা মনে রেখেও আমরা অনেকেই তাঁকে কেবল কবি হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত। কবিতার ঐশ্বর্যময় ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র রবীন্দ্র প্রতিভার যে পরিচয় মুদ্রিত কখনও স্বেচ্ছাক্রমে, কখনও অজ্ঞানতা-প্রসূত আমরা সেদিক সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থাকি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিচয় শুধু কবি অভিধায় সীমাবদ্ধ নয়—তিনি ছিলেন অনেক বড়ো মাপের নাট্যকার, নট এবং নাট্য পরিচালক তাঁর অভিনয় শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করেছেন প্রতিমা দেবী, রাণী চন্দ, শান্তিদেব ঘোষ, সুধীরচন্দ্র কর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনের অভিনয় দেখে অমৃতলাল বসু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন—অভিনেতাদের শিক্ষকের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—

"অঙ্গভঙ্গি রঙ্গ দেখে হইল বিস্ময়
সবে সখে অভিনেতা কে জানে এদের নেতা
প্রতিভা যে শিক্ষাদাতা বুঝ পরিচয়।"[১]

নাট্যরচনার প্রথম যুগ থেকে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্রতে ব্রতী রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন নাট্যকাঠামোর ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পর পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, অন্যদিকে রঙ্গমঞ্চ সজ্জায় অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন। হ.চ.হ. হরিশ্চন্দ্র হালদার ছিলেন মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে। খামখেয়ালী সভার দ্বারা অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটকে'র দৃশ্যসজ্জায় প্রশংসা করে সোমপ্রকাশ লিখেছিল,—"নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্মিত ও দ্রষ্টব্যার্থ গুলি সুন্দর...."। রবীন্দ্র-স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী বেথুন কলেজ প্রাঙ্গণে অভিনীত 'মায়ার খেলা' নাটকের মঞ্চসজ্জায় উল্লেখ করেছেন। সেখানে "মায়াকুমারীদের দন্ডের মুন্ডে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল, বোধ হয় বিলিতি পরীর অনুকরণে।"[২]

রচনাকাল ও অভিনয় : খামখেয়ালী সভার সভ্যদের চাহিদাতেই ১৩০৩ বঙ্গাব্দে, ইংরেজি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, রবীন্দ্রনাথ 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটিকাটি রচনা করেন। এটি রবীন্দ্র রচনাবলীতে 'প্রহসন' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। খামখেয়ালী সভার সভ্যবৃন্দ 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনটির অভিনয় করেছিলেন যথাবিহিতভাবেই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কেদারের ভূমিকায়, গগনেন্দ্রনাথ বৈকুণ্ঠের ভূমিকায়, অবনীন্দ্রনাথ তিনকড়ির ভূমিকায় এবং নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় অবিনাশের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দান করেছিলেন।[৩] শুধু তাই নয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরবাড়ীর দ্বারা পরিচালিত 'বিচিত্রা' ক্লাব যে নাট্যরজনী নাট্যামোদীদের উপহার দিয়েছিল তাতে 'ডাকঘরে'র সঙ্গে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'ও অভিনীত হয়েছিল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী এবং অসিতকুমার হালদার যথাক্রমে বৈকুণ্ঠ, কেদার, তিনকড়ি, অবিনাশ ও ঈশানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অভিনয়টি কোলকাতার পন্ডিত সমাজে

১. উদ্ধৃতিটি অমৃতলাল বসুর কবিতা 'অমৃত থেকে উদ্ধৃত।
২. রবীন্দ্র স্মৃতি / ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী / পৃঃ ৩৩
৩. রবীন্দ্র জীবনী / প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশেষভাবে প্রশংসিতও হয়েছিল। এই নাটকটির অভিনয়েই রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো পাশ্চাত্য ও মঞ্চসজ্জার অনুকরণ করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জুন স্টার রঙ্গমঞ্চে এটি পুনরায় অভিনীত হয়। এই প্রহসনের কয়েকটি ভূমিকায় এ সময় অভিনয় করেছিলেন কয়েকজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা। বৈকুণ্ঠের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, কেদারের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অবিনাশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রসিদ্ধ হাস্যকৌতুকাভিনেতা জহর গাঙ্গুলী।

রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত খামখেয়ালী সভার ফল আর যাই হোক না কেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সম্ভবত এই সভার কার্যবিবরণীই কবি রবীন্দ্রকে উৎসাহিত করেছে নানান সরস রচনা কর্মে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাদু গদ্য নিবন্ধ 'পঞ্চভূত' এবং হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র রচনা ঐ সময়কার রবীন্দ্রমানসকে উপলব্ধি করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে কৌতুকহাস্য সম্পর্কে তিনি তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন—সভার পাঁচ সভ্যের কথাবার্তার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ হাস্যরস কি—হাস্যরসের উৎস কোথায়—এদেশের হাস্যরস ও পাশ্চাত্য হাস্যরসের মধ্যে সূক্ষ্ম তফাৎটুকু বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। পরিহাসপ্রবণ রবীন্দ্র মনটিকে ছোঁয়া গেছে সেই নিবন্ধগুলিতে—প্রায় সমসাময়িককালে রচনা 'চিরকুমার সভা,' 'গোড়ায় গলদ' এবং 'বৈকুণ্ঠের খাতা'—এই তিনটি কৌতুকনাট্য কোলকাতার নাগরিক সমাজ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের অদ্ভুত খেয়াল ও বিচিত্র জীবনযাত্রা অবলম্বনে প্রসন্ন কৌতুকের চমৎকার চিত্র প্রকাশ করেছে।

প্রহসন কিনা : বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটিকাটি রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রহসন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেও একে নিঃসন্দেহে প্রহসন শ্রেণীর রচনা বলা যায় না। প্রহসনের সংজ্ঞা বিচার প্রসঙ্গে আমরা 'প্রাক্-কথন' অংশে দেখেছি,—

১। প্রহসনে জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির এক হৃদয়গ্রাহী চিত্র আঁকা হয়ে থাকে।

২। প্রহসনের কাহিনী হবে সমকালীন, বহু আলোচ্য, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতির দুর্বলতম এবং কলঙ্কময় স্থানকে নিয়ে গঠিত।

৩। প্রহসন হবে নকসাধর্মী। চরিত্রগুলি type-ধর্মী।

৪। চরিত্রগুলির ভাষা হবে স্বাভাবিক বা আঞ্চলিক।

৫। প্রহসনে নীতিবাদ উচ্চারিত হবে না—অনাবিল হাস্যরসের উৎসারণই এর লক্ষ্য।

৬। প্রহসনের কাঠামো হবে সংক্ষিপ্ত—নাতি বৃহৎ দুই অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটিকাটি রচিত হয়েছে একটি অঙ্কে তিনটি মাত্র দৃশ্যে। সেদিক থেকে একে একাঙ্ক শ্রেণীর নাটকও বলা যায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এর কাহিনী ধারা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখীন হয়েছে। সমকালীন সুগের প্রতিনিধিত্ব না করলেও কলকাত্তাই নাগরিক সমাজের জীবনাচরণের অসঙ্গতিটুকু অত্যন্ত মার্জিতভাবে হাস্যরসের মৃদু মন্দ উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে এই নাটিকার কাহিনী। বলা বাহুল্য, সেই খামখেয়ালী জীবনাচরণ বহু পরিচিতও। ধর্ম নয়, রাজনীতি নয়—বিশেষ সমাজের প্রাত্যহিক জীবনচিত্রই এই নাটিকার উপজীব্য।

নাট্য সমালোচক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—'বৈকুণ্ঠের খাতা' 'গোড়ায় গলদে'র মতো অবিমিশ্র প্রহসন নহে, ইহার মধ্যে প্রথম-হইতে শেষ পর্যন্ত যে একটি প্রচ্ছন্ন

করুণ রসের আবেদন আছে, তাহা এই ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্যখানিকে এক অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে।"[১]

রবীন্দ্র গবেষক অশোক সেন বলেছেন,—

> "হাস্যরস এবং করুণরসের অতি সুন্দর সংমিশ্রণে সে কাহিনীটি কবি গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা এত স্বাভাবিক এবং প্রাণবন্ত যে প্রহসনের অসম্ভবতা ইহার মধ্যে একেবারেই নাই। ব্যঙ্গ, শ্লেষ বা বিদ্রূপের কশাঘাতে যে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয় তাহার মধ্যে কোথায় যেন একটা তিক্ততার ভাব লুকাইয়া থাকে। তাহা হইতে এ নাটিকাটি সম্পূর্ণ মুক্ত। যে অনাবিল হাস্যরস কবি এ নাটকটির মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটা নির্মল আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায়।"[২]

সাধারণ প্রহসনের হাস্যরস বা কৌতুক রসের সঙ্গে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনের ব্যঙ্গ বা কৌতুকের মূলগত কিছু প্রভেদ রয়েছে। এই উভয় ক্ষেত্রেই হাস্যরস অঙ্গীরস—কিন্তু অন্যান্য প্রহসন জাতীয় রচনায় হাস্যরসই যেখানে সব—ভাঁড়ামির যেখানে সুপ্রচুর উপস্থিতি প্রায়শ লক্ষিত হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাট্যে সূক্ষ্ম হাসির ফুলেল বিস্তার। অন্যান্য প্রহসনে ককনি বুলি অথবা প্রচলিত মুদ্রাদোষ থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাষা যেখানে শ্লীলতার সীমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, সেখানে সংযমী কবির মরমী শব্দপ্রয়োগ মৃদুভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে শ্রোতা ও পাঠককে। চরিত্রের মুদ্রাদোষও এখানে উপস্থিত কিন্তু বাক্‌সিদ্ধ কবির বাগ্‌বৈদগ্ধ্য কখনই ছিঁড়ে ফেলতে দেয়নি সংযমের কঠিন বাঁধনকে। ফলত 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র উচ্চকিত হয়, মৃদু—কুলপ্লাবী। উচ্ছ্বলতায় চঞ্চল নয়, অন্তঃশায়ী স্নিগ্ধতায় হৃদয়গ্রাহী। শ্লেষ এখানে প্রতিপদে বিদ্ধ করে না অন্তরের করুণতম স্থানকে। জীবনরসরসিক নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ Humour এর সরস ছোঁয়ার উজ্জীবিত করেছেন 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র চরিত্রগুলিকে। তাই 'গোড়ায় গলদ'-এর দুর্বলতাটুকু বৈকুণ্ঠের খাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এজন্য রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক রঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটিকাগুলির মধ্যে অনেকে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'কে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিতে চান।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনে বৈকুণ্ঠ নামে এক ব্যক্তির জীবনের এক হর্ষ-বিষাদময় দিক অত্যন্ত হাল্‌কা তুলির নিপুণ ছোঁয়ার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ঘটনাগত অসঙ্গতির ফলে হাস্যরসের উদ্ভব প্রহসনের বিষয়, কিন্তু 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় হাস্যরসের উদ্ভব চরিত্রের আচরণগত শৈথিল্যে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে সমসাময়িককালে রচিত 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের কথা। এই প্রবন্ধগ্রন্থে সভাপতি ও তার সভাসদদের শরীরের গঠন এবং পোষাক পরিচ্ছদের বিচিত্রতা, তাদের আচরণগত ভিন্নতা ও শৈথিল্যের মাধ্যমে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বৈকুণ্ঠের খাতা'র চরিত্রগুলির পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা পরে দেখব—এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বৈকুণ্ঠ লেখা ও গ্রন্থ সংগ্রহে পাগল, অবিনাশ গাছপাগল, বিপিন গানপাগল, কেদার ধান্দাপাগল। এইভাবে চরিত্রগুলিকে সহজেই আমরা কৌতুক উদ্রেকের এক একটি উপকরণ হিসেবে পেতে পারি।

বৈকুণ্ঠ স্বরচিত খাতাটি নিয়ে যে কোনো শ্রোতাকে শোনাতে পারলেই কৃত কৃতার্থ। এই কারণেই তিনি বাড়ীর চাকর ঈশানের কাছেও শাসিত হয়েছেন—তবু তিনি সংযত

১. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (২য় খন্ড) / ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য / পৃঃ ১২৮
২ রবীন্দ্র নাট্যপরিক্রমা / অশোক সেন / পৃঃ ১০৫

হতে পারেন নি। সবেমাত্র পরিচিত কেদারকে এবং তার সাগরেদ তিনকড়িকে নিজের লেখা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন ও প্রচলিত সংগীতশাস্ত্রের আদিম উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং নূতন সার্বভৌমিক সংক্ষিপ্ত ও সরল আদর্শপ্রকরণ' গ্রন্থটি পর্যায়ক্রমে শোনাতে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কেদার ধান্দাবাজ লোক। বৈকুণ্ঠকে খুশি করে তাঁর অনুগত ভ্রাতা অবিনাশের সঙ্গে নিজের শালীর বিবাহের ব্যবস্থা পাকা করে নেবার জন্য একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বৈকুণ্ঠের লেখা শুনেছে। অবিনাশ কেদারের চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ কেননা সহপাঠী তারা। সে একবার মাত্র দাদা বৈকুণ্ঠকে কেদার সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেই চুপ করে গেছে। কারণ অবিনাশ বারণ করবে কি, সে নিজেই তো বাগানের নেশায় দিবস রাত্রি মত্ত। কেদারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অবিনাশের সেই বৃক্ষের প্রতি মত্ততাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া। বৈকুণ্ঠকে হাত করে কেদার অল্পায়াসেই অবিনাশকে নিজ ঈপ্সিত লক্ষ্যে চালিত করল। নিজ শালীর সঙ্গে অবিনাশের বিবাহ ব্যবস্থা পাকা হবার পর বিবাহের বয়োত্তীর্ণ অবিনাশকে প্রেম পাগল করে তোলার কায়দায় কেদার অনায়াসেই সফল হল। অবিনাশ প্রেমোপহার প্রেমপত্র ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। প্রেমপত্র রচনা প্রসঙ্গে অবিনাশের শব্দচয়ন প্রচেষ্টায়—'পদতলে' 'করতলে' প্রভৃতির মাধ্যমে—বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। কেদারের চরিত্রে স্বাভাবিকতা ফুটে উঠেছে তার মুদ্রাদোষে। এ পর্যন্ত ' বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটিকার গতি নিঃসন্দেহে প্রহসনের। দুটি দৃশ্যের মাধ্যমে নাট্যকাহিনী এই পর্যন্ত এগিয়েছে 'বৈকুণ্ঠের খাতা প্রহসনের ঘটনাসংস্থান কৌশল প্রসঙ্গত আলোচনা করা যেতে পারে।

সমগ্র নাটিকাটির দৃশ্য সংখ্যা তিন। তিনটি দৃশ্যের ঘটনা স্থানই বৈকুণ্ঠের বাড়ি। তবু তিনটি দৃশ্যের মধ্যে রয়েছে তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—যদিও ঘটনার মূল স্রোতধারা অবিচ্ছিন্ন। প্রথম দৃশ্যে অবিনাশের পাত্রী দেখা সম্পর্কে বৈকুণ্ঠের সম্মতি আদায়। দ্বিতীয় দৃশ্য পাত্রীদেখা ও পাকা কথার পর অবিনাশের চিত্তচাঞ্চল্য। এই দুটি দৃশ্যের মধ্যে রয়েছে পাকা দেখার কাজটুকু—সেটুকু পদান্তরালে নিষ্পন্ন হয়েছে তৃতীয় দৃশ্যে আছে অবিনাশ-মনোরমার বিবাহের পর বৈকুণ্ঠের সংসারের বিপর্যয় ও মিলন।

সুতরাং সোজা কথায় বললে বলতে হয় প্রথম দৃশ্যের পরে অবিনাশের কনে দেখা, দ্বিতীয় দৃশ্যের পরে বিবাহ এবং তৃতীয় দৃশ্যে নাট্য ঘটনার কাঙিক্ষত পরিসমাপ্তি। তাই প্রথম দৃশ্যের নায়ক বৈকুণ্ঠ হলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যের নায়ক অবিনাশ। কারণ বৈকুণ্ঠ যেখানে অসহায়ভাবে প্রতিকূলতার কাছে আত্মসমর্পণ করে গৃহত্যাগের জন্য কৃতসংকল্প সেখানে অবিনাশই বৈকুণ্ঠকে ফিরিয়ে এনে এবং নিজের শ্বশুর বাড়ীর লোকদের জঞ্জালের মতো বিদায় করে দাদার সঙ্গে মিলনকে সুগম ও ত্বরান্বিত করেছে।

ঘটনা সংস্থান : স্ত্রী চরিত্র বর্জিত এই প্রহসনটিতে স্ত্রী চরিত্র প্রত্যক্ষত নেই সত্য কিন্তু পরোক্ষভাবে কয়েকটি চরিত্র এই নাট্যকাহিনীর ঘটনাসংস্থানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যের কাহিনী নিয়ন্ত্রণে নিঃসন্দেহে প্রথম দৃশ্যে উল্লেখিত মনোরমা চরিত্র বিশেষ দায়িত্ব নিয়েছে। মনোরমার অপরূপ সুন্দর মূর্তি দেখে বৃক্ষপাগল অবিনাশ মুহূর্তে তার রূপোন্মাদ ভক্তে পরিণত হয়েছে। ফলত কাহিনীকে একটি বিশেষ লক্ষ্যে পরিচালিত করায় তার ভূমিকা অনুল্লেখ্য নয়। প্রথম দৃশ্যে আর একটি নারী চরিত্রের উপস্থিতির ইঙ্গিত

মেলে সে চরিত্রটি বৈকুণ্ঠের বাল্যবিধবা কন্যা নীরুর সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি, সেবার মহিমান্বিত প্রতীক হিসেবে সে দৃশ্যান্তরালে থেকেও ঈশানের কণ্ঠে উচ্চারিত ভক্তি গদগদ পূজোপহারের যোগ্যা হয়ে উঠেছে। বাল্যবিধবা নীরু প্রথম দৃশ্যেই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে তার ব্রতোপবাসে ও সেবায়। বিপত্নীক পিতা বৈকুণ্ঠ ও অবিবাহিত খুল্লতাত অবিনাশ আর বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য ঈশানকে নিয়ে গড়া তাদের সংসারের চালয়িত্রী যেন নীরুই।

তৃতীয় দৃশ্যের কাহিনীতে রয়েছে কেদার এবং তার পরিচিত লোকদের বৈকুণ্ঠের বাড়ি দখল করার প্রচেষ্টা, বৈকুণ্ঠকে উৎখাত করার প্রচেষ্ট। এই কার্যে যে দুটি চরিত্র বিশেষভাবে কেদারকে সহায়তা করে নাট্যকাহিনীর দ্রুত অগ্রসরণে সহায়তা করেছে সে দুটির একটি পুরুষ চরিত্র—অন্যটি নারী চরিত্র। পুরুষ চরিত্রটি সঙ্গীতজ্ঞ বিপিনের। সে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ—কিন্তু নারী চরিত্রটি কেদারের পিসির। এই বুড়ীর কুটিলপনা এবং ঝগড়াটে রূপ এই প্রহসনে প্রত্যক্ষ করানো হয়নি—কিন্তু বুড়ীর আচরণের কথা পার্শ্ববর্তী চরিত্রের মানস প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত হয়েছে। বুড়ীর কুটিলতার এবং সংসার ভাঙার পারদর্শিতার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনকড়ি জানিয়েছে—"ওকে বিবাহ করে কেদারদার পিসে আর বাঁচতে পারলে না, বিধবা হয়ে ভাইয়ের বাড়ি আসতে ভাইও মরে বাঁচল। এখন কেদারদা নিজের প্রাণ রক্ষে করতে ওকে বৈকুণ্ঠের বাড়িতে 'চালান' দিয়েছে।' কেদারের পিসির আচরণের রূক্ষতা এবং নিষ্ঠুরতা পরিশেষে নাট্যকাহিনীতে এক tragic সুর সংযোজন করে দিয়েছে। আবার অগ্রপশ্চাৎ চিন্তাহীন তার এক কর্মই নাটিকাটিকে হঠাৎ বিষাদান্ত থেকে মিলনান্ত করে দিয়েছে। নীরুর উপর মানসিক নির্যাতন করতে করতে এতদিন বিধবা পিসি হঠাৎ তাকে দৈহিকভাবে পীড়ন করে ফেলে। স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখে অবিনাশ তৎক্ষণাৎ বুড়ী পিসিকে গঙ্গা পারে রেখে এসেছে।

প্রথম দুটি দৃশ্যে নাট্যগতিতে যে শ্লথতা ছিল—রয়ে বলে রসানুভবের বিস্তৃত অবকাশ ছিল, খাবার ঠান্ডা করে দিয়ে আড্ডা ও খাতা পাঠের যে অবকাশ ছিল—তৃতীয় দৃশ্যে সেটা আর নেই। বিপিন ও কেদারের পিসি 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র কাহিনীকে দ্রুতবেগে টেনে নিয়ে গিয়েছে অব্যর্থ tragic খাদের মরণ-গহবরের দিকে—কিন্তু ততোধিক দ্রুততায় নাটকের বিষাদান্ত পরিণতিকে শেষ মুহূর্ত বজ্র বাঁধের মাধ্যমে রোধ করে দেয় অবিনাশ—যে অবিনাশ চরিত্র কিয়ৎক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য দাদার মুখাপেক্ষী ছিল—যে অবিনাশ কিছু পূর্ব পর্যন্ত বৃক্ষ এবং তৎপরে মনোরমাকে নিয়ে নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল—সে দ্রুত বলিষ্ঠ যুবায় পরিণত হল। দ্বিধা গেল তার ঘুচে।

বস্তুত নাটকের শেষদিকে দুটি প্রধান চরিত্র অবিনাশ এবং বৈকুণ্ঠের পরিবর্তন এমন আকস্মিকভাবে দেখানো হয়েছে যে চরিত্রগুলির পরিণতি অবিশ্বাস্য অসম্ভবের স্তরকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। খাতা পাগল বৈকুণ্ঠ হঠাৎই যেন সবাইকে চমকে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি যে ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন সেটা তাঁর প্রকৃত পরিচয় নয়—তিনি 'সাজাহান' নাটকের দিলদারের মতো কপট বিদূষকের ভূমিকা পালন করেছেন মাত্র। তিনি জানেন তাঁর লেখা কিশ্‌শ্যু না। তিনি জানেন কেউই তাঁর লেখার কদর করে না—কেন না সেটা প্রশংসার যোগ্যও নয়। সুতরাং বাড়ি ত্যাগের সময় খাতা অবহেলায় পড়ে রইলো। আর দাদার মুখের রেখায় আপন ভালোমন্দের অনুসন্ধানে রত ছিল যে অবিনাশ-

পত্নী, নামক নবলব্ধ খেলনাটিতে সে অনেক আনন্দ পাবার সাথে সাথে ভুলে যায় দাদা-নামক আদেশকারী, পথপ্রদর্শককে। আবার হঠাৎই সে ফিরে পায় এমন এক মূর্তি, যে মূর্তিতে এ নাটিকায় তাকে একেবারেই বেমানান। যেটা অবিশ্বাস্য অসম্ভবের স্তরেই পড়ে! জনৈক সমালোচক বলেছেন,—

> "...প্রহসন কোনো বিষয় বা ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়া চিত্রিত করিলে বা কোনো বিষয়ের কিয়ৎপরিমাণে অনৈসর্গিক বর্ণনা করিলে দোষ হয় না। প্রত্যুত তাহা না করিলে সকল সময়ে প্রহসনের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না।"[১]

শেষে একথা বলতেই হয় প্রহসনধর্মী রচনায় কাহিনী সংস্থাপনে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ অসাধারণত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এখানেই, যে, মাত্র কয়েকটি চরিত্রকে নিয়ে এবং ততোধিক নিপুণতায় কয়েকটি নারী চরিত্রকে অন্তরালে রেখে এই ঠাসবুনুনি কাহিনীর মালা গেঁথেছেন।

'বৈকুণ্ঠের খাতা'র নামকরণ প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। সিরিয়াস গ্রন্থের মতো সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় নামকরণ সাধারণত ব্যঙ্গকৌতুক জাতীয় রচনার ক্ষেত্রে হয় না। রবীন্দ্রনাথের মতো সংবেদনশীল কবিও তাঁর ব্যঙ্গ কৌতুকগুলির নামকরণ করেছেন প্রচলিত ধারাকে অনুসরণ করেই। কৌতুকরসের প্রধান উপজীব্য বিষয় বা চরিত্রই হল শীর্ষনামের উপজীব্য। 'গোড়ায় গলদ' বা 'শেষ রক্ষা,' 'বশীকরণ' প্রভৃতি নামকরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও সেই পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করেছিলেন—যাঁরা তাঁদের প্রহসনের নাম রেখেছিলেন হাস্যরসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে—'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'জামাই বারিক' প্রভৃতি।

নামকরণ : 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকের মূল বিষয় বৈকুণ্ঠের খাতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। কেদারের মত ঠক চরিত্র বৈকুণ্ঠকে সহজেই কায়দা করতে পারে তাঁর খাতা লেখা ও শোনানোর বাতিকের জন্য। সৎ, সহজ ও সরল এই মানুষটির জীবনে ট্র্যাজেডির ছায়াপাত ঘটে এই দুরতিক্রম্য দুর্বলতার রন্ধ্রপথে। সমগ্র প্রহসনটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার বৈকুণ্ঠের খাতা নিয়েই কথাবার্তা হয়েছে। এই প্রহসনের হাস্যরসের উৎস ওই খাতাতেই। সেই হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তার নামকরণ থেকে। নামকরণের মধ্যেই বৈকুণ্ঠ তাঁর সঙ্গীতশাস্ত্রের গবেষণামূলক আলোচ্য সমস্ত বিষয় সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করাতে চান। এখানে বৈকুণ্ঠ ও কেদারের সংলাপের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাক,—

> "কেদার। আজ্ঞে হাঁ, দেখছি বৈকি। কিন্তু, আমার মতে, ওর নাম কি, বইয়ের নামটা যেন কিছু বড়ো হয়ে পড়েছে।
>
> বৈকুণ্ঠ। বড়ো হোক, কিন্তু বিষয়টা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন ও প্রচলিত সংগীতশাস্ত্রের আদিম উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং নূতন সার্বভৌমিক স্বরলিপির সংক্ষিপ্ত ও সরল আদর্শপ্রকরণ'—এতে আর কোনো কথাটি বাদ গেল না।
>
> কেদার। তা বাদ যায়নি। কিন্তু, ওর নাম কি, মাপ করবেন বৈকুণ্ঠবাবু, কিছু বাদসাদ দিয়েই নাম রাখতে হয়।....." [প্রথম দৃশ্য]

১. প্রবাহ (দামোদর মুখোপাধ্যায়) ১২৮৯, আষাঢ় / পৃঃ ১৬৭।

গ্রন্থ নামের দীর্ঘত্বে আস্থাশীল লেখকদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গের খোঁচা কেদারের উক্তিতে দুর্লক্ষ্য থাকে নি।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনীর অগ্রগতির মূলে রয়েছে বৈকুণ্ঠ-রচিত খাতা বা বই। নিজ শালীর সঙ্গে বৈকুণ্ঠের ভ্রাতা অবিনাশের বিবাহের বন্দোবস্ত করতে এসে কেদার ঠেকে গেছে বৈকুণ্ঠের স্বরচিত বই বা খাতায়। পড়া বা শোনা কোনটাতেই তার আগ্রহ বিশেষ নেই—দায়ে পড়ে তাকে শুনতে হচ্ছে বৈকুণ্ঠের রচনা। সাকরেদ তিনকড়ির কাছে সে দুঃখ করে বলেছে—'কে জানত বুড়ো বই লেখে!' বৈকুণ্ঠ শুধু খাতা পড়ে শোনায় না—পড়তে দিয়েও চলে যায়। তিনকড়ি যাকে বলেছে 'খাতার জাঁতাকল'। কেদার এই খাতার জাঁতাকলে পড়ে ইঁদুরের মতো বিব্রত। কিন্তু অত্যন্ত সুকৌশলে যে সব কিছু বাধাকে অতিক্রম করে গেছে—ঈশ্বরের কাছে খাতা শোনার জন্য ধৈর্য ভিক্ষা করেছে। বৈকুণ্ঠের খাতা শোনার আগ্রহী পাঠকের ছদ্মবেশে সে অনায়াসে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করছে। প্রহসনের দ্বিতীয় দৃশ্যের পুরো অংশ জুড়ে রয়েছে খাতা শোনাবার জন্য বৈকুণ্ঠের আপ্রাণ প্রয়াস, অবিনাশের জেগে ওঠা নববাতিক প্রেমপত্র রচনা ও তা শোনাবার প্রচেষ্টা। কেদার ও তিনকড়ি এই শ্রোতাদ্বয়কে নিয়ে দাদা-ভাই-এর যে টানাটানি তাতে হাস্যরসের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটিকার তৃতীয় দৃশ্যে যে স্বল্পকালস্থায়ী বিষাদের কালো মেঘ দানা বেঁধেছে তাতে বৈকুণ্ঠ যেমন হেনস্তা হয়েছেন—তাঁর খাতার অবস্থা হয়েছে তার চেয়েও বেহাল। সংসারে বৈকুণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে সেও আজ হয়ে উঠেছে আবর্জনার বস্তু। যে ঈশান বৈকুণ্ঠকে বার বার অনুযোগ করেছে তাঁর লেখার বাতিকের জন্য, আজ সবার কাছে পরিত্যক্ত, বন্ধুবান্ধবহীন পথে কর্তা যখন যাত্রা করতে উন্মুখ তখন আকস্মিক ভাবে সে-ই তাঁর লেখাপড়ার প্রতি, তাঁর খাতার প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠেছে। প্রভুভক্ত ঈশানের এই সহানুভূতি বা সম-বেদনানুভব এখানে tragic অনুভাবনকে গাঢ়তর করে তুলেছে। ঈশানের কথার প্রত্যুত্তরে বৈকুণ্ঠ যে কথা বলেছেন তাতে তাঁর হৃদয়ের সর্বগ্রাসী বেদনার রেখাচিত্রটি অস্পষ্ট থাকে নি,—

> "আমার লেখা! সে আবার একটা জিনিস! সবাই হাসে অমি কি তা জানি নে ঈশেন! ও-সব রইল পড়ে। সংসারে লেখায় কারো কোনো দরকার নাই!"
> (তৃতীয় দৃশ্য)

কেদারের সাগরেদ তিনকড়ি হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়েই ফিরে এসেছে বৈকুণ্ঠের কাছে, কেননা 'বৈকুণ্ঠের খাতাখানা না চুকিয়ে' সে যেতে পারছে না কোথাও। বৈকুণ্ঠের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবা মাত্রই সে তাই তাঁকে বলেছে,—'এখন আপনার খাতাপত্র বের করুন।' বৈকুণ্ঠের খাতাখানা চুকিয়ে তবেই তিনকড়ি কোথাও যেতে চায়—খাতাখানা চুকানোর অর্থ আমরা ভিন্ন ভিন্নভাবে নিতে পারি—

১। সাধারণ অর্থে—বৈকুণ্ঠের খাতা আগাগোড়া শোনো।

২। বৈকুণ্ঠের বদান্যতায় অবিনাশের সঙ্গে কেদারের শালী মনোরমার বিবাহ হয়েছে। তিনকড়ি নিশ্চিত জানে কেদারের মতো শঠ লোক এরপর নিশ্চয় বৈকুণ্ঠকে ঠকিয়ে তাঁকে বাড়ী ছাড়া করবে। তাই কেদারের হাত থেকে বৈকুণ্ঠবাবুকে রক্ষার জন্য হাসপাতাল থেকে সে সোজা তাঁর বাড়ি চলে এসেছে। এটাকে সে বৈকুণ্ঠবাবার

কাছে তাঁর বদান্যতার ঋণ বলে মনে করেছিল। সেই ঋণ চুকিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য বলে মনে করেছিল। তাই কেদার এবং তার সঙ্গীসাথীদের বিতাড়নে সে অবিনাশকে উৎসাহিত করেছে। বৈকুণ্ঠ তাঁর হৃত স্থান ফিরে পাওয়ায় সে খুশি হয়েছে।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটিকার নামকরণে নাট্যকার প্রচলিত বিধির অনুসরণ করলেও মোটা দাগের অতিরিক্ত এক সরু দান এঁকে নাটিকাটিতে এক বিশেষ অর্থী-ব্যঞ্জনা এনেছেন, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

নাট্য-সংলাপ : এই নাটিকাটির সংলাপ রচনায় রবীন্দ্রনাথ ভাষার দিকে কোনো বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেন নি। চরিত্রগুলি মার্জিত ও শিষ্ট ভাষায় কথা বলেছে। বৈকুণ্ঠ অবিনাশের মতো শিক্ষিত ব্যক্তি যে ভাষায় কথা বলেছে—তিনকড়ি বা ঈশানও সেই ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সংযমী বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভাষণভঙ্গীকে অতিক্রম করে তিনকড়িকে তার নিজের ভাষা দিতে পারেন নি—ঈশানকেও তিনি দিতে পারেন নি তার সহজ চলিত ভাষার ছাঁদ। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র হাস্যরস রেখা সূক্ষ্ম তুলির টানে পরিণত হয়েছে; এই ভাষাগত ওজস্বিতার জন্য। আবার একথাও ঠিক এই অতি পরিমিত সংযত ভাষা রঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটিকার হাস্যরসকে সর্বসাধারণের উপযোগী হয়ে উঠতে দেয় নি।

কিন্তু তবু 'বৈকুণ্ঠের খাতা' উপভোগ্য হয়ে উঠেছে চরিত্রের বিশেষ মুদ্রাদোষে। সাহিত্য সমালোচক William Congreve বলেছেন,—

> "A singular and unavoidable manner of doing or saying anything, peculiar and natural to one man only, by which his speech and actions are distingushed from those of other men."

এই নাটিকায় বৈকুণ্ঠ, অবিনাশ এবং কেদার চরিত্রের অদ্ভুতত্ব রয়েছে তাদের স্ব স্ব কর্মসাধনে এবং বাক্যবিন্যাসে। তীব্র তীক্ষ্ণ দ্যুতিময় সংলাপের ব্যবহারের মাধ্যমে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনে বহু স্থানে সংযত হাস্যরস পরিবেশন করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি নমুনা নেওয়া যাক,—

প্রথম দৃশ্য ঃ

১। কেদার যখন তিনকড়ির উপর দোষারোপ করে বলে 'তুইই আমার সব প্ল্যান মাটি করবি' তখন তিনকড়ি উত্তর দেয় 'কিছু দরকার হবে না দাদা, তুমি একলাই মাটি করতে পারবে।' তিনকড়ির এই উত্তরে চাপা হাসির ঝিলিক।

২। আবার কেদারের কাছে বৈকুণ্ঠ যখন তিনকড়ির পরিচয় জানতে চান তখন,—
"বৈকুণ্ঠ। এ ছেলেটি কে?
কেদার। দেনার সঙ্গে যেমন সুদ, ওর নাম কি, উনি আমার তেমনি...
তিনকড়ি। উনি যদি হন গোরু আমি হই ওঁর লেজ। যখন চরে খান আমি পিঠের মাছি তাড়াই .....প্রভৃতি'

এই সংলাপের মধ্যে শেকসপীয়রীয় নাট্য-সংলাপের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ম্যানারিজম বা মুদ্রাদোষ নাটকে চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনের সংলাপ

রচনায় রবীন্দ্রনাথ এই সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন দুটি চরিত্র অঙ্কনে। চরিত্র দুটি হল কেদার ও বৈকুণ্ঠ। কেদারের মুদ্রাদোষ অর্থহীন কয়েকটি শব্দ উচ্চারণে সীমাবদ্ধ— 'ওর নাম কি' 'তা, কী বলে,' 'কী বলে ভালো'। এই শব্দগুলির পুনরাবৃত্ত উচ্চারণের মাধ্যমে চরিত্রটির স্বরূপ বোঝানো যেমন সম্ভব হয়েছে তেমনি হাল্‌কা হাস্যরসের মাধ্যমে দর্শককুলকে হাস্যরসে উচ্ছ্বসিত করাও গিয়েছে। সচেতন পাঠকমাত্রই কেদার উচ্চারিত মুদ্রাদোষ-সূচক শব্দ উচ্চারণের সময়কাল লক্ষ্য করে থাকেন। সন্ধিৎসু-পাঠক তখন দেখতে পান আত্মকার্যসিদ্ধিতে তৎপর এবং সুচতুর কেদার বৈকুণ্ঠ বা অবিনাশের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে তখনই—তার মুদ্রাদোষ লক্ষ্য করা গেছে—অন্য সময় নয়। তোষামোদপ্রিয় কেদার চরিত্রের একটা বিশেষ দিক এই শব্দগুলি উচ্চারণের মাধ্যমে উদ্ভাসিত। দু একটি উদাহরণ নিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে—বৈকুণ্ঠের সঙ্গে সংলাপ,—

"কেদার। ইনি আপনার কে হন?
বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, আমার চাকর
কেদার। ওঃ, এর নাম কি, এঁর কথাগুলি পষ্ট পষ্ট।"

অবিনাশের সঙ্গে সংলাপ—

"কেদার। ওর নাম কি, অবিনাশ, ডাকছ?
অবিনাশ। হাঁ, তোমার চুলো প্রস্তুত হয়েছে, এখন ঘর থেকে নাবতে হবে।
কেদার। তোমার ঠাট্টাটা, অবিনাশ, অন্য লোকের ঠাট্টার চেয়ে; ওর নাম কি, কিছু কড়া হয়।"

কিন্তু এই কেদার যখন তিনকড়ির সঙ্গে কথাবার্তা বলে তখন একবারও মুদ্রাদোষ-সূচক শব্দ উচ্চারণ করে না,—

"তিনকড়ি। ...যাই হোক দাদা, তুমি তো এখানে দিব্যি জমিয়ে বসেছ।
কেদার। যা যা, মেলা বকিস নে। এখন এ আমার আত্মীয় বাড়ি তা জানিস?
তিনকড়ি। সমস্তই জানি, আমার অগোচর কিছুই নেই। কিন্তু বুড়ো বৈকুণ্ঠকে দেখছি নে যে! তাকে বুঝি ঠেলে দিয়েছিস? ঐটে তোর দোষ। কাজ ফুরোলেই—
কেদার। তিনকড়ে! ফের! কানমলা খাবি।"

সুতরাং কেদারের সংলাপ তার চরিত্রের যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছে।

কিন্তু বৈকুণ্ঠের স্মৃতিভ্রংশতার বিষয়ে আমাদের কেমন সন্দেহ জাগে। বিপিনবাবুর নাম উচ্চারণের পূর্বে বৈকুণ্ঠের নাম ভুলে যাবার কোনো চারিত্রিক দুর্বলতা আমাদের নজরে পড়ে না। কিন্তু হঠাৎ যখন তিনি বার বার বিপিনবাবুকে বেণীবাবু বলে ডাকতে থাকেন এবং বিপিনবাবুও সেই 'বেণীবাবু' ডাককে সংশোধন করে দিয়ে বলতে থাকে—বেণীবাবু, নয় বিপিনবাবু; তখন সব ক্ষেত্রে আর হাস্যরস উদ্রিক্ত হয় না বরং কিছুটা বিরক্তির উদ্রেক করে। একে কিছুটা আরোপিত বলেও মনে হয়।

বৈকুণ্ঠ : 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনের কেন্দ্রীয় চরিত্র বৈকুণ্ঠ। কেননা তিনিই এই নাটকের কেন্দ্রীয় বিন্দু—তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে অবিনাশ, কেদার, তিনকড়ি, ঈশান প্রভৃতি চরিত্রগুলি। দুঃখসুখের দোলায় তাঁর হৃদয় যখন দোলায়িত তখনই এই নাটিকায় প্রাণস্পন্দন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উজ্জ্বল হাসিতে নাট্যকার যে অনাবিল হাস্যরসধারার উৎস মুখ

খুলে দিয়েছেন রুচিবান দর্শক হৃদয় তা আকণ্ঠ পান করে পরিতৃপ্ত হয়। আমরা সেই চরিত্রটিকেই সাধারণত কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দিই—সমগ্র কাহিনীর মর্মমূলে থেকে যে চরিত্র কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, ট্র্যাজেড়ি নাটক হলে বলি doing suffering-এর ভাগী হয় যে সেই নায়ক। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ট্র্যাজেডি শ্রেণীর নাটক না হলেও সমগ্র কাহিনীর doing এবং suffering-এর ফলভোগী বৈকুণ্ঠ চরিত্র।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বৈকুণ্ঠ চরিত্রের বাস্তবতার দিকে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন,—

> "বৈকুণ্ঠের খাতা' কাহিনীটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজ পারিবারিক জীবনের কিছু ছায়াপাত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠের চরিত্রটি বিশেষভাবেই তাঁহার কোনো নিকট আত্মীয়কে সম্মুখে রাখিয়া রচিত"[১]

শিলাইদহ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতেও এ বক্তব্যের সমর্থন মিলবে।[২] সুতরাং বিশেষ অভিজ্ঞতার আলোকে বৈকুণ্ঠ চরিত্র আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। নাট্যকাহিনীর শুরু থেকেই দেখা যায় বৈকুণ্ঠই এই নাটকের লক্ষ্যস্থল। সংসার অনভিজ্ঞ, নিরীহ, বিপত্নীক ভদ্রলোক বৈকুণ্ঠ। জ্ঞানচর্চায় নিয়ত রত—এই জ্ঞানচর্চা তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত বাতিকের জন্ম দিয়েছে—সেটি এই, যে কোনো লোককে কাছে পেলেই নিজের লেখা খাতা তাকে পড়তে দিয়ে অথবা পড়ে শুনিয়ে বৈকুণ্ঠ পরম তৃপ্তি পান। কিন্তু তাঁর লেখা পড়ার কিংবা শোনার জন্য বিশেষ শ্রোতা তিনি পান না। বৈকুণ্ঠের চরিত্রে এই বিশেষ দুর্বলতার সন্নিবেশ ঘটিয়ে নাট্যকার কবি সাহিত্যিকদের এক চিরকালীন সাধারণ (common) দুর্বলতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলও হতে পারে।

সংসার-অনভিজ্ঞ বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠকে ঠকাবার লোকের অভাব সংসারে নেই। তাঁর বাতিক শুধু লেখা এবং লেখা শোনানো নয়—শখ তাঁর পুরাণো গ্রন্থসংগ্রহের প্রতিও। সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক অতি প্রাচীন নষ্ট হয়ে যাওয়া পুঁথি 'স্বরসূত্রসার' গ্রন্থটি তিনি প্রচুর দাম দিয়ে কেনেন—কিন্তু পড়বার জন্য তাঁর এই গ্রন্থ সংগ্রহ নয়—প্রাচীন জিনিসের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জন্যই এই গ্রন্থ ক্রয় ও সংগ্রহ। অবিনাশ যখন এই পুরাণো গ্রন্থটির শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে বলে,—

> "অবিনাশ। ওতে আর আছে কী দাদা! নাড়তে-চাড়তে গেলে যে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে।
>
> বৈকুণ্ঠ। সেই তো ওর দাম। ও ধুলো কি আজকের ধুলো! ও ধুলো লাখ টাকা দিয়ে মাথায় রাখতে হয়।"

লাখ টাকা নয়, মাত্র তিনশো টাকায় সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রন্থটি কিনেছেন বৈকুণ্ঠ—গ্রন্থের ধুলো রাখার জন্য—পড়ার জন্য নয়। প্রথম সাক্ষাতেই বৈকুণ্ঠের বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ সংগ্রহ-বাতিক সম্পর্কে ধারণা হয়ে যায় ঠক কেদারের। চতুর কেদার চীনাম্যানের জুতোর দোকানের

১. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইহিহাস (২য় খন্ড) / ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য / পৃঃ ১২৯

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড) / ড. সুকুমার সেন / পৃঃ ২২৯

পুরাণো হিসেবের খাতা চেয়ে এনে 'চীনেদের সংগীত পুস্তক' বলে বিক্রি করেছে নিঃসন্দিগ্ধ, সরলমনা বৈকুণ্ঠের কাছে এবং পঁয়ত্রিশ টাকা পকেটস্থ করেছে নির্বিকারচিত্তে।

দ্বিতীয় বাতিকের সূত্রে নয়—প্রথম বাতিক অর্থাৎ নিজের খাতা পড়ে শোনেনোর দুর্বলতার রন্ধ্রপথেই বৈকুণ্ঠের হাসোচ্ছ্বল ঘরে শনিরূপী কেদারের প্রবেশ। নিজের লেখা সম্পর্কে বৈকুণ্ঠের দুর্বলতা অপরিসীম—কিন্তু সে লেখার প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত দ্বৈতবোধ কাজ করেছে। নিজের লেখা সম্বন্ধে অন্যের প্রশংসাকে একদিকে তাই যেমন তিনি আনন্দিত অন্তঃকরণে গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে সন্দিগ্ধও হয়েছেন—আদৌ সে লেখার কোনো গুরুত্ব আছে কিনা—এই ভেবে। তাই বৈকুণ্ঠের খাতা পড়ে তার লেখার কপট প্রশংসা করে কেদার যখন তার স্বভাবসিদ্ধ চাটু-ভঙ্গিমায় বলে ওঠে,—

'লেখা যা' হয়েছে সে পড়তে পড়তে ওর নাম কী—শরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠে।" তখন বৈকুণ্ঠের চিত্তে এক দ্বৈধ সত্তার যুগপৎ আবির্ভাব ঘটে বা বৃদ্ধের হৃদয়ের সরলতাকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলে। ড. ভট্টাচার্য কেদারের উক্তির উত্তরে বৈকুণ্ঠের এই সময়কার উক্তিকে বলেছেন,—"ইহা যে উপহাস মাত্র বৈকুণ্ঠের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না, তখনই অভিমানাহত হইয়া তিনি বলিলেন, হা হা হা হা। রোমাঞ্চ! আপনি ঠাট্টা করছেন...বুড়ো মানুষকে পরিহাস করবেন না, কেদারবাবু।" খেয়ালী বৃদ্ধের এই নিদারুণ অভিমানাহত কণ্ঠস্বর যেন চকিতে দর্শকের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করিয়া যায়।"[১]

কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠের অভিমান এই উক্তিতে প্রকাশিত নয়—বরং কিছুটা আত্মাভিমান প্রকাশিত। আপন লেখার সম্বন্ধে এক উচ্চ মনোভাব পোষণ করে থাকেন প্রতিটি লেখকই—বৈকুণ্ঠও তার ব্যতিক্রম নন। কেদার যখন বৈকুণ্ঠের রচনার প্রশংসা করল, তখন বিগলিত বৈকুণ্ঠের হৃদয় এভাবে ছাড়া আর কীরূপেই বা নিজের খুশীকে প্রকাশ করতে পারে। ড. ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণ অনুসারে যদি ধরে নিই কেদারের উক্তি বৈকুণ্ঠকে অভিমানাহত করেছে, তাহলে তিনি তখনই আবার তাকে নিজের লেখা শোনাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতেন কি? সেকথা যাক, "স্নেহশীল, উদারচিত্ত ও একান্ত ভদ্র চরিত্র বৈকুণ্ঠের বাতিক দেখাইয়া নাট্যকার হাসিলেও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ"[২] ছিল। রবীন্দ্র সমালোচক অশোক সেন তাই বলেছেন,—"বৈকুণ্ঠ-প্রকৃতির লোক মুখে বলিলেও কখনই বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহাদের লিখিবার ক্ষমতা নাই। ইহাই যদি হইত তবে তাঁহারা লেখা বন্ধ করিতেন এবং পুনরায় অন্যকে লেখা শুনাইবার চেষ্টা করিতেন না। বৈকুণ্ঠ জাতীয় লোকেদের চারিত্রিক অসঙ্গতির দিকটা অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত বৈকুণ্ঠ চরিত্রের ভিতর দিয়া কবি বিশ্লেষণ করিয়াছেন।"[৩]

১. আবেগ সর্বস্ব চরিত্রের এ ধরনের দুর্বলতার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও বহু জায়গায় এঁকেছেন। এক্ষেত্রে বিশেষ করে মনে পড়ে বৈকুণ্ঠের খাতার সমসাময়িককালে রচিত 'মালিনী' নাটিকাটির কথা। সেখানে মালিনীর বিরুদ্ধপক্ষীয় সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেও মালিনীর কাছে এসে তার প্রেমে একেবারে যেন দ্রবীভূত হয়ে যায়। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অবিনাশ চরিত্রের আবেগ তাকেও মনোরমার প্রেমে পাগল করে দিয়েছে।

২. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য / পৃঃ ১৩১

৩. বঙ্গসাহিত্য হাস্যরসের ধারা / ড. অজিতকুমার ঘোষ / পৃঃ ৩৮৮

সংসারের যাবতীয় কর্তব্যকর্মের প্রতি উদাসীন নিরীহ ভদ্রলোক বৈকুণ্ঠ-ই তাঁর সংসারের ভাগ্যবিধাতা। ভ্রাতা অবিনাশ দাদা-অন্ত প্রাণ। মাসে ছয় শত টাকা রোজগার করে সমূহ টাকা সে তুলে দেয় দাদার হাতে। দৃশ্যান্তরালে থেকে বৈকুণ্ঠের নির্দেশে অথবা তাঁরই জন্য সংসারকে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যায় তাঁর বিধবা কন্যা নীরু। ঈশানের উক্তি মারফৎ মাঝে মধ্যে আমরা তার কর্মনিষ্ঠার, সেবাপরায়ণতা ও সহনশীলতার কথাও জানতে পারি। বৈকুণ্ঠের সংসার খেয়ালের সংসার হলেও সে খেয়াল বৈকুণ্ঠের ইচ্ছা-নির্ভর। ভ্রাতা অবিনাশ প্রচুর অর্থ রোজগার করলেও তার বাগান বাতিকের পশ্চাতে রয়েছে যেন বৈকুণ্ঠের অদৃশ্য সম্মতি। নিতান্ত স্নেহ পরবশ হয়েই যেন ভ্রাতার এই ব্যয়বহুল-বাতিককে লালন করছেন বৈকুণ্ঠ। কিন্তু তলে তলে ভায়ের বয়েস যে চল্লিশ হয়ে গেছে সে খেয়াল তাঁর হয় নি। যখনই সে কথা শুনলেন আবেগপ্রবণ মানুষের লক্ষণ যা—তৎক্ষণাৎ তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়া—বৈকুণ্ঠও তাই করলেন, কেদারের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে তার শালী মনোরমার সঙ্গে অবিনাশের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন। চাকর ঈশানও প্রভু বৈকুণ্ঠ-চালিত। কন্যা নীরুও তাই। তাই বৈকুণ্ঠই এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকের লক্ষ্য চতুর কেদারের নিখুঁত কৌশলে বৈকুণ্ঠের অনুমতি-সাপেক্ষে অবিনাশ-মনোরমার বিবাহ। সুতরাং বৈকুণ্ঠের অঙ্গুলি হেলনই এখানে মুখ্য। কিন্তু অতঃপর! মনে হয় যেন বৈকুণ্ঠ কাহিনীর বাইরে ছিটকে পড়ছেন দ্বিতীয় দৃশ্যের পর—কেদার যেন কাহিনীর নিয়ন্ত্রণ রশি হাতে তুলে নিয়েছে। বিপিন এসেছে বৈকুণ্ঠের ঘরে। বৈকুণ্ঠের সংগৃহীত সাধের বইগুলিকে আলমারী থেকে বের করে বিপিন গানের সঙ্গে সঙ্গেতের জন্য বই বাজিয়েছে। এক নিদারুণ অন্তর্বুন্দ্ব বেদনায় বৈকুণ্ঠ নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তাঁর এই বেদনাবোধের মূলে একদিকে যেমন ছিল কেদার, বিপিন এবং অবিনাশের শ্বশুর বাড়ির লোকেদের তাঁর উপর অত্যাচার, অন্যদিকে এই অত্যাচার সত্ত্বেও ছোট ভাই অবিনাশের নির্বাক ভূমিকা। সংসারের কঠিন হৃদয়হীনতায় সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ আবেগপ্রবণ বৃদ্ধি সংসার থেকে সরে যেতে চেয়েছেন। নীরুর প্রতি তাঁর ভালোবাসা অটুট। অবিনাশের প্রতিও তাঁর বাৎসল্যের প্রগাঢ়তা তখনও কমে যায় নি। কিন্তু যে অবিনাশকে ভালোবেসে তাঁর এই যন্ত্রণা—সেও কি তাঁকে তেমনি ভালোবাসে? এই চিন্তা এক সুগভীর নিষ্ঠুর ব্যথায় তাঁর হৃদয়কে বার বার দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। সংশয়ে মন হয়েছে ক্ষতবিক্ষত, তবু বহুকালের পুরানো ভৃত্য ঈশানের কাছে একবার মাত্র তিনি জানতে চেয়েছেন,—

> "ছোটোর উপর বড়োর যে রকম স্নেহ বড়োর উপর ছোটোর সে রকম হয় না, না ঈশেন?"

তাঁর ভাবি জানতে ইচ্ছে হয়েছে কয়েকটি অতীব প্রয়োজনীয় কথা,—

১। বৈকুণ্ঠ চলে গেলে অবিনাশ বিশেষ কষ্ট পাবে কিনা। ঈশান প্রত্যুত্তরে জানিয়েছে 'না পাবারই সম্ভব'।

২। যে নীরুকে অবিনাশ আগে এত ভালোবাসত তার জন্য অবিনাশের মন কাঁদবে কিনা! ঈশান রূঢ় ভাবে জানায়—অবিনাশের মন কাঁদবে না—কারণ সে না সাহস দিলে মনোরমার বুড়ী পিসি নীরুর উপর অত্যাচার করার সাহস পেত না।

বৈকুণ্ঠের সাধের স্বপ্ন যেন তিল তিল করে ভেঙে পড়ছে—প্রভু-ভৃত্যের এই কথোপথনে। তীব্র অন্তর্জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে বৈকুণ্ঠ চীৎকার করে উঠেছেন,—

"তুই একটা মিষ্টি কথা বানিয়েও বলতে পারিস নে? এতটুকু বেলা থেকে আমি তাকে মানুষ করলুম, একদিনের জন্যেও চোখের আড়াল করি নি, অমি চলে গেলে তার কষ্ট হবে না—এমন কথা তুই মুখে আনিস হারামজাদা বেটা। সে জেনেশুনে আমার নীরুকে কষ্ট দিয়েছে! লক্ষ্মীছাড়া পাজি, তোর কথা শুনলে বুক ফেটে যায়।"

Suffering-এর এরচেয়ে অসাধারণ উক্তি আর কি হতে পারত! স্নেহকাতর ভগ্নপ্রাণ হৃদয়ের অসহ যন্ত্রণার এক অপরূপ চিত্রায়ন ঘটেছে এখানে। সংসারের কাছে এই নিদারুণ কষ্ট উপহার পেয়ে নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় গ্রন্থগুলি এবং তদপেক্ষা প্রিয় নিজের লেখা খাতার প্রতি তাঁর তীব্র অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। স্নেহবঞ্চিত বৃদ্ধ-বালক বৈকুণ্ঠের হৃদয়ের বালোচিত সারল্য আমাদের মুগ্ধ করে। নিজের খাতার প্রতি বিতৃষ্ণায় খাতাকে ফেলে রেখে যাওয়া নয়, নিজের লেখার দুর্বলতার প্রতি সচেতনতাবোধ থেকেও খাতা না নিয়ে যেতে চাওয়া নয়, ভ্রাতার উপর তীব্র অভিমানে নিজেকে কষ্ট দেবার জন্য বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠের এ যেন অভিনব কৌশল। কন্যা নীরু বৃদ্ধের এই মর্মবেদনা বুঝতে পেরেছে বলেই পিতাকে অনুরোধ করছে খাতাটিও সঙ্গে নেবার জন্য—অভিমান অন্তত এক জায়গায় সান্ত্বনা বা আশ্রয় পেতেই বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ ভৃত্য ঈশানকে বলেনে,—

"ভেবেছিলুম, খাতাপত্রগুলো আর সঙ্গে নেব না। শুনে মা নীরু কাঁদতে লাগল। ভাবলে, বুড়ো বয়সের খেলাগুলো বাবা কোথায় ফেলে যাচ্ছে। এগুলো নে ঈশেন।"

বৈকুণ্ঠ চরিত্র সব চরিত্রের গুরুত্বকে ছাড়িয়ে গিয়েছে আপন মহত্ত্বে। স্নেহপ্রবণ, পরসেবাপরায়ণ, বাতিকগ্রস্ত এই বৃদ্ধটি যাদের দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং প্রায় বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে চলেছিলেন—তাদের জব্দ করার সুযোগ পেয়েও শাস্তি না দিয়ে অনায়াসে মার্জনা করেছেন। শুধু কি তাই! শঠ এবং প্রবঞ্চকচূড়ামণি কেদারকে তাঁর গৃহ থেকে একেবারে চলে যাবার পূর্বে মিষ্টমুখ করে যাবার জন্য সরল মনে অনুরোধও করেছেন। অপরাধী প্রবঞ্চকের প্রতি এই মমত্ববোধ বৈকুণ্ঠের চরিত্রকে নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় চরিত্রের আসনে সুপ্রতিষ্ঠ করেছে। 'স্বপ্ন ও সত্যের মিশ্র উপাদানে গঠিত বৈকুণ্ঠের এই চরিত্রটি রবীন্দ্র প্রতিভার একটি সার্থক সৃষ্টি'।

অবিনাশ : অবিনাশ বৈকুণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দাদা-অন্ত প্রাণ অবিনাশ নিজ আয়ের সমস্ত অর্থ দাদার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত। নিজের হাত খরচের টাকাটিও সে দাদার কাছে চেয়ে নেয়। সময় সময় মনে হয়েছে বৈকুণ্ঠরূপী জাহাজের পশ্চাতে অবিনাশ যেন গাধা বোট। তার বৃক্ষ-বাতিকও বৈকুণ্ঠের অনুমোদন সাপেক্ষ। কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনের মূল ভাব প্রকাশে কাহিনী বয়সের প্রয়োজনে এবং পরিণতির কাঙিক্ষত রূপটিতে ঘটনাধারাকে চালিত করতে অবিনাশের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

চল্লিশ বৎসর বয়সী অবিবাহিত যুবক অবিনাশের সখ ভালো বাগান করার। বৈকুণ্ঠ এ নিয়ে তাকে অনুযোগও করেছেন,—

'নিলেম থেকে বিলিতি গাছ কিনবি বুঝি? ওই তোর এক গাছ পোঁতা বাতিক হয়েছে। দিনরাত যত রাজ্যের উড়ে মালী নিয়ে কারবার!'

বৈকুণ্ঠ যেমন পুরাণো বই এর নামে উন্মাদ—অবিনাশ তেমনি উপযুক্ত দাদার উপযুক্ত ভাই—বিলিতি গাছের নামে উন্মাদ। আবেগ প্রাবল্য দাদা এবং ভাইয়ের চারিত্রিক ভিত্তি।

আবেগের আতিশয্যই বাগানের প্রতি তাকে মনস্ক রেখেছে। কিন্তু বাগান এবং অবিনাশের মাঝখানে যখন 'বিলিতি বেগুনের মতো টক্‌টক্‌ করে ওঠা' গাল নিয়ে কেদারের শালী মনোরমা এসে হাজির হয় তৎক্ষণাৎ বাতিক সবেগে সেই দিকে প্রবাহিত হয়। তখন মানিকতলা থেকে অভিজ্ঞ উড়ে মালী গাছের সম্পর্কে নানান প্রয়োজনীয় কথা জানাতে এলে অবিনাশের তার সঙ্গে দেখা করার সময় হয় না। মনোরমার প্রতি অতিরিক্ত মোহ তাকে তার দাদার প্রতি লক্ষ্য রাখারও ফুরসুৎ দেয় না।[1] প্রৌঢ় বয়সে যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে তার মত্ততাই কেদারকে সুযোগ করে দিয়েছে বৈকুণ্ঠের উপর অত্যাচার করার। ঈশান ভৃত্যও অবিনাশের এই বৌ-কে নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার কথা কিছুটা অনুযোগের সুরে বলেছে বৈকুণ্ঠকে,—"সময় কালে বিয়ে হলে এতটা বাড়াবাড়ি হয় না।"

মনোরমাকে নিয়ে অবিনাশের বাড়াবাড়ির এক হাস্যরসোচ্ছল চিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন। কেদারের কাছে ভাবী পত্নীর লজ্জার কথা শুনে পুলকিতভাবে মোহমুগ্ধ অবিনাশ তাকে এক প্রণয়োপহার পাঠাতে চেয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপহারের সঙ্গে পাঠানো ছোট্ট চিরকুটের রচনায় মনোযোগী গবেষণামূলক সংলাপে—'করতলে' অথবা 'পদতলে' কিংবা 'পূজোপহার' অথবা 'প্রণয়োপহার'—প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগসমস্যার সমাধান প্রচেষ্টায় অবিনাশকে বৈকুণ্ঠের যোগ্য ভ্রাতারূপে লক্ষ্য করা গেছে।

অবিনাশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি আনুগত্যে যেন লক্ষ্মণের মতো অবিচল। দাদা বৈকুণ্ঠের ধমক খেয়ে তাই সে চুপ করে থাকে এবং ক্ষুব্ধ দাদাকে শান্ত করার জন্য তাঁর মনোমত কাজ করতে—শ্যালিকাকে দেখতে যাওয়া—রাজী হয়। বৈকুণ্ঠের মতোই অবিনাশের চরিত্রের বড় গুণ সারল্য। আবেগাতিরিক্ততা বৈকুণ্ঠকে যেমন সংসারের প্রতি নিস্পৃহ করে তোলে, অবিনাশকে তেমনি কখনও সখনও ক্রুদ্ধ করে তুলেছে।

কেদারের সহপাঠী হলেও অবিনাশ প্রথম থেকেই কেদারকে অপছন্দ করত তার ঠক প্রবৃত্তির জন্য। পাছে সে-তার সরলচিত্ত দাদাকে ঠকায় এই আশঙ্কায় কেদারকে তীব্রভাবে তিরস্কার করতে গিয়ে সে নিজেই ঠকে গিয়েছে। চতুর কেদারের চালে ভুলে বৈকুণ্ঠ অবিনাশকে বাধ্য করিয়েছে মনোরমাকে দেখতে যেতে।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনের পরিণতিতে অবিনাশ চরিত্রের আচরণে যে বাস্তববুদ্ধির প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে তার অন্তরালে রয়েছে দুটি বিশেষ কারণ,—

১। অবিনাশ জানতে পেরেছে মনোরমার সঙ্গে কেদারের ও কেদারের পিসির প্রকৃত সম্পর্ক।

২। ভাইঝি নীরুকে সে ভালোবাসত নিজের মেয়ের মতো। কিন্তু সে স্বচক্ষে দেখেছে 'সে নীরুর গায়ে হাত তুলেছে।

সুতরাং একরোখা আবেগপ্রবণ অবিনাশ তৎক্ষণাৎ তার শ্বশুর বাড়ীর লোকজনদের প্রতি তার কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে। কেদারের বুড়ী পিসিকে গঙ্গা পার করে দিয়ে এসেই শোনে আর এক খবর। বিপিনবাবু নাকি বৈকুণ্ঠকে 'লুটিস দিয়েছেন' ঘর থেকে বইপত্র সরিয়ে নিতে এবং নিজেকেও সরিয়ে নেবার জন্য। ক্রোধ অবিনাশকে এক মহৎ উচ্চতায়

১. রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা / অশোক সেন / পৃঃ ১০৬

নিয়ে যায় এখানে। নিরীহ ভালোমানুষ দাদার উপর তার শ্বশুর বাড়ীর মানুষদের অত্যাচারের চিত্রটি ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার কাছে। প্রৌঢ় বয়সে নূতন বৌকে নিয়ে আবেগের স্বর্গে বাস করছিল যে সেই স্বপ্ন স্বর্গ থেকে তার দ্রুত অবনমন ঘটে। জেগে ওঠে সে। কেদারের চক্রান্তে দাদার অসহনীয় কষ্ট স্বীকার তাকে তার শ্বশুর বাড়ীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে। সে রোষে ফেটে পড়ে। বিপিনবাবুকে দূর দূর করে তাড়া করে—বৈকুণ্ঠের কোনো নিষেধকেই সে গ্রাহ্য করে না। বৈকুণ্ঠের বাধা সত্ত্বেও সে রূঢ় ভাবে কেদারকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছে। অবিনাশের আবেগপ্রবণ বাতিকগ্রস্ত রূপের ছবি এই নাটকে আগাগোড়া রয়েছে কিন্তু তার স্নেহপরায়ণ চরিত্রের রূপটির মাধুর্য প্রথম দুই দৃশ্যের সংলাপে প্রকাশিত নয়—নীরুর প্রতি অত্যাচারের পর তার আচরণে তা সুন্দরভাবে প্রকাশিত। কেন্দ্রীয় চরিত্র বৈকুণ্ঠ যখন শঠ কেদারের কূটকৌশলে স্বস্থানচ্যুত, ঠিক তক্ষুণি রুদ্ধ আক্রোশে জেগে উঠে অবিনাশ নাটকের গতিকে শেষ পর্যন্ত একমুখীন ও রমণীয় করে তুলেছে।

কেদার : 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনে কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপ যদি আমরা বৈকুণ্ঠর চরিত্রকে বেছে নিই, তবে তার প্রতিনায়ক হিসেবে কেদার চরিত্রকে গ্রহণ করতে আমাদের দ্বিধা থাকে না। কারণ দিন এবং রাত মিলিয়ে যেমন পৃথিবীর এক পূর্ণ আবর্তন, তেমনি বৈকুণ্ঠ এবং কেদার উভয়ে মিলে মনুষ্য চরিত্রের পূর্ণতা। বৈকুণ্ঠ সহজ, সরল, অমায়িক, সৎ পরোপকারী সদাশয় ব্যক্তি; কেদার ক্রুর, জটিল প্রকৃতির, শঠ, বাক্‌পটু চতুর ব্যক্তি। বৈকুণ্ঠ যদি হয় দিন, তবে কেদার হল রাত্রি। বস্তুতপক্ষে বৈকুণ্ঠ চরিত্র এতখানি হৃদয়গ্রাহী হতে পেরেছে প্রতিনায়ক কেদারের কূট ক্রিয়াপদ্ধতির জন্যই। এই নাটকের ঘটনা পরিকল্পনায় এবং রসাবেদনে কেদারের ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য।

কেদার অবিনাশের সঙ্গে কলেজে পড়েছে। ভদ্রলোকের ঘরে জন্ম তার। স্ত্রী বিবাহযোগ্য সুন্দরী শ্যালিকা, দূর সম্পর্কের পিসিকে নিয়ে দারিদ্র্যক্লিষ্ট বিড়ম্বিত জীবন তার। দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত হতে হতে তার মনের সৎ-প্রবৃত্তিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে বলেই সে লোক ঠকানোর অসৎপথে পা বাড়িয়েছে। সম্বল তার কলেজে পড়া বিদ্যায় সংগৃহীত অসাধারণ বাক্‌পটুত্ব। সরল প্রাণ, উদার হৃদয় বৈকুণ্ঠকে তাঁর পুরাণো বই সংগ্রহের নেশার সুযোগ নিয়ে, চীনেম্যানের জুতোর দোকানের পুরাণো হিসেবের খাতাকে, সে চীনেম্যানদের সঙ্গীত শাস্ত্রের বই বলে অনায়াসে বিক্রি করেছে। শুধু ঠকবাজীতে নয়—জালিয়াতিতেও সে যে পরম পটু তার প্রমাণও সে রেখেছে—বৈকুণ্ঠের সংগৃহীত 'স্বরসূত্রসার' পুঁথিটি সে নিজে সরিয়ে নিয়ে কিছু পরেই আবার সে সেটি বৈকুণ্ঠকে ফিরিয়ে দিয়েছে পুনরায় কিছু টাকা রোজগার করার উদ্দেশ্যে। এখানে অনায়াসে সে এই গ্রন্থ সরানোর জন্য অবিনাশকে দায়ী করেছে কেবল নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য।

বৈকুণ্ঠের কাছে কেদারের আগমন, তাঁর স্বরচিত খাতা শ্রবণ প্রভৃতির পশ্চাতে এক গূঢ় কারণ নিহিত ছিল, সেটি হল অবিনাশের সঙ্গে নিজ শ্যালিকা মনোরমার বিবাহদান এবং বৈকুণ্ঠের গৃহে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিজের দৈনন্দিন অভাব মোচন। প্রথম দৃশ্যেই কেদারের স্বগতোক্তিতে এ বক্তব্য সমর্থিত হয়েছে,—"শালীটিকে পার করা পর্যন্ত হে ভগবান, আমাকে ধৈর্য দাও—তার পরে আমারও একদিন আসবে।" তাই বৈকুণ্ঠের উদারতায় তার শ্যালিকা দায় মিটে গেলে সে বৈকুণ্ঠকে ঘরছাড়া করতে প্রাণপণ প্রচেষ্টা করেছে।

বিবেকবর্জিত কেদার চরিত্রে স্বকার্যসিদ্ধিই ছিল মূল লক্ষ্য। এ ব্যাপারে কোনো লজ্জাশরমের বোধ তার ছিল না। সহপাঠী অবিনাশ তাকে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ভর্ৎসনা করলেও সে তা গায়ে মাখে না। অনায়াসে নিতান্ত সহজভঙ্গীতে সমস্ত অপমানকে থ্যুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে সে তাদের গৃহে খাদ্য গ্রহণ করে। কূটকৌশলী কেদার সার্বিকভাবে জীবনযুদ্ধে ব্যর্থ হলেও এক্ষেত্রে তার পরিকল্পিত ফাঁদে অনায়াসে সহপাঠী অবিনাশকে ধরতে সফল হয়েছে। অবিনাশ তারই সঙ্গে তার শ্যালিকাকে প্রণয়োপহার পাঠাবার পত্ররচনা বিষয়ে আলোচনা করে।

একদিকে কেদার চরিত্রের লোভ, স্বার্থপরতা ও শঠতার চিত্র যেমন এখানে আঁকা হয়েছে, তেমনি দারিদ্র্য সত্ত্বেও বৃদ্ধ পিসির ভার গ্রহণ করা, শ্যালিকা দায় বহন করার মানসিকতার মধ্যে তার চরিত্রের মননীয় দিকটিও উদঘাটিত। পরিশেষে বৈকুণ্ঠকে সংসারচ্যুত করতে গিয়ে অবিনাশের হাতে ধরা পড়ে তার স্থান যখন 'করতলের' পরিবর্তে 'পদতলে' স্থিরীকৃত হল তখন কেদার চরিত্রের পরিণামী ট্র্যাজেডির দিকটি অনাবৃত থাকে নি। তিনকড়ি জানায় বারবার দেখে আসছি কেদারদা, শেষ কালটা তুমি ধরা পড়ই।' কেদার চরিত্রের মতো ব্যক্তিও যে নাট্যকারের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় নি—তার পরিণাম চিত্রণে একথা স্পষ্ট।

তিনকড়ি : তিনকড়ি চরিত্র নাট্যকারের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে সর্বাধিক। কেদারের কপটতা তার শঠতাকে বার বার সকলের কাছে অনাবৃত করে দিয়ে সে যেন তার বিবেকের কাজ করেছে। প্রতি মুহূর্তে সে কেদারকে সাবধান করে গেছে। কেদার যখন তার কৌশলী কূট আবর্তে বৈকুণ্ঠ অথবা অবিনাশকে জড়িয়ে ফেলতে গেছে তখনই সেখানে হাজির হয়েছে তিনকড়ি। ধূর্ত শঠ কেদারের সঙ্গী সে। শঠতা জালিয়াতি তারও কাজ—কিন্তু কেদারের মতো শঠতা করতে গিয়ে মনুষ্যত্ব বিবর্জিত হয়ে যায় নি সে। সে কেদারের অসংযত ধূর্ততাকে অনেকটা সংযমী বাঁধনে বেঁধেছে।

তিনকড়ি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। আনপড় এই মানুষটিকে যে শঠ বলব এমন প্রমাণ এ নাটকে কৈ? প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার চরিত্রের যে কুলক্ষণ এখানে প্রকাশিত, তা তার লোভ। তাও এ লোভ প্রাচুর্যের প্রতি নয়, নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সৎসামান্য পেলেই তার আকাঙক্ষা স্তিমিত হয়ে যায়। বৈকুণ্ঠবাবু তাকে খাবার কেনার জন্য যে টাকা সেন তার উদ্বৃত্ত অংশ সে তাই এসে ফিরিয়ে দেয় কেদারকে। সুতরাং তার লোভের মধ্যেও এক পরিচ্ছন্ন সীমারেখা স্পষ্ট।

তিনকড়ি অত্যন্ত মোটা দাগের মানুষ। ভাবা-ভাবির ধার ধারে না সে। সে বোঝে বস্তু সত্য। তাই অবিনাশ মনোরমাকে উপহার দেবার জন্য যে প্রণয়-চিরকুট লিখতে বসে সেখানে 'করতলে'র পরিবর্তে 'পদতলে' লিখলেও যে বিশেষ কিছু হেরফের হয় সে কথা সে বুঝতে পারে না। 'পদতলে' 'আংটি দিলে তা 'করতলে' তুলে নিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় বলেই তার অভিমত। তিনকড়ির চরিত্র এখানে নিতান্তই সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

তিনকড়ি সত্যকথা স্পষ্ট করে বলতে পিছপা নয়। কেদারের ধূর্ততার কথা সে যেমন সকলকে জানিয়ে দিয়েছে, বৈকুণ্ঠ খাওয়াতে চাইলে কেদার নিমরাজির অভিনয় করলে সে

স্পষ্ট ভাষায় তেমনি জানিয়েছেন—'খাওয়াতে ওঁর সামান্য অসুবিধে, না খেতে পেলে আমাদের অসুবিধে ঢের বেশি। ক্ষিধে পেয়েছে মশায়।' তিনকড়ি চোখে মুখে কথা বলে। অবিনাশের 'করতলে—পদতলে সমস্যার সমাধান এক কথায় করে দিয়েছে সে—"দোষ কী জানেন অবিনাশ বাবুঃ ও ভাবতে গেলেই দোষ, না ভাবলে কিছুতেই দোষ নেই, আমি তো এই বুঝি।" তিনকড়ির মধ্যেও রয়েছে এক অপূর্ণতার বেদনা—সে অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। অবিনাশের কথার উত্তরে—'মেয়ে মানুষের হৃদয় তিনকড়ি কখনো পায় নি, কখনো প্রত্যাশাও করেনি।' নিজ জীবনের বেদনা অন্যত্রও ব্যক্ত হয়েছে—'এই তিনকড়ির পোড়াকপালের আঁচ পেলে অন্নপূর্ণার হাঁড়ির তলা দুফাঁক হয়ে যায়,' কিংবা 'যম বেটা ঠাউরালে ছোঁড়ার দুনিয়ার কেউ নেই, নেহাত তাচ্ছিল্য করে নিলে না।' প্রভৃতি উক্তিতে।

পরিহাসপ্রিয় লোভী তিনকড়ির মধ্যে রয়েছে এক 'বোহেমিয়ান' ভাব। এই কারণেই বাসনার কলুষের মধ্যে লিপ্ত থাকাসত্ত্বেও কলঙ্ক তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে কষতে হাসপাতালের শয্যায় শুয়েও সে বৈকুণ্ঠের কথা ভাবে। বৈকুণ্ঠকে কেদারের হাত থেকে রক্ষা করার পর আবার অন্যত্র ভেসে যাবার জন্য তৈরি হয়। কেদারের মধ্যেও রয়েছে এমনি 'একটা ঘূর্ণি' যে কারণে কেদারও বার বার স্রোতের টানে ভেসেছে স্থায়ী ঠিকানা গড়তে পারেনি কোথাও। সুতরাং কেদার ও তিনকড়ির চরিত্রের মূলগত সাদৃশ্য এখানেই। কিন্তু একই মানুষের ভেতর যেমন রয়েছে সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি, তেমনি এই মানিকজোড়ের সৎ অংশটি তিনকড়ি এবং অসৎ অংশটি কেদারের চরিত্র। তিনকড়ির কাটাছাঁটা কথাবার্তা দর্শকদের একদিকে যেমন হাসিয়েছে অন্যদিকে কেদারের মতো শঠের হাতে বৈকুণ্ঠের হেনস্তা হবার সময় দর্শকগণ যেন অধীর আগ্রহে পরিত্রাতা তিনকড়ির আবির্ভাব কামনা করেছে। তিনকড়ির আবির্ভাবের পর কেদার এবং তার অকথা নাট্য শুরুর সময় যা ছিল নাটিকা সমাপ্তির পরেও তাই রইল। সেই ছিন্নমূল—আশ্রয় সন্ধানী মানুষ। এখানেই 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটিকাটি প্রহসনের স্তরে উন্নীত হতে পেরেছে। তা ছাড়া কেদারের শঠতার শাস্তি বিধান করে নীতিবাগীশ নাটিকায় রূপান্তরিত করা হয়নি নাটিকাটিকে। সহজ হিউমারের মাধ্যমে নাট্যমঞ্চের পর্দা ফেলা হয়েছে। এখানেই নাটিকাটি প্রহসন হয়ে উঠেছে।

ঈশান : ঈশান বৈকুণ্ঠবাবুর পরিবারের অতি পুরাতন ভৃত্য। সমালোচক অশোক সেন বলেছেন "হিন্দু পরিবারের পুরাতন ভৃত্যের যে একটি বিশিষ্ট স্থান থাকে—তাহাকে যে সামান্য চাকর হিসাবে ধরা হয় না বরং পরিবারের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়, তাহাই এই চরিত্রটির ভিতর দিয়া সুন্দরভাবে দেখানো হইয়াছে।" প্রকৃতপক্ষে ঈশান একদিকে যেমন কর্তব্যনিষ্ঠ ভৃত্য, অন্যদিকে তেমনি বাস্তব সংসারের সম্পর্কে উদাসীন প্রভুর গৃহের সুগৃহিণীও যেন সে-ই। শুধুমাত্র বেতনভোগী ভৃত্যের মতো কাজকর্মের সঙ্গেই তার সম্পর্ক নয়। বাড়ীর ভালোয় মন্দে ঈশানের চিন্তাও এক বিশেষ মূল্য পেয়েছে।

বহুদিনের পুরাণো ভৃত্য সে। বৈকুণ্ঠের সংসারের এক আপন জন। প্রভুকে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খাইয়ে এই আত্মভোলা প্রকৃতির মানুষটিকে সুস্থ রাখার সব দায় যেন তারই। বৈকুণ্ঠ খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কেও উদাসীন। নিজের খাতা শোনাতে গেলে ক্ষুধাতৃষ্ণাবোধও তাঁর আর থাকে না। তখন ঈশান তাকে খাবার খেতে ডাকতে এলে আত্মমগ্ন বৈকুণ্ঠ সেকথা

ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। ঈশান নিজ প্রভুকে ধমক লাগায়। প্রভুর অতিথিদেরও মৃদু ভর্ৎসনা করে 'যাও বাবু তুমি ঘরে যাও; আমাদের বাবুকে আর ক্ষেপিয়ে তুলো না।' অভিভাবকসুলভ ভঙ্গিতে ঈশান অতিথিদের বাড়ি যেতে বলেছে। বৈকুণ্ঠ অতিথিদের জন্য খাবার যোগাড় করতে বললে সে তিক্ত কণ্ঠে প্রভুকে জানিয়ে দিয়েছে যে তা হবে না। 'দিদি ঠাকরুণকে আমি আবার এই দিবসান্তে বেড়ি ধারাতে পারব না' ঈশানের এই উক্তিতে একদিকে যেমন অভিভাবকসুলভ কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়েছে অন্যদিকে শুধু বৈকুণ্ঠ নয়—তাঁর বিধবা কন্যার প্রতিও তাঁর মমত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

ঈশান বৈকুণ্ঠের সংসারের একজন বলেই সে অবিনাশের বিয়ের ব্যাপারে বহুকাল থেকে বৈকুণ্ঠকে পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু আত্মভোলা প্রকৃতির বৈকুণ্ঠ সে ব্যাপারে কর্ণপাত করেন নি। এ নিয়ে ঈশান অনুযোগ করতেও ছাড়ে নি। আবার অবিনাশের বিয়ের পর তার বাতিক দেখে বাড়ির লোকেদের মতোই মন্তব্য করেছে—'সময়কালে বিয়ে হলে এতটা বাড়াবাড়ি হয় না।' অবিনাশের শ্বশুরবাড়ীর লোকদের ব্যবহারে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। নীরুর উপর মনোরমার পিসির দুর্ব্যবহারে সে আত্মসংবরণ করতে পারে নি স্পষ্টাস্পষ্টি সব কথা বৈকুণ্ঠকে জানিয়েছে। এবং প্রথম সে-ই গৃহত্যাগের অভিলাষ ব্যক্ত করেছে। পরে বৈকুণ্ঠ ঈশানের মতে মত দিলে সে তাঁর সঙ্গে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেছে।

বৈকুণ্ঠের লেখাপড়ায়, বিশেষ করে, সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসকে—আর সকলের সঙ্গে সেও উপহাস করলেও, অনেক সময় ঈশানও অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও—তাঁর এই লেখাপড়াতে যে ঈশানের শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালোবাসা ছিল তা বোঝা গেল প্রহসনের শেষ দৃশ্যে। বাড়ি থেকে যাবার সময় ঈশান তাই প্রভুর খাতাটিও সে গুছিয়ে নিতে চায়। পরিশেষে অবিনাশের পুরুষ সুলভ ব্যবহারে বৈকুণ্ঠের সংসারের উটকো ঝামেলা মিটে গেলে যে খুশীর আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটিকার একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল চরিত্র ঈশানের চরিত্র। বুকভরা ভালোবাসা এবং প্রাণ ঢালা সেবা দিয়ে গড়া এই চরিত্রটি প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে সমগ্র নাটিকায়। তাঁর মুখের প্রেক্ষাপটে সামান্য রেখা কুঁচকে উঠলে শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে এই স্নেহপ্রবণ মানুষটি—প্রভুর স্বস্তিতে শান্ত হয়েছে সে।

বিপিন : বিপিন চরিত্রটি 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটিকায় মাত্র কয়েকটি সংলাপে সীমাবদ্ধ হলেও তার আচরণ নাট্যদেহের উপর একস্পষ্ট ছাপ মুদ্রণে সমর্থ হয়েছে। কৌতুকপ্রিয় স্বার্থপর খেয়ালী মানুষ বিপিন। সরাসরি বৈকুণ্ঠের সংসারে প্রবেশাধিকার লাভের সৌভাগ্য ঘটেছে তার কেদারের সহায়তার। ফলত সে পরোক্ষে কেদারের বহু-প্রত্যাশিত বাসনা বৈকুণ্ঠকে স্বগৃহে থেকে বিতাড়ন এবং নিজেকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করণে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

বিপিন সেই শ্রেণীর মনুষ্যের প্রতিনিধি যারা অন্যের বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে আশ্রয় দাতাকেই নানা উপায়ে হেনস্তা করার সুযোগটুকু ছাড়ে না। বৈকুণ্ঠের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে বিপিন। কেদার বিপিনকে রেখেছে বৈকুণ্ঠের ঘরে। স্বভাব লাজুক, পরোপকারী, ভ্রাতৃবৎসল বৈকুণ্ঠের উদারতার সুযোগ নিয়ে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল কেদার বিপিনকে বৈকুণ্ঠের ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে বৈকুণ্ঠকে বিব্রত করতে চেয়েছে। বিপিন পরাশ্রয়ী হয়েও বিন্দুমাত্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে অপারগ। তার চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ,—

১। অন্যে বিব্রত বোধ করলেও সে সদা সর্বদাই গুণ্‌গুণ্‌ করে গান করে যায়।
২। ফাঁকা ঘর ছাড়া সে নাকি থাকতে পারে না।
৩। যখন সে গান করে না তখন কোনো একজন সঙ্গী চায়—যার সঙ্গে সে গল্প করতে পারে।

বৈকুণ্ঠ বাবুর পুঁথিপত্র, ডেস্ক প্রভৃতির জন্য বিপিনের অসুবিধা হয়—কেননা তার কাছে প্রায়ই যে বন্ধুরা আসে তাদের বসার স্থান সঙ্কুলান হয় না। তাই সে গৃহকর্তাকেই যেন আদেশ করে—তার অসুবিধা সৃষ্টিকারী দ্রব্যগুলি সরিয়ে নেবার জন্য। স্বার্থপর, পরাশ্রয়ী বিপিন যখন 'ভাবিতে পারিনে পরের ভাবনা' গানটি বার বার গাইতে থাকে তখন এক বৈপরীত্যসূচক হাস্যরসের ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কারণ তার মতো চরিত্রের কণ্ঠে এ গান একেবারেই সাজে না—সে এ গানের যোগ্য নয়। সে গানটাও ভালো করে জানে না—তবলা বাজায় বই এ—তবলায় নয়।

আত্মমর্যাদজ্ঞানহীন বিপিনকে বৈকুণ্ঠ বার বার 'বেণীবাবু' 'বেণীবাবু' বলে সম্বোধন করেছেন—এতে হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে।[১] বিপিনের পরিণামটিও দর্শকদের যথেষ্ট তৃপ্ত করেছে। বাড়ীর ভৃত্য ঈশান তাকে লাঞ্ছনা করেছে, অবিনাশ তাকে তাড়া করেছে। আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন আত্মাভিমানী বিপিনের পরিণাম চিত্রণের মুহূর্তে নাট্যকারের সূক্ষ্ম পরিহাস রসবোধ লক্ষিত হয়—ঈশান যখন বিপিনকে বলপূর্বক বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করছে তখনও সে দম্ভ ত্যাগ করে নি—পরিশেষে অসহায়ভাবে তাকে যখন বেরিয়ে যেতে হচ্ছে, তখন তার উক্তি—'ঈশেন, একটা মুটে ডাকো, আমার হুঁকো আর ক্যাম্‌বিসের ব্যাগটা—' দর্শকদের হাস্যোদ্বেল করে তোলে।

চিরকুমার সভা বা প্রজাপতির নির্বন্ধ

রবীন্দ্রনাথের পূর্ণরঙ্গ রঙ্গনাট্য 'চিরকুমার সভা'র কাহিনী প্রথম উপন্যাস আকারে 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৭-০৮ সালে মুদ্রিত হয়েছিল। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে কবি রবীন্দ্রনাথ এটির নাট্যরূপ দেন।[২] এই রঙ্গনাট্যের কাহিনীতেও রয়েছে অস্বাভাবিকতা। কয়েকজন বন্ধু চিরকাল অবিবাহিত থাকতে চেয়ে চিরকুমার সভার প্রতিষ্ঠা করে। শ্রীশ, বিপিন, পূর্ণর হাতে গড়া এই সভা কীভাবে ভেঙে গেল, নারীকে এড়িয়ে যাবার প্রবণতা নারীর স্পর্শে কীভাবে নিমেষে লুপ্ত হয়ে গেল—তারই পটভূমিতে এই প্রহসনটি রচিত হয়েছে। তবে এই নাটকের চন্দ্রবাবু 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠকে স্মরণ করিয়ে দেন। একই রকম কায়দায় তাঁর বিস্মৃতি কৌতুক রসের এক অন্যতম প্রধান উৎস। কিন্তু এই নাটকে পুরুষ বেশে শৈলর চিরকুমার সভার সভ্য হওয়া এবং তার বিচিত্র কার্যকলাপ দর্শকদের কাছে এটিকে পরম আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এই নাটকে হাল্কা রসের সরস প্রবাহ বইয়ে

১. বাংলা নাটকে হাস্যরস সৃষ্টির একটি বহু অনুসৃত পদ্ধতি 'নাম বিস্মরণ।'' 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটিকার রবীন্দ্রনাথ সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালও রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এ পদ্ধতি নাটকে প্রয়োগ করেছেন—আজও এ পদ্ধতি হাস্যরসাত্মক নাটিকার অনুসৃত হচ্ছে।

২. 'চিরকুমার সভা'র নাট্যরূপ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জুলাই।

দিয়েছে অক্ষয় এবং দাদামশায়। অক্ষয়ের কণ্ঠে এই প্রহসনে কয়েকটি গান সংযোজিত হয়েছে। এই গান কখনও তার বক্তব্যকে, কখনও বিদ্রূপকে প্রকাশ করেছে। যুবক দারুকেশ্বর যখন কুলীন হওয়া সত্ত্বেও মুর্গীর প্রতি তার নিদারুণ আসক্তির কথা জানায় তখন অক্ষয় গেয়ে ওঠে,—

"কত কাল রবে বলো ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে।
* * * *
দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন
ধর হুইস্কি সোডা আর মুর্গি-মটন।"

নাটকের শেষে চিরকুমার সভার কৌমার্য ব্রত ধারণের বাধ্যবাধকতা অপসারিত হয়েছে এবং নির্মলা-পূর্ণ, নৃপবালা-শ্রীশ, বিপিন-নীরবালার বিবাহ কার্য সম্পাদিত হয়েছে।

'চিরকুমার সভা'র কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'। এই নাটিকাটির স্টার থিয়েটার মঞ্চে আর্ট থিয়েটার কর্তৃক অভিনয় প্রসঙ্গে ড. সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন,—

"Art Theater's next production is an event to remember. This was Rabindranath Tagor's 'Chirakumar Sabha' which had its premiere on 18 July, 1925. The poet himself had renamed and given a dramatic shape to his 'Prajapatir Nirbandha'. Dinendranath Tagore charge of the music. Gagnendranath Tagore designed the seenes and supervised the stage. and the sets. For the first time the Tagores became involved in a public theatre, participating actively in the production of a play."[১]

রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' নাটকের কাহিনীর সঙ্গে শেকসপীয়রের 'Love's Labour's Lost' নাটিকার কাহিনীর অনেকটা মিল রয়েছে। শেকসপীয়রের নাটকে দেখা যায় ন্যাভারের রাজা ও তাঁর তিনজন বন্ধু চিরকুমার সভার সদস্য। তাঁরা নারীকে শত্রু বলে মনে করেন এবং দেহ ও মনের সংযম পালন করে থাকেন। এমন সময় ফ্রান্সের রাজকুমারী; তাঁর তিনজন সখী সেখানে আসতেই তাঁদের ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয়ে গেল। রাজা এবং তাঁর তিন বন্ধু বুঝতে পারলেন শুধু বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করে প্রেমকে অস্বীকার করলে জীবনে অপূর্ণতা থেকে যায়। শেষে তাই তাঁরা বুঝতে পারেন,—

"But love, first learned in a lady's eyes,
Lives not alone immured in the brain.
But with the motion of all elements,
Courses as swift as thought in every power,
Above their functions and their offces."

এই নাটিকার কয়েকটি ভূমিকায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন কয়েকজন যশস্বী নট। রসিকবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পূর্ণর ভূমিকায়

---

১. The Story of the calcutta Theatres: 1753–1980/S.K.Mukherjee/P-166

অভিনয় করেছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়ের ভূমিকায় তিনকড়ি চক্রবর্তী, বিপিনের ভূমিকায় রাধিকানন্দ মুখার্জী, শ্রীশের ভূমিকায় ইন্দুভূষণ মুখার্জী, চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, শৈলবালার ভূমিকায় শ্রীমতী সুশীলবালা, নৃপবালার ভূমিকায় শ্রীমতী ফিরজাবালা, নির্মলার ভূমিকায় শ্রীমতী নিভাননী এবং নীরবালার ভূমিকায় পরতীকালে কাননদেবী নামে খ্যাতা শ্রীমতী নীহারবালা।

মুক্তির উপায়

রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে তাঁর বহুখ্যাত 'মুক্তির উপায়' গল্পের কাহিনী অবলম্বনে একটি কৌতুক রস স্নিগ্ধ প্রহসন রচনা করেন। দুই স্ত্রীর জ্বালায় পলাতক মাখন এবং গুরুভক্ত ফকিরের গল্পের কাঠামোয় অনাবিল হাস্যরস-স্রোত বইয়ে দিয়েছেন প্রহসনকার। এই প্রহসনের অন্যতম চরিত্র পুষ্পমালা—যে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে, 'কলেজী খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়াগাঁয়ে বোনের বাড়িতে সংসারটিকে প্রত্যক্ষ করতে এসেছে। কৌতূহলের সীমা নেই। কৌতুকের জিনিসকে নানারকমে পরখ ক'রে দেখছে কখনো নেপথ্যে কখনও রঙ্গভূমিতে'; ড. আশুতোষ ভট্টাচর্যের মতে "যে সকল ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরবর্তী জীবনে নাটক প্রহসনের আসরে নামাইয়া তাহাদের রসের হানি করিয়াছেন, ইহা তাহাদের অন্যতম।"

পরিশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের লেখা কৌতুক নাট্য ও প্রহসনের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও তাঁর বহু লেখায় একটি কৌতুকপ্রবণ সুস্থ মনের পরিচয় মেলে। 'বিসর্জন' নাটকে প্রজাদের কথোপকথনে 'তোরা দক্ষিণের মানুষ, উত্তরের জানিস কি যে উত্তর দিতে এসেছিস', প্রভৃতি; 'রক্তকরবী' নাটকে বিশুর উক্তিতে 'কথা বলি আমরা মানে যে করে ওরা' প্রভৃতি;—উপন্যাসে, প্রবন্ধে, ভ্রমণকাহিনীর কোনো কোনো জায়গায় সামান্য একটি দুটি বাক্যের আঁচড়ে রোমান্টিক কবির কৌতুক-প্রবণ মনের পরিচয় মেলে। বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় প্রধানত এই কারণেই যে তিনিই প্রথম ভাঁড়ামি বাদ দিয়ে মার্জিত শুচিস্নিগ্ধ হাসির পটভূমি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর হাস্যরসের মূলে ছিল চাপাকৌতুক, তির্যক ও বৈদগ্ধ্য বাগ্‌বিন্যাস। হাসি কেবল হাল্‌কা ও উপরিতলের ব্যাপার বলে থাকেন যাঁরা—রবীন্দ্রনাথের হাসির নাটকগুলি তাঁদের সে বক্তব্যের প্রধান প্রতিবাদী। তিনি তাঁর হাস্যরসাত্মক নাটিকাগুলিতে বুদ্ধি, বাক্-চাতুর্যে হাস্যরসের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। হাসির সঙ্গে মগজের যোগ ঘটিয়ে তিনি বাংলা প্রহসনের ক্ষেত্রে এক নূতন ধারার জন্ম দিয়েছেন।

অপ্রধান প্রহসনকার (১৮৯১—১৯০৫)

উনিশ শতকের শেষ দশকে অন্তত কয়েকজন প্রহসনকারের রচনায় আবার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং পরিবেশনে অভিনবত্ব লক্ষিত হয়। তবে অধিকাংশ প্রহসনকারই প্রাহসনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে চর্বিত চর্বণ করেছেন মাত্র।[১] **হরেন্দ্রনাথ মিত্র** রচিত 'আইন বিভ্রাট' (১৮৯১) সমকালীন নব্যবিবাহ বিষয়ক আইন কনসেন্ট বিলের কুফল অবলম্বনে লেখা। একজন ধনী জমিদার নরেন্দ্রনাথ তাঁর সম্ভ্রান্ত প্রজা ভূপতিকে কব্জা করতে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কনসেন্ট বিলের ফাঁদে ফেলে তাঁকে এবং তাঁর দুই পুত্রকে জেলে পাঠান। 'আইন বিভ্রাটে'র কাহিনী এই। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে অমৃতলাল বসুও এই সময় 'সম্মতি সঙ্কট' নামে একটি প্রহসন রচনা করেছিলেন।

চাকুরীজীবী মানুষের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে **নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের** 'বড়বাবু' (১৯৯১) প্রহসনে। এছাড়া **হাজারীলাল দত্ত** রচিত 'বানরের গলায় হীরার হার' (১৮৯১) একটি ক্ষুদ্র প্রহসন।

জানকীনাথ বসু ঃ

জানকীনাথ বসু বা বৈকুণ্ঠনাথ বসু কয়েকটি প্রহসন রচনা করেন। প্রাহসনিক মেজাজ ও অভিনয়ের মেজাজ ও অভিনয়ের নাটকের গুণে সেগুলি দর্শকচিত্ত জয়ে সমর্থ হয়েছিল। তাঁর প্রথম প্রহসন 'পৌরাণিক পঞ্চরং' (The Eighth wonder of the world) রয়াল বেঙ্গা ল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর। জানকীনাথ রচিত বার এর জীবনকেন্দ্রিক প্রহসন 'বারবাহার' (The Beauty of Bar) রয়াল বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জুলাই। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটার অভিনীত হয় বৈকুণ্ঠনাথ বসু রচিত 'ঘরে বিকার' প্রহসনটি।

জনৈক **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'গোবর গনেশ' (The Marriage Marred) ১৮৯১ সালের ২৭ মার্চ বয়াল বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

অপূর্বকৃষ্ণ মিত্র ঃ

অমৃতলাল তখন বাংলা রঙ্গমঞ্চে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় ভাস্বর। অসংখ্য নাট্যকার তাঁর অনুকরণে নাট্য রচনা করে চলেছেন। তাঁর সেই গোঁড়া হিন্দুয়ানী, বিলাতের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব তৎকালীন বহু নাট্যকারের নাটকে ছায়া ফেলেছে। অপূর্বকৃষ্ণ মিত্র অমৃতলালের মতো প্রাচীনপন্থী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রায় অর্ধশত বৎসরেরও আগে

১. গিরিশচন্দ্র নিজে কয়েকটি হালকা রসের নাটক লিখলেও দর্শক মন ভুলবার জন্য রচিত এই নাটিকাগুলিকে মনে প্রাণে বোধ হয় স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। তাই এক সময় বলেছিলেন,—"Serious drama-কে স্থানচ্যুত ক'রে শুধু কতগুলো light society sketch pantomime দর্শকদের সামনে ধরে নাচগান হাবভাবে ভুলিয়ে রঙ্গালয়ের অবনতি করলে কারা? তার climax হ'লো half-nude dancing. Histrionic art-এর এই কদর্য্য পরিণতির জন্য জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের শেষে পরিতাপ ক'রতে হ'বে।" গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য/কুমুদবন্ধু সেন/পৃঃ১৮

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নব্যবাবু নব্যবিবিদের ব্যঙ্গ করে রচনা করেছিলেন 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস'। অপূর্বকৃষ্ণ উনিশ শতকের শেষ দশকে দাঁড়িয়ে এইই মানসিকতায় রচনা করেছিলেন 'বাবুয়ানা বিবিয়ানার ঝকমকে আয়না' ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর 'আজব কারখানা বা 'বিলাতী সঙ্'।[২] বিলাতের অনুকারীদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গমূলক এই নাটিকার কয়েকটি গান অবধারিতরূপে মনে করিয়ে দেয়, দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিলাতফের্ত্তা কবিতাটি,—'আমরা বিলিতি ধরণে হাসি....' ইত্যাদি। 'আজব কারখানা' নাটিকার একটি ব্যঙ্গাত্মক গানে দেখি,—

"আমাদের সব বিলিতি ঢং।।
বিলিতি পরা বিলিতি খাওয়া
বিলিতি বসা, বিলিতি শোওয়া,
বিলিতি ধরম, বিলিতি করম,
ঠিক বিলিতি সং—
আমাদের সব বিলিতি ঢং—
নাচ বিলিতি, গান বিলিতি, ডিং ডং ডিং ডং—"

হাস্যরসাত্মক এই প্রহসনটি বড়ো মোটা দাগের রচনা।

কেদারনাথ মন্ডল ঃ

বীণা থিয়েটার অমৃতলাল বসুর ধাঁচে প্রহসন রচনা করে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা করিছেলেন কেদারনাথ মন্ডল। তিনি স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার নামে বেলেল্লাপনাকে একেবারে অনাবৃত করে দিয়েছেন তাঁর 'বেহদ্দ বেহায়া' (১৮৯৪) প্রহসনে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর এটি প্রথম অভিনীত হয় বীণা থিয়েটারে। এরপরে এটি এই রঙ্গ মঞ্চে প্রায় এক বৎসর সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

'বেহদ্দ বেহায়া'র কাহিনী নিম্নরূপ—স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী বড়বাবুর মেয়ে কৃষ্ণভাবিনী মিস গেঙ্গুলির দলে ভিড়ে স্ত্রীশিক্ষার উচ্চসোপানে উঠেছে, ফিজিক্যাল একসারসাইজ করছে। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ড্যান্সিং মাস্টারের প্রতি কৃষ্ণভাবিনী দুর্বল। কাশী থেকে ফিরে এসে তার ঠান্‌দি তাদের বুঝবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন—মেয়েরা অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চলে। তারা বলবান স্বামী নির্বাচনের জন্য রবিবার পার্কে 'রাক্ষসী সভা'র আয়োজন করে। সেখানে তারা স্বয়ম্বরা হবে। ব্যায়াম করে শক্তিশালী হতে গিয়ে মেয়েদের গায়ে গতরে ব্যথা—অনেকেই কাহিল হয়ে পড়েছে। পার্কে মিটিং-এর দিন প্রবীণেরা গুন্ডা ঠিক করে বিবাহ সভা ভেস্তে দেয়। মেয়েরা বেহায়ার চূড়ান্ত হয়ে হাহুতাশ করতে থাকে।

অতি-কল্পনা এবং কষ্ট-কল্পনার যুগ্ম রং-এ রঙীন 'বেহদ্দ বেহায়া'। এই প্রহসনে দেখি মালতী আট মাসের গর্ভবতী। তাই তাকে তার স্বামী মুগুর কিনে স্বাস্থ্যচর্চা করায় নিষেধ করেছে। কিন্তু উৎসাহে ভাটা পড়েনি মালতীর সে মোচা আর কচু নিয়েই ব্যায়ামকার্য চলিয়ে

---

২ লক্ষণীয় অপূর্বকৃষ্ণ মিত্র নিজ নাটিকাকে সঙ্ বলেছেন।

গেছে। স্থূল হাস্যরসের উতরোল তরঙ্গভঙ্গ এখানে দেখা গেলেও গভীর জীবনবোধের অভাব এখানে বড়ো প্রকট।[১]

শরৎচন্দ্র দাস ঃ

সুচিন্তিতভাবে সাহিত্যসেবার উদ্দেশ্য নয়, হঠাৎ যুগের হুজুগে কলম ধরে পাঠকের রুচির দিকে তাকিয়ে মাত্র তিনটি নক্সাধর্মী ছোট্ট নাটিকা রচনা করেই দৃশ্যান্তরালে চলে গিয়েছেন শরৎচন্দ্র দাস। তাঁর কাহিনীর মধ্যে নেই বৈচিত্র্যের আভাস। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল মানসিকতার আবরণ ছিঁড়ে প্রায় বিংশ শতকের ঠিক পূর্বমুহূর্তে ও বেরিয়ে আসতে পারেননি শরৎচন্দ্র দাস। গ্রাম্য সঙ্‌যাত্রায় যে ধরনের বিষয় অবলম্বিত হয় অনেকটা সে রকম জোলো কাহিনী নিয়ে ততোধিক স্থূল রসের বার পৃষ্ঠার নাটিকা 'দশ আনা ছ-আনা' (১৮৯৬, ১০ নভেম্বর) রচনা করেন। পথভ্রষ্ট দুটি যুবক চৌর্য কর্মে রত। একদিন তারা দশ আনা ছ-আনা বখরায় ভাগ নেবার চুক্তিতে একটি বাক্স চুরি করে ধরা পড়ে। বিচারে তাদের যে সাজা হয় তার বখরাও দশ আনা ছ-আনা থাকে। একজনের দশ মাসের অন্যজনের ছ-মাসের জেল হয়। নীতিশিক্ষামূলক দুই বন্ধুর গল্প (দুই বন্ধু পথে যেতে যেতে একটি জিনিস কুড়িয়ে পায়, তার উপর নিজ স্বত্ব আরোপ করতে চায় এক জন—চৌর্যাপরাধে ধরা পড়লে তারই সাজা হয়) নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্রের আদর্শ ছিল। ১৮৯৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর তাঁর বার পৃষ্ঠার আরও দুটি রঙ্গ ব্যঙ্গমূলক রচনা প্রকাশিত হয়। বেশ্যাসক্তিজনিত অধঃপতনকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গাত্মক নাটিকা 'প্রেমের কামড় বা দিল্লিকা লাড্ডু' এবং দ্বিতীয় নাটিকাটি 'এ মেয়ে পুরুষের বাবা'। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা অর্থেই শুধু নয়, বৃদ্ধের স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অসতী তরুণী স্ত্রী কীভাবে তাঁকে প্রতারণা করেছিল—এই ক্ষুদ্র প্রহসনে তাই স্থূল হাস্যরসের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে।

সুন্দরীমোহন দাস রচিত 'মিউনিসিপাল দর্পণ' (১৮৯২), **প্রমথনাথ দাসের** 'নদের চাঁদ' (১৮৯২), **উপেন্দ্রনাথ ঘোষের** 'পাশ করা আদুরে বৌ' (১৮৯২), **কুঞ্জবিহারী রায়ের** 'পশ্চিম প্রহসন' (১৮৯২) **জনৈক অজ্ঞাতনামা** রচিত 'পূজার রোশনাই' (১৮৯২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। **কুঞ্জবিহারী বসুর** 'হ য ব র ল' প্রহসনটি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর রয়াল বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। এটি প্যান্টোমাইম জাতীয় রচনা। **মীর মশাররফ হোসেন** রচিত 'এর উপায় কি?' (১৮৯২) প্রভৃতি এ সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রহসন প্রয়াস।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জুন **দেবেন্দ্রনাথ বসু** রচিত 'বেজায় আওয়াজ' (Royal Salute) প্রহসনটি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এই পালায় লবধনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। **যতীন্দ্রনাথ শর্ম্মা** (মুখোপাধ্যায়) রচিত 'কন্যাদায়'

---

১. "আজকাল বঙ্গ মুদ্রাযন্ত্র হইতে রাশি রাশি নাটকাদি উদগীর্ণ হইতেছে তদ্দ্বারা বঙ্গ সাহিত্য সমাজ উপকৃত কি অপকৃত তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বাঙালির কর কন্ডুয়ন রোগ যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই রোগের বিষময় ফল যে ক্রমশঃ সমস্ত দেশমধ্যে ভয়ানক সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে তাহা নিশ্চয়।" [আদরিণী মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। সম্পাদক শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস/১২৮৭ ১ম সংখ্যা / পৃঃ ১৬৬]

(১৮৯৩), **অনাথবন্ধু চক্রবর্তীর** 'জীবন্ত মানুষ যমের বাড়ি' (১৮৯৩), এ. ডি. রচিত 'জামাই বরণ' (১৮৮৪), **যোগীন্দ্রনাথ ভাস্কর** রচিত 'কপালের লেখা' (১৮৯৪), **চন্দ্রশেখর শর্মা** রচিত 'নারী চাতুরী' (১৮৯৫), **যশোদানন্দন চট্টোপাধ্যায়ের** 'কলির কাপ' (১৮৯৫), **আজিজ আমেদের** 'কলির বৌ' (১৮৯৫), **অক্ষয়কুমার চক্রবর্তীর** 'আক্কেল সেলামী' বা উদ্ভট মিলন' (১৮৯৫), **অক্ষয়কুমার দে** রচিত 'রক্তারক্তি' (১৮৯৬), **হরিনাথ চক্রবর্তীর** 'শয্যাগুরু' (১৮৯৬), **রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের 'ওল্ডফুল্'** (১৮৯৬), **অহিভূষণ ভট্টাচার্যের** 'বোধনে বিসর্জন' (১৮৯৬), **সিদ্ধেশ্বর ঘোষের** 'লন্ডভন্ড' (১৮৯৬), **অঘোর বসুচৌধুরীর** 'বিলাসী যুবা' (১৮৯৬), **রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের** 'কষ্টি পাথর' (১৮৯৭), **হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের** 'আড়কাটি' (১৮৭৯) **শশিভূষণ অধ্যায়ের** 'আমি হিন্দুমতে সাহেব হব, হ্যাট কোট্ পরে সদাই রব' (১৮৯৭), **হরিপদ ভট্টাচার্যের** 'মেয়েছেলের লেখাপড়া আপনা হতে ডুবে মরা' (১৮৯৭), **গোবিন্দচন্দ্র দের** 'নক্সা'(১৮৯৭), **চুণিলাল দেবের** 'ফটিক চাঁদ' (১৮৯৮), ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভায় অভিনীত হয় তাঁর 'সাধের বাজার', ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি গ্র্যান্ড ন্যাশানালতে (ii) 'বাহবা', **মান্নুলাল মিশ্রের** 'প্রেম নাটক' (১৮৯৮) **চন্ডীচরণ ঘোষের** 'ভিষক কুল তিলক', **ধীরেন্দ্রনাথ পালের** 'ভুটিয়া মাণিক' বা 'দার্জ্জিলিন্যের নক্সা' (১৮৯৮), **জনৈক অজ্ঞাতনামার** 'মর্কট বাবু' (১৮৯৮),**পঞ্চানন রায়চৌধুরীর** 'আমার ঝকমারি মাশুল' (১৮৯৯), **বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের** 'রগড়ের চাঁচি' (১৮৯৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে **কেদারনাথ দাসের** 'আমারই' মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। প্রথমে এই নাটিকাটির নাম ছিল 'মাইরি', পরে পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে নাম বদলে দিয়ে 'আমারই' নামকরণ করা হয়।[১] **সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের** হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'চন্ডীরাম' (১৯০১), 'নতুন বাবু' (১৩১১)। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর ইউনিক থিয়েটারে অভিনীত হয় **নিত্যবোধ বিদ্যারত্নের** 'একাদশে বৃহস্পতি' (১৯০২); এটি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮মে অরোরা থিয়েটারেও অভিনীত হয়। **আশুতোষ বিদ্যাভূষণের** 'চোখের নেশা' (১৯০৫), জনৈক **অজ্ঞাতনামা** রচিত 'গোবৈদ্য'[২] মলেয়ারের 'ল মেদিস্যাঁ মাল্গ্রে লুই' প্রহসন অবলম্বনে লেখা। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত **নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** 'নিরুপায়ে চিকিৎসক' প্রহসনটিও উপরোক্ত ফরাসী প্রহসন অবলম্বনে লেখা। **নলিনীবালা** নাম্নী মহিলা প্রহসনকার রচিত 'তোফা' ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। **বিহারীলাল দত্ত** রচিত 'মজা কি সাজা' (১৯০১), ন্যাশানাল থিয়েটার II-তে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৬

---

১. গিরিশচন্দ্র ঘোষ একস্থানে বলেছেন,—
"এই দেখ না দেশের দুর্ভাগ্য যে নাটকের বিচারকর্তা ও সমালোচক পুলিশ। সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের কোনও প্রতিবাদ নাই। পুলিশের নির্দ্দেশ মতো চরিত্র, dialogue ও scenes বদ্লাতে হয়।" [গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য / কুমুদবন্ধুসেন / পৃঃ ১৩]

২. "দীনবন্ধু ও বঙ্কিমবাবু নাটক ও উপন্যাসাদি লিখিয়া কি সর্ব্বনাশই করিয়াছেন! তাঁহাদের নাটক ইত্যাদি পাঠ করিয়াই সকলের মাথার আগুন জ্বালিয়াছে। যে রসিকতায় দীনবন্ধু বাবু ও বঙ্কিম বাবু বঙ্গীয় পাঠক সমাজকে কিনিয়াছেন সে রসিকতার উদ্গিরণে আজ কাল বঙ্গীয় যুবক হাসির তরঙ্গে বঙ্গ প্লাবিত করাইতেছেন। সে যাহাই হউক রসময়ী নাটকাদির আর অভাব নাই "ইলিষমাছ ভাজা" হইতে 'বদল মহিমা" পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থকর্ত্তার কাছে লেখনী ধরে কে? কোথায় দানে বঙ্কিম?" [আদরিণী মাসিকপত্র/১২৮৭ পৃঃ ১৬৬-১৬৭]

আগষ্ট অভিনীত হয় তাঁর 'বুদ্ধিকর' প্রহসনটি। **স্বর্ণকুমারী দেবী** রচিত কৌতুক নাট্য 'বিবাহ উৎসব' (১৯০১)।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি (১৮৫০-১৯০৮) রচিত 'ভগবান ভুত' প্রহসনটি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর। **সুরেন্দ্রনাথ বসু** রচিত 'হলো কি' প্রহসনটি ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর। **রামলাল ব্যানার্জীর** 'চাঁদের হাট' ইউনিক থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ারে বেশ কয়েক বছর থিয়েটার মঞ্চগুলিতে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারী ঐতিহাসিক নাট্য সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। এ সময় রঙ্গমঞ্চে চাহিদার অভাবে প্রহসন রচনার গতি কিছুদিন মন্দীভূত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩)

প্রহসন রচনার নেপথ্যে : বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাংলা নাটকের জগতে প্রথম আবির্ভাব প্রহসন রচয়িতারূপে। বিলেতফেরৎ বাঙালি নাট্যকার প্রথম কেন প্রহসন রচনায় আগ্রহী হয়েছিলেন তার কারণ উল্লেখ করে এক স্থানে তিনি বলেছেন "প্রথমত ঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে 'কল্কি অবতার'—একখানি প্রহসন গদ্যে-পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই।"[১] কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল সব সময় এই পথে স্থির থাকতে পারেন নি। মোট কথা প্রহসন রচনার নিষ্ঠ-মানসিকতার অভাবই তাঁর প্রহসনগুলিকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করাতে পারে নি। রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক নাট্যকার যে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন 'একঘরে' নিবন্ধে সে কথা তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন। তাঁর অধিকাংশ প্রহসনে তাই যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তা রক্ষণশীল সমাজের প্রতি ভ্রূকুটি, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ। বাংলা প্রহসনের জগতে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব প্রহসনের আঙ্গিক রচনার অভিনবত্বে বা কাহিনী বয়নের আশ্চর্য যাদুতে নয়—দ্বিজেন্দ্রলার কৃতিত্ব প্রহসনের আঙ্গিক রচনার অভিনবত্বে কাহিনী বয়নের আশ্চর্য যাদুতে নয়—দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনের পরম আকর্ষণ এর অসাধারণ হাস্যরসাত্মক গানগুলি।

সমাজ-বিভ্রাট ও কল্কি অবতার ঃ

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রহসন 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫, ৯ সেপ্টেম্বর) কিছুটা নক্সাধর্মী রচনা। দুটি 'অভিনয়' অংশ বিভক্ত এই নাটিকায় 'প্রথম অভিনয়' অংশে ন'টি দৃশ্য এবং 'দ্বিতীয় অভিনয়' অংশে দু'টি দৃশ্য রয়েছে। 'কল্কি অবতাণের' কাহিনী পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানে স্বর্গ ও মর্ত্য, দেবতাও মানুষ প্রভৃতি আপাতবিরোধী বিচিত্র উপকরণের সমাহার লক্ষ্য করা যায়। দেবলোক এবং মানবলোক যেন একই সমাজভুক্ত। গতানুগতিক এই আঙ্গি কে নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, পন্ডিত, বিলাতফেরৎ ও গোঁড়া হিন্দু—এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপের শরজাল বর্ষিত হয়েছে। তবে গোঁড়া হিন্দু সমাজের উপর তাঁর বিদ্রূপের ঝাঁজটা একটু বেশি বলে মনে হয়। 'কল্কি অবতার' প্রহসনের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা এর সংলাপ। সংলাপ কখনই স্পষ্ট নয়। তবে ছড়া বা সঙ্গীতগুলি প্রবল হাস্যরসোদ্রেকে সহায়তা করেছে। সংলাপ গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত। এই নাটিকায় ঘোষণাকারী দামামা ধ্বনি সহকারে জানিয়ে দেয়,—

"যত আছেন ভাট, জোচ্চোরের হাট,
করেছেন যাঁরা হিন্দু সমাজ-বিভ্রাট,
দেবেন তাঁদের সাজা দেব কল্কি সম্রাট"

পরবর্তীকালে 'কল্কি অবতার' নামটির 'সমাজ-বিভ্রাট' যোগ করে 'সমাজ-বিভ্রাট ও কল্কি অবতার' এই নামে গ্রন্থটি মুদ্রণ করায়-এর বর্ণিত বিষয় অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে।

---

১. নাট্যমন্দির / ১৩১৭, শ্রাবণ / আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ / দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

এই প্রহসনে গানের সংখ্যা মোট পনেরটি। এই প্রহসনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র রাজার কুলপুরোহিত বিদ্যানিধির। এই সুরসিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটির সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুদের কথোপকথনে গোঁড়া হিন্দু সমাজের উপর তির্যক আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। নব্য-হিন্দুরা যেভাবে ইংরেজি-বাংলা মিশ্রিত গানে নিজেদের পরিচয় দিয়েছে তা যথেষ্ট কৌতুককর হলেও প্রহসনের ক্ষেত্রে হানিকর হয়েছে। অবশ্য এই প্রহসনের ভূমিকায় পদ্য-গদ্যে রচিত এই প্রহসনটির পাঠ সম্পর্কে এভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,—

> "কথোপকথনে শব্দগুলির যেরূপ উচ্চারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ উচ্চারণ করিতে হইবে যেমন 'সমাজ' স-মা-জ এরূপ না পড়িয়া সমাজ্ এরূপ পড়িতে হইবে। পদ্যগুলি অবিকল গদ্যের মতো করিয়া পড়িতে হইবে। যদিও ছত্রে ছত্রে মিল আছে, সে মিলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পড়িয়া যাইতে হইবে।"

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন 'পাঠকের পক্ষে ইহা এক নূতন অভিজ্ঞতা সন্দেহ নাই।'[১]

বিরহ ঃ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দ্বিতীয় প্রহসন 'বিরহ' প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। দুই অঙ্কে রচিত গ্রন্থটি এই তিনি উৎসর্গ করেছেন 'কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'কে। এই গ্রন্থরচনার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে নাট্যকার জানিয়েছেন "আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য—অল্পায়তনের মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্যকর অংশটুকু দেখানো।" প্রকৃতপক্ষে 'বিরহ' দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম সুসংবদ্ধ কাহিনীযুক্ত বিশুদ্ধ প্রহসন। সামাজিক বিদ্রুপের সুর এখানে প্রস্ফুট নয়, কৌতুকরসের উদ্বোধই এই প্রহসনের মূল ব্যাপার।[২] প্রৌঢ় গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন কুরূপা তরুণী নির্মলাকে। তাঁদের দাম্পত্য কলহের পরিণামে নির্মলা বাপের বাড়ি চলে যায়। স্ত্রীর চলে যাবার পর গোবিন্দ ভাবেন "এবার খুব রাশ কড়া টেনেছি, তবে ছিঁড়ে না যায়।" গেবিন্দর খাওয়া বেড়ে যায়, মোটা হতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে রূপসী শ্যালিকার কথা। এদিকে শ্যালিকার নামে স্ত্রী একটি 'ফটো' পাঠিয়েছেন। কিন্তু গোবিন্দ ফটো পাঠাতে গিয়ে ইন্দুকে বলেন "আমার স্ত্রী বোধ হয়, ভেবেছেন যে, তাঁর বিরহে আমি একেবারে শীতকালের পদ্মার মতো শুকিয়ে যাব। তা যে যাইনি, তা এ 'ফটো' পেলেই দেখতে পাবেন।" এরপরই ষড়যন্ত্র করে চপলা ও তার স্বামী ইন্দু। তারা গোলাপীকে শরৎ হালদার সাজিয়ে নির্মলার সঙ্গে তার ছবি তুলে পাঠিয়ে দেয় গোবিন্দের কাছে। গোবিন্দও তার পুনর্বিবাহের মিথ্যা খবর পাঠিয়েছে ভৃত্য রামকান্তের মারফতে। রামকান্ত গোলাপীর কাছে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে বাবুর মিথ্যা রটনার কথা ফাঁস করে দেয়। নির্মলার বোন চপলা গোলাপীর কাছে একথা জানতে পেরে পুরুষের বেশ ধরে গোবিন্দের কাছে আসে। সে তাঁকে জানায় যে তার শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিল কাল "তা কাল সেখানে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা হওয়াতে সব খাজনা বকেয়া রয়ে গেল।"

---

১. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (২য়) / ড়. আশুতোষ ভট্টাচার্য / পৃঃ ২৮৩

২ "Biraha....is an entertaining short play with funny situations witty dialogues and catchy comic songs." (The Story of the Calcutta Theatres: 1753-1980/S.K.Mukherjee P–602)

"গোবিন্দ উৎকণ্ঠিত স্বরে তাঁর বাড়িতে কি দুর্ঘটনা হয়েছে বলতে পারেন?
চপলা। তা ঠিক জানি নে। তাঁর একটি মেয়ে মারা গিয়েছে। শুন্‌ছি।
গোবিন্দ। এ্যাঁ—কোন্‌টি?
চপলা। তা জানি নে; বড়টি কি ছোটটি যেটির বিকার হইছিল।" পরিশেষে অবশ্য নির্মলা গোবিন্দর পুর্নমিলন হল।

দুটি অঙ্কে মোট দশটি দৃশ্যে (৫+৫) প্রহসনটি রচিত। মূল কাহিনীর সঙ্গে রামকান্ত-গোলাপীর উপকাহিনী যোগ করা হয়েছে। নাটিকাটিতে এই উপকাহিনীকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে এর মূল কাহিনী কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 'বিরহ' প্রহসনের হাস্যরসের মূল উৎস কিন্তু সংলাপ বা চারিত্রিক অসংগতি নয়। ঘটনার জটিল আবর্ত এবং উদ্ভটত্বই এই প্রহসনের হাস্যরসের উৎসমুখ খুলে দিয়েছে। 'বিরহ' প্রহসনে মোট সতেরটি গান রয়েছে। শেষ গানটিতে হাস্যরসিক কবির পরিহাসপ্রিয়তা ফুটে উঠেছে,—

"এক স্ত্রী নিয়ে হ'লে কারবার
ঝালিয়ে নিতে হয় দু' চারবার
বিরহ-আহুতি ভিন্ন—প্রেমের আগুন জ্বলে না।"

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'বিরহ' প্রহসনটি স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।

ত্র্যহস্পর্শ ঃ

অমৃতলালের 'রাজা বাহাদুর' প্রহসনের অনুসরণে লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের 'ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার' (১০০৭ বঙ্গাব্দ) কাহিনীর অসম্ভাব্যতা ও চরিত্রসৃস্টির ব্যর্থতার জন্য অনুল্লেখ্য রচনার দলে স্থান পাবার যোগ্য। বিবাহ বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধের বাতিক নিয়ে লেখা এই প্রহসনটিতে পিতা ও পুত্র, পিতামহ ও পৌত্রের একই পাত্রীর প্রতি যেভাবে আসক্তি দেখানো হয়েছে তার মধ্যে নাট্যকারের কোনো উচ্চ আদর্শ প্রকাশ পায় নি। পরন্তু চরিত্রগুলির গ্রাম্যতা ও স্থূল রুচি প্রহসনকার সম্পর্কেও দর্শক হৃদয়ে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। হাসির গান সতেরটিই এই প্রহসনের উপভোগ্য দ্রব্য। রাজা বিজয়গোপাল, তাঁর মধ্যমপুত্র আনন্দ গোপাল এবং পৌত্র কিশোরগোপাল—এই তিনজনে ত্র্যহস্পর্শের সৃষ্টি করেছেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর 'ত্র্যহস্পর্শ' স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।

প্রায়শ্চিত্ত ঃ

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি ক্লাসিক থিয়েটার অভিনীত অমৃতলালের 'বহুৎ আচ্ছা'র অনুকরণে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য সমাজ এবং বিলাত ফেরতা সমাজকে ব্যঙ্গাবিদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩০৮) নাটক রচনা করেন। এটি পরে সংশোধিত হয়ে 'বহুৎ আচ্ছা' নামে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষও এই প্রহসনে রয়েছে। এর প্রস্তাবনা অংশে রয়েছে কোরাসদের কণ্ঠে বিখ্যাত সঙ্গীত,—

"নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।
নাকগুলো কাটো, কানগুলো ছাঁটো,
পাগুলো সব 'উঁচু করে' মাথা দিয়ে হাঁটো;

হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো,
কিংবা চিৎপাত হোয়ে পাগুলো সব ছোড়ো;
ঘোড়া গাড়ি ছেড়ে এখন উটের ওপর চড়ো; ''

বিলাত ফেরৎ চম্পটি ও ধনী বিধবা ইন্দুমতীর উৎকট প্রেমোপাখ্যান এই প্রহসনের কাহিনীকে জটিলতা দান করেছে। বিনোদবিহারী ও সরোজিনীর ষড়যন্ত্র অর্থগুরু চম্পটি ও রোমান্স নায়িকার লক্ষণাক্রান্ত ইন্দুমতীকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছে। পরিণামে চম্পটি তাই বলেছে "দেখছি যে বিলিতি চালের চেয়ে বাঙ্গালীর পক্ষে দেশি চালই বহুৎ আচ্ছা।" এই প্রহসনের গানগুলি যথেষ্ট হাস্যরসের উৎসার ঘটিয়েছে। যেমন বিলিতিপ্রেমীদের সঙ্গীত,—

"আমরা বিলাতি ধরণে হাসি
আমরা ফরাসি ধরণে কাসি
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।"

সমাপ্তি সঙ্গীতে তুলে ধরা হয়েছে যুগগত আচার বিচারে নানান উলট পালট-এর কথা,—

"হ'ল কি? এ হ'ল কি? এত ভারি আশ্চর্যি!
বিলেত ফের্তা টানছে হুক্কা
সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চার্যি!"

বিদেশি শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত রমণীরা গেয়েছে,—

"গৃহের কার্য করুক সকলে খুড়ি জেঠী পিসী মাসীতে;
আমরা সবাই নব্যপ্রথায় শিখেছি হাসিতে কাসিতে;
করিতে নাটক নভেল শ্রাদ্ধ;
করিতে নৃত্য গীত বাদ্য ;
বসিতে, উঠিতে, চলিতে, ফিরিতে, ঘুরিতে দিবস যামিনী।"

"প্রায়শ্চিত্তে'র চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতিও স্বাভাবিক নয়।

পুনর্জন্ম :

অতি লঘুরচনার স্তর থেকে সার্থক প্রহসন হয়ে উঠতে পারেনি দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম' (১৯১১) নাটিকাটি, যদিও প্রহসনকার এ প্রহসনের মধ্যে নীতিকথা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন তুলেছেন—এখানে "প্রহসনের মর্ম যদি কেহ জানিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি যেন একটু চিন্তা করে দেখেন। ইহাতে নীতি কথার অভাব নেই।" প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রহসনে যে নীতির প্রশ্ন তুলেছেন—সে নীতি এখানে কতটা রক্ষিত সে ব্যাপারে সংশয় থেকেই যায়। ড. সুকুমার সেনের মতে একটি কাহিনী 'ইংরেজি হইতে নেওয়া'।

যাদব নামে এক কৃপণ, নির্মম ও স্বার্থপর সুদখোরের হাস্যকর জীবনচর্যা এবং ততোধিক হাস্যকরুণ পরিসমাপ্তি এই নাটকের মূলকাহিনী। 'পুনর্জন্মে'র শেষ দৃশ্যে যাদব চক্রবর্তীর মতো কৃপণ অমানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার অমানবিকতার জন্য তার উপর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব তো ক্ষুব্ধ ছিলই—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সৌদামিনী পর্যন্ত ষড়যন্ত্রে যোগ

দিয়ে যাদবকে মৃত ঘোষণা করে তার সম্পত্তি দখল করতে চেয়েছে। শিক্ষাপ্রাপ্ত যাদব গেয়েছে,—

"ওরে সিন্দুক ভরা টাকা মিছে বন্ধ করে রাখা।
যদি, লাগল না কারো উপকারে,
এলো নাক ব্যবহারে,
সে টাকা ত ধনীর ঘাড়ে শুধুই মুটের ঝাঁকা।
যে টাকার জন্য মর্চ্ছে ভেবে বার ভুতে উড়িয়ে দেবে
তোমার ভাগ্যে রৈল শুধুই উপোস করে থাকা।
ওরে টাকার উচিত ব্যবহারে রীতিমত আয়ু বাড়ে,
এই কথাটি একেবারে ব'লে গেলাম পাকা।"

'পুনর্জন্ম' প্রহসনে গানের সংখ্যা সাতটি। নাট্যকার জানিয়েছেন ডীন সুইফট নামে এক জোতিষীকে মৃত বলে ঘোষণা করার পর তিনি উকিল নিযুক্ত করেও নিজেকে জীবিত প্রমাণ করতে পারেন নি। এই বিদেশি সত্যকাহিনী অবলম্বনে দেশীয় কাঠামোর বাঙালি পরিবেশে 'পুনর্জন্ম' রচিত। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুলাই মিনার্ভা থিয়েটারে 'পুনর্জন্ম' অভিনীত হয়।'

আনন্দ বিদায় ঃ

বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্যারোডি নাটক রচনার কৃতিত্ব দ্বিজেন্দ্রলালের। 'আনন্দ বিদায়ে'র (১৯১২) মতো বিতর্কমূলক নাটিকার জন্য তিনি এ গৌরবের ভাগীদার।[১]

গিরীন্দ্রশেখর বসু বলেছেন "অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'নন্দ বিদায়' (১৮৮৮) নামক গীতিনাট্যের প্যারোডি হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ বিদায়' (১৯১২) প্রহসন রচিত হয়।"[২]

ড. সুকুমার সেন বলেছেন 'আনন্দ বিদায়' "রচনাটি বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের

---

১. 'আনন্দ বিদায়' ব্যঙ্গনাট্যটি 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রথম হয়। এই নাটিকায় ভূমিকায় নাট্যকার দাবী করেছেন— 'বাঙ্গালা ভাষায় বোধ হয় এই প্রথম প্যারডি নাটিকা। ইয়ুরোপীয় অথবা সংস্কৃত সাহিত্যে প্যারডি নাটিকার অস্তিত্ব আমি অবগত আছি। সঙ্গীতের মাধ্যমে, প্যারডি কবিতা ও গান সর্বসাহিত্যেই প্রচলিত আছে।' ভূমিকার পর প্রস্তাবনা অংশে নাট্যকার জানিয়েছেন,—
"এটা এক অভিনব নাটিকা।
ইংরাজি ভাষাতে একে বলে 'প্যারোডি'
জানেন ত পাঠক ও পাঠিকা।।
প্যারডিতে প্রহসনে পিষিয়ে
গুলে নিয়ে অপেরাতে মিশিয়ে
কটু ও মিষ্টে
(পরে) যা থাকে অদৃষ্টে—
(কাব্যে) কুনীতির পৃষ্ঠে ঝাটিকা।"
১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ নভেম্বর স্টার থিয়েটারে এটি অভিনীত হয়।"

২. বাংলা নাটকে গান / গিরীন্দ্রশেখর বসু / পৃঃ ৩০৭

'নন্দবিদায়' এর ব্যঙ্গ-অনুকৃতি। প্রথমে ইহার ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য ছিল 'কড়ি-ও-কোমল'। নাটিকাটি পরিবর্ধনের সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল ঘোরতর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিদ্বেষের একটা প্রধান উপলক্ষ্য ছিল পঞ্চাশদ্ বয়ঃপূর্তি উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন সমারোহ। পরিবর্ধিত 'আনন্দবিদায়ে' এই বিদ্বেষবিষ পুরোমাত্রায় উদ্গীর্ণ হইয়াছে।"[১] অমৃতলাল বসুকে উৎসর্গ করা এই বইতে যে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ না করাই দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্য ছিল, এই নাটিকার ভূমিকায় একথা জানিয়েছেন। কিন্তু তবু একথা ঠিক এই নাটিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-অনুগামীদের সঙ্গে নাট্যকারের সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। স্টার থিয়েটারে প্রহসনটির অভিনয় শুরু হলে রবীন্দ্রানুরাগী দর্শকেরা উত্তেজিত হয়ে এর অভিনয় বন্ধ করে দেন। কেনবা দ্বিজেন্দ্রলাল হয়ত 'নন্দবিদায়ে'র প্যারোডি করতে গিয়েছেন কিন্তু রচনাটি সমগ্ররূপে রাবীন্দ্রিক ব্যঙ্গ নাটিকায় পর্যবসিত হয়েছে। দুই অঙ্কে আটটি দৃশ্যে রচিত 'আনন্দবিদায়' যেন রবীন্দ্রগানের এক প্যারোডি সংকলন। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক,—

১। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান—'সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে'
দ্বিজেন্দ্রলাল লেখেন—'সে আসে ধেয়ে এন্ ডি ঘোষের মেয়ে'

২। দ্বিজেন্দ্রলাল লেখেন—"আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি leisure মাফিক বাসিও।"
রবীন্দ্রগানে ছিল—'তুমি অবসর মতো বাসিয়া।'
রবীন্দ্রনাথই যে আক্রমণের লক্ষ্য সেটা বোঝা যায় নিম্নোক্ত গানটিতে,—

"একাধারে কবি, অধিকারী, ঋষি,—কিবা ত্যাগ কিবা দান,
'পরিষৎ' জল ছিটায়ে দিলেই (কবিবর) স্বর্গে উঠিয়া যান।।"

এখানেই শেষ নয়। নেপালের গানে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কাব্যে স্পষ্টতা-অস্পষ্টতা ও কাব্যে নীতি নিয়ে কিছুদিন ধরে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তীব্র বিতর্ক চলছিল। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'সোনার তরী' কে তিনি অস্পষ্টতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন,—নেপালের গানে তাই দেখি,—

"আমি লিখছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্যে
নিজেই বুঝি না তার অর্থ বুঝবে কি তা অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং আজকাল যা সব লিখছি
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক শিখ্‌ছি।"

নাটকের নাটকীয়তাকে বাদ দিয়ে স্কেচধর্মী রচনায় ব্যক্তিগত আক্রমণই যদি মুখ্য হয়ে ওঠে সে নাটিকাকে সার্থক প্রহসন বলা যায় না। 'আনন্দ বিদায়ে'র ভাগ্যে সেই বিফলতা জুটেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা আরও একটি হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা' স্টার থিয়েটারে (১৯১১, ১১ নভেম্বর) অভিনীত হয়। এটি দ্বিজেন্দ্রলালের ওই নামের একটি কবিতার নাট্যরূপ।

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য়) / সুকুমার সেন / পৃঃ ৩৬৭

দুর্গাদাস দে (১৮৬৫—১৯১১)

উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলা প্রহসনের ধারাকে কিছুটা সতেজ করেছিলেন স্বল্প প্রাহসনিক প্রতিভাধর দুর্গাদাস দে। গতানুতিক প্রাহসনিক পদ্ধতিতে চালিত হয়ে তিনি কয়েকটি মঞ্চ-সফল রঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটিকা রচনা করেছিলেন। স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্বহীন এ নাটিকাগুলিও এককালে দর্শকদের স্থূল রুচিকে তৃপ্ত করেছিল।

পয়জারে পাজী ঃ

'পয়জারে পাজী' (১৮৯১, ২৩ ডিসেম্বর) দুর্গাদাস দের প্রথম প্রহসন। বীণা থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে সিটি থিয়েটারে কর্তৃক ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর এটি প্রথম অভিনীত হয়।[১] নাটিকায় কাহিনীকে দুটি ভাগে বিন্যস্ত করে তিনি সমাজের অপকৃষ্ট চরিত্রগুলির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। প্রথম ভাগে আছে বঙ্গভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণের লাম্পট্য। স্ত্রীস্বাধীনতাও এসেছে প্রসঙ্গত। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে স্ত্রীস্বাধীনতা ও বিধবাবিবাহের সমর্থক গয়ারামের কথা। সে সাম্য, সভ্যতা ও স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করে বক্তৃতা দেয়। সে নিজের বিধবা বোন, চল্লিশ বৎসরের পুত্রসহ বিধবা পিসি এবং নিজের সধবা স্ত্রীর বিবাহ দেবার আয়োজন করে। এই অংশে সমকালীন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা উপস্থাপিত—স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, free love, বিধবা বিবাহ, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি। বলা বাহুল্য কোনটিই নাট্যকারের প্রশ্রয়ী মনোভাবের স্পর্শ পায় নি। গয়ারাম মুখে রাজা বাদশা মারলেও সে আসলে একটি লম্পট। মুচির স্ত্রীকে রাস্তায় দেখে সে তাকে প্রেম জানায়, মুচি গয়ারামের এই ব্যবহারের যোগ্য পাওনা প্রহার করে মিটিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল যে খেলুড়ে পার্টি, যারা ধরেছে কাবুলে সম্পাদক, বঙ্গভট, রামনিধি সমাজ সংস্কারককে—তারা তাকে ধরে মুখে লাগাম পরিয়ে নিয়ে যায়। কাহিনী অংশে নূতনত্ব কিছু নেই—হাস্যরসের প্রবাহ অনেক ক্ষেত্রে নাট্যকারের অসংযমী কাহিনী বিন্যাসের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ভন্ড সমাজ সংস্কারকের চরিত্রটি ভালো ফুটেছে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ মার্চ বীণা থিয়েটারের মঞ্চে সিটি থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত হয় ' ভোট ভেল্কি'। গিরিশচন্দ্রের 'ভোট মঙ্গলের' ছাঁচে তৈরি এটি।

বড়দিনের পঞ্চরং ঃ

'ছবি' বা 'বড়দিনের পঞ্চরং' (১৮৯৬, ২৮ ডিসেম্বর) রূপকথার মতো অবিশ্বাস্য কাহিনীর মোড়কে ঢাকা। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নদেরচাঁদ মেয়ের বিয়েতে কম টাকা লাগবে এই প্রত্যাশায় কন্যা বঙ্কিম বিনোদিনীকে সর্বাধুনিকা করে গড়ে তুলেছেন। সে বি. এ. অনার্স পাশ করেছে। সে জিমনাস্টিক মাঠে যায়, সে নাটক নভেলের প্রেম নিয়ে বড়ো

১. Statesman পত্রিকার ২৩ তারিখের নিম্নরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়— '24TH DECEMBER, At 9 P.M. / Babu Girish Chunder Ghosh's devine drama/ BUDDHA/To conclude with our X-mas Pantomime, a/Fashionable/Humbag/Pyzara-Pazi/Dyspepsia will be cured/by a single Drop. NILMADHAB CHAKRABORTI (lessee & Secretary) 'পয়জারে পাজী' প্রহসনটি বহুবার অভিনীত হয়েছিল।

বেশি মশগুল। রামদাস নামে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সঙ্গে তার বিয়ে হল পণ দিয়ে। বিনোদিনীর বিলিতি জিনিসের ফরমাস মেটাতে গিয়ে রামদাস ঋণের দায়ে জেলে যায়। তখনও বিনোদিনীর নায়িকা ঢঙ ঘোচে নি। জেলার সাহেব বিনোদিনীকে ধিক্কার দেওয়ায় এক কথায় সে হঠাৎ বদলে যায়। স্বামীকে দেশি পদ্ধতিতে সে প্রণাম করে।

মিস্ বিনো বিবি বি.এ. ঃ

দুর্গাদাস দের পরবর্তী প্রহসন 'মিস্ বিনো বিবি বি. এ' (১৮৯৮, ২৫ জুলাই) স্ত্রীশিক্ষাও স্ত্রীস্বাধীনতার উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে নাট্যকারের মতামতটি এখানে প্রকাশিত। বলা বাহুল্য, 'ছবি'তেও ধরণের মানসিকতায় স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি দেখানো হয়েছে।

ল্য-বাবু ঃ

দুর্গাদাস দের 'ল্য-বাবু' প্রহসনটি (১৮৯৮) এই সময়ই রচিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে এটি অভিনীত হয়।[১] রাজা বাহাদুর, রায়বাহাদুরের খেতাবের লোভে কোলকাতায় অনেক ধনী পরিবার ইংরেজিয়ানা রপ্ত করেতে গিয়ে কীভাবে সর্বস্বান্ত হয়েছে তার পরিচয় রয়েছে এতে।

টুনিরাম হলেন ন-বাবু, ভৃত্য শিবু বলে 'ল্য-বাবু। টুনিরাম টাইটেল পেতে চান বলে মেয়েদের স্কুলে পড়াচ্ছেন, স্ত্রীকে মেম করে তুলেছেন, চাপরাশীকে ধরে সাহেবদের নেক নজরে পড়ার চেষ্টায় হুদ্দর পাইখানার উড়ে চাপরাশীর তোয়াজ করেন। পাশাপাশি রয়েছে তাঁর শালা বিজ্ঞান-পাগল বয়স্কা বারবণিত সক্ত টেলিফোঁকুমারের হাস্যকর কাহিনী। টুনিরামের কথায় সে নাকি আবিষ্কারের তেজে বয়স্কা বারবণিতাকে যুবতী করে ফেলবে। এখানে অমৃতলালের 'বাবু' প্রহসনের প্রভাব স্পষ্ট। টেলিফোঁকুমার 'লালদীঘি' মন্থন করে নানা বয়সের নারীকে তুলে নিয়ে আসে। গিরিশচন্দ্রের 'পাঁচকনে' প্রহসনের অনুসরণে এ বক্তব্য পরিবেশিত। টুনিরামের বাড়িতে চলছে সাহেবীয়ানার চূড়ান্ত। তার মেয়ে ঠাকুমাকে যিশুর স্তব করতে বলে, নিজে সে গলা ছেড়ে বিদ্যাসুন্দর থিয়েটার করে। বাবা টুনিরামের বাধাতে কিছু হয় না। টাইটেল লোভী টুনিরামের শেষ আশ্রয় হয় চিড়িয়াখানায়।

অমৃতলালের মতো দুর্গাদাসও স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। আধুনিক কালে জন্মেও তাঁর মধ্যে মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল মানসিকতা রয়ে গিয়েছে।

Encore ! 99 ! শ্রীমতী !

'Encore ! 99 !!! শ্রীমতী !!!' (১৮৯৯, ৯ ডিসেম্বর) প্রহসনটিকে দুর্গাদাস 'সামাজিক ব্যঙ্গকাব্য' বলে উল্লেখ করেছেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে এটি অভিনীত হয়।

আলালের ঘরের দুলাল নচ্ছারবাবুর মোসাহেবদের নিয়ে দিন কাটে। হঠাৎ মিস্ নিস্তারের কথা তার মনে জেগে ওঠে। সাড়ে আঠার ভাজার মতো হিন্দুধর্মকে একটু মডার্ণ করে নিতে 'ননসেন্স ক্লাবে' যুক্তির পর নচ্ছারবাবু নবকৃষ্ণ লীলা করার উপায় বের করেন— গোপিনীদের ব্যারাকে লুকিয়ে গিয়ে মাখন খাওয়া, বিডন বাগানে যথেচ্ছ বেড়ানো প্রভৃতি।

১. 'ল্য-বাবু একটি মঞ্চ সফল প্রহসন। এটি বহুবার অভিনীত হয় বীণা থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে।

কিন্তু নচ্ছারের অর্থাৎ ধিনিকৃষ্ণের শ্রীমতী আধুনিকা। সে ধিনিকৃষ্ণকে যথেচ্ছ শায়েস্তা করে তার সর্বস্ব লুঠে নেবার জন্য প্রয়াস করে। কিন্তু ধিনিকৃষ্ণ নিজেকে সামলে নেয়। শ্রীমতীর বিরহে ব্যথিত হয়ে সে বলে আধুনিকাদের ব্যবহার "ভালো আহার দিতে পার তোমার হব, নইলে সু বিট করবো। সুখে রাখ মিস্টি কথা কইব, নইলে গালাগালির চোটে ধাপার মাঠে পাঠাব। পয়সা দাও, তবে প্রেম দেখাব।"[১] অনেক মান অভিমানর পালা সাঙ্গ হবার পর ধিনিকৃষ্ণ আর 'রিফাইন এনকোর নাইনটি নাইন, মিষ্টার নচ্ছারবাবুর নিজের পরিবারে'র মিলন হল। ঘরের বৌকে রাস্তায় বের করে এনে স্ত্রীস্বাধীনতা দেখানো বিরুদ্ধে নাট্যকার যেন গর্জে উঠেছেন এখানে।

দুর্গাদাসের প্রহসনগুলি তাঁর বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্ত করেছ। অমৃতলালের অন্ধ অনুকারী দুর্গাদাসও প্রাচীনপন্থী ছিলেন। তাঁর প্রহসনগুলিতে প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে নাট্যকারের লেখনী স্যাটায়ারে মুখর হয়ে উঠেছে স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতির সমর্থক তিনি ছিলেন না। তিনি বাঙ্গালীর প্রাচীন লৌকিক সংস্কারে বিশ্বাস করতেন। 'বড়দিনের পঞ্চরং' প্রহসনে বাঙালিয়ানার জয় ঘোষণা করেছেন শেষ পর্যন্ত দুর্গাদাসের উদ্দেশ্য ছিল সমাজশোধন। সমকালীন ঘটনাগুলি তাঁর মনকে যে নাড়া দিয়েছিল তা তাঁর প্রহসনগুলিতে প্রমাণিত হয়েছে।

---

১. স্ত্রী স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি হবার সম্ভাবনায় উনিশ শতকেই 'আদরিণী' পাত্রিকা সাবধান করে দিয়েছিল। সমসাময়িক আর একটি পত্রিকা এ সময় গ্রামবাংলায় নৈতিক অধঃপতনের রেখাচিত্র এঁকেছে—"...বঙ্গ দেশের সমুদয় গ্রাম এবং নগরে অশ্লীল গালাগালি, সঙ্গীত এবং কথাবার্তার স্রোত অনিয়ত চলিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে সাধারণের নীতি এরূপ হীন যে, সম্পর্ক বিশেষ গুরুজন অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণের সহিত সহিত অতি অশ্লীল পরিহাস করিয়া থাকেন। ...অবশ্য ইতর শ্রেণীর মধ্যেই ইহা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। কিন্তু ইহা ইতর শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ নহে। অনেক 'ভদ্র' পরিবারেও লক্ষিত হইয়া থাকে।" দোসী/১২৯৯, চৈত্র/পৃঃ ২৩৫/অশ্লীলতার নিবারণ

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩—১৯২৭)

নাট্যবৈশিষ্ট্য : অধ্যাপনার জগৎ ছেড়ে নাটককে ভালোবসে বাংলা নাটকের জগতে এসেছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। তাঁর স্বক্ষেত্রে বাংলা নাটকের গীতিনাট্য শাখা; 'আলিবাবা'র মতো অসাধারণ জনপ্রিয় গীতিনাট্যের স্রষ্টা তিনি। বাংলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার সুবাদে কিছু ফরমায়েসী রচনায় হাত দিতে হয়েছে তাঁকেও। তাঁর প্রথমদিককার হাস্যরসাত্মক নাটিকাগুলি এভাবেই রচিত হয়েছিল। প্রহসনকার ক্ষীরোদপ্রসাদ এই নাটিকাগুলিকে রঙ্গনাট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে শুধু রঙ্গের ক্ষেত্রেই নাটিকাগুলির বক্তব্য সীমাবদ্ধ হয়ে নেই—তা ব্যঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে—এভাবেই এই রঙ্গনাট্যগুলি মধ্যে প্রহসনের লক্ষণও খুঁজে পাওয়া গেছে। তাই বাংলা প্রহসনের আলোচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদকে বাদ দিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ক্ষীরোদপ্রসাদের হাস্যরসাত্মক নাটকগুলির কয়েকটি বিশেষত্ব রয়েছে—

ক. কৌতুক এবং রঙ্গই এই নাটিকাগুলির প্রাণ।

খ. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য satire-এর ছোঁয়া রয়েছে।

গ. জীবনরস এবং হাস্যরসের ওতপ্রোত মিশ্রণে বাস্তবজীবন সম্পর্কে সচেতন নাট্যকারের দ্বারা এই প্রহসনগুলির রচিত।

প্রেমাঞ্জলি :

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রেমাঞ্জলি' রঙ্গনাট্যটি সম্ভবত প্রহসনকারের লেখা প্রথম প্রহসন। এই প্রহসনের কাহিনী নিম্নরূপ—নারদের ভাগনে পর্বতমুনি এবং স্বয়ং নারদমুনির মর্ত্য নারীর প্রতি প্রেম জেগে ওঠে। প্রেমমুগ্ধ এই দুই মুনির নারীর পদতলে প্রেমাঞ্জলি প্রদানই এই রঙ্গনাট্যের মূল কাহিনী। পর্বতমুনি, নারদ, রমা ও সুকুমারীর পারস্পরিক প্রেমনিবেদনের মাধ্যমে 'প্রেমাঞ্জলি' নাটিকাটিতে হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই নাটিকায় বাঙালি মানসিকতাকে তৃপ্তি দেবার উদ্দেশ্যে নারদ চরিত্রটিকে একান্ত লঘু করে এঁকেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। কয়েকটি হাস্যরসের গানও রয়েছে। জনার্দনের একটি গানের উদাহরণ নেওযা যাক,—

"হেরে তার বদনখানি,
প্রাণে প্রাণে টানাটানি,
কেমনে প্রাণ—সজনি,
হিয়ার মাঝার গেছে ছ'ড়ে।"

আয়তনের দিক থেকে 'প্রেমাঞ্জলি' ঠিক প্রহসন হতে পারে না। কারণ এটি চার অঙ্কে রচিত।

প্রমোদরঞ্জন :

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রমোদরঞ্জন' রঙ্গনাট্যে লঘু কৌতুকের মধ্য দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপস্থাপনা করেছেন। 'প্রমোদরঞ্জন' নামকরণের মূলে রয়েছে প্রমোদ ও রঞ্জন নামে দুই বন্ধু। এই দুই বন্ধুর বিশেষ সিদ্ধান্ত ও পরিণাম চিত্রণই এই প্রহসনের মূল কথা। মানুষের ব্যবহারে তিক্ত হয়ে প্রমোদ মানুষের সঙ্গ ছেড়ে গভীর অরণ্যে চলে

যেতে চাইলে নাছোড়বান্দা রঞ্জন তার সঙ্গী হল। কিন্তু প্রমোদ রঞ্জনের সঙ্গও চায় না। তাই একদিন রঞ্জনকে নিদ্রিত অবস্থায় রেখে প্রমোদ তাকে মুক্তি দেবার জন্য এবং নিজ মানস শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় গভীরতর বনে প্রবিষ্ট হল। হাস্যরসের লঘুপ্রবাহ এই কাহিনীর গূঢ় সঞ্চারী বক্তব্যের উপরেই যেন রয়ে গেছে, গভীরে প্রবেশ করে নাটকটিকে সার্থক হাস্যরসাত্মক নাটক করে তোলে নি।

ভূতের বেগার ঃ

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের লেখা একটি জনপ্রিয় প্রহসন 'ভূতের বেগার' ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ কোহিনূর থিয়েটার প্রথম মঞ্চস্থ হয়। বাঙালির চাকুরীপ্রিয় মানসিকতার প্রতি অম্লমধুর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে বাঙালির মানসপ্রকৃতি বদল ঘটাতে চেয়েছেন প্রহসনকার।[১] প্রস্তাবনা অংশেই একটি গানে প্রহসনকার বাঙালির চাকরি-সর্বস্বতাকে আঘাত করেছেন,—

"চাকরি চাকরি চাকরি (ও গো)
বাবুরা চাকরি নিয়ে গেছেন সহরে।
তাড়াতাড়ি বাড়ী ছেড়ে—
চাবি দিয়ে সদরে।।
কলম পিষে দিবা-রাত দু'বেলা জোটে না ভাত
ব'সে ব'সে গেঁটে বাত—(আফিসে)..."

বিশ শতকের প্রথম দিকে 'জন্মভূমি', 'অনুসন্ধান' প্রভৃতি পত্রিকায় বাঙালির চাকরিপ্রিয় মানসিকতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

দাদা ও দিদি ঃ

১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি' প্রহসনটি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর কোহিনূর থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত হয়। উপেন্দ্রনাথ দাসের জনপ্রিয় প্রহসন 'দাদা ও আমি' অনুকরণে এই নামকরণ করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আচরিত নর-নারীর পারস্পরিক আচরণের প্রতি কিছুটা বিদ্রূপ করা হয়েছে। বিদেশীদেরও ব্যঙ্গ করা হয়েছে এখানে। এর কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ,—

চন্দ্রদ্বীপে উপযুক্ত খাদ্যের অভাব হওয়ার তক্ষকও শঙ্খিনী দলবল নিয়ে বেলুনে চড়ে চলে আসে হট্টমালার দেশে। হট্টমালা সোনার দেশ। সেখানে প্রাচুর্য আছে আর আছে হুজুগ। রাজা চিত্রবিন্দু, রাণী চিত্রলেখাও হুজুগপ্রিয়। বেলুনে চড়ে মানুষ এসেছে শুনে রাজা-রাণী সমেত দেশের প্রজারা ছুটে আসে। তক্ষক শঙ্খিনী নিজেদের রাজার শ্বশুরবাড়ির লোক বলে পরিচয় দেওয়ায় রাজা তাদের রাজপ্রসাদে আশ্রয় দেয়। পরে রাজা নিজেই প্রসাদচ্যুত হয়। রাজা-রাণীকে তক্ষক শ্মশানে নির্বাসিত করে। তখন রাজার চোখ ফুটে।

১. "নিরন্তর হাস্য রসোৎপাদন করা ও তৎসহ কোনো সামাজিক বা সাময়িক ঘটনা বিশেষের দোষ বিবৃত করাই প্রহসনের তাৎপর্য। সুতরাং তদুদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশে প্রহসন কোনো বিষয় বা ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়া চিত্রিত করিলে বা কোনো বিষয়ের কিয়ৎ পরিমাণে অনৈসর্গিক বর্ণনা করিলে দোষ হয় না।" [প্রবাহ/১২৮৯, আশ্বিন/পৃঃ ১৬৭]

এই হাস্যরসাত্মক নাটিকায় ক্ষীরোদপ্রসাদ একসঙ্গে অনেক দিকে তাঁর সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করেছেন—(১) তক্ষক-শঙ্খিনীর পারস্পরিক সম্পর্ক ব্রাহ্মদের সম্পর্কে মত তারা সাধারণ মানুষের কাছে দাদা ও দিদি রূপে প্রথমে নিজেদের পরিচয় দেয়। (২) ইংরেজরা যেমন এদেশে এসে ধাপে ধাপে এদেশ অধিকার করে আমাদের হুজুগপ্রিয়তার জন্য—তেমনি এ প্রহসনেও হট্টমালার দাদা-দিদিরা দেশ দখল করে নিয়েছে সুযোগ বুঝে। (৩) হুজুগের রূপ নানরকম—এখানে দেখানো হয়েছে উনিশ শতকের শেষ দশকে কোলকাতার বেলুনে চড়া নিয়ে যে হুজুগ দেখা দিয়েছিল তা-ও। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহসনে। (বেলুনে বাঙালি বিবি) এই বিষয়টি আরও চমৎকারভাবে ধরা রয়েছে। (৪) দেশের সর্বক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সবার আগে দরকার ভোগবিলাসে মানুষকে ডুবিয়ে দিয়ে তাদের অকর্মণ্য করে তোলা। এই প্রহসনে দেখি হট্টমালার কমবয়সী ছেলেরাও নানা কাজ করে থাকে—হট্টমালার সমৃদ্ধির মূলে এই পরিশ্রম, এটা বুঝতে পেরে ছদ্ম-সহানুভূতি দেখিয়ে তক্ষক কমবয়সী ছেলেদের মহাসর্বনাশ করে,—

"তক্ষক। কীসের জন্য তোরা এমন দুঃখু করিস ভাই?
১ম বালক। আর কীসের জন্য—দু'মুঠো খাবার জন্যে।
তক্ষক। য়্যাঁ! এই তুচ্ছ জিনিষের জন্যে এত মেহনৎ—আয় আমরা তোদের খাবার দিই। (লজেঞ্জুস প্রদান)....
বালকগণ। (খাইতে খাইতে) তাহলে আমরা কি করবো?
তক্ষক। তোমরা কেবল বসে বসে খাবে—" (৭ম দৃশ্য)

(৫) হট্টমালার মানুষের সমৃদ্ধির মূলে ছিল সততাও। তক্ষক তাই তাদের মদ ধরিয়ে (ভেলু ও ফেলুকে) অসৎ করে দেয়।

তক্ষকদের জপমন্ত্রটিও চমৎকার—"জিজ্ঝাংষা (জিঘাংসা) জুগোপিষা (জুগুপ্সা) চিকিমিষা (চিকিৎসা) বিজীগিষা" (৪র্থ দৃশ্য) দশটি দৃশ্যে রচিত এই রঙ্গনাট্যের গানগুলি কিন্তু হাস্যরস সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়নি।

রূপের ডালি ঃ

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রূপের ডালি' প্রহসন রচনা করতে গিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ 'পারস্য উপন্যাসে'র কল্পকাহিনীকেই অবলম্বন করেছেন। এই নাটিকায় তিনি আগাগোড়া 'ফাঁকির গান' গেয়েছেন। প্রস্তাবনা অংশে রয়েছে সেই ইঙ্গিত। বোখারার কাহিনী নিয়ে 'রূপের ডালি' রচিত।

বোখারার নবাব খাঞ্জা খাঁ সমরকন্দের ছদ্মবেশী সুলতান আসগর আলির কন্যা সেলিমাকে পারস্যের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মনোনীত করেন এবং তাকে একটি মহামূল্যবান ওড়না উপহার দেন। রূপের প্রতি খাঞ্জা খাঁর এই ডালি প্রদানে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তাঁর বেগম রোশেনা। এদিকে সমরকন্দের সুলতান বোখারার এক বণিক-পুত্র ওস্‌মানকে করেন। পরে ওসমানই তাঁর এবং তাঁর সেলিমার কন্যা সেলিমার জীবন ও সম্মান রক্ষা করেন। খুশি হয়ে আসগর আলি নিজের কন্যা সেলিমার সঙ্গে ওসমানের বিবাহ দেন।

এই প্রহসনে কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে যখন রোশেনা সেলিমার প্রতি ঈর্ষাবশত তাকে অপদস্থ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তালপাতার তলোয়ার দেখিয়ে ওসমান

রোশেনার চক্রান্ত ব্যর্থ করেন। একদিকে রঙ্গ-চিত্র অন্যদিকে নৃত্য-গীতে নাটকটিকে জমজমাট করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে 'আলিবাবা' নৃত্যনাট্যের ঢঙে। এই রঙ্গনাট্যের প্রস্তাবনা গীতিতে এর উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে,—

"আগাগোড়া গাইব ফাঁকির গান।
পিয়ে সুধার ধারা হয়ো না হে বুদ্ধিমান।।
নূতন ঢং এর কারখানা,
এর ষোল আনাই ফাঁকি।
কিনতে হবে পীরের নামে—পূরো দামে—
পাই কড়াটি থাকবে না বাকী।।
রসিক যদি থাক কেউ
দেখবে নূতন মজার ঢেউ
ধাক্কা দিয়ে প্রাণের তারে তুলবে নূতন তান—
আনবে টেনে মনের মানুষ
ডাকবে প্রেমের বান।"

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬—১৯১৬)

যুগরুচি সম্পর্কে সচেতনতা : বাংলা প্রহসনের আকাশে অমৃতলাল বসু তখন মধ্যাহ্ন সূর্যের তেজে ভাস্বর, সে সময় সমকালীন দর্শক রুচি চরিতার্থতার সাথে সাথে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অবক্ষীয়মান বাংলা প্রহসনকে শেষবারের মতো ঔজ্জ্বল্য দেবার চেষ্টা করেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ একদিকে ছিলেন নাট্যকার, অন্যদিকে ছিলেন বিখ্যাত নট ও নাট্য-পরিচালক। ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তিনি দর্শক রুচি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। রঙ্গামঞ্চের প্রয়োজন মেটাতে অমরেন্দ্রনাথ পৌরাণিক নাটক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মানসগঠনটি সিরিয়াসে নাটক রচনার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত ছিল না। বরং অনাবিল হাস্যরসের উৎসারে লঘু নাটিকা রচনায় অমরেন্দ্রের কৃতিত্ব সমধিক। বস্তুতপক্ষে সে সময় রসরাজ অমৃতলাল ছাড়া অমরেন্দ্রনাথের সমকক্ষ প্রহসনকার বিরল ছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ যুগস্রষ্টা নন, যুগানুসারী। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের এবং নিজ পারিপার্শ্বিক জগতের সমস্যাগুলিকে নিয়ে প্রহসন রচনায় তিনি অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। পূর্বতন ধারাকে অনুসরণ করে তিনি কখনও তদানীন্তন শিক্ষার নামে উচ্ছৃঙ্খল আচরণকারী যুবসমাজকে বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করেছেন। কখনও-বা স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও স্ত্রীস্বাধীনতার বাড়াবাড়িকে আঘাত করেছেন। যুবসমাজের চশমা ব্যবহারও তাঁর কৌতুকদৃষ্টিতে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে। তিনি রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নানা স্বাদের অজস্র প্রহসন রচনা করেছিলেন। প্রহসনগুলির বিষয়বস্তু সবক্ষেত্রে এক নয়। এগুলি বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্যে অমরেন্দ্রনাথের সমকালজ্ঞতার প্রমাণ দেয়।

মজা ঃ

প্রহসনটির 'মজা' (১৯০০) নামকরণ করে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই নাটিকাটির সহজত্ব এবং সারল্যের পরিচয় দিতে চেষ্টা করলেও এটি মোটেই 'জলবৎ তরলং' নাটিকা নয়। অমৃতলাল বসুর প্রহসন স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে নাট্যকারের নিজস্ব মতামতের যেমন পরিচয় মেলে, তেমনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি ব্যঙ্গও অস্পষ্ট থেকে যায় নি। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অমৃতলালের পথেরই পথিক।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'মজা'। প্রথম অভিনয় অভিনয় রজনীতে কয়েকটি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন,—

হরিহর—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।	ফুলকুমারী—কুসুমকুমারী
নদেরচাঁদ—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।	মোহিনী—প্রমদাসুন্দরী
নিতাই—নটবর চৌধুরী	গণক-পত্নী—বিনোদিনী (হাঁদি)
গণক—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু	মালতী—প্রকাশমণি

'স্টেটস্‌ম্যান্' পত্রিকায় 'মজা' প্রহসনের বিজ্ঞাপনটি ছিল নিম্নরূপ,—

"Hurrah! Hurrah! A HAPPY NEW YEAR TO ALL!

CLASSIC THEATRE

Dramatist—Baboo G.C. Ghose

MONDAY NEW YEAR'S DAY, 1ST JAN, 1900,
AT 7 P.M.
GRAND OPENING OF
A.N.Dutt's New Society Sketch
FUN or MOJA !
Wit, Humour, Fun, Frolic, Dancing, Singing"[১]

এই প্রহসনের সঙ্গে 'হরিরাজ' নাটকেরও বিজ্ঞাপন ছিল। 'মজা' প্রহসনটি জনপ্রিয় হবার কারণে বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছিল।

হাস্যরসাত্মক 'মজা' নাটিকাটিতে নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উচ্ছৃঙ্খল স্ত্রীসমাজের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল স্ত্রীসমাজকে আরও নাড়া দিয়েছে 'ফ্রি-লাভ' বিষয়ক সমকালীন বিশেষ সমাজের চিন্তা ভাবনা। 'মজা' নাটিকায় আক্রমণের মূল লক্ষ্য স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা নয়— লক্ষ্য 'ফ্রি-লাভ'-এর উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গবাণের বর্ষণ।[২] 'ফ্রি-লাভে'র সমর্থক ফুলকুমারী ও মোহিনীর দ্বৈত সঙ্গীতে এর প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো হয়েছে,—

'এদেশে কে রবে
গঞ্জনা কে সবে
চ'ল দেশ ছড়িয়া যাই
ঘরে ঘরে বল উচৈচঃস্বরে
ফ্রি-লাভ প্রিচ্ করিয়া বেড়াই।"

একদিকে ফ্রি-লাভ অন্যদিকে সনাতন ঘর-গেরস্থালী পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে নাট্যকার যথেষ্ট হাস্যরসের উদ্ভাবন করেছেন। অমরেন্দ্রনাথ 'মজা' নাটিকায় 'কুলের বধু'র ঘরের বাইরে বেরিয়ে 'হাওয়া খাওয়াকে' ধিক্কার জানিয়েছেন।

থিয়েটার ঃ

অমরেন্দ্রনাথের 'থিয়েটার' প্রহসনটি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ আগস্ট ক্লাসিক থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত হয়। 'থিয়েটার' ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন। মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী শ্রীপুরের তরুণ জমিদার শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার এবং নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এই প্রহসনে।

খুলনার বাঙাল নগেন কোলকাতায় পাবলিক থিয়েটার খুলতে এসে কি বিপাকে পড়েছিল তাই এ কাহিনীর বিষয়। এই প্রহসনটিও বেশ মঞ্চ সফল। কারণ ১৯০০ সালে বার বার 'থিয়েটার' প্রহসনটি অভিনীত হয়েছে। ২৫ আগস্টে প্রথম অভিনয়ের পর ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৩, ২০, ২৭ অক্টোবর, ২১ নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসেও 'থিয়েটার'

১. The Statesman, 1st January 1900

২ "প্রাচীন ভারতে যেরুপ স্ত্রী স্বাধীনতা ছিল তাহাই প্রবর্তিত হউক। স্বামীর সহিত স্ত্রী যথেচ্ছা যাইবে, স্বামীর বন্ধু বান্ধবের সহিত কথা কহিতে পারিবে ইত্যাদি। এই স্বাধীনতাই যথেষ্ট, ইহার উপর অন্য কোনো প্রকার স্বাধীনতা দিতে আমরা কুন্ঠিত।" আদরিণী ১২৮৯ সাল ২য় সংখ্যা/পৃঃ ৭২। 'আদরিণী' পত্রিকার এই মানসিকতার সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের মানসিকতা মিলে যায়।

বহুবার অভিনীত হয়। 'থিয়েটার' প্রহসনের মুখ্য ভূমিকাগুলিতে প্রথম রজনীর অভিনেতা অভিনেত্রীবৃন্দ হলেন,—

নগেন্দ্র (খুলনানিবাসী ধনীর সন্তান)—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
বরেন (নগেনের ভ্রাতা)—অহীন্দ্রনাথ দে
গুণেন্দ্র (হাইকোর্টের উকিল, নগেনের আত্মীয়)—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত
যতীন (গুণেন্দ্রের পুত্র)—বিনোদিনী (হাঁদি)
নটবর (থিয়েটারের ম্যানেজার ও নাট্যকার)—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
খাঁটিচাঁদ (সম্পাদক)—জীবনকৃষ্ণ সেন।
রসময় (মহাজন)—নটবর চৌধুরী
সুবর্ণলতা (নগেনের স্ত্রী)—রাণীসুন্দরী।
রসবতী (গুণেনের স্ত্রী)—কুসুমকুমারী
পটল সুন্দরী (জনৈকা বেশ্যা)—পটল।
ক্ষান্তমণি (পটল সুন্দরীর মা)—গুলফম্‌হরি[১]

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'লাট গৌরাঙ্গ' (১৯০৫) প্রহসনটি ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অনেকগুলি প্রহসন রচনা করেন। তাঁর লেখা **'চাবুক'** (১৯০৫) প্রহসনটির নামে যতটা বিদ্রূপ কিংবা বিক্ষোভের পরিচয় মেলে, কার্যক্ষেত্রে নাটিকাটিতে ব্যঙ্গের চাবুক সেভাবে আস্ফালিত হয়নি। এই নাটিকায় অমৃতলাল বসু ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণে পাশ্চাত্য শিক্ষায় মোহগ্রস্ত যুব সমাজকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণে জর্জরিত করে নিজ অবস্থা সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে চেয়েছেন নাট্যকার। প্রহসনটির একটি গানে শহরের প্রকৃত চিত্রকে ফুটিয়ে তুলে এর মেকিরূপ প্রকাশ করে দিয়েছেন,—

"লেডি ভলেন্টিয়ারগণ,—
সহরে আগাগোড়া জাল
ভেতর ঢাকা বাইরে চিকণ চাল...."

অমৃতলালের মতো সমাজের বিভিন্ন কোণে অমরেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের চাবুক আছড়েছেন। সে পলিটিক্যাল লিডার হোক, কী এডিটার হোক, কী বাবু হোক—সর্বত্রই খোঁচা দিয়েছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি ক্লাসিক থিয়েটার অভিনীত হয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের **'কোনটা কি'** প্রহসন। এরপর কিছুদিনের জন্য তাঁর ক্লাসিক থিয়েটারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মে হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রীটের জংশনে (বর্তমান গ্রেস সিনেমা) অমরেন্দ্রনাথ নূতন থিয়েটার শুরু করেন। প্রথম দিন মনোমোহন গোস্বামীর ঐতিহাসিক নাটক 'পৃথ্বীরাজের' সঙ্গে অভিনীত হয় অমরেন্দ্রনাথের লেখা প্রহসন **'ঘুঘু'**। ক্লাসিক থিয়েটার নিজের প্রয়োজনে আবার অমরেন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে আনে। প্রিন্স অব ওয়েলস এ সময় ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন। এই ঘটনাকে অবলম্বন করে অমরেন্দ্রনাথ লেখেন **'এসো যুবরাজ'** নামক প্রহসনটি। বলা বাহুল্য এটি ক্লাসিক থিয়েটার মঞ্চে অভিনীত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর।

---

১. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান/শঙ্কর ভট্টাচার্য/পৃষ্ঠা : ৫২৯—৩০

কেয়া মজাদার ঃ

স্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য অমরেন্দ্রনাথ 'কেয়া মজাদার' নামে একটি প্রহসন রচনা করেছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর এই প্রহসনটি স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্রের আদর্শে লেখা পঞ্চরং জাতীয় রচনা এটি। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সময় বিভিন্ন মঞ্চে 'পরীস্থান' নামে একটি নক্সা জাতীয় রূপকথাধর্মী অভিনয় কলা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। স্টার থিয়েটারে বহুবার 'পরীস্থান' অভিনীত হয়েছে। দৈনন্দিন অভিনয় তালিকা দেখলেই তা বোঝা যায়। অমরেন্দ্রনাথের 'কেয়া মজাদার' পঞ্চরংটিতে কালাপরী এবং পরী রাজ্যের সেনাপতি সত্যম খাঁর মাধ্যমে কিছুটা উদ্ভট রস সৃষ্টি হয়েছে।

কাজের খতম ঃ

অমরেন্দ্রনাথ রচিত 'কাজের খতম' ও পঞ্চরং জাতীয় রচনা। নক্সাধর্মী এই নাটিকার স্ত্রীশিক্ষা, বিলিতিয়ানা, শাড়ি গাউনে আসক্তি, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার—সবকিছুকেই আক্রমণের লক্ষ্যস্থল করা হয়েছে।

এক অঙ্কে রচিত সাতটি গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত 'কাজের খতম' নাটিকাটির শুরুতে রয়েছে প্রস্তাবনা অংশ। এই অংশে আছে স্কুলের ছাত্রীদের গান,—

"ওলো দিদি ঘুচ্‌লো যাওয়া থিয়েটার।
স্কুলের পড়া, যিশুর ছড়া,
এ জীবনে হ'ল সার।"

'কাজের খতম' নাটিকায় রামকান্তবাবু ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে কৌসুলি করে এনে গোবর খাইয়ে শুদ্ধ করে নেবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু ছলে বিলেত থেকে ফিরে এসে একেবারে বিগড়ে গিয়েছে: রামকান্তবাবু বলেন—"ধুতি চাদর পরতে বলেছিলুম আমায় গালি মারতে বাকি রেখেছি।" তার স্ত্রীও দারুণ মেম। মতি অভিনেতা। বাচস্পতি সেজন্য তাদের ঘৃণা করেন। তিনি বলেন,—"আজকালকার থিয়েটার নরক। নরক। সেথায় নটী সংকীর্তন করে, ওরূপ স্থানে ভদ্রলোক যায়"? (১/১) মতি ক্ষিপ্ত হয়ে জানায়,—'বেশ্যাপল্লীতে গিয়ে পয়সার জন্যে ঠাকুর পূজা কর;.... তাতে বুঝি কিছু হয় না!

নক্সধর্মী নাটিকাটিতে সব আছে—আছে সাহেবীয়ানা প্রসঙ্গ, বেশ্যাগমন, ভন্ড দেশসেবকের স্বরূপ উন্মোচন প্রভৃতি। 'কাজের খতম' এর শেষে রয়েছে একটি সঙ্গীত। সুশীলা, শশীকলা ও রঙ্গিনীর কণ্ঠে গীত এই গানটি হল,—

"চেপে থাক্ আর কোস্‌নে কথা হলো কাজের খতম।...."প্রভৃতি। "কাজের খতম' প্রহসনটিতে থিয়েটার-বিমুখ মানুষেরা শেষ পর্যন্ত কীভাবে নিজের কাজ ভুলে থিয়েটার প্রেমে মগ্ন হয়ে পড়ল তার চিত্রও আঁকা হয়েছে।

আহা মরি ঃ

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় অমরেন্দ্রনাথের 'আহা মরি' প্রহসনটি। এবছর ১৭ জুন গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার II (GREAT NATIONAL THEATRE II)-তে 'আহামরি'

হাস্যরসাত্মক নাটিকাটি অভিনীত হয়। এই নাটিকার কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত নট-নটীবৃন্দ—কামিনীবান্ধবের ভূমিকায় মনোমোহন গোস্বামী, মলিনার ভূমিকায় বসন্তকুমারী, কেদার চরিত্রের রূপায়ণে ক্ষেত্র মিত্র, রোজির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কোহিনূরবালা। ব্যক্তিগত আক্রমণ এই নাটিকায় এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে অচিরে এটির অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।[১]

সমকালীন নানা বিষয়কে অবলম্বন করে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে অমরেন্দ্রনাথ কয়েকটি হাল্‌কা রসের নাটিকা রচনা করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে ১৩২৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩ মে স্টার থিয়েটারে অভিনীত 'কিসমিস', ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে স্টার থিয়েটারে অভিনীত 'বড় ভালোবাসি', ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি স্টার থিয়েটারে অভিনীত অমরেন্দ্রনাথের 'প্রেমের জেপলিন,' 'ভক্ত বিটেল', 'রোক শোধ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'কিসমিস' প্রহসনে স্কুল সুপারিনটেন্ডেট এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ, কিসমিসের ভূমিকায় বসন্তকুমারী; এ ছাড়া নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, হীরালাল দত্ত, কার্ত্তিকচন্দ্র দে, সুশীলাবালা, পান্নারাণী প্রমুখ। নাটিকাটিতে অশ্লীলতার মাত্রা একটু চড়া।

প্রহসনকাররূপে অমরেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব দর্শক মত জয় করার ক্ষমতায় সীমাবদ্ধ। নাট্যশিল্পের উন্নতির জন্য অমরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ছিল। মাত্র চল্লিশ বৎসরের জীবৎকালে তিনি বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের উন্নতির স্বার্থে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না।

১. "The Play was, however, soon banned as it was supposed to contain personal vilification." The Story of the Calcutta Theatres : 1753-1980 by S.K.Mukherjee p 116

চতুর্থ অধ্যায়

প্রহসনের রূপান্তর পর্ব বা অবক্ষয়ের যুগ

অমৃতলালের প্রাহসনিক প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য ক্রমে ম্লান হয়ে যেতে থাকল বয়ঃজনিত নব-নব চিন্তাশক্তির দীনতায় অথচ পাশাপাশি সমভাবে আলোকদান করায় সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন নি প্রতিভাধর কোনো নাট্যকার। প্রহসনের অগ্রগতির এবং তার বিস্তৃতির মূলে রয়েছে তার বিচিত্রপথে গাতায়াত, দু'দন্ড রয়ে বসে আত্ম-সমালোচনার অবকাশ—রাস্তার মাঝে গাড়ি থামিয়ে সব কিছু দেখে নিয়ে যেন সেই দৃশ্যের অস্বাভাবিকতার সূত্রটুকু আবিষ্কারের জন্য বহুল সময়ের অধিকারী ছিলেন প্রহসন- কারেরা। তাই সামাজিক, আর্থনীতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক নানান ত্রুটি বিচ্যুতির উৎস অনুসন্ধানে রত থাকতেন তাঁরা অনুদিন। ফলে বিশেষ চিন্তা পেয়েছে ব্যাপ্তি, কোথাও কোথাও আবার ব্যক্তিগত আক্রমণই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এবং সেক্ষেত্রে সামাজিক নীতি নিয়মের শৈথিল্যের কারণেই ব্যক্তিগত আক্রমণের প্রয়াস—সে ব্যাপারও লক্ষ্য করেছি। 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রকাশিত ও অভিনীত হবার পর নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল রচিত হল।[১] প্রহসন—যার উৎসমূলে থাকে কোনো উদ্দিষ্ট শ্রেণীর চরিত্রের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ—তার ধারা স্বাভাবিক কারণে কিছুটা মন্দীভূত হল। আধুনিকযুগে প্রহসন চিন্তায় ঘটল বিবর্তন। নূতন দৃষ্টিতে সমাজসচেতন মানসিকতার সমাজদর্শনের নাটকীয় অভিপ্রকাশ প্রহসন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই[২] বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সারা দেশে যে এক নবজাগরণের, নব-জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটল তার ফলে নিজের বা পাশের মানুষের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে সমালোচনার সাথে সাথে বিদ্রূপ করার অবকাশ বড় কমে গেল। সেই বীর্যপ্রকাশের দিনে, সেই দুঃখের সাথে পাঞ্জা কষার দিনে, প্রাণখুলে হাসানোর বা হাসার মতো প্রচুর সময় প্রহসনকার বা দর্শকদের হাতে ছিল না। প্রাণে উন্মাদনা সঞ্চার করতে সমর্থ যে ঐতিহাসিক নাটকগুলি, সেগুলিই তাই সে সময়ে দর্শক ও রঙ্গমঞ্চের নট-নাট্যকারদের আকৃষ্ট করেছে। স্বাভাবিক কারণেই এ সময় প্রহসনের অবস্থা অনেকটা তৃতীয়ার চাঁদের মতো।

বাংলা প্রহসনের এই ক্রমাবক্ষয়ের মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে শুরু হওয়া জাতীয় আন্দোলনের কথা। জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত মানুষদের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে তাই-ই স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরের কালপর্বে স্বাধীনতাকামী প্রতিটি মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ বিতাড়ন—এজন্য তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে। এই সময় সমালোচনাধর্মী

---

১. ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক প্রথম নাট্য নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স প্রবর্তন করেন। এই আইন অনুসারে প্রথম অভিযুক্ত হন নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু এবং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ৮ জন কর্মী। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের 8 মার্চ অভিযুক্তদের ধরা হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর আনা হয় Act XIX of 1876—যা নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন নামে কুখ্যাত।

২. ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিষয়ক সরকারী সিদ্ধান্ত জানানো হলেও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লর্ড কার্জন এ ব্যাপারে বিশেষ চিন্তা করেছেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়েও এ সম্পর্কে তিনি সামান্য আভাস দেন।

প্রহসন তাই প্রায় রচিত হয়নি বললেই চলে। আবার স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মানুষের মনে নেমে এসেছিল এক গভীর আত্মতৃপ্তির ভাব। দু'শ' বৎসরের পরাধীনতার নাগপাশ-মুক্ত বাঙালি সেদিন আনন্দে এমন আত্মহারা, হয়ে পড়েছিল যে আত্মসমালোচনা ব্যাপারটাই সেদিন তাঁরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল। আমরা পূর্বেই বলেছি, সমাজমুখী প্রহসনের মূলে রয়েছে এই আত্মসমালোচনা এবং অন্য সমালোচনা—সুতরাং সমালোচনা-বিমুখ জাতির দ্বারা রচিত সাহিত্যে তাই এ সময় প্রহসন সংখ্যার স্বল্পতা লক্ষণীয়।

শুধু এই একটি কারণেই বাংলা নাটকে প্রহসনের মতো একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় নাট্যশাখা অবক্ষয়িত হয়েছে দিনে দিনে, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। উনিশ শতকের সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন এবং বিশ শতকের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সময় সচেতন নাট্যকারদের ভীষণভাবে সিরিয়াস করে তুলছিল ক্রমেই। বিশ শতকের প্রায় শুধু থেকেই লক্ষ্য করা যায় সহজ হাস্যরসের আধার প্রহসনের বিষয়বস্তুতে সিরিয়াস বক্তব্যের প্রবল উপস্থিতি। কিন্তু হাল্‌কা নাটকে গম্ভীর কথা বলাকে দর্শকেরা বাচ্চাছেলের বুড়োমি মনে করেছেন। কারণ সিরিয়াস বক্তব্যের জন্য রয়েছে সিরিয়াস নাটক। প্রহসন দেখতে এসে নানা সমস্যা জর্জরিত মানুষ দু'দণ্ড উচ্চহাস্যে নিজেকে হাল্কা করে নিতে চেয়েছিলেন—গভীর চিন্তায় মগ্ন হতে চান নি। কিন্তু অসংখ্য সমস্যা জর্জরিত সমাজ সচেতন নাট্যকার সমকালীন গভীর চিন্তাকে ঠাঁই দিয়েছিলেন অন্তরের তাগিদেই। এভাবে প্রহসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ জটিলতাহীন সহজতার সীমাও কিছুটা লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রমথনাথের রচনায় তার প্রমাণ মিলবে।

পূর্বেই বলেছি সাধারণ মানুষ সাহিত্যের কাছে যেমন গভীর চিন্তার খোরাক চায় তেমনি চায় সরস হাসির উপকরণও।[১] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বল্প কয়েকটি পৃষ্ঠায় হাস্যরসের আধারে পরিবেশিত লঘু নাটিকা বা প্রহসনগুলি সাধারণ পাঠকের সাময়িক চাহিদা পূরণ করেছিল। উনিশ শতকের শেষদশকে বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব এবং অতিদ্রুত তার বিস্তার স্বল্প সময়ে পাঠের জন্য রচিত লঘু নাটিকাগুলির সৃষ্টিকে ব্যাহত করেছিল। পূর্বে যে কথা প্রহসনকারেরা কেবলমাত্র সংলাপে ব্যক্ত করতেন এখন ছোটগল্পে সংলাপের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বর্ণনা করে গল্পকারেরা সে কথাকে, নিজের নিজের বক্তব্যকে আরও প্রত্যক্ষবৎ করে তোলার চেষ্টা করলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ছোটগল্পের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরে দশ/বারো পৃষ্ঠায় রচিত বাংলা প্রহসনগুলির সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে কমে গেছে। এ সময় 'ভারতী' ও 'বালক' পরে 'ভারতী-বালক' পত্রিকায় 'হেঁয়ালী নাট্য' নামে বেশ কয়েকটি নাটিকা প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। যা ওই পথপুস্তিকা বা লঘু নাটিকার

---

১. মানুষের মনে হাসির খোরাক কি, এ প্রসঙ্গে টমাস হবস্‌ (১৫৮৮—১৬৭৯) বলেছেন,—"The passion of laughter is nothing else but a sudden glory arising from a sudden conception of some eminence in ourselves, by comparison with the infirmity of others, or with our own formerly." অর্থাৎ হবস্‌-এর মতে হাসির উৎস হচ্ছে আকস্মিক আত্মগৌরববোধ। আমাদের তখনই হাসি পায়, যখন হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম করি অপরের তুলনায় আমি কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ; অপরের ভেতর যে সব দুর্বলতা, বোকামি, ছেলেমানুষি ইত্যাদি আছে তা থেকে আমি মুক্ত ; অথবা যখন হঠাৎ বুঝতে পারি নিজের পুরাতন বোকামি—যা আগে খেয়াল করিনি।"
[বাংলা সাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গ ও আজগুবি রচনা / অজিতকৃষ্ণ বসু / পৃঃ ১৪]

নাটিকার ধারাতেই সৃষ্ট বলে মনে হয়। ছোটগল্পের ধারায় প্রমথ চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, রাজশেখর বসু, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ হাস্যরসের পরিবেশনার মাধ্যমে এই সময় প্রহসনের সৃষ্টি সীমাকে আরও সংকুচিত করে দিয়েছিলেন।

প্রহসনের অবক্ষয়ের আর একটি এবং বোধ করি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি কারণ একাঙ্ক নাটিকার আবির্ভাব। মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' একাঙ্কিকা অভিনীত হবার পর বহু নাট্যকার একাঙ্ক নাটক রচনায় উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। একাঙ্ক নাটকের বড়ো গুণতা ব্যস্ত দর্শকদের জন্য স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাট্য পরিবেশন করে তাঁদের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করে। কিন্তু একাঙ্ক নাটক মানেই অনেকে মনে করেন সিরিয়াস নাটক। এ ধারণা ঠিক নয়। সমাজমনস্ক নাট্যকারদের হাতে একাঙ্ক নাটকগুলি কখনও বুদ্ধিদীপ্ত, কখনও মনন ঋদ্ধ, কখনও করুণ রসাত্মক, কখনও-বা বীভৎস রসাত্মক, কখনও আবার হাস্যরসের অনাবিল উৎসারের সহায়ক হয়ে উঠেছে। এক বা দু' অঙ্কের সীমার মধ্যে বদ্ধ প্রহসনগুলি যেমন জীবনযন্ত্রণার অভিঘাতে জর্জর সাধারণ দশর্কের মুখে হাসি ফোটাত, পথভ্রান্ত মানুষের চোখের সামনে আয়না তুলে ধরে তাকে আপনা আপনি শুধরে নেবার ব্যবস্থাও করে দিত—তেমনই একাঙ্ক নাটিকাগুলি প্রহসনের সে কর্তব্য সমাধা করতে লাগল। আপাতদৃষ্টিতে হাস্যরসাত্মক একাঙ্ক নাটিকার সঙ্গে প্রহসনের কোনো প্রভেদ নেই, কিন্তু আঙ্গিক বিচারে এবং নাট্যরস বিচারে না হোক একাঙ্ক নাটিকার আবির্ভাবে ফলে প্রহসনের সামাজিক প্রয়োজন অনেকটাই কমে গেল; একাঙ্ক নাটিকাগুলিই স্বল্পাবকাশে ব্যস্ত মানুষকে এনে দিল হাস্যরসাত্মক নাটিকার অনুভব।

সাল-তামামের বিচারে বঙ্গভঙ্গ পরবর্তীকাল নিয়ে যে আলোচনা করা হচ্ছে এই সময় পর্বে অমৃতলাল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের বেশ কয়েকটি প্রহসন এসে যায়। কিন্তু ওঁদের প্রথম প্রহসনের রচনাকাল যেহেতু বহুপূর্বে সেহেতু এখানে পুনরায় তাঁদের রচিত প্রহসনগুলির উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। ১৯০৫ পরবর্তীকালে যাঁদের প্রথম প্রহসন প্রকাশিত এ অধ্যায়ে তাঁদের কথাই এবং তাঁদের রচিত প্রহসনের কথাই উল্লেখ করা হবে।

হরিশ্চন্দ্র সান্যাল ঃ

হরিশ্চন্দ্রের রচিত কয়েকটি প্রহসন বাংলা রঙ্গমঞ্চের দর্শককে আনন্দ দিয়েছিল। এঁর 'গ্রহের ফের' কোহিনূর থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ অক্টোবর। তাঁর আর একটি প্রহসন 'আলুবখরা' অভিনীত হয় গ্র্যান্ড ন্যাশানাল থিয়েটারে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মে। হাস্যরসের উচ্ছ্বলতায় প্রহসন দুটি উপভোগ্য হয়েছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল কোহিনূর থিয়েটারে অভিনীত হয় **শৈলেন্দ্রপ্রসাদ সরকার** রচিত 'সখের জলপান'। এই নাটিকা রচনায় শৈলেন্দ্রপ্রসাদ সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' রবীন্দ্রনাথের 'বিনি পয়সার ভোজ'-এর দ্বারা কিয়দংশে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। **অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়** রচিত 'ঝকমারি' প্রহসনটি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল।

ছন্দের যাদুকর কবি **সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের** (১৮৮২—১৯২২) কয়েকটি ক্ষুদ্র কৌতুক নাটিকার সংকলন 'রঙ্গমল্লী (১৩২০) প্রসঙ্গত উল্লেখের দাবি রাখে।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'মাণিকজোড়' হাস্যরসাত্মক নাটিকাটি গ্র্যান্ড ন্যাশানাল থিয়েটার অভিনীত হয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর। **অমলা দাস** রচিত 'বলিহারি'

হাস্যরসাত্মক নাটিকাটি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল II থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর।

প্রসাদ গোস্বামীর 'নাস্তানাবুদ' হাস্যরসাত্মক নাটিকাটি মিনার্ভায় অভিনীত হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। **দেবকণ্ঠ বাগচীর** 'উজ্জ্বলে মধুরে' (১৯১৩, মিনার্ভা), 'হেস্তনেস্ত' (মিনার্ভা, ১৯১৪), 'হুলুস্থূল' (১৯১৫, মিনার্ভা), 'ছবির বাজার' (মিনার্ভা, এপ্রিল, ১৯১৮)—হাসির গানগুলিই দেবকণ্ঠ বাগচীর হাসির নাটকগুলির প্রাণ। **স্বর্ণকুমারী দেবীর** হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'কনেবদল' স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি। **কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডুর** 'রাত দুপুরে' মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে, **প্রমথ চৌধুরীর** 'আক্কেল সেলামী' (মিনার্ভা, ১৯১৬), **সুরেন রায় রচিত** 'রূপের ফাঁদ' প্রহসন মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হয় ৭ আগস্ট ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর 'মুকুরে মুশকিল' ঐ মঞ্চেই অভিনীত হয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'হাতের পাঁচ' ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়, স্টার থিয়েটারে অভিনী হয় 'লাখ টাকা' ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুলাই। এই নাটিকায় অর্থলোলুপ উকিল রক্তবীজের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, ফক্কারামের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রাধিকানন্দ মুখার্জী, লক্কারামের ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তী, সুশীলাসুন্দরী অভিনয় করেছিলেন চঞ্চলার ভূমিকায়।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ আগস্ট স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় **অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** (১৮৭৫-১৯৩৪) রচিত হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'দু' মুখো সাপ'। **নির্মলশিব ব্যানার্জীর** 'রাতকানা' (মিনার্ভা, ১৯১৭), 'মুখের মতো' (স্টার, ৩০ মার্চ ১৯১৯) প্রভৃতি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। **বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্তের** দুটি হাসির নাটক 'প্রেমের তুফান' (১৯১৬) এবং 'সবুজ সুধা' (১৯২৮)-ও উল্লেখযোগ্য।

বাংলা প্রহসনে বিষয়বস্তুগত কোনো পরিবর্তন উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে লক্ষিত হয় নি। কাহিনী অংশে অমৃতলালের পর থেকে কিছু জটিলতা, চমক দেবার প্রয়াস লক্ষ্য যায়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের দোলায় সারাদেশ টালমাটাল। স্বাভাবিক কারণেই সে সময়ে রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক নাটক প্রাধান্য পেয়েছে—দর্শকদের হাসির উপকরণ জোগিয়েছে পুরাতন কাহিনীর চর্বিত চর্বণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে অজস্র সমস্যা দেখা দিয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে যে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারী, অনিশ্চয়তা এবং মানুষের অনিকেত মনোবৃত্তি এক ভয়াল ইঙ্গিত করছিল—বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। এই সময়কার কয়েকটি প্রহসনে দেখা গিয়েছে বেকারী ঘুচাতে নায়িকাকে কী নিদারুণ ঝুঁকিই না নিতে হয়েছে! 'মানময়ী গার্লস স্কুল' প্রহসনে দেখি নায়ক মানস নায়িকা নীহারিকা পরস্পরের সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর অভিনয় করে রুজি রোজগারের সংগ্রামে জয়ী হতে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকে প্রহসনে হাস্যরস থাকা সত্ত্বেও কারুণ্যের রসধারায় দর্শককে স্নান করানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেভাবে হাসি-কান্নাকে মিলিয়ে মিশিয়ে অপূর্ব স্বাদের নাটিকা উপহার দিয়েছেন—বিশ শতকের ত্রিশ-পরবর্তী বাংলা প্রহসনে সে পদ্ধতি বহুলরূপে প্রযুক্ত হয়েছে।

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ঃ

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় একজন স্বল্প খ্যাত প্রহসনকার। বাংলা প্রহসনের বিরাট মঞ্চের পাদপ্রদীপে তাঁর অবদান অতি সামান্য। তাঁর লেখা 'পিয়ারী নজর' প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয় মনোমোহন থিয়েটারে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর। তাঁর হাল্কা রসের দ্বিতীয় নাটিকা 'পরদেশী' প্রকাশিত হয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিনটি অঙ্কে ষোলটি দৃশ্যে রচিত এই হাস্যরসাত্মক নাটিকাটির প্রধান গল্পাংশ হল—তুরস্কের রাজার দুই কন্যা সেরিনা ও জারিনা অপরিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রেমাসক্তা হয়েছেন। ওই ব্যক্তিটি আসলে পারস্যের রাজকুমার নোয়াজেম। নোয়াজেম বিদিশী। তাই নাটিকাটির নাম 'পরদেশী' নোয়াজেমের সহকারী ফোনাসার প্রেমে পড়ে রাজকন্যার দুই সহচরী সানিয়া শাখিয়া। পরিশেষে মিলনে এ নাটিকার সমাপ্তি। নাচ, গান আর কৌতুকপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি পরদেশীকে মঞ্চসফল করেছিল। পাঁচকড়ি চ্যাটার্জীর আর একটি উল্লেখযোগ্য হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'নজরে নাকাল' মনোমোহন থিয়েটারে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয়।

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯—১৯৩৮)

বিশ শতকের প্রথম তিন দশক ধরে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। অমৃতলালের ভাবশিষ্য ভূপেন্দ্রনাথ তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকগুলি প্রহসন রচনা করেছিলেন এবং সেগুলি সাফল্যের সঙ্গে মিনার্ভা, কোহিনূর, স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। অমৃতলালের প্রতিভার প্রাহসনিক বিস্তৃতির ধার কাছ দিয়েও ভূপেন্দ্রনাথ যেতে পারেন নি। তাই উপর উপর অমৃতলালের প্রহসনের কয়েকটি বিষয়কে নিয়ে প্রহসন রচনা করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সস্তায় বাজিমাৎ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রহসনগুলিতে হুজুগপ্রিয় বাঙালী জাতির হুজুগের তৎকালিক রূপের পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য হাস্যরসাত্মক নাটিকাগুলি হল—'ভূতের বিয়ে' (১৯১০), 'গোঁসাইজী' (১৯১৫), 'বিদ্যাধরী' (১৯১৮), 'বৈবাহিক' (১৯১৯), কেলোর কীর্তি (১৯২১), 'পেলারামের স্বাদেশিকতা' (১৯২২) 'কৃতান্তের বঙ্গাদর্শন' (১৯২৪), 'ডার্বি টিকিট' (১৯২৬), 'যুগমাহাত্ম্য' (১৯২৭), 'পরদেশী' (১৯২৭), 'শাঁখের করাত' (১৯২৮) প্রভৃতি।

'ভূতের বিয়ে' অভিনীত হয় কোহিনূর থিয়েটারে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মার্চ। স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় 'গোঁসাইজী' (১৯১৫, ১৮ ডিসেম্বর)। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় 'বৈবাহিক'।

কেলোর কীর্তি ঃ

মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাস্যরসের আধারে রচিত নাটিকা 'কেলোর কীর্তি। কেলোর বিচিত্র কীর্তকলাপের পরিচয়ই এই নাটিকার হাস্যরসের মূল উৎস। এই নাটিকায় ঘোড়দৌড়ের কথাও রয়েছে, ভুলোর চরিত্রের মাধ্যমে রেসুড়ে মানুষের জীবনের হাস্যকরুণ চিত্র আঁকা হয়েছে। এই প্রহসনের কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—কেলো—শ্রীমন্মথনাথ পাল, ভুলো—শ্রীসন্তোষ দাস, কর্তা—শ্রীকুঞ্জ চক্রবর্তী, মঘা—শ্রীকার্তিক দে। 'কেলোর কীর্তি' বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

'কেলোর কীর্তি'র কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ—কালভৈরব বসু নামে জনৈক যুবক পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে মানকুমারী নামে এক মহিলাকে সমুদ্রের থেকে সে কোন রকমে উদ্ধার করে। এরপর কালভৈরব ওরফে কেলে এবং মানকুমারী ওরফে মানিলার মধ্যে প্রেম জাগে। কিন্তু বাধ সাধেন মানিলার বাবা দামোদর। তিনি এজন্য পাঁচ হাজার টাকা দাবি করেন। কেলো সাময়িকভাবে বিপত্তিতে পড়ে যায়। সে নানা রকমের ফন্দি ফিকির শুরু করে। শেষ পর্যন্ত চতুর 'কেলো দামোদরকে ফাঁদে ফেলে পাঁচ হাজার টাকা হাতায়। সেই টাকায় সে তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হবার বাধা দূর করে।

একটি অঙ্কে দশটি দৃশ্যে রচিত 'কেলোর কীর্তি' নাটকে বেশ কয়েকটি অভিনব'দৃশ্য সংযোজন করা হয়েছিল—একটি সমুদ্র স্নানের দৃশ্য, ময়দানে ঘোড়দৌড়ের দৃশ্য, রাস্তার নানা যানবাহনের যাতায়াতের দৃশ্য, হাসপাতালের চিকিৎসা দৃশ্য প্রভৃতি।

পেলারামের স্বাদেশিকতা ঃ

মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় ভূপেন্দ্রনাথের আর একটি উল্লেখযোগ্য হাস্যরসাত্মক প্রহসন 'পেলারামের স্বাদেশিকতা'। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জুন এটি মঞ্চস্থ হয়। এই নাটিকায় ছদ্ম-দেশসেবীদের নানান আচরণের চিত্র এঁকে তাদের মুখোশ খুলে দেখার চেষ্টা করেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ। অমৃতলালের অনুসরণ এখানেও স্পষ্ট। এই নাটিকায় পেলারামের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন পরবর্তীকালে জনপ্রিয় অভিনেতা রাধিকানন্দ মুখার্জী এবং জেকবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নট ও নাট্যকার নরেশচন্দ্র মিত্র। এই দুই অভিনেতাই এই নাটিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

'পেলারামের স্বাদেশিকতা'র কাহিনী অংশ সংক্ষেপে এই রকম—এক গ্রাম্য যুবক পেলারম শহুরে চাকুরে। তার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে চরিত্রগত ব্যাপারে সে একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। সে তার গ্রামের সাধারণ মানুষদের উন্নতি করার জন্য পরিকল্পনা করতে থাকে। এ ব্যাপারে সে তার এক কৃপণ আত্মীয়ের সহযোগিতা চায়। পেলারাম গ্রামের দুর্ভাগা মানুষদের কীভাবে সেবা করল তারই এক রসাল কাহিনী এই 'পেলারামের স্বাদেশিকতা'।

মঞ্চ সফল এই প্রহসনটি কিছুদিনের মধ্যেই সরকারী বিষনজরে পড়ে। পুলিশের নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে অচিরে (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুলাই) এটি বন্ধ হয়ে যায়। এই নাটিকায় তিনটি অঙ্কে মোট এগারোটি দৃশ্য রয়েছে।

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী প্রহসন 'কৃতান্তের বঙ্গাদর্শন' মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর। মিত্রা রঙ্গমঞ্চে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর অভিনীত হয় 'ডার্বি টিকিট'।

যুগমাহাত্ম্য ঃ

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কতখানি অমৃতলালের অনুসারী ছিলেন তা 'যুগমাহাত্ম্য' প্রহসনটিতেই বোঝা যায়। ১৩৩৩ সালের ১০ পৌষ বড়দিনের উৎসবে এটি অভিনীত হয়। ওই বৎসর পৌষ মাসেই নাটিকাটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এটিও একটি মঞ্চ সফল প্রহসন। এই নাটিকার বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন—রাঙ্গা ঠাকুদ্দা—শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্তী, মন্মথলাল—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদু বাবু)—নটবর পাকড়াশী—শ্রীকার্তিকচন্দ্র দে,

ভূধর—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে, প্রভঞ্জনময়ী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, বিষ্ণুপ্রিয়া—শ্রীমতী আঙুরবালা, শঙ্কটা—শ্রীমতী শরৎকুমারী এবং আরও অনেকে।

'যুগমাহাত্ম্য' প্রহসনের বিজ্ঞাপন অংশে ভূপেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে অমৃতলালের নির্দেশ অনুসারে তাঁর (অমৃতলালের) লেখা 'তাজ্জব ব্যাপারে'র দ্বিতীয় পর্ব্বরূপে এই প্রহসনটি রচিত হয়েছে। দুটি অঙ্কে রচিত এই প্রহসনের প্রথম অঙ্কে একটি মাত্র দৃশ্য রয়েছে, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য।

'যুগমাহাত্ম্য' প্রহসনের কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ—রোহিনীকুমার, রুক্মিনী কুমার, কামিনীকুমার তিন ভ্রাতা। তাঁদের তিন স্ত্রী যথাক্রমে তেজোময়ী, অজিতময়ী এবং দর্পময়ী। আধুনিক শিক্ষার গুণে তিন ভাই কেবল একটি কথাই শিখেছে তা হল এ জগতে পুরুষেরা ভীষণ নিষ্ঠুর। তারা স্ত্রীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে—বৃথা জুলুম চালায়। কার্যক্ষেত্রে এই তিন ভাই তাদের স্ত্রী কর্তৃক অত্যাচারিত। জোরে কথা বলার অধিকার পর্যন্ত তাদের স্ত্রীগণ তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। তিন স্ত্রী রাঙ্গা ঠাকুদ্দার সভাপতিত্বে নারী জাগরণের জন্য এক সঙ্ঘ গড়ে তুলেছে। পিসিমা এই 'মহিলা মহলে'র উগ্র চিন্তাধারার বিরোধী।

প্রতিবেশী ভাইপো মন্মথনাথ একজন শক্ত সবল পুরুষ। নিত্য ব্যায়াম করে। গায়ে অসম্ভব জোর তার। বাপ-ঠাকুর্দার মতো সেও তার স্ত্রীকে ঘর-সংসারের কাজে ব্যস্ত দেখতে চায়। কিন্তু তার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রথম প্রথম স্বামীর সঙ্গে সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করলেও তেজোময়ী, অজিতময়ী আর দর্পময়ীর পাল্লায় পড়ে মাথা একদম বিগড়ে যায়। প্রথম দৃশ্যের শেষের দিকে তাই দেখা যায় সে তার স্বামীকে ত্যাগ করে এসে মহিলামহলে আশ্রয় নিয়েছে—কারণ তার স্বামী তাকে অযথা খাটায়। আলমারী থেকে জামা কাপড় বের করে দিতে বলে, খাবার সময় খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে, তা ছাড়া আছে ঘর গোছানোর কাজ। তিন নেত্রীর আস্কারা পেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে ত্যাগ করে আসে। কারণ স্বাধীনা হতে চায় সে কিন্তু মন্মথ নিজের বিয়ে করা বউকে ছাড়বে না। সে মহিলা মহলের সভা থেকে জোর করে নিজের স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যেতে চায়। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে অকথ্য গালিগালাজ করে। অন্যান্য মেয়েরা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘিরে ধরে। তেজোময়ীর নির্দেশে দারোয়ান এসে এক রাম রদ্দা ঘাড়ে কষিয়ে মন্মথকে ভূতলশায়ী করে দেয়। বিষ্ণুপ্রিয়া তখন মনের আনন্দে গান করে,—

"জানা'ব জগতে নারী নহে হীনা
নহে পুরুষের দাসী পরাধীনা
হলে প্রয়োজন পারে অকাতরে
দিতে আত্ম-বলিদান!!" (২/৪)

বিষ্ণুপ্রিয়াকে চুরি করে ধরে আনার জন্য মন্মথ তার বন্ধু ভূধরের সঙ্গে পরামর্শ করে। এই সময় তিন ভায়ের উপর তাদের বউদের নির্যাতনের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে।

মহিলা মহলের সবাই যখন নারীর উন্নতির জন্য নানা চিন্তা শেষ করে ঘরে ফিরে যায়, তখন ক্লান্ত অজিতময়ী শয্যায় শুয়ে পড়ে। রুক্মিনীকুমার স্ত্রীর জন্য খাবার আনতে যায়। এই সময় এক গাঁট্টাগোট্টা চোর ঘরে ঢুকে পড়ে অজিতময়ীর গা থেকে সমস্ত গয়না

খুলে নেয়। রুক্মিনীকুমার ভয় পেয়ে চীৎকার করে ওঠে তখন তিন ভাই আর মেয়েরা হৈ হল্লা ফেলে দেয়। তিন ভাই চোরকে ধরতে না এগিয়ে তার হাতে ছুরি দেখে ভয় পেয়ে পুলিশ ডাকার জন হম্বিতম্বি করতে থাকে। এসময় মন্মথনাথ হঠাৎ ঘরে ঢুকে এক ঝটকায় চোরের হাত থেকে ছুরি ফেলে দেয়। তারপর হাতাহাতি লড়াই করে তাকে ধরে ফেলে। একই সঙ্গে তিন ভাইয়ের পুরুষরূপী নারীত্ব আর নিজের স্বামীর পুরুষত্ব দেখে বিষ্ণুপ্রিয়ার চৈতন্য হয়। সে তার স্বামীর দেহের ক্ষতস্থান বাঁধতে বাঁধতে নিজের দোষ স্বীকার করে। মন্মথকে সে বলে,—

> "চলো—যেখানে নিয়ে যাবে আমি কুকুরের মতো তোমার পেছনে পেছনে যাব! তুমি আমায় মাপ করো! আমি তোমার হারিয়েছিলুম নিজের বুদ্ধি দোষে, আবার তোমারি কৃপায় তোমায় পেলুম।" (২/৪)

প্রহসনটির শেষ উক্তি বৃদ্ধ রাঙ্গা ঠাকুর্দার। তিনি উপদেশ দিয়েছেন,—

> "...'যুগমাহাত্ম্যের' প্রভাবে 'পুরুষ' যেন 'প্রকৃতি' হবার—আর প্রকৃতি যেন 'পুরুষ' হবার চেষ্টা করে প্রহসনের সৃষ্টি না করে!!" (২/৪)

'যুগমাহাত্ম্যে'র আগাগোড়া হাস্যরসের ফেনিল উচ্ছ্বাস লক্ষণীয়। যেমন নাটিকার শুরুতেই দেখি রুক্মিনীকুমার, রোহিনীকুমার আর কামিনীকুমার গর্ভধারণ বিষয়ে নারীর যে তীব্র কষ্ট সে সম্পর্কে গভীর আলোচনা করেছে। এই আলোচনা দর্শক সাধারণের কাছে উচ্ছ্বল হাসির উপকরণ নিয়ে এসেছে,—

> "রু। সন্তান গর্ভে ধারণ! তাতে একটা রীতিমতো 50 Horse power অর্থাৎ প্রায় অর্ধশত অশ্বের সমবেত শক্তি নারীদেহ রূপ Battery-তে সদাসর্ব্বদা মজুত থাকা আবশ্যক।
>
> রো। বটেই তো। তারপর সেই সন্তানকে পালন কর্ত্তে নারীর হাতে, পায়ে, কোমরে, বক্ষে, কক্ষে, পৃষ্ঠে, বেণীতে—
>
> রু। বেণীতে শক্তির আবশ্যকতা তা ঠিক বুঝতে পারছি নে বড়?
>
> রো। বেণীতে শক্তি চাই না? দুর্দ্দান্ত নারী নির্য্যাতনকারী অত্যাচারী শিশু প্রতি পদে তার মাতার বেণী এবং খোঁপা যেভাবে যেরূপ নির্দয়ভাবে আকর্ষণ করে, তা দেখে অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও অশ্রু সংবরণ কর্ত্তে সক্ষম হয় না।" (১/১)

ভ্রাতাদের এই উক্তি হাস্যরসের যোগান দেয়। আবার তিন ভায়ের নাম লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তিনটিই নারীর নাম—পক্ষান্তরে তাদের স্ত্রী তিনজনের নামের প্রথম অংশ পুরুষের। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তেজ, অজিত এবং দর্প যথাক্রমে রুক্মিনী, রোহিনী এবং কামিনীর উপর হুকুম চালায়। ঘরে বসে বসে পাছে স্বামীদের এ্যাসিড হয়, এজন্য তিন বৌ সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের ঘরের বাইরে বেড়াতে যাবার অনুমতি দেয়। তারা একথাও তাদের স্বামীদের জানিয়ে দেয়, অন্য মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা তারা এসময় একদম বরদাস্ত করবে না। এতে এক ভায়ের নারীসুলভ অভিমানের চিত্র উদাহরণের সহায্যে লক্ষ্য করা যাক,—

> "দর্প। না—না—you are quite right, secretary। তবে যার তার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে মেলামেশা আমি বড় পছন্দ করি না।

রো। তোমাদের যদি এতই সন্দেহ হয় এই অবলদের ওপোর যে আমরা কোন্ পর নারীর সঙ্গে—(অভিমান ভরে অবস্থান)

তোজো। না—না Dear darling blooming Roses! আমরা তোমাদের তিলমাত্র অবিশ্বাস করি না। আমরা স্থির জানি তোমরা কায়মনোবাক্যে 'সৎ—সাধ্ব!"

পুরুষদের সম্পর্কে প্রযুক্ত 'অবল'[১] 'সৎ-সাধ্ব' প্রভৃতি শব্দ যথেষ্ট হাস্যরসের খোরাক জোগিয়েছে। প্রসঙ্গত ১২৮৯ সালের 'আদরিণী' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার একটি নিবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যায়। এখানেও অতিরিক্ত স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া থেকে বিরত হবার অনুরোধ করা হয়েছে,—

"...দিন দিন স্ত্রী স্বাধীনতা আপনা আপনি প্রবর্ত্তিত হইতেছে এবং হইবে। তাই বলি, এই বেলা সাবধান! সাবধান হইয়া স্ত্রী স্বাধীনতা দাও। এখনও স্ত্রীগণ পুরুষের বাধ্য, একবার বাঁকিলে আর সোজা হইবে না। তখন বিষম বিপদগ্রস্থ হইবে।"[২]

আবার প্রথম অঙ্কের শেষে মন্মথনাথ যেখানে গায়ের জোরে তার নিজের বিয়ে করা স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফিরিয়ে আনতে গেছে সেখানে তার এবং নারীদের আচরণেও যথেষ্ট হাসির খোরাক দেওয়া হয়েছে। দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য এসময় ভূপেন্দ্রনাথ কিছু লৌকিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন। বার বার স্ত্রীকে 'মাগ' রূপে সম্বোধন করে বিষ্ণুকে বিস্‌টে বলে মন্মথ নারীদের উত্যক্ত করেছে দর্শকদেরও হাসিয়েছে। এই অংশে কয়েকটি অশ্লীল শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে অযথাই। অযথা প্রযুক্ত হয়েছে বলেই শব্দগুলিকে অশ্লীল বলছি। এগুলি হল—মাগ, ভাতার, হাড়-হাবাতে ছুঁড়ী প্রভৃতি।

নাটিকার প্রস্তাবনায় অমৃতলালের অনেক প্রহসনের মতো রঙ্গিনীদের গান আছে। স্ত্রীস্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যে এ নাটকে বক্তব্য রাখা হবে তা এই গানেই পরিস্ফুট। রঙ্গিনীরা গেয়েছে,—

"খুব জাঁক্‌জমকেই চম্‌কে দোবো
এই হালকা পোষাকে।
কস্তা পাড়ের রাঙ্গা সাড়ী
(তার) মুখে মারি ঝাঁটার বাড়ী
তাড়াতাড়ি চল্‌তে গেলেই পড়ব বিপাকে।"

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'পরদেশী'** নাটিকাটি অভিনীত হয় মিত্রা থিয়েটারে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় তাঁর **'শাঁখের করাত'**।

বাংলা প্রহসনের জগতে ভূপেন্দ্রনাথের নাম অবশ্য স্মর্তব্য একারণে যে, তিনি প্রায় দুই দশক ধরে বাঙালি দর্শককে অনাবিল হাস্যরসের ধারায় স্নান করিয়েছিলেন।

---

১. বঙ্কিমচন্দ্র নারীদের বলেছেন 'অবলা'—'অবলা' কেন মা এত বলে'। প্রহসনকার পুরুষকে বলেছেন 'অবল' 'অবলা'র পুংলিঙ্গে, আবার সতী-সাধ্বী স্ত্রী-লিঙ্গের পুংলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়েছে সৎ-সাধ্ব। বলাবহুল্য, এগুলি হাস্যরসের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে।

২ 'আদরিণী' ১২৮৯ সাল, দ্বিতীয় সংখ্যা/পৃঃ ৭২-৭৩

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

বাংলা একাঙ্ক নাটকের জগতের বিস্ময় পুরুষ দিগিন্দ্রচন্দ্রের লেখা কয়েকটি হাস্যরসাত্মক নাটিকা এককালে দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছিল। তাঁর লেখা তুমুল হাসির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাটিকাটি হল 'দাম্পত্য কলহে চৈব।'

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৮৯৬—১৯৩৫) ঃ

গল্পকার রবীন্দ্রনাথ মৈত্র অসংখ্য প্রহসন রচনা করেন নি। তাঁর লেখা সর্বাধিক পরিচিত একটি প্রহসনের নাম 'মানময়ী গার্লস স্কুল' (১৮৩২)। এই একটি মাত্র প্রহসনের দ্বারাই তিনি দর্শক হৃদয়ে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছিলেন। 'মাটির কাছাকাছি' মানুষের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর গল্পে। তাঁর এই নাটিকায় হাসির মাধ্যমে জীবন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত বেকার যুবক-যুবতীর যন্ত্রণার প্রকাশ রয়েছে।

মানময়ী গার্লস স্কুল ঃ তিনটি অঙ্কে দশটি দৃশ্যে বিন্যস্ত 'মানময়ী গার্লস স্কুল' একটি হাস্যকৌতুকপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত নাটক। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের দ্বারা স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় 'মানময়ী গার্লস স্কুল'। এই নাটিকার কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ,—

মানসমোহন মুখোপাধ্যায় একজন শিক্ষিত বেকার, নীহারিকা একজন শিক্ষিতা খ্রীষ্টান মহিলা বেকার। দু'জনেই বেবারীর জ্বালায় অস্থির। আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে গ্রামের এক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা পদের জন্য তারা এক পোস্টার দেখে। চাকরীর বিশেষ এক শর্ত মেনে আবেদন করার জন্য তারা স্বামী-স্ত্রী সাজে এবং মানময়ী গার্লস স্কুলে চাকরি নেয়।

গ্রাম্য জমিদার দামোদর চৌধুরী এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছেন পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিত্তশালী ব্যবসায়ী বদন সরকারের স্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুলের উপর টেক্কা দেবার জন্য। রাজেন বাড়োরী সরকারি রেভিনিউ বোর্ডের চাকরি ছেড়ে ওই স্কুলের সেক্রেটারী হয়েছে দামোদর চৌধুরীর মেয়ে চপলাকে পাবার আশায়। পাছে অবিবাহিত কোনো মাস্টার এসে চপলার মন জয় করে, এজন্য সে-ই ঐরকম অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় শিক্ষক আনার ব্যবস্থা করেছে।

চপলা প্রায়ই মানসের বাড়িতে আসে বলে রাজেন আশঙ্কিত। মানসের বাড়ির খবরাখবর জানার জন্য যে তার বাড়ির চাকর হারানিধিকে ঘুষ দিয়ে বশ করে। চাকরি যাবার আশঙ্কায় মানস তটস্থ। আর চাকরি রাখতে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করে করে ক্লান্ত নীহারিকা ফিরে যেতে চেয়েছে। মানসের অনুরোধে আর মাত্র এক মাস থাকতে চেয়েছে— এক মাস শেষ হতে মাত্র একদিন বাকী। দামোদরের বাড়িতে তারা নিমন্ত্রিত হল। দামোদরের স্ত্রী কোনো একটা সন্দেহ বশে তাদের এক ঘরে শোবার ব্যবস্থা করলেন। বাইরে শেকল। নীহারিকা মানসের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে নারাজ। বাধ্য হয়ে মানস খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে মান, সম্মান ও প্রাণ বাঁচল। নীহারিকাকে মুক্তি দিল। তার বিদায় সভায় ছাত্রীরা যে গান করল এবং অভিনন্দন পত্র পাঠ করল তা মানসের লেখা। এ ঘটনা যখন নীহারিকাকে দুর্বল করে দিচ্ছে, সে সময় রাজেন গোপন চিঠির মাধমে চপলার সঙ্গে মানসের সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলল। হারানিধির মারফতে তখন রাজেন জেনে গেছে সব

কথা—সব কিছু ফাঁস করে মানসের সর্বনাশ করার জন্য রাজেন যখন দামোদরের কাছে গিয়েছে—সে সময় চিরন্তন নারীর সংস্কার বসে নীহারিকা মানসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বৃদ্ধ দামোদর এ ঘটনায় নিজের স্কুল সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন, রাজেনও চপলা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হল, চাকরি খোয়াল কেবল হারানিধি।

পাশের গ্রামের ব্যবসায়ী বদন সরকার যেহেতু স্ত্রীর নামে স্কুল খুলেছে অমনি জমিদার দামোদর চৌধুরীও নিজের স্ত্রীর নামে স্কুল খুললেন। স্ত্রীর নাম মানময়ী—তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের নাম 'মানময়ী গার্লস স্কুল'। এই হাস্যরসাত্মক নাটিকাটির প্রশংসা করে জনৈক সমালোচক একে 'a fine comedy' আখ্যা দিয়ে বলেছেন,—

> "....'Manmoyee Girl's School' by the Rabindranath maitra. With a higly interesting story of concealed identity, unspoken love, funny situations, with dialogues, likeable characters, fine humour and moving sentiments, 'Manmoyee Girl's School' left a sweet taste in the mouth of the theatregoers of the time and established the fame of Rabindranath Maitra as a playwright even though his contribution to the public theatre was just this one comedy."

'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' প্রহসনে দামোদর চৌধুরীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ননীগোপাল মল্লিক, মানময়ীর ভূমিকায় শ্রীমতী শরৎকুমারী, মানসের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী, নীহারিকার ভূমিকায় পদ্মাবতী, চপলার ভূমিকায় শ্রীমতী সুহাসিনী এবং রাজেনের ভূমিকায় ইন্দু মুখার্জী সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।

সতীশচন্দ্র ঘটক (১৮৮৫—১৯৩৯) : রচিত 'হাটে হাঁড়ি' মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে।

শরৎচন্দ্র ঘোষ :

শরৎচন্দ্র ঘোষ রচিত 'অভিজাত' ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুন মিনার্ভা মঞ্চে অভিনীত হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে শরৎচন্দ্র ঘোষের হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'কলির সমুদ্রমন্থন' হয় মিনার্ভা থিয়েটারে। সমকালীন সমাজের কাহিনী নিয়ে রচিত এই নাটিকায় প্রহসনকার দেখিয়েছেন যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে কীভাবে এ দেশের মাটির মানুষেরা বার বার বহিরাগতদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। এই নাটিকার সারকথা এই যে, সমুদ্রমন্থনে যেমন সকলে অমৃত পেলেও শিব পেয়েছিলেন গরল, তেমনি আজকের দিনে যেখানে এদেশে এসে বিদেশীরা এর শাঁস দখল করছে—সেখানে বাঙালী পাচ্ছে বিষ এবং ছিব্ড়ে। 'কলির সমুদ্রমন্থন' প্রহসনটি বেশ কিছুদিন দর্শক মন জয়ে সমর্থ হয়েছিল। এই প্রহসনের নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—তরুণ—অহীন্দ্র চৌধুরী, ভৃঙ্গী—হীরালাল চ্যাটার্জী, মহাদেব—প্রভাত সিংহ, ভদ্রকালী—বেদানাবালা, প্রভাতী—আঙ্গুরবালা প্রভৃতি।

মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই অভিনীত হয় ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের 'পুরোহিত'। এ নাটকে পুরোহিতের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী।

শচীন্দ্রমোহন মুখার্জী ঃ

রঙমহল মঞ্চে মাত্র চারটি দৃশ্যে রচিত 'যবনিকার অন্তরালে' (কাজরী, ১৯৩৪) নাটিকা পরিবেশন করে শচীন্দ্রমোহন এক নূতনত্ব এনেছিলেন। 'কাজরী' বা 'যবনিকার অন্তরালে' অভিনীত হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ আগস্ট। এই নাটিকার মধ্যে একদিকে আছে ট্রাজিক উপাদান, অন্যদিকে আছে নৃত্যনাট্যের উপকরণ, আছে ভালোবাসার গল্প, শেষে রয়েছে ব্যঙ্গাত্মক মনোভব। এতে তিনটি গল্প রয়েছে—একটি অশ্রুমতী-তমাল-ঝর্ণাকে ঘিরে, অন্যটি ঝর্ণা-শ্যামলকে ঘিরে, শেষেরটি এ্যামেচার থিয়েটারের ব্যস্ততা-উদ্বেগ, ঈর্ষা প্রভৃতির বাস্তব চিত্র।

'গৈরিক পতাকা' খ্যাত **শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত** (১৮৯২—১৯৬১) রচিত আংশিক হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'সুপ্রিয়ার বিচার' থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ মে।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (১৮৮৬—১৯৪১) ঃ

বাংলা নাটকের ইতিহাসে নট, নাট্যকার এবং বাণিজ্যিক রঙ্গমঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। চারে দশকে বাঙালি দর্শক যখন আবার হাস্যরসাত্মক নাটকের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করল, সে সময় তিনি রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন মেটাতে রচনা করেন 'পূর্ণিমা মিলন' (১৯৩৪) নাটিকাটি। তবে এটি সম্পূর্ণরূপে যোগেশচন্দ্রের মৌলিক রচনা নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্র-অমৃতলালের সময় থেকে যে ফরাসী নাট্যকার বাংলা নাটকের শাখার একটি অংশকে (প্রহসন) প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করে চলেছিলেন সে-ই মলেয়ারের লেখা 'School for Husbands' অবলম্বনে 'পূর্ণিমা মিলন' প্রহসনটি রচিত। আগাগোড়া হাস্যরসের উচ্ছল ধারায় এই নাটিকার কাহিনী স্রোত প্রবাহিত। এর কাহিনী মূলে রয়েছে বাংলাদেশের বহু পরিচিত বৃদ্ধের তরুণীর আকর্ষণ অনুভবের কাহিনী। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হবার পর তাকে পাবার জন্য যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে যে হাস্যঘন কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, ত দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে। এ নাটিকায় বৃদ্ধ অর্থপতির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয় 'পূর্ণিমা মিলন'। এই হাস্যরসাত্মক নাটিকার অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন,—অমর—জহর গাঙ্গুলি, রামফল—তুলসী চক্রবর্তী, চিদবিলাস—সন্তোষ সিংহ, তর্কবাচস্পতি—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তরঙ্গিনী—শ্রীমতী রাণীবালা, মালিনী—শ্রীমতী চারুশীলা, চতুরিকা—শ্রীমতী নীহারবালা, নিপুণিকা—শ্রীমতী সুশীলাবালা প্রমুখ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর কিংবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো কিছু নাটকও রচনা করেছিলেন—নিজের গল্পের নাট্যরূপও দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুলাই রঙমহল থিয়েটারে শরদিন্দুর একটি হাস্যরসাত্মক নাটিকা অভিনীত হয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

লেখা এই নাটিকাটির নাম 'ডিটেকটিভ'। জমিদার অনন্ত চৌধুরীর হঠাৎ খেয়াল হল তিনি ডিটেকটিভ হবেন। কেননা ডিটেকটিভ হবার মজাই নাকি আলাদা। এমন সময় তিনি খবর পেলেন একটি নিরুদ্দিষ্টা কন্যার—কন্যাটিকে সঙ্গে করে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি ডিটেকটিভগিরি করতে গেলেন এবং পরে মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেলেন। স্বল্প পরিসরে এই নাটকটিতে শরদিন্দু তাঁর মানবজীবন সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন।

'ডিটেকটিভ' নাটকের কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন,—অনন্ত—জহর গাঙ্গুলী, বলাই—কৃষ্ণধন মুখার্জী, হীরেন্দ্র—হরিধন মুখার্জী, জগদীশ—তুলসী চক্রবর্তী, নলিনী—শ্রীমতী সুহাসিনী, কেয়া—শ্রীমতী শেফালিকা, সমরেশ—সন্তোষ সিংহ, সরমা—উষা প্রমুখ।

শরদিন্দুর রচিত হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'বন্ধু' রঙমহল থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগস্ট। কৌতুকরসের আধারে রচিত 'বন্ধু' নাটিকায় কাহিনীর কোনো জটিলতা নেই। এই বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক চরিত্রে যাঁরা রয়েছে শিশুর সারল্য, আর রয়েছে ভাবুকসুলভ নানা মুদ্রাদোষ। এরই সঙ্গে রয়েছে হেমন্ত-অশনির সঙ্গে উর্মিলা-মন্দার প্রেমের চটুল কাহিনী—সবটাই বর্ণিত হয়েছে লঘু ও কৌতুককরভাবে। মোটামুটিভাবে এটি মঞ্চ সফল হয়েছিল।

'বন্ধু' নাটিকার নানা ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন, —হেমন্ত—জহর গাঙ্গুলী, জ্ঞানাঞ্জন—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হেবলরাম—তুলসী চক্রবর্তী, গজানন—কৃষ্ণধন মুখার্জী, অশনি—সন্তোষ সিংহ, মন্দা—শ্রীমতী উষাদেবী, উর্মিলা—শ্রীমতী শেফালিকা, অক্ষয়—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-১৯৮৬)

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে বাংলা নাটকের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। বাংলা নাটকে ফ্ল্যাশব্যাক প্রথা সূচনা মাধ্যমে তিনি নাটকের জগতের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন। বিধায়ক ভট্টাচার্য সামাজিক নাট্যকার। পরিচিত পরিবেশ, ঘরের কথা—সুখ-দুঃখ, মান-অভিমানে গড়া সাধারণ বাঙালীর সংসারের চিত্রকেই তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সিরিয়াস সামাজিক নাটক রচনার সাথে সাথে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে বিধায়ক ভট্টাচার্য কয়েকটি 'সিরিও-কমিক' নাটকও রচনা করেছিলেন। কান্না-হাসির দোলায় দুলেছে এই নাটিকাগুলোর কাহিনী। তাঁর লেখা এ ধরনের উল্লেখযোগ্য নাটিকাগুলি হল—'মেঘমুক্তি' (১৯৩৮), 'তুমি ও আমি' (১৯৪১), 'তাইতো' (১৯৪৪), 'অতএব' (১৯৬৬) প্রভৃতি।

মেঘমুক্তি :

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুলাই বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'মেঘমুক্তি' নাটকটি রঙমহল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। 'মেঘমুক্তি নাটিকাটি করুণে-হাস্যে মিলে মিশে একাকার। একে তাই

বিশুদ্ধ প্রহসন বলা যায় না—tragi-comedy বলা যায়। 'মেঘমুক্তি' নাটিকার কাহিনী এরূপ—বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় স্বামীকে (বিজয়) রোজ সন্ধ্যে ৮টায় বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যেতে হয়—ফিরে আসেন তিনি পরের দিন সকাল ৮ টায়। এ নিয়ে স্ত্রী স্বামীর উপর নিত্য অভিমান করে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর জিজ্ঞাসার কোনো সদুত্তর দেন না। এই পরিবারের গৃহ চিকিৎসক বিলাতফেরৎ ডাক্তার—নাম তাঁর স্বপন রায়। নানা সময় নানাভাবে কথা বলে ডাক্তারবাবু স্ত্রীর এই অভিমানকে স্বামীর প্রতি সন্দেহে রূপান্তরিত করেন। ফলে শুরু হয় দাম্পত্যকলহ। এমন প্রফেসর অতুল ঘোষ তাঁর নাতনীকে নিয়ে দেবদূতের মতো সেখানে উপস্থিত হন। প্রফেসর স্ত্রীর কাছে প্রমাণ করে যে ডাক্তার স্বপন রায় একজন অসৎ, দুর্বৃত্ত। তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহের মেঘে কেটে গেল। এইভাবে ঘটল সন্দেহমুক্তি তথা মেঘমুক্তি। তাই এই নাটিকার নাম 'মেঘমুক্তি' 'মেঘমুক্তি'তে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন প্রফেসর অতুল ঘোষের চরিত্রে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বিজয় চরিত্রে জহর গাঙ্গুলী, প্রদ্যোৎ চরিত্রে রতীন ব্যানার্জী, ড. স্বপন রায়ের চরিত্রে সন্তোষ সিংহ, গীতা চরিত্রে শ্রীমতী রাণীবালা, অপর্ণার চরিত্রে শ্রীমতী পদ্মাবতী, বেবি চরিত্রে শ্রীমতী ঊষা দেবী। নাটিকাটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

তুমি ও আমি ঃ

বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা 'তুমি ও আমি' প্রহসনটি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর অভিনীত হয় রঙমহল মঞ্চে। রচনাটি কেবলমাত্র নিয়ম মাফিক লেখা। জনৈক সমালোচক বলেছেন,—

> "...his Toomi-O-Ami was a mixture of humour and satire centring on a theatrical group engaged in rehearsing a play."[১]

'তুমি ও আমি' নাটিকার বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—প্রথম ও চন্ড-কৌশিক—দুর্গাদাস ব্যানার্জী, শতদল ও অরূপ—নীতিশ মুখার্জী, ডলি—রেণুকা রায়, মিলি—পদ্মাবতী, রীণা—অঞ্জলি রায়, আন্টি—শ্রীমতী গিরিবালা।

এই নাটিকায় প্রহসনকার বিধায়ক ভট্টাচার্য আধুনিক জীবনের নানান জটিলতার মূলে যে কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা তার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনচর্যার চিত্রায়ন ঘটিয়ে কৌতুককে আরও তীব্রতর করে তুলেছেন। নাটিকার নামকরণে উনিশ শতকের 'দাদা ও আমি' কিংবা 'গাধা ও তুমি' প্রহসনের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

তাইতো ঃ

বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা 'তাইতো' প্রহসনটি শ্রীরঙ্গমে অভিনীত হয় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি। এটিও একটি হাল্কা রসের সামাজিক পালা। এই হাস্যরসাত্মক নাটিকাটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন—জীবন্ময়ের ভূমিকায় শ্রীশৈলেন চৌধুরী, সময়—শ্রীমিহির ভট্টচার্য, সুরেশ—শ্রীবিপিন মুখার্জী, মালবিকা—শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, মল্লিকা—

১. The Story of the Calcutta Theatres: 1753–1980 / S. K. Mukherjee /241

শ্রীমতী মলিনা দেবী, বল্লিকা—শ্রীমতী রেবা দেবী, মিসেস ঢোলে—শ্রীমতী নিভাননী। 'তাইতো' নাটিকাও শ্রীরঙ্গমে বেশ কিছুদিন দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে।

অতএব ঃ

প্রায় বাইশ বৎসর বিধায়ক ভট্টাচার্য মঞ্চের জন্য প্রহসন রচনা করেননি। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর তাঁর সামাজিক প্রহসন 'অতএব' রঙমহল থিয়েটারে অভিনীত হয়। হাস্যরসের উচ্ছলতায় দীর্ঘদিন পরে তিনি রঙমঞ্চের দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছেন। হাস্যকৌতুকাভিনেতা জহর রায় এবং সিনেমা জগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী চ্যাটার্জীর অসাধারণ অভিনয়ে 'অতএব' নাটিকাটি দীর্ঘদিন দর্শকদের আকর্ষণ করেছে। এই নাটিকায় দোলগোবিন্দের ভূমিকায় জহর রায়, অনন্তের ভূমিকায় হরিধন মুখার্জী সৌমিত্রের ভূমিকায় অজয় গাঙ্গুলী, বেচারামের ভূমিকায় মিন্টু চক্রবর্তী, নয়নের ভূমিকায় *সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী সরযূবালা দেবী, দীপুর ভূমিকায় মমতা* ব্যানার্জী, প্রমুখ অবতীর্ণ হন।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৬—১৯৭৬) ঃ

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ভারতে তারুণ্যের মূর্ত প্রতীক। তাঁর কবিতা, গান, প্রবন্ধে তিনি ছুটিয়েছেন আগুনের ফুল্‌কি। কিন্তু চির তরুণ এই সদাহাস্যময় মানুষটি এক সময় কয়েকটি প্রহসনও রচনা করেছিলেন। জনৈক প্রবন্ধকার জানিয়েছেন,—

> "তৎকালে সেই অঞ্চলে 'লেটো নাচ' নামক এক ধরনের যাত্রাভিনয় প্রচলিত ছিল; পল্লী কবিরা পদ্যে নাটক রচনা করতেন, আর গ্রাম্য অভিনেতারা নৃত্যগীত সহকারে সেই যাত্রানাট্যের রূপ দিতেন। নজরুল এগারো বারো বৎসর বয়সেই সেই 'লেটো'র দলের জন্য বহু গান, নাটক ও প্রহসন লিখে খ্যাতি অর্জন করেন।"[১]

বহু চেষ্টা করেও নজরুল রচিত সেই প্রহসনগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে নজরুলের যে প্রাহসনিক প্রতিভা ছিল তা তাঁর হাস্যরসাত্মিক গানগুলি সঠিকভাবে প্রমাণ করে। স্ত্রী ও পুরুষের সংলাপে রচিত সংলাপময় দুটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃতি নেওয়া যাক,—

"স্ত্রী। হদ্দ হ'য়ে মলুম মাগো মদ্দ বিয়ে করে।
পু। ধাড়ী মেয়ে বিয়ে করে নাড়ী গেল চ'ড়ে।।
উভয়ে। (বেশি) ব'কো না—হাটের মাঝে ভেঙে দেবো হাঁড়ি।
স্ত্রী। সোয়ামী যদি বল্‌তে হয় ত আমার বড় দাদা,
পু। বল্‌তে হয় ত বলো,—আমার নাইকো কোনো বাধা।"[২]

একপৃষ্ঠার আয়তনে বদ্ধ কৌতুক নাট্য 'কালোয়াতী কসরৎ" (১৩৪০) নাটিকায় হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটেছে। একটি হাসির গানে দেখি,—

"বৌ পালাল বৌ পালাল
বিয়ের হাঁড়ি নিয়ে।

১. সওগাত / ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা
২. নজরুল রচনাসম্ভার (৭ম) / হরফ / পৃঃ ৮৮

সে বৌকে আনতে যাব
মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে।।”

কালোয়াতী গান শুনে গাব্বুসের বাপের মনে পড়ে গেছে তার পোষা পাঁঠার কথা, কারণ “তোমার মুখের ওস্তাদজীর লাহান দাড়ি আছিল। হেও ঐহুন ম্যা ম্যা কইরা ডাক্‌ত।”

“পুতুলের বিয়ে' (১৩৪০) নজরুলের আর একটি শিশুদের উপযোগী সরস কৌতুক নাটিকা। আর একটা কথা, নজরুল যে 'লেটোর গান' রচনা করতেন—গ্রাম্য অভিনেতারা যে 'লেটো মার্চ' নাচতেন তা অনেকটা গ্রাম্য সঙযাত্রা বা ভুচুং বাউলের সমধর্মী বলে মনে হয়। এই সব পালা কখনও কখনও খাতায় লেখা থাকত—কখনও থাকত স্মৃতিতে। তারপর একসময় পোকা নষ্ট করে দিত খাতাকে আর সময় নষ্ট করে দিত স্মৃতিকে। এইভাবে গ্রাম্য সংস্কৃতির এক একটা অধ্যায় শেষ হয়ে যেত। তবে নজরুলের লেখা কিছু উচ্চভাবাশ্রয়ী লেটো গান ও পালার সন্ধান পাওয়া গেছে।

অয়স্কান্ত বক্সী ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলা রঙ্গমঞ্চে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন অয়স্কান্ত বক্সী 'ভোলা মাস্টার' নাটক রচনা করে। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে সংযত বিদগ্ধ সংলাপ পূর্ণ একটি হাস্যরসাত্মক নাটকও রচনা করেন তিনি 'ডক্টর মিস্ কুমুদ' এই নাটিকাটি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০মে রঙমহল থিয়েটারে অভিনীত হয়। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও কাহিনীর উজ্জ্বলতায় নাটিকাটি সহজেই দর্শক মন জয়ে সমর্থ হয়েছিল। তবে কাহিনী নিতান্ত সাদামাটা হওয়ার 'ডক্টর মিস্ কুমুদ' বেশিদিন দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারে নি।

জলধর চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৬৪)

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে 'দেশের মাটির সঙ্গে' যোগাযোগ রাখার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে জলধর চট্টোপাধ্যায় বাংলা নাটকের আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যুগগত প্রয়োজন এবং রঙ্গমঞ্চের তীব্র চাহিদা থাকা সত্ত্বেও জলধর ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক রচনায় উৎসাহ দেখাননি। তিনি তাঁর চারপাশের মানুষজন, তদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার পাঁচালী রচনা করেছিলেন তাঁর নাটকগুলির মধ্যে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> “...তিনি মৌলিক বিষয়বস্তু লইয়া প্রধানত বাংলার সমাজ ও পারিবারিক জীবনভিত্তিক নাটকই রচনা করিয়েছেন, পাশ্চাত্ত্য নাটকের কোনও অনুবাদ কিংবা কোনো উপন্যাসের কোনো নাট্যরূপ দিবার প্রয়াস পান নাই।”[১]

নাট্যকার নিজেও দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য কাল্পনিক কাহিনী নিয়ে নাটক রচনাকে সমর্থন করতে পারতেন না। তিনি এক সময় বলেছিলেন “দেশের মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ শূন্য হাওলাতী গল্পাংশ লইয়া নাট্যরচনাকে নাট্যসাহিত্যিকের পক্ষে অকর্তব্য মনে করি।”[২]

জলধর চট্টোপাধ্যায় বাংলা নাটকের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর হাল্‌কা রসের প্রহসনধর্মী সামাজিক নাটিকাগুলির জন্য। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য হাস্যরসাত্মক নাটিকাগুলি

১. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) / ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য / পৃঃ ৪০২
২. ঐ / পৃঃ ৪০২

হল—'পি-ডাবলিউ-ডি', 'হাউসফুল' প্রভৃতি। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক হল 'রীতিমতো নাটক' (১৯৩৫)।

পি-ডাব্ লিউ-ডি

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'পি-ডাব্লিউ-ডি' হাস্যরসাত্মক নাটিকাটি নাট্যভারতীতে অভিনীত হয় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের মহালয়ার দিন (১৯৪০)। এই নাটিকার কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—রায়বাহাদুর—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সনৎ—সন্তোষ সিংহ, সৌমেন—রতীন ব্যানার্জী, মিঃ সেন—দুর্গাদাস ব্যানার্জী, বিরূপাক্ষ—তুলসী চক্রবর্তী, দ্বিজবর—কুমারকৃষ্ণ মিত্র, অঞ্জলি—শ্রীমতী সুহাসিনী, মালতী—শ্রীমতী নির্মলা, শ্যামলী—রাণীবালা, মাধবী—শ্রীমতী নন্দরাণী প্রমুখ।

'পি-ডাব্লিউ-ডি' নাটিকাটি আগাগোড়া হাস্যরসাত্মক নয়, কিন্তু স্থানে স্থানে কাহিনী বিন্যাসে এবং উপসংহারে এতে প্রহসনের বীজ লক্ষ্য করা যায়। এর কাহিনী অংশটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

সৌম্যেন নামে একজন প্রিয়দর্শন যুবক 'সেবিকা-সঙ্ঘের সেক্রেটারী। সে সেবিকা-সঙ্ঘ গড়ে তুলেছে অর্থ রোজগারের ধান্দায়। বিত্তবান অসুস্থ মানুষ, যাদের সেবা শুশ্রুষা করার কেউ নেই— সৌম্যেন মাসিক অর্থের বিনিময়ে তাদের সেবা করার জন্য সেবিকা পাঠায়। সে বিয়ে করতে চায় না—কারণ বিয়ে করলে জগতে কোনো কাজ করা যায় না। অঞ্জলি নামে এক সেবিকা সৌম্যেনকে ভালোবাসে। সে বারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল। এখন সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সৌম্যেন রাজী নয়।

রায়বাহাদুর একজন বিত্তবান বৃদ্ধ মানুষ। সারা জীবন বহু পরিশ্রম করে তিনি নয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা জমিয়েছেন। তাঁর ছেলে সনৎ—যাকে তাকে অর্থ দান করে। একদিন সে মাতাল মিঃ সেনকে অর্থ দান করার জন্য বাবা তাকে তিরস্কার করায় সে সন্ন্যাস নিয়ে ঘর থেকে চলে যায়। সনৎ বর্তমানে সদানন্দস্বামী।

রায়বাহাদুর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সেবিকা শ্যামলী তাঁর সেবা করে। তিনি শ্যামলীকে তাঁর 'মা' বলে বলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শ্যামলীর নামে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে বলে যান সে টাকা তাঁর পুত্রের হাতে তুলে দিতে। তবে পুত্র সন্ন্যাসী তাই একবারে তার হাতে টাকা তুলে দিলে সে সব দান করে নয়ছয় করে দেবে—তাই শ্যামলী যেন বুঝে শুনে টাকা দেয়।

রায়বাহাদুরের মৃত্যুর পর সদানন্দ স্বামী পিতৃশ্রাদ্ধ কার্যের জন্য ফিরে আসে শ্যামলীর অনুরোধে ঘরে থাকে ক'দিন। তারপর কৌশলে শ্যামলী তাকে গেরুয়া ছাড়িয়ে সংসারী করে তোলে। শ্যামলীর সঙ্গে সনতের বিবাহ হয়নি—কিন্তু শ্যামলীর গর্ভে আসে সনতের সন্তান।

শ্যামলীকে হত্যা করে বৃদ্ধের সমস্ত টাকা হস্তগত করবার জন্য সৌম্যেন মিঃ সেনকে দিয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইড নামে উগ্র বিষ আনায়। তারপর অঞ্জলিকে বিবাহের লোভ দেখিয়ে শ্যামলীর চায়ে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে—কিন্তু শেষমেষ সেই চা নিজে খেয়ে সে আত্মহত্যা করে। সনৎ শ্যামলীকে দোষী ভেবে তাকে ত্যাগ করে আবার আশ্রমে ফিরে যায়। মিঃ সেনের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সৌম্যেন তার দোষ

স্বীকার করে। কুমারী শ্যামলীকে জননী করার অভিযোগে[১] মিঃ সেন সদানন্দ স্বামী ওরফে সনৎকে অভিযুক্ত করে বলেন—হয় সে শ্যামলীকে বিয়ে করবে, নাহলে তার হাতের রিভলবারের গুলিতে মরবে। সম্ভাব্য মিলনের ইঙ্গিতে নাটক শেষ ভেবে যখন অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা নিজেদের পোষাক খুলতে শুরু করে দিয়েছে—নাটকে নিজেদের অভিনয়ের সমালোচনা করছে নিজেদের মধ্যে—এমন সময় প্রমটার স্টেজে ঢুকলেন খাতা আর টর্চ নিয়ে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তিনি বলেন,—

"প্রমটার—আপনারা করছেন কি? এখনো ড্রপ পড়েনি!

সেন সাহেব—অ্যাঁ ড্রপ পড়েনি! কেন?

প্রমটার—আপনার পার্ট বাকি আছে যে...

সেন সাহেব—তাই নাকি? দশটা টাকা দাও। নেই?

হা হা হা Then, my P. W. D. work over, Good night ladies and gentlemen, good night" (২।৪)

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'পি-ডাব্লিউ-ডি' প্রহসনটি অসাধারণ মঞ্চ সাফল্য লাভ করেছিল। কিন্তু এর রচনা ছিল অত্যন্ত সাধারণ মানের। জনৈক সমালোচক বলেন,—

"Jaladhar Chatterjee's P. W. D. was the puja offering of 1940, P. W. D. proved an outstanding success on the stage even though as a drama it was only mediocre.[২]

সৌম্যেন চরিত্রে অর্থগৃধ্নু স্বার্থপরতার চূড়ান্ত রূপ দেখানো হয়েছে। এই চরিত্রটি ঐ সময়কার এক বিশেষ শ্রেণীর চারিত্র্যরূপ প্রকাশ করেছে—যারা ধর্ম মানে না, সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন, এমনকি সামাজিক জীবনে সুস্থতার জন্য যে বিবাহ—তাকেও ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করে থাকে। বিবাহ সম্পর্কে সৌম্যেনের মত,—

"শোনো অঞ্জলি, বিবাহ একটা Convention ছাড়া আর কিছু নয়। ভালোবাসা তো weakness! সত্যিই যদি এ জগতে কিছু করতে চাও—ওসব weakness গুলো ত্যাগ করো।" (১।১)

কিন্তু অঞ্জলির আত্মহত্যার পর সে-ই সৌম্যেন ভেঙে পড়েছে।

সে সন্ন্যাসীর গেরুয়া ধারণকেও ব্যঙ্গ করেছে, সদানন্দ স্বামীর গেরুয়া ধারণ প্রসঙ্গে সে বলে,—

"Hang your ভগবান! ভগবান এলেই তার সঙ্গে আসে ধর্মের ভণ্ডামি আর সংস্কারের হীনতা। মার্কস বা লেনিন তোমাদের মত গেরুয়া পরতেন না।" (১।৬)

---

১. 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা (১৯২২) গ্রন্থে যতীন্দ্রমোহন সিংহ সাহিত্যে অশ্লীল প্রসঙ্গের বিরুধে মন্তব্য করেছিলেন বহুপূর্বেই। তিনি বলেছিলেন,—"আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—পাশ্চাত্য সমাজের প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের স্থিতিশীল সমাজে অনেকদিন হইতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে ; সমাজের আদর্শ ও আকাঙ্খার মধ্যে অত্যন্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, ...পাশ্চাত্য সমাজের লালসা-পিপাসা উদ্দীপ্ত হইয়া—হিন্দুজাতির মজ্জাগত সংযমের বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীশ্বর শিক্ষাপদ্ধতি (godless education) নব্য যুবকদিগকে কেন্দ্রভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া আসিতেছে। ইহার পরে বাস্তব নামধারী কামকলুষময় সাহিত্য যদি আর্টের পুষ্টির জন্য লালসার ইন্ধন যোগাইতে আরম্ভ করে, তবে সমাজকে কিসে রক্ষা করিবে?"

২. The Story of the Calcutta Theatres: 1753—1980 / S. K. Mukherjee / p-259.

প্রহসনের ধর্ম স্বীকৃত এর দৈর্ঘ্যে। দুই অঙ্কে সীমাবদ্ধ 'পি-ডাবলিউ-ডি' প্রহসনটির প্রথম অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য রয়েছে। এই নাটিকার উপসংহারটি উনিশ শতকে গিরিশচন্দ্রের নাটকের শেষাংশের টেকনিকের কথা মনে করিয়ে দেয়।

হাউস ফুল ঃ

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের আর একটি হাস্যরসাত্মক মঞ্চসফল সাধারণ রচনা 'হাউসফুল' (১৯৪১)। খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জুলাই মিনার্ভা থিয়েটারে 'হাউসফুল' প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয়। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং রবীন্দ্রমোহন রায় প্রমুখ অভিনেতা এই নাটিকায় অভিনয় করেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন,—"ইহার নামকরণ হইতেই ইহার বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ইহা বিশেষত্বহীন রচনা হইলেও মিনার্ভা থিয়েটারে কিছুকাল অভিনীত হইয়াছিল।"

জলধরের প্রহসন দুটির উল্লেখযোগ্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল দুটিতেই কাহিনীর জটিল বিন্যাস, অর্থগৃধ্নু মানুষের নিষ্ঠুরতা, পিস্তল-রিভলবারের প্রয়োগ, এসময়কার অন্যান্য নাটিকার মত বিষ মানেই পটাসিয়াম সায়ানাইডের প্রয়োগ ইত্যাদিতে। কিছু কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও জলধরের প্রহসন দুটি সমকালে জনপ্রিয় হয়েছিল। জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'লেডিজ ওনলি' (১৯৪৬) 'কন্ট্রোলের শাড়ি' (১৯৫৫), প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য নাটিকা।

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ঃ

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'অনিলা বা বরবদল' কোহিনূর থিয়েটারে অভিনীত হয়। এটি একটি রঙ্গনাট্য। মন্ত্রী দুর্বুদ্ধির মেয়ে অনিলাকে বিয়ে করতে চান রাজা গম্ভীর সিংহ, কিন্তু দুর্বুদ্ধি তাঁর বন্ধুর পুত্র বিজনকুমারের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চান। রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে জানান—কদাকার পেচকলালের সঙ্গে তিন দিনের মধ্যে অনিলার বিয়ে না দিলে মন্ত্রীর গর্দান যাবে। মন্ত্রী ভূতের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কৌশলে মেয়ের সঙ্গে বিজনের বিয়ে দেন। রাজাও শেষ পর্যন্ত তা মেনে নেন। হাস্যরসের অনাবিল স্রোতে নাটিকাটি বড় উপভোগ্য হয়েছে। মোসাহেবদের কথাবার্তা যথেষ্ট হাসির খোরাক জোগায়। এখানে একটু উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি,—

"দুর্ব্বুদ্ধি। মহারাজ কি আমাকে সেলাম দিয়েছেন?
মোঃ গণ। কি—মহারাজ তোমায় সেলাম দেবেন? তুমি মহারাজকে সেলাম দাও,—তুমি সেলাম দাও!
গম্ভীর। না হে না, দিয়েছি, আমিই সেলাম দিয়েছি।
মোঃ গণ। দিয়েছেন—মহারাজই সেলাম দিয়েছেন।" (১।১)

অন্যত্র দেখি,—

গম্ভীর। "চিরকাল—সেই ঠাকুরমার কাছে রূপকথা শোনা থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত শুনে আস্‌ছি যে কত ভূত আছে সব কালো—
মোঃ গণ। যত ভূত আছে সব কালো মহারাজ,—একটাও শাদা কি লাল নেই—সব কালো।
গম্ভীর। তার আবার বিকটাকার—
মোঃ গণ। বি-ক-টা-কা-র (স্বগতঃ) রাম—রাম? "(১।৫)

প্রমথনাথ বিশী (১৯০১—১৯৮৬)

প্র-না-বি ছদ্মনামের অন্তরালে থেকে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ব্যাপী যে শক্তিমান প্রহসনকারের অসাধারণ লেখনী বারবার নানা সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গের খোঁচায় মানুষ জাগানিয়া গান গেয়েছে—সে মানুষটি এ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসনকার প্রমথনাথ বিশী। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এই ছোট্ট-খাটো মানুষটির ভেতর এমন এক বলিষ্ঠ চেতনা এবং সমাজবোধ ও মানবিকতাবোধ ছিল যা ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুতপক্ষে বাংলা ভাষায় হাস্যরসাত্মক গল্প রচনার মাধ্যমে পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু বাঙালী পাঠকমনকে জয় করেছিলেন হিউমারের মিষ্টি ছোঁয়ায় কিন্তু প্রমথনাথ বিশীর নাটকে হিউমার নয় স্যাটায়ারের চাবুক বার বার ঝলসে ঝলসে উঠেছে। চাবুকের আস্ফালন অব্যর্থ-লক্ষ্য হয়েছে।

উনিশ শতকের বাংলা প্রহসনে ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের প্রভাবের কথা বার বার বলেছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বহু প্রহসনকারও প্রহসন রচনা করতে গিয়ে কখনও কখনও মলেয়ারের দ্বারা হয় অনুপ্রাণিত হয়েছেন, নয়তো সরাসরি অনুসরণ করেছেন। প্রমথনাথ বিশীও মলেয়ারের দ্বারা কিছুটা অনুপ্রাণিত হলেও বার্ণাড শ'কে তিনি আদর্শ করে নিয়েছিলেন। মলেয়ারের সঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর নাট্যবোধের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন,—

> "...মলেয়ারের তুলনায় প্রমথনাথ বিশীর জীবনদৃষ্টি গভীর এবং স্বচ্ছতর; তাঁহার সহজাত কৌতুকবোধের স্পর্শে তাঁহার রচনা মাত্রই সরস হইয়া উঠে। তথাপি মলেয়ার অপেক্ষা তাঁহার আঘাত তীব্রতর বলিয়া বোধ হইবে।"[১]

ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমথনাথ বিশীর প্রাহসনিক প্রতিভার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন,—

> "Pramathanath Bishi, the noted scholar-critic-poet-novelist, contributed two delightful plays to the public theatre...The plays are marked by the author's observation of hollowness and hypocrisy in modern sophisticated urban life. His satire is at once pungent and pleasent. His wit and humour are polished."[২]

প্রমথনাথ বিশীর প্রাহসনিক কৃতিত্ব বিচার করতে গিয়ে ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন,—

> "প্রমথনাথ বিশীর 'ঋণং কৃত্বা', 'ঘৃতং পিবেৎ', এবং 'মৌচাকে ঢিল' ব্যঙ্গ নাট্যের ইতিহাসে একক স্থানের অধিকারী। পুরাতন প্রহসনের রুচিহীনতা এদের স্পর্শ করে নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথসুলভ স্মিতহাস্যও এখানে প্রত্যাশিত নয়। ব্যঙ্গের তীব্রতা এদের কটু আস্বাদে বিশিষ্ট করে তুলেছে। ভাষার উপরে সম্পূর্ণ অধিকার থাকায় ব্যঙ্গরস সৃজনে তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন।"

---

১. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) / ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য / পৃঃ ৩৯২

২. The Story of the Calcutta Theatres : 1753–1980 / S. K. Mukherjee / p--569.

'ঋণংকৃত্বা' প্রহসনটির কাহিনী নিম্নরূপ,—

সনৎকুমারের পিতা একজন ব্যবসাদার। ব্যবসার মূলধন ছিল তাঁর ঋণের টাকা। ব্যবসা ফেল হয়ে যাওয়ার শোকে পুত্র সনতের উপর প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার দেনার দায়িত্ব রেখে তিনি স্বর্গে চলে যান। সনৎকুমার নিজেও ভীষণ অপব্যয়ী। ফলে সেও ঋণগ্রস্ত ছিল। এ অবস্থায় পিতৃঋণ এবং নিজ ঋণের ভারে বিপর্যস্ত হয়ে সনৎকুমার পালিয়ে বেড়ায়। চাকর ভজুয়া কোন রকমে পাওনাদারদের সামাল দেয়।

সনৎকুমার ভালোবাসে মঞ্জরীকে। সে ছিল তার গানের শিক্ষক। উকিল হর্ষনাথবাবুরও দৃষ্টি ছিল মঞ্জরী এবং তার বন্ধবী মণিকার প্রতি। মণিকা ভালোবাসে ললিত নামে এক যুবককে। ফলে হর্ষনাথবাবু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে মঞ্জরীর দাদু সুরদাসবাবুকে দিয়ে সনৎকুমারকে সঙ্গীতের শিক্ষকতা থেকে অপসারিত করে একজন বৃদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষককে মঞ্জরীর জন্য নিয়োগ করেন। সে বৃদ্ধ আর কেউ নয় ছদ্মবেশী সনৎকুমার। সুরদাসকে দিয়ে হর্ষনাথ সনৎকুমারকে উকিলের চিঠি পাঠালেন তাঁর দেনাশোধের জন্য।

মণিকার বাবার প্রচুর টাকা ছিল। হর্ষনাথের মণিকার প্রতি দুর্বলতার কারণ এটাও সমস্ত খবরাখবর পাবার জন্য হর্ষনাথ তার বন্ধু লোকেনের শ্যালক চন্দ্রনাথকে পুনর্ণবার ছদ্মবেশে ললিতদের বাড়ীতে পাঠান। ললিত পুনর্ণবাকে প্রেম নিবেদন করে বসল। এরি মধ্যে মেজর গুপ্তও পুনর্ণবাকে পেতে চাইলেন, ফলে—উভয়ে উভয়কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানান।

ছদ্মবেশী সনৎকুমারকে চিনতে পেরে মঞ্জরী আনন্দের সঙ্গে গান শিখছিল। কিন্তু সুরদাস সনতের ছদ্মবেশ ধরে ফেললেন। সনৎকুমারের সঙ্গে তিনি মঞ্জরীর বিয়ে স্থির করে ফেললেন। ইতোমধ্যে পুনর্ণবা আর হর্ষনাথের গোপন কথাবার্তা আড়াল থেকে শুনে ললিত আর মণিকা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পরস্পর মিলিত হয়। চাকর-চাকরাণী ভজুয়া-পুঁটিও নিজেদের বিবাহের কথা ঘোষণা করে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে প্রথমনাথের হাস্যরসাত্মক নাটকের কাহিনী নায়ক-নায়িকার মিলনের পাশাপাশি আরও দুটি মিলনবার্তা জানানো হয়েছে—একটি নায়কের কোন বন্ধুর, অন্যটি নায়ক-নায়িকার চাকর-চাকরাণীর। সুতরাং সংলাপ প্রয়োগে কৃতিত্ব থাকলেও কাহিনী বয়নে প্রমথনাথ আঠারো-উনিশ শতকের থেকে খুব দূরে যেতে পেরেছেন বলে এখানে মনে হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও অভিনীত 'কাল্পনিক সংবদল' নাটিকার সঙ্গে কাহিনী অংশে 'ঋণং কৃত্বা'র একটা সূক্ষ্ম মিল রয়েছে। তবে তফাৎ শুধু ঋণ-প্রসঙ্গ।

'ঋণং কৃত্বা' প্রহসনটি মঞ্চসফল হয়েছিল এর বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ এবং চাতুর্যপূর্ণ নাট্য-পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য। মোটা দাগের হাসির সৃষ্টি করেছিল সনৎকুমারের বৃদ্ধের ছদ্মবেশ ধারণ। এ নাটিকায় হাস্যের ফোয়ারা ছোটে যখন ধারশোধের নামতা আবৃত্ত হয়,—

"ধার এক্কে ধার
কে—করে তোয়াক্কা কার॥
ধার দুগুণে ধার
হও—একটু হুঁশিয়ার॥
তিন ধারে ধার

কর—মিঠা বচন সার॥

* * *

নয় ধারে ধার

হোক—বডি ওয়ারেন্ট বার॥

দশ ধারে ধার

দাদা—হওগে পগার পার॥" (২।১)

মৌচাকে ঢিল ঃ

প্রমথনাথ বিশীর হাস্যরসাত্মক বিদ্রূপাত্মক নাটিকা 'মৌচাকে ঢিল'কে কেউ কেউ বলেছেন রাজনৈতিক তর্কনাট্য। 'মৌচাকে ঢিল' নাটিকায় একই সঙ্গে রয়েছে দুটি ঘটনার বিন্যাস। প্রথমটি ৭৮৫-৯০ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় রাজ্যে মাৎস্যন্যায়ের যুগে গোপালদেবের সিংহাসনে আরোহণ ও রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নানা আইন প্রণয়ন। এতে এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দেশে অব্যবস্থা না চলায় যাদের সমূহ ক্ষতি। এদের দলনেত্রী ভদ্রা। পরে বিশেষ কৌশলে গোপালদেব ভদ্রাকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করলেন। অতঃপর তিনি মরার ভান করে পড়ে থাকলেন। এই সুযোগে মগভট্ট, ঈশ্বর ঘোষ উৎফুল্ল হল—মণিভদ্র-ভদ্রার মাল্যবিনিময় হয়ে গেল। বাইরে যখন আবার কোলাহল শুরু হল তখন হঠাৎ গোপালদেব উঠে এসে সৈন্যদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভণ্ডদের মুখোশ খুলে দিলেন। জনসাধারণকে জানিয়ে দিলেন ভূস্বামী, শ্রেষ্ঠী ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের ভুলিয়ে রেখেছে।

'মৌচাকে ঢিল' নাটিকার অন্য কাহিনীটি এরূপ—সর্বানন্দবাবু মৃত্যুর সময় উইল করে গেছেন, তাঁর কন্যা সুভদ্রা যদি কোন বঙ্গীয় আইন-সভার সভ্যকে বিয়ে করে তবে তাঁর সম্পত্তি পাবে—নতুবা সব সম্পত্তি গৌড়ীয় পুরাতত্ত্ব গবেষণা সমিতি পাবে। মণিময় এবং শ্রীমন্ত—দুজন সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী। শ্রীমন্ত আবার সুভদ্রার বিমাতারও পছন্দসই পাত্র। মণিময় ও শ্রীমন্ত দু'জনে নির্বাচনে দাঁড়াল। কল্যাণ হল নিরপেক্ষ দ্রষ্টা। শ্রীমন্ত জিতে যাওয়ায় মণিময় হার্টফেল করে মারা গেল। এ অবস্থায় শ্রীমন্ত জানান তার এই জয়ের মূলে রয়েছে তার চালাকি। তখন সুভদ্রা তাকে ছেড়ে কল্যাণকে বিয়ে করতে চাইল—কল্যাণও জানাল সে শ্রীমন্তের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর ম্যাজিসিয়ান মাত্র। তখন সুভদ্রার সমস্ত সম্পত্তি গৌড়ীয় পুরাতত্ত্ব গবেষণা পরিষদে চলে গেল। সেখানে সুভদ্রা সম্পাদক হল, কোষাধ্যক্ষ হল কল্যাণ।

দেশের দুরবস্থায় চিন্তিত শিক্ষিত ও পণ্ডিত বর্গ গবেষণা পরিষদের এক সভায় গোপালদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে জানান দেশের এ অবস্থায় তাঁরা সকলেই গোপালদেবের পুনরায় আবির্ভাব কামনা করেছেন। এ সময় হঠাৎ মঞ্চের গোপালদেবের মূর্তি সজীব হয়ে ওঠায়—সকলে পালিয়ে গেলেন। রইলেন কেবল রিপোর্টার। রিপোর্টার গোপালদেবের প্রশ্নের উত্তরে জানান—এঁরা সত্যি সত্যি গোপালদেবকে চাননি, বক্তৃতা দিতে গিয়ে মিছিমিছি কেঁদেছেন—কেননা এটাই স্মারক বক্তৃতার নিয়ম। গোপালদেব চলে যাবার পর শ্রীমন্ত এসে বক্তৃতা দিয়ে জানাল নির্ভেজাল মিথ্যা কথাই বাংলাদেশে বর্তমানে একমাত্র সত্যবস্তু। জনতা শ্রীমন্তের সত্যভাষণের তারিফ করল। এদিকে সুভদ্রা-কল্যাণকে প্রেম নিবেদন করল। নাটিকাটির উপর যবনিকা পড়ল।

এই নাটিকার দুটি কাহিনীতেই দেখা যাচ্ছে গোপালদেবের মত দক্ষ এবং সৎ শাসককে সুবিধাবাদী মানুষেরা কেউ চায় না। কিন্তু মুখে সবাই চায়—মনে মনে চায় লুটে পুটে নেবার মত বিশৃঙ্খল পরিবেশ। গোপালদেব মাৎস্যন্যায়ের পক্ষে বিভীষিকার প্রতীক। তাই তার মৃত্যু চায় অনেকেই, আগেও চেয়েছে এখনও চায়। এর কাহিনী বিন্যাস নাটকটিকে ঠিক প্রহসন হতে দেয় নি। শেষ পর্যন্ত বক্তব্যের গভীরতায় 'মৌচাকে ঢিল' নাটিকাটি একটি সার্থক কমেডি নাটক হয়ে উঠেছে। এর নামকরণও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যবসায়ী ও সুবিধাবাদী শ্রেণীদের চক্রই হল মৌচাক। সেই চক্র বা চাককে ভাঙতে চেয়েছিলেন গোপালদেব। সেকারণে মৌচাকের সদস্যরা চাকে ঢিল ক্ষেপণকারী গোপালকে সমর্থন করতে পারে নি। 'মৌচাকে ঢিল' অর্ধশত বৎসর পূর্বে রচিত হলেও এ নাটক আজকের নাটকও। কেননা আজও এ দৃশ্য দুর্লভ নয়।

ঘৃতং পিবেৎ বা সানিভিলা ঃ

আধুনিক জীবনের অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বরকে ব্যঙ্গ করেছেন প্রমথনাথ 'ঘৃতং পিবেৎ' বা 'সানিভিলা' হাস্যরসাত্মক নাটিকাটিতে। বড় সাজার হাস্যকর প্রয়াসে জীবনকে ইচ্ছাকৃত অনিশ্চয়তার দোলায় দুলিয়ে কেউ কেউ যেভাবে সংসারকে নষ্ট করে ফেলে, শহুরে হবার চেষ্টায় চেষ্টিত জনৈকের জীবনচিত্রের মাধ্যমে তারই এক করুণ মধুর চিত্র আঁকা হয়েছে এই ছোট লঘুরসাত্মক নাটিকাটিতে। তিন অঙ্কে রচিত 'ঘৃতং পিবেৎ' নাটকের দৃশ্য সজ্জা এরূপ—প্রথম অঙ্কে চারটি, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি এবং তৃতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য রয়েছে। নাটকটির ভূমিকায় প্রমথনাথ একে বিবাহতত্ত্ব বিষয়ক একটি 'অপ-রোমান্টিক নাটক' বলেছেন।

এর কাহিনী অংশ এরূপ—সর্বেশ্বরবাবুর একমাত্র কন্যা প্রমীরা। বড়লোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিজের ভাগ্য ফেরানোর জন্য 'রায় বাহাদুর' সেজে বালীগঞ্জে 'সানি ভিলা'য় বসবাস শুরু করলেন। গুজবের কল্যাণে তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা, ঘরের জাঁকজমকের কথা অচিরে সর্বসাধারণ জেনে গেলে মাকড়দহের রাজকুমার ত্রিদিবেন্দুনারায়ণ প্রমীরাকে বিবাহ করতে চায়। ত্রিদিবেন্দু আসলে ছদ্মবেশী ত্রিদিব—গাড়ীর ড্রাইভার সে। প্রমীরাকে বিয়ে করে বড়লোকের জামাই হয়ে সেও অদৃষ্ট ফেরাতে চায়। আবার প্রমীরাকে যাতে ত্রিদিবের পছন্দ হয় এজন্য সর্বেশ্বরবাবু নিজের কন্যাকে নানা শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

প্রমীরার সেক্রেটারী মালবিকা ও নীরজানাথ পরস্পরকে ভালোবাসে। মালবিকার পূর্বনাম মন্দাকিনী। নীরজার পূর্বনাম নৃপনাথ। মালবিকার পূর্বে বিয়ে হয়েছিল—বাবা মা জোর করে বিয়ে দেওয়ায় সে বিয়ের রাত্রেই পালিয়ে এসেছিল। এখন মালবিকা-নীরজানাথ এবং প্রমীরা-ত্রিদিবের বিবাহ হল। বিবাহের পর প্রমীরা মালবিকা উভয়েই তাদের স্বামীকে বিদেশ যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। এ সময় হঠাৎ জানা যায় যে নৃপনাথের বাবা উইল করে গেছেন যে-সে আবার বিবাহ করলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। এখন সব খুইয়েছে ভেবে বাজার থেকে পটাসিয়াম সায়ানাইড কিনে এনে দুজনে তা পান করে আত্মহত্যা

করতে যায়। কিন্তু তা ছিল পটাসিয়াম ব্রোমাইড। ফলে কারো কিছু হল না। এ সময় জানা যায় নৃপনাথ নূতন বিবাহ করে নি, মালবিকা আসলে মন্দাকিনী। তখন তারা দুশ্চিন্তামুক্ত হয়।

এদিকে এই ঘটনা প্রমীরা ও ত্রিদিবকেও বাস্তব সচেতন করে দিয়েছে। সর্বেশ্বরবাবু ও ত্রিদিব উভয়ে উভয়ের পরিচয় পেয়ে ভেঙে পড়েছে। এ সময় সর্বেশ্বরবাবুর ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হল নৃপনাথ। সে তাকে তার বাড়ীতে নিয়ে এল।

'ঘৃত পিবেৎ' প্রহসনটির নামকরণের মূলে রয়েছে দু'টি বিষয়—

(i) সর্বেশ্বরবাবুর বড়লোকের শ্বশুর হয়ে ঘৃত পান করতে তথা জীবনধারা বদলানোর প্রয়াস করেছেন—অনুরূপভাবে ড্রাইভার ত্রিদিবেরও ইচ্ছে বড়লোকের জামাই হয়ে নিজ অদৃষ্ট ফেরানোর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় দু'জনেই দু'জনকে ফাঁকি দিতে গিয়ে নিজেদের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে।

(ii) নৃপনাথ ও মন্দাকিনী পিতৃসম্পত্তি হারিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে সেটা উগ্র বিষ পটাসিয়াম সায়ানাইড নয় পটাসিয়াম ব্রোমাইড। ফলে মরতে গিয়েও তাদের মরা হয়নি। আবার যখন এ সত্য প্রকাশিত হয় যে তাদের দ্বিতীয়বারে বিয়ে—প্রথমবারের বিবাহের পরিশুদ্ধি মাত্র, তখন নৃপনাথ তার পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হয়। অতএব বিষ পান করতে গিয়ে তারা ঘৃত পান করার পথ খুঁজে পেল। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারল।

'ঘৃত পিবেৎ' বা 'সানি ভিলা' হাস্যরসাত্মক নাটিকাটি অভিনীত হয় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর রঙমহল রঙ্গামঞ্চে।

গবর্ণমেণ্ট ইন্সপেক্টর :

প্রমথনাথ বিশীর 'গভর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টর' নাটিকাটি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শিল্পায়ন গোষ্ঠী কর্তৃক অভিনীত হয়। এই নাটিকার মূল কাহিনী এরকম,—

সরকার নাকি তার নানা দপ্তরের কাজকর্মের গোপন খবর নেবার জন্য ছদ্মবেশে এক ইন্সপেক্টরকে প্রেরণ করেছেন। এ খবর শুনে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত তটস্থ। কেরানী অনঙ্গ কানাইবাবুর হোটেলে থাকে। তার বিস্তর ধার হওয়ায় যখন অনঙ্গ-কানাই ঝগড়া করছে এমন সময় ম্যাজিস্ট্রেট অনঙ্গাকে ইন্সপেক্টর ভেবে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। এরপর হেডমাস্টার ও অন্যান্য অফিসের অফিসারেরা অনঙ্গাকে খুশী করার জন্য প্রচুর উৎকোচ দেন। অনঙ্গ যাবার সময় জানায় যে সে শীঘ্রই ম্যাজিস্ট্রেটের জামাই হতে চায়। অনঙ্গ চলে যায়। ম্যাজিস্ট্রেট অনঙ্গের একটি চিঠি পান। সব জানতে পেরে হায় করতে থাকেন। ঠিক এই সময়ে খবর আসে গভর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টর আসছেন। এই নাটিকা এক বিদেশী নাটিকার গল্পানুসরণে লেখা।

এই হাস্যরসাত্মক নাটিকাটিতে দেখানো হয়েছে সর্বস্তরে ঘুন ধরে যাওয়ায় দেশ কিভাবে সর্বনাশের দিকে এগিয়ে চলেছে। এটির তির্যক বক্তব্য অভ্রান্তভাবে লক্ষ্যভেদ করেছে।

প্রমথনাথ বিশী রচিত আরও দু'টি হাস্যরসাত্মক নাটিকার নাম প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—'বেনিফিট অব ডাউট' (১৯৭৬), 'চব্বিশ ঘণ্টা' (১৯৭৬)। দু'টি নাটিকাই আকাশবাণী কর্তৃক প্রচারিত হয়েছিল—১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল 'বেনিফিট অব ডাউট', ১৯৭২

খ্রীষ্টাব্দের ২ অক্টোবর 'চব্বিশ ঘণ্টা'—এদের মধ্যে 'চব্বিশ ঘণ্টা' অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিল। হরি নামে এক চাকর লটারীর প্রথম পুরস্কার পেয়েছে এই খবর পাওয়ার পর তার মালিক তার প্রতি কি অস্বাভাবিক ধরনের আচরণ করেছে—দেশের অজস্র মানুষ কিভাবে এসে তার তোষামোদ করেছে—পরিশেষে চব্বিশ ঘণ্টা পরে সংবাদপত্রে লটারীর পুরস্কার সংক্রান্ত ভ্রম সংশোধনের পর সেই ভৃত্যের প্রতি তার মালিক ও অন্যান্য মানুষের কি মর্মান্তিক অথচ হাস্যকর আচরণ, তা এই নাটিকায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থের দাসত্ব করায় পটু মানুষের হীনমন্যতা ও অর্থগৃধ্নুতাকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গের চাবুক কষিয়েছেন প্রমথনাথ। এখানেই তিনি অনন্য।

কুমারেশ ঘোষ (১৯১৩-৯৫)

আধুনিক কালের জনপ্রিয় রসিক মানুষ কুমারেশ ঘোষের এক আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে—তা আধুনিক জীবনযন্ত্রণার মধ্যে থেকেও রসের ধারা বইয়ে দেবার। তবে তিনি মূলত কবি। 'যষ্টি মধু' পত্রিকায় প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল ধরে তিনি হাস্যরসাত্মক কবিতা সৃষ্টির ধারাটি ধরে রেখেছেন। তিনি বেশ কয়েকটি লঘু রসের নাটক লিখেছেন ; সেগুলির মধ্যে হাস্যরসের ফেনিল উৎসারে 'ম্যানিয়া' (১৩৫৪), 'ফ্যাশান ট্রেনিং স্কুল' (১৩৩৮), 'যম' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

লঘু নাটকের বিশেষত্ব বিচার করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন,—"আমোদ যাহার লক্ষ্য, আনন্দে যাহার অবসান, হাস্য ও কৌতুক, প্রীতি ও প্রফুল্লতা, সজীবতা ও উৎসাহ যাহার অবয়ব ও সর্বস্ব তাহাই লঘু নাটক বলে অভিহিত।"[১] কুমারেশ ঘোষের নাটকে এ লক্ষণগুলি মেলে।

ম্যানিয়া

হরিহর বাড়ীর কর্তা। সংসারে তাঁর আপন বলতে আছে কেবল এক ভাইপো পুষ্পরেণু, আর ভৃত্য। হরিহরের রোগ বাতিক। নানা রকমের ওষুধ খান তিনি কখনও হোমিওপ্যাথি, কখনও এলোপ্যাথি, কখনও কবিরাজি। তবু সব সময় রোগ রোগ বাতিক। ঘড়ি ধরে তাঁর ওষুধ খাওয়া চাই। এক মিনিট এদিক সেদিক হবার জো নেই। ভাইপো পুষ্পরেণু আধুনিক কবি। তার কবিসঙঘ বিদ্রোহী ভাব পোষণ করে। সে তাদের মাথা। গুরুজনদের তারা থোড়াই কেয়ার করে। কাকা হরিহরের বাড়ীতে থেকে অহোরাত্র শুধু কবিতা চর্চা করে চলেছে। হরিহরের কথা সে মান্য করতে চায় না। ভৃত্য তিনকড়ি এবং কবিরাজ বিপদভঞ্জনের পরামর্শ মত তাই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। হরিহর পাশের ঘরে বসে কয়েকটা পয়সা ঠং ঠং করে বাজাতে থাকেন। ভৃত্য পুষ্পরেণুকে জানায় কাকার সেবা না করলে কাকার প্রচুর অর্থ থেকে সে বঞ্চিত হবে। পাশ থেকে সে কাকার পয়সা গোনার শব্দ শোনায়। এরপর পুষ্পরেণু হঠাৎ কাকার প্রতি ভক্তিবান হয়ে পড়ে, কবিবন্ধুদের খেদিয়ে দেয়। গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে। কাকা হরিহরেরও পরিবর্তন আসে। কারণ ডাক্তার

---

১. প্রবাহ / ১২৮৯, আষাঢ় / দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত / পৃঃ ৭৬

তাঁকে ওষুধ দিয়েছেন তেঁতুল গোলা জল। নাটকের শেষ তিনি ডাক্তারকে এজন্য তিরস্কার করেন।

'ম্যানিয়া' নাটিকায় বিপদভঞ্জন কবিরাজের মুখে কয়েকটি টোট্‌কা সম্পর্কিত ছড়া দেওয়া হয়েছে, এগুলি হাস্যরস উদ্রেক করেছে,—বিপদভঞ্জন হরিহরকে জানিয়েছেন বাজে ওষুধ না খেয়ে—পেট ফাঁপলে,—

"নুন যোয়ানে মিশিয়ে খাবে।
পেট ফাঁপানি ভাল হবে।"

কিংবা

"তলপেটটা মালিশ করো
সাবান ঘসা জলে।
পেট ফাঁপাটি যাবে তোমার
দেখবে অবহেলে।।"

কবি পুষ্পরেণুর কবিতা বাতিক ঘুটে গেছে হরিহরের টাকার শব্দ শুনে। সে ছড়ার মাধ্যমে তার এই অবস্থার বর্ণনা করেছে টাকার বন্দনার মাধ্যমে,—

"টাকা ধর্ম, টাকা কর্ম, টাকা ব্রহ্মগুরু।
টাকা ইষ্টি, টাকা মিষ্টি, টাকা কল্পতরু।।"

সহজ সরল হাস্যরসাত্মক এই নাটিকাটি কুমারেশের হাস্যরসিক মনটির পরিচয় তুলে ধরেছে। Humour এই নাটকের হাস্যরসের আধার।

ফ্যাসান ট্রেনিং স্কুল ঃ

১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য লেখা রঙ্গব্যঙ্গামূলক নাটিকা 'ফ্যাশান ট্রেনিং স্কুল' প্রকাশিত হয়। এই নাটিকায় কুমারেশ ঘোষ 'দৃশ্য' বা 'গর্ভাঙ্ক' নামকরণের মাধ্যমে এক একটি অংশ চিহ্নিত করেননি—এগুলির নাম করেছেন 'ঘটনা'। 'ফ্যাশান ট্রেনিং স্কুল' নাটিকাটি দশটি 'ঘটনা'য় বিভক্ত।

শিক্ষিতা আধুনিকা রমণী মাধবী রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। যানবাহন চলছে অনবরত। সেখানে যে ৯/১০ মাসের একটি শিশুকে দেখতে পায়। শিশুটিকে তার মা বাবার কাছে পৌছে দেবার জন্য সে চীৎকার করে—কিন্তু কেউ বাচ্চাটিকে নিতে আসে না। মাধবী তখন তাকে ঘরে নিয়ে যায়। নিজে সে কুমারী মেয়ে, বেকার, একা থাকে। শিশুটিকে নিয়ে গিয়ে তার ফ্যাসাদ হল। রাঁধুনির কাছে সে ছেলেটিকে রেখে তবে কাজ খুঁজতে যেতে পারে।

তৃতীয় ঘটনার শুরু এক উগ্র আধুনিকাদের স্কুলে। লতিকাদিকে আধুনিকা ছাত্রীরা বিদায় জানাচ্ছে। এ সময় তারা মিস্ মিত্রিরকে মিস্ মিটার না বলার জন্য প্রধানা শিক্ষিকার কাছে ধমক খেয়েছে। প্রগতির নামে মেয়েরা নিজেদের নাম পরিবর্তন করেছে লীলা হয়েছে লিলি, কেতকী হয়েছে কিটি, মলিনা হয়েছে মলি, লতিকা হয়েছে লোটী। প্রধানা শিক্ষিকা তাদের ট্রেনিং দিয়েছে কীভাবে ফ্যাশান-দুরস্ত হতে পারা যায়—শোয়া, বসা, কথা বলা, জামা কাপড় পরায় এক কথায় দৈনন্দিন চলন-বলনে।

চাকরী খুঁজতে খুঁজতে মাধবী আসে আধুনিকাদের স্কুলে। ইন্টারভিউ-এর সময় সে প্রধানা শিক্ষিকাকে খুশী করার জন্য জানায় সে ব্যায়ামচর্চায় উৎসাহী, কাপ ডিস ভাঙায় দক্ষ। অর্ধেক বেতনে মাধবী চাকরী পায় কিন্তু মেয়েরা তার পিছু লাগে। চাকরী হারাবার ভয়ে মাধবী মেয়েদের ব্যঙ্গ সহ্য করে।

এ সময় জানা যায় শিশুটি রমার দিদির। রমা স্কুলের ঝি হরিপ্রিয়াকে জানায় শিশুটিকে খুঁজে দিতে পারলে একশ টাকা পাবে। মেয়েরা হঠাৎ মাধবীর ঘরে গিয়ে শিশু প্রদীপকে দেখতে পায়। মাধবীকে ব্যঙ্গ করে ম্যাডোনাদি বলে। তারপর মাধবীর কাছে আদ্যোপান্ত সব কথা শুনে মেয়েরা প্রধানা শিক্ষিকার বিরুধে বিদ্রোহ করে অতি আধুনিকতার অবসান ঘটায়। এবং মাধবীর চাকরী রক্ষা করে। শিশু প্রদীপ তার মার কাছে ফিরে যায়। শিশু প্রদীপের কল্যাণে মেয়েদের চৈতন্যোদয় হয়।

এই রঙ্গ নাটিকাটিকে ঠিক প্রহসন বলা যায় না। তবে প্রহসনের অনেকগুলি লক্ষণ এতে বর্তমান। হাস্যরস পরিবেশনের যে রীতি এখানে গৃহীত বলাবাহুল্য, তা ব্যঙ্গ বা wit। যে সব স্কুলে শিক্ষার পরিবর্তে আধুনিক হবার, প্রগতিশীল হবার জন্য বেশি জবরদস্তি করা হয়, এই নাটিকায় তাদের রূপ চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একটি শিশুর হারিয়ে যাওয়া এবং তার ঘরে ফিরে যাওয়ার মধ্যেও একটি প্রতীক কাজ করেছে। সভ্যতার অভিমানে রমণীরা পথে বেরিয়ে এসেছে এবং বাইরের পরিবেশে এসে শত বিরুদ্ধতার ও সহস্র কৃত্রিমতার মুখোমুখি হয়ে পুনরায় নিজের ঘরে ফিরে গেছে। এই নিয়েই 'প্যাশন ট্রেনিং স্কুল' নাটিকা।

কবিসুলভ মানসিকতায় কুমারেশ ঘোষ এ নাটকেও আচ্ছন্ন। 'ম্যানিয়া'র মত এ নাটকেও আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গ আছে। বস্তুতপক্ষে চতুর্থ দশক থেকে বাংলা হাস্যরসাত্মক নাটিকায় আধুনিক কবিতাকে ব্যঙ্গ করা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গযুক্ত কিংবা অপ্রাসঙ্গিকভাবেও পর পর আধুনিক কবিতা একালের বহু নাট্যকারের ব্যঙ্গের খোঁচা খেয়েছে। এ ব্যাপারে বনফুল, কুমারেশ ঘোষ ও সুধীর সরকারে হাস্যরসাত্মক নাটিকাগুলি দৃষ্টান্ত বিশেষ। কুমারেশ ঘোষ 'ফ্যাশান ট্রেনিং স্কুল' নাটিকাতেও আধুনিক কবিতাকে ব্যঙ্গ করেছেন 'ডাস্টবিন' কবিতার মাধ্যমে,—

"ডাস্টবিন, ধন্য তুমি!
যত জঞ্জাল—অস্পৃশ্য,
মরা বেড়াল, ভাত-তরকারি,
ছেঁড়া নেকড়া, ভিজে-তুলো
সব স্থান পায় তোমার মাঝে।
এ কালের নিলকণ্ঠ তুমি!"

অনাবিল হাস্যরসের উৎসারে 'ফ্যাসান ট্রেনিং স্কুল' একটি সার্থক প্রহসন জাতীয় নাটিকা।

কুমারেশ ঘোষের আর একটি রঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটিকা হল 'যম' (১৩৬০?) একটি একটি পূর্ণাঙ্গ হাস্যপরিহাসমূলক নাটক। তাঁর 'ছুটি' (১৯৭৬, ৪ এপ্রিল) হাস্যরসাত্মক নাটিকাটি আকাশবাণী কর্তৃক প্রচরিত হয়।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (১৯০৫-৯১)

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বিরূপাক্ষ ছদ্মনামে একসময় বাঙালী পাঠককে হাসিয়েছেন—শিক্ষা দিয়েছেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ একজন স্যাটায়ারিস্ট। তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চাবুকে অনেক বাঙালীর সেদিন চৈতন্যোদয় হয়েছিল। জনৈক সমালোচক বলেছেন,—

> 'নীতিশাস্ত্র বিশারদগণের বক্তৃতা অপেক্ষা কবির ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা সমাজের অনেক উন্নতি হইয়া থাকে।''[১]

মিনার্ভা, রঙমহল ও রূপমহলরঙ্গমঞ্চে এককালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের প্রতাপ ছিল দারুণ। তিনি নাট্য পরিচালনা করেছেন সগৌরবে। ১৩৪১ (১৯৩৪) বঙ্গাব্দে তাঁর লেখা 'ঝঞ্ঝা' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ আগস্ট তাঁর লেখা 'ভোট ভণ্ডুল' রূপমহল রঙ্গমঞ্চে (পরবর্তীকালে আবার নাম হয় রঙমহল) অভিনীত হয়। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় (বিরূপাক্ষের) 'ঝঞ্ঝাট'। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মঞ্চের প্রয়োজনে অনেক গল্প কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত হাস্যরসাত্মক গল্প 'সুবর্ণগোলক'-এর কাহিনী অবলম্বনে 'সুবর্ণগোলক' নাটক রচনা করেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ মার্চ 'সুবর্ণগোলক' মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

তারাকুমার মুখার্জীর (১৯০২-৬১) 'জীবনরঙ্গ' (১৯৪১), নিতাই ভট্টাচার্যের 'উড়ো চিঠি' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় তাঁর সরস মেজাজের পরিচয় মেলে। তাঁর নাটক 'বিশেষ রজনী' (১৩৫১), 'গণশার বিয়ে' (১৩৫৯)-কে লঘু রসাত্মক নাটক বলা যেতে পারে। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'নিতাই গড়গড়ির বৌ' সুদর্শনম কর্তৃক ঐ বৎসরই অভিনীত হয়। জীবনসরসিক বিভূতিভূষণের স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি এই নাটিকাগুলিকে প্রকাশিত।

পরিমল গোস্বামীর (১৮৯৯) 'দুষ্যন্তের বিচার' (১৯৪৩), 'ঘুঘু' (১৯৪৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'বন্দনার বিয়ে' (১৯৪৪, শ্রীরঙ্গম, ২৬ অক্টোবর) মহেন্দ্র গুপ্তের 'স্বর্গ হতে বাধা' (স্টার, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭), আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-৮৪) রচিত 'মনীশের বউ' (স্টার, ১৯৪৬, ৩০ এপ্রিল), দিলীপ দাশগুপ্ত রচিত 'শনিবার বৈসে' (১৯৪৭, ৭ মে, স্টার), তারক মুখার্জী রচিত 'অতঃপর' (কালিকা থিয়েটার, ১৯৪৮, ১৪ এপ্রিল) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা লাভের লগ্নে ব্যক্তিগত ভুল ত্রুটিকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে মন ওঠে নি কারো। তাই ১৯৪০-এর পর থেকে প্রায় পনের বৎসর আবার বাংলা প্রহসনের তথা হাস্যরসাত্মক নাটকের ধারার মন্দা যুগ দেখা দেয়। ছয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলা প্রহসন আবার একটা পথ খুঁজে পায়—ফিরে পায় মঞ্চে তার দর্শককেও।

---

১. বঙ্গদর্শন / ১২৮০, শ্রাবণ / হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয় / শ্রীরামদাস সেন

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা প্রহসনের রূপান্তর ও অগ্রগমন

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশের বুকে নেমে এসেছিল প্রাকৃতিক দুর্বিপাক। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকাগুলি প্রবল সামুদ্রিক ঝড় ও বন্যায় প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকেই জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় এই এলাকায় খাদ্যশস্যকে সরিয়ে ফেলা হয়, নয় তো নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার গড়ে তোলার অপরাধে অপরাধী যে এলাকার লোক তাদের উপর সরকারের সাথে সাথে প্রকৃতিও ভীষণ অবিচার করে বসল। সারা বাংলায় এর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ল। পঞ্চাশের (১৩৫০) মন্বন্তরে বাংলা মরুভূমি হতে বসল। এই রকম এক সর্বনাশের চূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রহসনকারেরা হাস্যরোলে ফেটে পড়ার নাটক লিখতে পারেন নি—দর্শকেরাও হাসির দমকে শরীর দুলিয়ে আনন্দ পাবার জন্য থিয়েটারে আসতে পারেন নি। এ যুগের বাণী বাহক হয়েছে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' প্রভৃতি। ভারত স্বাধীন হল ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট। কিন্তু যে অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেশসেবক যোদ্ধারা দেখেছিলেন তা ভেঙে গেল। এই মুহূর্তে তাই বঙ্গভঙ্গের মানুষেরা চিন্তা করতে লাগলেন ভারতবর্ষকে ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান গড়ে যে স্বাধীনতা পাওয়া গেল তা কতখানি খাঁটি? একদিকে সদ্য স্বাধীন হবার ঘোর, অন্য দিকে দু'শ বৎসরের পরাধীনতার পর প্রাপ্ত স্বাধীনতার যাথার্থ্য সম্পর্কে চিন্তন-অনুচিন্তনের মধ্য দিয়ে কেটে গেল আরও কয়েকটা বছর। জীবনে স্বাভাবিকতা আসার সাথে সাথে মানুষ আবার চাইল হাসির স্রোতে গা ভাসিয়ে দৈনন্দিন জীবন সমস্যার চাপ কমাতে, স্বাধীন দেশের নেতার কাদের কথার অমিল দেখাতে। ফলে আবার রচিত হতে লাগল হাস্যরসাত্মক নাটক। দেশের রঙ্গমঞ্চগুলিতে সগৌরবে অভিনীত হতে থাকল প্রহসনগুলি।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর রচিত হাস্যরসাত্মক নাটকগুলির মধ্যে স্পষ্টত দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়,—

(i) দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা-অবলম্বী চিরাচরিত ধারায় রচিত হাস্যরসাত্মক নাটিকা।

(ii) রাজনৈতিক আদর্শানুসারী কিছুটা একদেশদর্শী হাস্যরসাত্মক নাটিকা।

প্রথম শ্রেণীর নাটিকায় প্রহসনের ধারার পূর্বানুসৃতিই লক্ষণীয়, কিন্তু দ্বিতীয় ধারাটি কিছুটা স্বতন্ত্র। এগুলি মূলত ভোটকেন্দ্রিক পোস্টার নাটিকা। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দাদাঠাকুর প্রমুখ ভোটকে কেন্দ্র করে যে হাস্যরসাত্মক নাটিকা, গান ও ছড়া রচনা করেছিলেন অত্যাধুনিক এই ধারাটির সঙ্গে তার বিশেষ কোন মিল নেই। কারণ পূর্বের ভোটকে কেন্দ্র করে রচিত প্রহসনগুলিতে ছিল হাস্যরসের সহজ উৎসার—তার মূল ভিত্তি ছিল হিউমার কিন্তু বর্তমানে এই নাটিকাগুলির মূল উদ্দেশ্য ব্যঙ্গের তীব্র খোঁচায় প্রতিপক্ষকে

ধরাশায়ী করা। একথা সত্য যে সাহিত্য হিসেবে এগুলির মূল্য নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর।[১] তবু হাস্যরসাত্মক নাটকের ধারাটিকে অনুভব করার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এই নাটিকাগুলির নামোল্লেখ একান্ত কর্তব্য।

বিশ শতকে যখন থেকে নাটকের দাক্ষিণ্য-ব্যতীত প্রহসন এককভাবে নিজস্ব গৌরবে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে শুরু করল—সেখানে প্রায়শই একটা ব্যাপার দেখা গেল—তা অধিকাংশ প্রহসনই প্রহসনের দৈর্ঘ্য বিষয়ক সীমা লঙ্ঘন করে চলেছে। কারণ এককভাবে অভিনীত হবার জন্য দু'অঙ্কের মধ্যে সীমিত নাটিকা যথেষ্ট নয়। এর ফলে প্রহসন জনপ্রিয় হয়েছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রহসনগুলি নিজ আঙ্গিক হারিয়ে হাস্যরসাত্মক নাটিকায় পর্যবসিত হয়েছে।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মন্মথ রায় প্রথম সার্থক একাঙ্ক নাটিকা রচনা করলেন। শুধু গুরুগম্ভীর ভাব নয়—মন্মথ রায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখের হাতে রচিত এই একাঙ্কিকাগুলিতে কখনও বীররস, কখনও করুণ রস, কখনও বা হাস্যরসের মূর্ছনা লক্ষ্য করা গেল। পঞ্চাশের পর একাঙ্ক নাটক এদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সে সময় থেকে প্রহসনের উপর যে হাস্যরস বিতরণের একক দায়িত্ব ছিল—তা যেন একাঙ্কিকাও সমানভাবে ভাগ করে নেয়। ফলত প্রহসন বলা হয় সেই নাটিকাকে যা এক অঙ্ক থেকে দুই অঙ্ক পর্যন্ত দীর্ঘ। সে অর্থে একাঙ্কিকায় হাস্যরস প্রধান হয়ে উঠলে দৈর্ঘ্যে দিক থেকে তাকে প্রহসন বলায় আপত্তি না থাকাই স্বাভাবিক। আবার যেহেতু নাটকটির আয়তন এক অঙ্কে সীমাবদ্ধ সেহেতু তাকে একাঙ্ক নাটকও বলা যেতে পারে।

এখানে আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার মন্মথ রায়ের হাতে বাংলার প্রথম সার্থক একাঙ্ক নাটকের জন্ম হলেও বাংলায় নাটক রচনা শুরু হবার অব্যবহিতকাল পর থেকেই এক অঙ্কেও কিছু নাটক রচিত হয়েছে। অধিকাংশ হাস্যরসাত্মক নাটিকাগুলি নক্সাধর্মী নাটিকাগুলি, সাময়িক পত্রাদির পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, অমৃতলাল রচিত কৌতুক নাট্যগুলি প্রায় কখনই এক অঙ্কের চেয়ে দীর্ঘ হয় নি। তবে এই ক্ষুদ্র নাটিকাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠের জন্য রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে, অন্যদিকে মন্মথ রায়ের পরবর্তী একাঙ্ক নাটিকাগুলি মূলত অভিনয়ের জন্য রচিত হয়েছে।

শ্রীরঙ্গম ও অন্যান্য কয়েকটি মঞ্চে যখন একাঙ্ক নাটক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তখন বাঙালী দর্শক (বেশীর ভাগ) বড়ো রঙ্গমঞ্চে সিরিয়াস সামাজিক বা ঐতিহাসিক নাটক দেখেই তৃপ্তি পেয়েছেন। সাতের দশক থেকে রঙ্গমঞ্চে দর্শক আকর্ষণ করতে আবার নিয়মিত হাস্যরসাত্মক নাটক অভিনীত হতে শুরু হওয়ায় বেশ কিছু হাস্যরসাত্মক নাটক রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। 'দর্পণা', 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ' প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়,

---

১. মানবতাবাদে বিশ্বাসী নাট্যকার ব্রেশটও যে মন্তব্য করেছেন তাতে তাঁকে এ ধারার সমর্থক বলে মনে হয়—

"বহির্জগতের নিয়ত পরিবর্তনশীল বাস্তব, মানুষের অন্তর্জগতে পুনর্বিন্যাস সৃষ্টি করে; ফলে আমরা এক প্রত্যক্ষ বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করি; কারণ আমাদের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ নিখুঁত নয়। তাই বহির্জগতের এই পরিবর্তনশীল বাস্তবকে আমরা 'অ-সঙ্গত' আখ্যা দিই।"

ব্রেশট্ ও তাঁর থিয়েটার/সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়/পৃঃ ১৩৩

জহর রায়, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, অনুপকুমার দাস প্রমুখের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বেশ কয়েকটি হাস্যরসাত্মক : নাটক দর্শকদের হাসির খোরাকও জুগিয়েছে।

বাংলাদেশে বেতারের প্রচলন ও জনপ্রিয়তার মূলে অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে রয়েছে হাস্যরসাত্মক নাটকও। বেতারে প্রচারিত বহু নাটক পরবর্তীকালে অসাধারণ মঞ্চসফল নাটকরূপে পরিচিত হয়েছে। মনোজ মিত্র রচিত 'চোখে আঙুল দাদা' এইরকমই একটি হাস্যরসাত্মক নাটক। তাছাড়া দূরদর্শনের প্রচার ও জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে দূরদর্শনে অভিনীত হাস্যরসাত্মক নাটিকাগুলির কথ্য উল্লেখ করতে হয়। বেতারের তুলনায় দূরদর্শনে পরিবেশিত নাটিকাগুলির জনপ্রিয়তার সম্ভাবনা স্বাভাবিক কারণেই বেশি।

শৈলেশ গুহনিয়োগী (১৯৩১-) ঃ

'ক্যালকাটা মেরিমেকার্স ক্লাবে'র (Calcutta Merrymakers' Club) কর্ণধার শৈলেশ গুহনিয়োগী এই শতকের ছয়ের দশকের একজন শক্তিশালী একাঙ্ক নাট্যকার। সমাজসচেতন নাট্যকার শৈলেশ গুহনিয়োগী সমাজের অন্যায়, অবিচার, অপরাধ দুর্নীতিকে দেখেছেন। দেখেছেন সর্বনাশা রাজনৈতিক চাকুরীর চক্রে নেতাদের হাতে কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনে সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। নাটকেও সে সব রূপ এঁকেছেন ; তবে বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে তাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় এ কারণে যে তিনি ব্যঙ্গ-কৌতুকের মাধ্যমে তাঁর ঐ বিশেষ মনোভাবটি ব্যক্ত করেছেন—হাস্যরসের স্পর্শে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন সেই সব শোষণের ঘটনাকেও। শৈলেশ গুহনিয়োগীর প্রাহসনিক সত্তার বিচার করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক যে কথা বলেছেন এখানে সেটুকু উদ্ধৃত করে দিলাম,—

".....নাট্যকারের কৌতুকোচ্ছল মনের একঝলস আলো পড়ে জীবন তার বেদনা-যন্ত্রণার সমস্যা সঙ্কট নিয়েই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। লঘু কৌতুক-হাস্যেরএরূপ অনায়াস স্বতোৎসারণ সম্প্রতিকালের খুব কম নাট্যকারের মধ্যেই পাওয়া যায়।

অবশ্যই বলা প্রয়োজন শৈলেশ গুহনিয়োগী ঠিক যেন সরিয়াস নন—সমাজ-সমস্যার গভীর মূলানুসন্ধান বা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তাঁর নাটকে কোথাও নেই ; তিনি জীবন সমুদ্রের উপরিভাগের ফেনোচ্ছল তর-ভঙ্গাকে দেখেছেন, কিন্তু তার অনন্ত প্রসার বা দূরবগাহ গভীরতার কোন পরিচয় তাঁর নাটকে আদৌ পাওয়া যায় না। তাঁর হাস্যরসেও হিউমারের হাসি-কান্নার শ্রাবণী মহিমা পাওয়া যায় না, স্যাটায়ারের তীক্ষ্ণতা বা উইটের শাণিত দীপ্তি নেই—তা মনন প্রকর্ষ বর্জিত হয়ে যেন নিতান্তই ছ্যাওলামিতে পর্যবসিত।?"[১]

শৈলেশ গুহনিয়োগীর নাটিকাগুলি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার সেন্টার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। এগুলি হাস্যরসের উচ্ছ্বলতায় সমাদর পেয়েছিল সেদিনের রসপিপাসু দর্শকদের কাছে। তবে একথা বলা একান্ত প্রয়োজন—এই সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামাধ্বনি যাঁরা তাঁর নাটিকায় শুনতে চেয়েছিলেন তাঁরা একান্ত হতাশ হয়েছিলেন। সামাজিক অনাচারের ও অত্যাচারের জঘন্যতার, রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হওয়া মানুষদের চোখের সামনে দেখে—সেই অত্যাচার ও চক্রান্তের চিত্রের মাধ্যমে হাস্যরসের

১. আধুনিক বিশ্বনাট্য সাহিত্য/দিলীপকুমার মিত্র/পৃঃ ১৮৩

স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহে বইয়ে দেবার জন্য নাট্যকারের যে কতখানি ক্ষমতা প্রয়োজন—তার কথা কেবল তাঁরাই অনুভব করতে পারেন, সাহিত্য মানেই প্রতিবাদ, একথা যাঁরা ভাবেন না।

শৈলেশ গুহনিয়োগী রচিত প্রথম নাটিকা 'কলেজ হস্টেল' (১৯৫৪) ক্যালকাটা মেরিমেকার্স ক্লাব কর্তৃক অভিনীত হয়। হাসির তারল্যে রসাল তাঁর 'গোলপার্ক' নাটিকাটিও। 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' (১৯৫৫) নাটিকাটিতে সামাজিক অন্যায় দূর করার জন্য তিনি এক কল্পনাসর্বস্ব ঘোর পথ অবলম্বনের কথা বলেছেন। 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ক্যাম্প III', 'রিহার্সাল', 'ভগবান গ্রেপ্তার', 'বিবাহ বিভ্রাট' 'ভুতের মুখে রাম নাম', 'টেক্কা', 'ফ্লু', 'রিএ্যাক্সন', 'বৌদির বিয়ে', 'গভীর জলের মাছ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য হাস্যরসাত্মক নাটিকা। শৈলেশ গুহনিয়োগীর হাস্যরসাত্মক অধিকাংশ নাটিকাই একাঙ্কের। তাঁর এই ধরনের নাটিকাগুলির কয়েকটি ১৯৫৭-র নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। সে হিসেবে এগুলিকে পোস্টার নাটিকাও[১] বলা যেতে পারে। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুলাই তাঁর লেখা হাসির নাটিকা 'জীবনরঙ্গ' আকাশবাণী কর্তৃক প্রচারিত হয়।

সুনীল দত্ত (১৯২৬—২০০৬) :

বিশ শতকের পাঁচ ও ছয় দশকের নাট্য আন্দোলনের একজন ঋত্বিক সুনীল দত্ত। বাম রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এই মানুষটি স্বাধীনতার পরকবর্তীকালে নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'জবাব', 'মালাবদল' প্রভৃতি একাঙ্ক নাটিকা। ১৯৫৭ সালে রাজ্য নির্বাচন উপলক্ষ্যে তিনি অনেকগুলি হাস্যরসাত্মক পোস্টার নাটিকা রচনা করেছিলেন। তাঁর এই নাটিকাগুলির কোনটির বিষয় নব-সংবিধানের দুর্বলতা, কোনটির বা শিক্ষান্ত বিষয়ক সরকারী পদক্ষেপে গাফিলতি, আবার কোন প্রহসনে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক জগতের অসাম্যকে ব্যঙ্গের তীব্র খোঁচায় উস্কে দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে। মানবতাবাদী বামপন্থী নাট্যকার এখানেকিছুটা সফল হয়েছেন। তবে একথা ঠিক, পার্টির হ্যান্ডবিলের উপর ভিত্তি করে পোস্টার নাটক লেখা হয়। তাই অধিকাংশ জায়গায় নাটিকাগুলি পার্টির বক্তব্যসর্বস্ব হয়ে যাওয়ায় এগুলির সাহিত্যমূল্য কমে যায়। কিন্তু সুনীল দত্তের কোন কোন পোস্টার নাটিকা কোন কোন জায়গায় অনবদ্য সাহিত্য হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখা হাস্যরসাত্মক নাটিকাগুলি হল—'ভাঙাতরী' (১৮৫৭), 'বিপুলের সংসার' (১৯৫৭), কেরালা নির্বাচন উপলক্ষে লেখা ১৯৫৮ তে 'সংবিধান বিভ্রাট', 'শিক্ষা বিভ্রাট'। এছাড়া 'হবু রাজার দেশে', 'ভূতের খপ্পরে', 'হঠাৎ রাজা', 'চোদ্দ পাকে' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য হাস্যরসাত্মক নাটিকা।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) (১৮৯৯—১৯৭৯)

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বাংলা প্রহসনের জগতে আর একটি অবশ্য উচ্চার্য নাম। তিনি অত্যন্ত সংক্ষেপে এমন নাটকীয়ভাবে কোন ঘটনার উপস্থাপন করতে সক্ষম ছিলেন যে

---

১. পোস্টার নাটিকার প্রচারধর্মিতাই প্রধান। একদেশদর্শিতা এই শ্রেণীর নাটকের প্রধান দোষ। ব্যঙ্গের চাবুক সদাই আস্ফালন করে এতে, তাই এগুলি সার্থক নাটিকা নয়। ওর ব্যঙ্গ ওই রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী মানুষের কাছে হাসির খোরাক জোগায় বলে এর রস হাস্য বলেই বলা যায়। যদিও তাকে আক্রোশ রস বলাই বাঞ্ছনীয়।

তা যে-কোন পাঠকের বিস্ময়ের উদ্রেক করত। তাঁর 'দশ ভান ও আরও কয়েকটি' গ্রন্থে তিনি কতকগুলি হাস্যরসাত্মক নাটিকা সংকলিত করেছিলেন। এগুলি হল—'লেহ্য', 'জল', 'নব সংস্করণ', 'বাণপ্রস্থ', 'কবয়ঃ', 'কবিতা-বিভ্রাট'। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত হয়েছিল এই নাটিকাগুলি।[১] এগুলি ছাড়াও 'মন্ত্রমুগ্ধ' (১৩৪৫), 'কাঞ্চি' (১৩৫৬) প্রভৃতি কয়েকটি নাটক বনফুল রচনা করেছিলেন।

লেহ্য ঃ

'লেহ্য' নাটিকায় রয়েছে এক বেকার যুবক হরেনের উদ্ভট স্বপ্নদর্শন। চাকুরী প্রার্থী সে। ত্রিশ টাকা মাইনেতে স্কুলে মাস্টারী নেবার জন্য চপলাকান্তবাবুর কুকুরের মুখোশ পরে তার পা চাটতেও তার আপত্তি নেই। গানের মাস্টারী নিতে গিয়ে চপলাকান্ত বাবুর লেখা গান গাইতে হয় তাকে, বিদ্রূপ এই গানের ছত্রে ছত্রে উপ্ত,—।

"তু তু তু করে ডাকবে যখন,
ল্যাজটি নেড়ে আসব তখন,
লুটিয়ে পড়ে চাটব চরণ—
রাতুল চরণে রে।"

শেষ পর্যন্ত হরেনের ঘুম ভেঙে যায়। বোঝা যায় সিদ্ধি খেয়ে ঝিমিয়ে পড়ে সে স্বপ্ন দেখেছে। শেষে অবশ্য তার চাকরী মিলেছে। এই নাটিকায় ছদ্ম-সমাজ-সেবক শিক্ষায়তনের কর্ণধারদের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি প্রহসনকারের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তবে রক্ষে এই, বিদ্রূপের সবটাই দেখানো হয়েছে সিদ্ধির ঘোরে স্বপ্নের মধ্যে। তাই আঘাত লক্ষ্যভেদী হলেও কাউকে রাগিয়ে দেওয়া যেন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না এ ভাবনা নাট্য শেষে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'জল' নাটিকায় আর্য-অনার্যের ভেদাভেদ দেখানো হয়েছে অক্সিজেন-হাইড্রোজেনের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। একটি ফ্লাস্কে স্থিত হাইড্রোজেন গোষ্ঠী মনে করেছে যে 'আমাদের ধর্ম আজ বিপন্ন'। প্রথম হাইড্রোজেনের বক্তৃতার মধ্যে খবর এল ৮ম হাইড্রোজেনের কন্যাকে অক্সিজেনরা হরণ করেছে। দারোগা সাহেব যদিও অক্সিজেন গোষ্ঠীর, তবু থানায় খবর দেওয়া হল। বলাইচাঁদ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে 'ধর্ম ধর্ম' করে চীৎকার করে যারা বাজিমাৎ করতে চায় তাদের আঘাত করেছেন। দ্বিতীয় হাইড্রোজেন বলেছে—"আমার প্রথম সন্দেহ, তুমি এই যে আজ হঠাৎ 'ধর্ম ধর্ম' ব'লে চেঁচিয়ে একটা হৈ চৈ বাধাবার চেষ্টায় আছ, এর মূল কারণ তোমার ছেলে চাকরি পায়নি, একটি অক্সিজেন যুবক পেয়েছে। আমার দ্বিতীয় সন্দেহ, এই যে হাইড্রোজেন কুমারীটি অক্সিজেন-গুন্ডা কর্তৃক অপহৃত হয়েছে, এর মূল কারণ ওর বাপটি অপদার্থ। খুব সম্ভবত ওই মেয়েটির কাছ থেকে ওই গুন্ডার দল প্রণয়ঘটিত কোনরূপ ইসারাও পেয়েছিল, তা না হ'লে দিনে দুপুরে—ইত্যাদি।"

---

১. বলাইচাঁদের এই নাটিকাগুলি অধিকাংশই শুধু এক অঙ্কে রচিত নয়, দৃশ্যও রয়েছে মাত্র একটি করেই।

অক্সিজেনদের জাতীয় সঙ্গীত 'আমরা আর্য, আমরা অক্সিজেন'। হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের কলহ নিয়ে সভা বসল। সভাপতি সিদ্ধান্ত নিলেন উভয়ে দোষী হলেও হাইড্রোজেন একটু বেশি দোষী। এই সময় ভিড়ের ভিতর থেকে একটি জুতা এসে লাগে প্রথম হাইড্রোজেনের বুকে, জনৈক অক্সিজেন চীৎকার করে ওঠে 'মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিয়েছে'। এই অবস্থায় গণ্ডগোলের সময় দেখা গেল হাইড্রোজেন-অক্সিজেন মিলে হঠাৎ জল হয়ে গেছে ফ্লাস্কের ভেতর।

এই নাটিকায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এমনভাবে জাতিতত্ত্বের পরিণতি বোঝানো হয়েছে যার ফলে নাটিকাটি কেবল হাসির নাটিকা হয়ে থাকেনি। এর মঞ্চ পরিকল্পনাও অভিনব—একটি কাঁচের ফ্লাস্ক হল মঞ্চ। তবে পরিণতিতে সামান্য রসাভাসের ইঙ্গিত মেলে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে জল হবার পূর্বে তাদের চার্জ করা দরকার। নাটিকায় সে চার্জের কাজ করেছে 'মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেয়া। এবং এর পরই দেখা গেল ফ্লাস্কে দুই গ্যাস মিলেমিশে জল হয়ে গেছে। এর হাস্যরস কখনও উচ্চকিত নয়।

নব সংস্করণ ঃ

বলাইচাঁদের 'নব সংস্করণ' নাটিকাটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এটি দূরদর্শনে, আকাশবাণীতে[১] এবং রঙ্গমঞ্চেও বহুবার অভিনীত হয়েছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ—

পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট রক্ষিতের মেয়ে অপর্ণা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। পুলিশ বহু চেষ্টা করেও তার খোঁজ পায়নি। তারা রক্ষিতের নির্দেশ অনুসারে কয়েকজন কলেজের ছেলেকে ধরে এনেছে। ছেলেরা অপর্ণাকে যে চিঠি দিয়েছিল তার উপর ভিত্তি করেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিবারণ স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ। রক্ষিতের বন্ধু তিনি। 'লাভ-লেটার' লেখার জন্য ছেলেদের অ্যারেস্ট করায় তিনি ক্ষুব্ধ। রক্ষিত ছেলেদের উপর অত্যাচার করে আসল সত্য প্রকাশ করতে অর্থাৎ কন্যাকে উদ্ধার করার পথ বের করতে চাইলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। নানা ঘটনার পর জানা গেল কলেজের ফিলজফির প্রফেসর মঙ্গলময়বাবু অপর্ণাকে বিয়ে করেছেন। মঙ্গলময় জাতিতে সদগোপ। অসবর্ণ বিবাহ বলেও এই গোপনীয়তা অবলম্বন। রক্ষিত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন,—'I want an explanation!' মিলনের মধ্যে 'নব সংস্করণ' নাটিকার উপসংহার ঘটেছে। নির্মল হাস্যরস এ নাটিকাটিকে সার্থক করে তুলেছে। চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকারের সামর্থ্য প্রমাণিত।

'কবয়ঃ' এবং 'কবিতা-বিভ্রাট' দুটি নাটিকাই হাস্যরসাত্মক। আধুনিক কবিতাকে নিয়ে কিছু ব্যঙ্গও রয়েছে এ দুইটিতে।

কিরণ মৈত্র (১৯২৪-) ঃ

একাঙ্ক নাট্যকার রূপে পরিচিত কিরণ মৈত্র হাস্যরসাত্মক নাটক রচনায় ছয়ের দশকে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা কয়েকটি হাস্যরসাত্মক নাটক মঞ্চে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর লেখা 'নাটক নয়' নাটিকাটি অভ্যুদয় নাট্যসংস্থা কর্তৃক ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও অভিনীত হয় 'বারো ঘন্টা' নাটিকাটি একই নাট্যসংস্থার দ্বারা। ১৯৮০-র পর প্রকাশিত 'টোপর বদল হলো', 'কেঁচে গণ্ডুষ',

১. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'নব-সংস্করণ' নাটিকাটি দূরদর্শনে প্রচারিত হয় ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে।

'ভজ গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি তাঁর হাস্যরসাত্মক মাঝারি আকারের নাটক। কিরণ মৈত্রের লেখা স্ত্রীভূমিকাবর্জিত কয়েটি হাস্যরসাত্মক নাটকও বর্তমানে যথেষ্ট জনপ্রিয়—এই নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'এপিডেমিক' (১৯৬০), 'এদের রাখবো কোথায়' (১৯৬০), 'কালমেমির লঙ্কাভাগ' (১৯৬৫), 'বিশ পঞ্চাশ', 'এলোপাথাড়ি', 'যা হচ্ছে তাই', 'যা হলো তাই', 'তেলে জলে', 'মেয়ে দেখা', 'কাজের মেয়ে' প্রভৃতি।

বীরু মুখোপাধ্যায় (১৯২৬-৮৯) ঃ

কখনও মঞ্চের প্রয়োজনে কখনও-বা কোন নাট্যসংস্থার তাগিদে এখনকার অনেক নাট্যকারের মত বীরু মুখোপাধ্যায়ও অনেকগুলি হাস্যরসাত্মক নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি স্ত্রীভূমিকাবর্জিত হাস্যরসাত্মক একাঙ্ক নাটিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'দাদা জন্মালেন' (১৯৬৮), 'সুতরাং' (১৯৬৮) প্রভৃতি। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে তিনি সম্প্রতি কয়েকটি হাস্যরসাত্মক নাটক রচনা করেছেন। বনফুলের কাহিনী অবলম্বনে বীরু মুখার্জী ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন 'অঘটন'। 'অঘটন' নাটকটি হাস্যে-করুণে অপূর্ব আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে অনুপকুমারের নির্দেশনা ও প্রাণবন্ত অভিনয়ে। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে এটি প্রথম অভিনীত হয়। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'অদল বদল' সাফল্যের সঙ্গে বয়েজ ওন হলে অভিনীত হয় ঐ বৎসরই।

অজিত গাঙ্গুলী (১৯২১-৮৪) ঃ

মঞ্চ ও বেতারখ্যাত অভিনেতা অজিত গাঙ্গুলী রচিত হাস্যরসাত্মক নাটক 'নাট্যকারের বিপত্তি' বহুরূপীর দ্বারা অভিনীত হয় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের চতুরঙ্গ নাট্যগোষ্ঠীর দ্বারা। আনাতোল ফ্রাঁসের কাহিনী অবলম্বনে একটি হাস্যরসাত্মক নাটক লেখেন তিনি 'মৌনমুখর'। এচাড়া তাঁর আরও অনেকগুলি হাস্যরসাত্মক নাটিকা রয়েছে 'প্রমত্ত প্রহসন', 'নব স্বয়ম্বর' 'থানা থেকে আসছি', 'বিষণ্ণ প্রহসন', 'মুচিরাম গুড়', 'শকুন্তলা রায়' প্রভৃতি তাঁর অধিকাংশ নাটকের কাহিনী বিদেশী গল্প ও নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

উৎপল দত্ত (১৯২৯-৯৩) ঃ

ফিল্মের জগতের অসাধারণ জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা, বাংলা নাট্য-আন্দোলনের একজন শরিক 'কল্লোল' খ্যাত উৎপল দত্ত নির্বাচন উপলক্ষে বহু পোস্টার নাটিকা রচনা করেছিলেন। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর 'এবার রাজার পালা', 'রাতের অতিথি' বা 'হাঁড়ি ফাটিবে', 'মধুচক্র' (বার্ণাড শ'-এর 'মিসেস ওয়ারেন্স প্রোফেশন'-এর কাহিনী অবলম্বনে লেখা), 'হিমালয়ে জীবন্ত মানুষ' প্রভৃতি রঙ্গনাট্য। এগুলির মধ্যে রঙ্গ আছে, ব্যঙ্গও আছে—তবে নাট্যকারের একদেশদর্শিতাও রয়েছে প্রচুর—যা নাটকগুলিকে সাহিত্য হিসেব সার্থক হতে দেয়নি, জনৈক সমালোচক তাঁর কয়েকটি নাটিকা সম্পর্কে বলেছেন,—

> "তাঁর 'ব্যারিকেড' দুঃস্বপ্নের নগরী ও 'লেনিন কোথায়' নাটকে শুধু বক্রোক্তির চাবুক মারা সপাৎ সপাৎ আওয়াজ, জীবন ও সমাজের সামগ্রিক বাস্তব সত্যের প্রতি চূড়ান্ত বিমুখতা ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়ম লঙ্ঘন....."[১]

---

১. নাট্যচিন্তা ঃ শিল্প জিজ্ঞাসা/দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/পৃঃ ৩৯৭

—লক্ষ্য করা যায় ; এগুলি তাই হাসির নাটক নয়—কিন্তু ব্যঙ্গরস যেহেতু হাস্যরসেরই অন্তর্ভুক্ত সেহেতু ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষার জন্য এই নাটিকাগুলির কথাও উল্লেখ করা গেল।

সরোজ রায়ের লেখা কয়েকটি হাস্যরসাত্মক নাটক এসময় কিছুটা জনপ্রিয় হয়েছিল। —'গরুর গাড়ীর হেড লাইট', 'এই মরেছে', 'ভুল' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটিকা। **বাদল সরকারের** (১৯২৫-) 'বড় পিসিমা', 'সল্যুসন এক্স', 'বাসিখবর', 'রূপকথার কেলেঙ্কারি', লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালি' প্রভৃতি সাতের দশকের উল্লেখযোগ্য নাটিকা।